# উনবিংশ শতাব্দীর
# বাঙলা সাহিত্যে সাম্যচিন্তা

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনেটোলা লেন। কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :
১৫ আগস্ট, ১৯৫৮

প্রকাশক :

সাহিত্য প্রকাশ

শ্রীরুশো মিত্র
৬০ জেমস লঙ সরণি
[ পুরাতন : সত্যেন রায় রোড ]
কলিকাতা ৩৪

প্রচ্ছদ :
শ্রীতপন কর

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯।

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| পরিচায়িকা : | ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য | নয় |
| নিবেদন : | | উনিশ |
| প্রাক্-কথন : | | ১ |
| প্রথম অধ্যায় : | সাম্য : বৈষম্য ও বৈষম্যের নিরসনচিন্তা—সাম্যনীতির মূলকথা—প্রাকৃতিক নিয়মে বৈষম্যহীনতা—ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তায় সাম্যের আদর্শ—খ্রীষ্টজগতে সাম্যমূলক মতবাদ | ২৯-১০৪ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় : | বাঙালীর সমাজ ও সাহিত্যে সাম্যচিন্তার উদয় : আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলন-প্রয়াস—দেবদেবী-পরিকল্পনায় ও ধর্মাদর্শে পৌরাণিকতা ও লৌকিকতার সমন্বয়—সাহিত্যে সাম্যাদর্শ—সাম্যমূলক চৈতন্যসংস্কৃতি | ১০৫-১৩৮ |
| তৃতীয় অধ্যায় : | পাশ্চাত্ত্য-সংস্রব : ইংরাজী শিক্ষা—রুশো, মিল, কোঁত্ প্রভৃতি সমাজবিপ্লবীদের মতবাদ—আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ, ফরাসী-বিপ্লব—পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্নমুখী জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারা—পাশ্চাত্ত্যের সাহচর্য—ডিরোজিও—পাশ্চাত্ত্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলন | ১৩৯-১৭৮ |
| চতুর্থ অধ্যায় : | রামমোহন-প্রবর্তিত সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ধর্মে সাম্যবাদের আদর্শ | ১৭৯-১৯৮ |
| পঞ্চম অধ্যায় : | নারী-পুরুষের অধিকারগত সাম্য স্থাপনে বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ প্রত্যয় | ১৯৯-২২৮ |
| ষষ্ঠ অধ্যায় : | ব্রাহ্মসমাজ ও বাঙালীর সাম্যসাধনা | ২২৯-২৮৭ |
| সপ্তম অধ্যায় : | বঙ্কিমযুগে সাম্যচিন্তা—বঙ্কিমের সাম্যাদর্শ | ২৮৮-৩৩৮ |
| অষ্টম অধ্যায় : | বিবেকানন্দের ধর্মাদর্শে সাম্যচিন্তার প্রাধান্য | ৩৩৯-৩৬৯ |
| নবম অধ্যায় : | ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে সাম্যচিন্তা | ৩৭০-৪৫১ |
| শব্দসূচী | | ৪৫২-৪৫৮ |

# পরিচায়িকা

আমার কৃতী ছাত্র শ্রীমান্ রমেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল অধ্যাপনা এবং পড়াশোনা করিবার পর কোনও একটি বিষয় লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ. ডি. উপাধির জন্য গবেষণা করিবার উদ্দেশ্যে আমার পরামর্শ এবং সহায়তা প্রার্থনা করিল। বিষয় সম্পর্কে সে নিজে কিছু ভাবিয়াছে কিনা, তাহা তাহার কাছে জানিতে চাহিলাম, সে 'বাংলা সাহিত্যে সাম্যবাদ' বিষয়টি উল্লেখ করিল। আমি জানিতাম, শ্রীমান্ রমেন্দ্রনারায়ণ ধীর এবং সহিষ্ণু প্রকৃতির লোক। তাহার দ্বারা একটি গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া গবেষণা করিয়া কৃতিত্বলাভ করা সম্ভব, তাহা মনে করিয়া তাহার প্রস্তাবিত বিষয়টি আমি তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিয়া দিলাম। কারণ, এই বিষয়ে আজও আমি যতদূর জানি কোনও গবেষণা-কর্ম কোনও বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই হয় নাই।

দীর্ঘদিন ধরিয়া শ্রীমান্ রমেন্দ্রনারায়ণের গবেষণা-কর্ম চলিল। কারণ সে কিছুতেই কোন বিষয়ই গভীরভাবে বার বার না পড়িয়া সন্তুষ্ট হয় না, তারপর যাহা সে শেষ পর্যন্ত লেখে, তাহাও অনেক ভাবনা-চিন্তা করিয়া লেখে, কোনও ব্যাপারেই যেন তাহার কাজের কোনও খুঁত না থাকে। তাহার গবেষণা-কর্ম বিষয়ের নূতনত্বে, চিন্তার গভীরতায় এবং ক্ষেত্রের বিস্তারে পরীক্ষকদিগের উচ্চপ্রশংসা লাভ করিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণা-গ্রন্থ রচনার জন্য তাহাকে যথাসময় পি-এইচ্. ডি. উপাধি প্রদান করিল।

কিন্তু গবেষণা-গ্রন্থটি মুদ্রিত না করিলে তাহার দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমের ফল হইতে বাঙ্গালী বিদগ্ধ পাঠক সমাজ বঞ্চিত হইবে, ইহা ভাবিয়া তাহাকে গ্রন্থটি মুদ্রিত করিবার পরামর্শ দিলাম। সেই কাজও যাহাতে একেবারে নিখুঁত হইতে পারে সেইজন্য ইহার মুদ্রণকর্ম সম্পূর্ণ করিতেও তাহার অনেক সময় লাগিল। যাহাই হউক, এতদিন পর একজন অধ্যবসায়ী গবেষকের পরিশ্রমের ফল যে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল, তাহা আমার পক্ষেও পরম আনন্দ এবং গৌরবের বিষয়। তাহা সে কেবল আমার ছাত্র বলিয়াই নহে, বাঙ্গালী জীবনের একটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয় ইহার মধ্যে প্রকাশিত হইল বলিয়া।

গ্রন্থের বিষয় 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা সাহিত্যে সাম্যচিন্তা।' বিষয়টি প্রথমেই একটু বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা

সাহিত্যে ইংরেজি সাহিত্য এবং পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার প্রভাবের যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর নামে যাহাই আমরা চিহ্নিত করিয়াছি, তাহাই আমরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার ফলে পাইয়াছি, সর্বক্ষেত্রে আমরা তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছি এবং তাহাই বুঝিয়াছি। কিন্তু এই কথা সকলেই স্বীকার করিবেন, জীবনে এবং সমাজে সাম্যচিন্তা আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে নূতন কোনও বিষয় নহে। নূতন নহে বলিয়াই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, দর্শন এবং সমাজ-বিজ্ঞান আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সাম্যচিন্তা প্রচার করিল, তাহা আমাদের দেশের সমাজের সর্বস্তরে সমান ভাবে গৃহীত হইল। এই দেশের সমাজে এবং ধর্মে সাম্যচিন্তার অস্তিত্ব বহুদিন হইতেই বর্তমান ছিল, অনেক সময় ধর্মীয় আচারের আবর্জনা স্তূপে তাহা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত, আবার কোনও নূতন সংস্কারকের আবির্ভাবের ফলে তাহা বিদূরিত হইয়া গিয়া শাশ্বত রূপ তাহার ভিতর হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিত। ভারতীয় ধর্মের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস অনুসরণ করিলে তাহা আমরা জানিতে পারি।

এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষ এক অতি প্রাচীন এবং বিশাল দেশ। এই দেশ, ইহার বিশালত্ব এবং অখণ্ডতা রক্ষা করিয়াই প্রাচীনকাল হইতে ইহার সভ্যতা বিকাশ লাভ করিয়াছে; ইহা আয়তনে বিশাল বলিয়া কখনও খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন কিংবা স্বতন্ত্র হইয়া যাইতে পারে নাই। ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। চীন দেশও বিশাল এবং অখণ্ড দেশ, তথাপি চীন দেশের সঙ্গেও ভারতবর্ষের এই বিষয়ে পার্থক্য আছে। চীন জাতিগত পরিচয়ে [ ethnically ] এক জাতি, এক মানব-গোষ্ঠী-সম্ভূত; কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা নহে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং এই দেশের মাটি ও সমাজকে কালক্রমে আপনার করিয়া লইয়াছে। ভারত পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মানব-গোষ্ঠীর এক মহামিলনের শ্রীক্ষেত্র। সুতরাং ইহার সাম্যচিন্তা কেবল মাত্র কঠিন সাধনার ফলেই সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ভারতে তাহা অতি সহজে সম্ভব হইয়াছে, ইহাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়। ভারতের চাইতে কোনও কোনও ক্ষুদ্রতর মহাদেশেও তাহা সম্ভব হয় নাই। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের মধ্যে মার্কিন দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে সেখানে শ্বেতাঙ্গ মার্কিনজাতি কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদিগের বংশধরদিগের সঙ্গে বহু সংগ্রামের পরও আজও পরিপূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। মার্কিনদেশের আদিবাসীরা ত

এই সংগ্রামে বলি প্রদত্ত হইয়া আজ প্রায় তাহাদের স্বদেশের মাটি হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। অথচ ভারতবর্ষে এই অবস্থা ত কোনদিনই হয় নাই, সুদূর প্রাচীন কালেও তাহা যেমন হয় নাই, বর্তমান কালেও তাহার কোনও নিদর্শন নাই।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এই কথা বলিয়া থাকেন, কোনও দেশের উপর নবাগত কোনও জাতির অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে তাহাদিগের প্রাথমিক একটি সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে। ইহা জৈব প্রবৃত্তি জাত। আদিম যুগে এই সংঘর্ষে বহু রক্তপাত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে দেখা গিয়াছে, ক্রমে ইহাদের মধ্যে বিজয়ী জাতি বিজিতের উপর তাহার প্রভাব স্থাপন করিয়া তাহাকে নিজের মধ্যে আপন করিয়া লইয়াছে, তখন তাহাদের উভয়ের মধ্যে সকল বৈষম্য দূর হইয়া গিয়া সেখানে সামাজিক ঐক্য স্থাপিত হইতে বিলম্ব হয় নাই। এই ভাবে ভারতীয় সমাজ-জীবনের আদিম স্তরে বহু মানবজাতি নানা সংঘর্ষের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত একটি ক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়া এই দেশকে সাম্যবাদের আদিপীঠস্থান করিয়া তুলিয়াছিল। কারণ, এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে পৃথিবীর প্রথম যে দেশে ধর্মের মধ্য দিয়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষ। পৃথিবীর প্রথম সাম্যবাদী ধর্ম বৌদ্ধধর্ম এবং এই বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। খৃষ্ট জন্মের পূর্বেই আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী যে একদিন বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা কি ভাবে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা যদি আমরা ভাবিয়া দেখিতে যাই, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী বহির্ভারত হইতে ভারতের মাটিতে আসিয়া পৌছিবার পর তাহারা প্রাথমিক সংঘর্ষ কাটাইয়া উঠিয়া অচিরেই সংঘর্ষের পরিণাম বিবেচনা করিয়া এক সাম্য-চিন্তার মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহাতেই তাহাদের পরস্পর ভেদ বুদ্ধি হ্রাস পাইয়া গিয়াছিল। তারপরই বৌদ্ধ ধর্মের উদার আহ্বান তাহাদের কানে আসিয়া পৌছিল এবং নির্বিচারে সেইদিন সকলে এই সাম্যবাদী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল। রাজা এবং প্রজা, সম্রাট্ এবং ভিক্ষু সেদিন সমাজের চোখে একাকার হইয়া গেল। সামাজিক তীব্র ভেদবুদ্ধির ইহাই যে অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া তাহা সেইদিন এইভাবে বুঝিতে পারা গেল।

বৌদ্ধধর্মই ভারতবর্ষব্যাপী সেইদিন সাম্যবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। ইহা একদিনে কখনও সম্ভব হইতে পারে নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া যেমন ইহার প্রস্তুতি চলিয়াছিল, তেমনই দীর্ঘকাল ইহার প্রভাব স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে।

ভারতের সাহিত্যে, দর্শনে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রশিল্পে এক কথায় ভারতীয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাহার প্রভাব অনুপ্রবেশ করিয়াছিল, তাহা হইতে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ভারত মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। মানব-সমাজ গঠনের আদি যুগে মানুষের প্রকৃতি বহুলাংশে হিংস্র ছিল, সেই পথেই যদি বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী চলিতে থাকিত তবে তাহা কোনদিন সমাজ-গঠন করিতে পারিত না, পরস্পরের সংঘর্ষের মধ্য দিয়া নিজেদের ধ্বংস অনিবার্য করিয়া তুলিত। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম অহিংসা, করুণা এবং মৈত্রীর বাণীর উপর সেইদিন গুরুত্ব আরোপ করিল, তাহার ফলে মানুষের পশুশক্তিকে হ্রাস করিয়া তাহার উপর মনুষ্যত্বের শাশ্বত গুণাবলীর বিকাশ করিবার সহায়ক হইল, মানুষের প্রতি মনুষ্য-মাত্রেরই করুণাগুণ বিকশিত হইল, মানুষ তাহার নিজের আত্মাকে স্বার্থপরতায় সঙ্কীর্ণ না করিয়া স্বার্থত্যাগে আত্মবিসর্জন করিতে শিখিল। মানুষের মধ্যে জাতিগত, বর্ণগত কোনও ভেদাভেদ রহিল না। এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে মহারাজ অশোকের সময় হইতে কেবল সমগ্র ভারতবর্ষ নহে, অর্ধেক পৃথিবী এই মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিল, সুতরাং কেবল মাত্র ভারতবর্ষের নহে, অর্ধেক পৃথিবীর সামাজিক জীবনের আদিম অবস্থার উপরই বৌদ্ধধর্ম সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজ এবং রাষ্ট্র-জীবন গঠনে সহায়তা করিয়াছে। বিষয়টি কিছুতেই ছোট করিয়া দেখিবার নহে।

যে ধর্মে যে জাতির প্রথম দীক্ষা হয়, সেই ধর্মের প্রভাব প্রচ্ছন্ন ভাবেই হউক, কিংবা প্রকাশ্যভাবেই হউক তাহার মধ্যে সর্বদাই একভাবে না একভাবে আজীবন সক্রিয় থাকে। আজ ভারতবর্ষ হইতে দৃশ্যত বৌদ্ধধর্মের বহির্মুখী আচার লুপ্ত হইয়া গেলেও স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকার ধর্মচক্র এবং রাষ্ট্রীয় প্রতীক্ অশোক-স্তম্ভের সিংহমূর্তি তাহারই নিদর্শন। অর্থাৎ ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মের বহির্মুখী আচার স্বীকার করিয়া মঠে গিয়া ভিক্ষুজীবন যাপন করে না সত্য, তথাপি বৌদ্ধধর্মের করুণা, অহিংসা, মৈত্রী এবং সাম্য-চিন্তার প্রেরণা তাহার জীবন আজও নিয়ন্ত্রিত করে। অর্ধেক পৃথিবীর যে সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম একদিন বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সেখানেও সাম্য-চিন্তা এই ভাবেই সমাজে এবং রাষ্ট্রে তাহার অধিকার স্থাপন করিয়াছে। ভারতবর্ষেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার কথা নহে। সেইজন্য ভারতবাসী তাহার জীবনের সর্বস্তরে এখনও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব শুধু অনুভব নহে, স্বীকার করিয়া থাকে।

সুতরাং সাম্যবাদ ভারতীয় চিন্তায় নূতন কিছু নহে, ইহা যে পাশ্চাত্য দর্শনের

সঙ্গে আমাদের দেশে আসিয়াছে, তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এমন কি, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবেরও বহু বৎসর পর আজ হইতে মাত্র পাঁচশত বৎসর পূর্বে বাংলাদেশের মাটিতেই আর একজন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি শ্রীচৈতন্যদেব। তিনিও সমাজে সাম্যবাদেরই প্রবক্তা ছিলেন। তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভারতীয় সন্ন্যাস ধর্মের মূল যদি আমরা অনুসন্ধান করিতে যাই, তবে বৌদ্ধধর্মে গিয়াই আমাদিগকে পৌঁছিতে হইবে। কারণ, শঙ্করাচার্য সন্ন্যাস ধর্মের প্রবর্তক হইলেও তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন দেখিতে পাইলেন যে সমস্ত ভারতবর্ষ জড়বাদী বৌদ্ধ ধর্মচিন্তায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তখন তিনি জড়বাদ হইতে মুক্তির সন্ধানে অদ্বৈতবাদ প্রচার এবং সন্ন্যাস ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ভিক্ষুধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই স্থাপিত হইয়াছিল। এমন কি, বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগের বাসোপযোগী যেমন মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্যও ভারতের চতুর্দ্বারে সন্ন্যাসীদিগের জন্য চারিটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, বৌদ্ধমঠে ভিক্ষুদিগের আচার-জীবন এবং শঙ্করমঠে সন্ন্যাসীদিগের জীবনে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। এই ভাবে এখনও ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যোগ অনুভব করা যায়। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও জীবন ও অধ্যাত্ম দর্শনের দিক দিয়া নানাভাবে ঈশ্বর চিন্তা বিকাশ লাভ করিয়াছে। তথাপি তাঁহারাও প্রেম, অহিংসা, করুণা, মৈত্রীর আদর্শ হইতে বিচ্যুত নহে। এই ভাবে বৌদ্ধধর্ম ভারতের সমাজে বাহিরে লুপ্ত হইলেও অন্তরে বাঁচিয়া আছে। সেইজন্য সাম্যচিন্তা এই দেশের মাটিতে দৃঢ়মূল হইতে পারিয়াছে। যদি তাহা না হইত, তবে পাশ্চাত্ত্যের যে প্রভাবই উনবিংশ শতাব্দীর পর হইতে আমাদের উপর আসিয়া পড়ুক না কেন, আমরা মনের দিক হইতে তাহা কোনদিন এমন ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতাম না। কারণ, সাম্যবাদ একটি বিশেষ সামাজিক দর্শন, তাহার সঙ্গে ব্যক্তির বিশ্বাসও জড়িত। ব্যক্তি তারপর জাতির বিশ্বাস এক দিন, দুইদিনে জন্মায় না ; উনবিংশ শতাব্দীতে দেশের কয়েকজন ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তি সাম্যবাদ সম্পর্কে রুশোর রচনা পাঠ করিল, অমনই সমগ্র জাতি সাম্যবাদী হইয়া উঠিল তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। এই চিন্তা বহুদিন ধরিয়া সমাজজীবনে তাহার ক্রিয়া করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত তাহার রক্তে মিশিয়া যায়, তারপর তাহা তাহার জাতীয় চেতনায় পরিণত হয়। তাই ভারতবাসী যত সহজে সাম্যবাদী হইয়াছে,

পাশ্চাত্ত্য জাতি তত সহজে তাহা হইতে পারে নাই ; এখনও কাগজ পত্রে তাহারা সাম্যবাদী হইলেও প্রকৃত জীবনে তাহা পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত করিয়া তুলিতে পারে নাই। একটি কথা এখানে গভীর সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, যতদিন পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসন থাকিবে, ততদিন পাশ্চাত্ত্য জাতি মুখে সাম্যবাদী হইলেও কাজে সাম্যবাদী হইবে না। মার্কিন জাতির সঙ্গে তাহার ক্রীতদাসের বংশধরদিগের এখনও কার্যত যে সম্পর্ক তাহাতেও তাহা প্রমাণিত হয়। কিন্তু ভারতের উপনিবেশ নাই, কখনও ছিল না, সুতরাং তাহার কাছে সাম্যচিন্তা যত সহজ, ঔপনিবেশিক স্বার্থবাদী জাতির পক্ষে তাহা তত সহজ নহে। কারণ, শোষণবাদ ও সাম্যবাদ একসঙ্গে চলে না।

ভারতবর্ষে এবং পাশ্চাত্ত্যদেশে সাম্যচিন্তা ঠিক একভাবে জন্মলাভ করে নাই। পঞ্চদশ লুইর আমলে ফরাসী জাতির মধ্যে সাধারণ লোকের অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশার মূলে ফরাসী সম্রাটের বৈষম্যমূলক আচরণ দেখিয়া তাহা মর্মস্পর্শী ভাষায় রুশো বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্তব্য দুর্দশাগ্রস্ত ফরাসী জাতিকে সেই দিন মন্ত্রের মত আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার ফলে সেখানে ফরাসী বিপ্লব হইল, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজে কিংবা সাহিত্যে এইভাবে সাম্যচিন্তা জন্ম এবং প্রসার লাভ করে নাই। যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষার্দ্ধ হইতে এই দেশেও ঔপনিবেশিক শাসন আরম্ভ হইয়াছিল, তথাপি সাম্যচিন্তা ইহার বহু পূর্বেই এই দেশের ধর্মে সমাজে এবং সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছিল। দুই দেশে সাম্যচিন্তা উদ্ভবের ইতিহাসও তাই স্বতন্ত্র—পাশ্চাত্ত্য দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইতে সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষে সামাজিক বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইতেই সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কারণ. এই কথা সকলেই জানেন যে বৈদিক যাগযজ্ঞে নির্বিচার পশুবলি ও সামাজিক আচার-বিচারের কঠোরতার বিরুদ্ধেই বৌদ্ধধর্মের বিদ্রোহের জন্ম হইয়াছিল, তাহাই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মূল। অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্যের কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং ভারতবর্ষের কারণ সামাজিক বৈষম্য। পাশ্চাত্ত্যদেশে অর্থনৈতিক বিষয়ে নিপীড়িত সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ করিয়াছে, ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয় রাজপুত্র সামাজিক অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্যদেশের বিদ্রোহের ফলে রক্তপাত হইয়াছে, ভারতবর্ষে যে বিদ্রোহ হইয়াছে তাহা

রক্তপাতহীন, অথচ তাহারই আদর্শ কেবল মাত্র ভারতবর্ষেরই সামাজিক বৈষম্য দূর করে নাই, দেশ-দেশান্তরেও কোনও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হইবার অবকাশই দেয় নাই। সুতরাং একদিক হইতে অর্থনৈতিক অভাব, আর একদিক হইতে সামাজিক বৈষম্য এই দুই দিক হইতে সমাজে সাম্যচিন্তা প্রচার লাভ করিবার প্রেরণা দিয়াছে।

সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত যাঁহারা মনে করেন যে রুশো যে ভাবে ফরাসী জাতির জন্য সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহাই পথ, তাহা হইলে তাঁহারা ভুল করিবেন। কারণ, এই দেশে অন্যপথে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পর হইতে এই দেশে ঔপনিবেশিক শোষণ-বাদ আরম্ভ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের নিজস্ব ধারায়ই ইহাতে সাম্যবাদের পুনর্জাগরণ সম্ভব হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি এবং হরিজন আন্দোলন ভারতীয় সেই প্রাচীন ধারারই সমর্থক ছিল বলিয়া তাহা এত ব্যাপক জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়া সেই পথেই জন-জাগরণকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। ঔপনিবেশিক শোষণ আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত সমাজের অর্থনৈতিক অসাম্য ইহার কোনও গুরুতর সঙ্কট সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জাতির অর্থনৈতিক সঙ্কট কঠিন হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। ইহার দুইটি কারণই প্রধান, একদিকে ঔপনিবেশিক শোষণ, আর একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমিহীন কৃষকশ্রেণীর উপর দেশীয় জমিদারদিগের শোষণ। তাহার ফলে দেশে ধনী-দরিদ্রের অর্থনৈতিক অসাম্য অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিল। বিদেশী শাসন হইতে পরিত্রাণ না পাইলে এই অসাম্য দূর হইতে পারে না ভাবিয়া, দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই তখন বদ্ধপরিকর হইলেন। মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় প্রচলিত পথে অহিংসা, অসহ-যোগিতা, সত্যাগ্রহ দ্বারা শাসন ক্ষমতা অধিকার করিয়া এই অসাম্য দূর করিতে চাহিলেন। বাংলা এবং পাঞ্জাবের স্বদেশ-প্রেমিকগণ তাঁহাদের সঙ্কল্পকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য পাশ্চাত্ত্য ধারায় হিংসার পদ্ধতি অনুসরণ করিলেন। নিরবচ্ছিন্ন বৃহত্তর এক সামাজিক সাম্যচিন্তার ধারার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষ নব-প্রতিষ্ঠিত বিদেশী শাসনে যে শোষণের সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহার ফলে তাহার চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে পড়িয়া তাহার মধ্যে এই অসাম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহা হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও তাহার অল্প-

কালের মধ্যেই তীব্র হইয়া উঠিল, কারণ, এই অসাম্যের মধ্যে তাহার জীবনের ঐতিহ্য গড়িয়া উঠে নাই। সেইজন্য সে ইহা সহ্য করিতে পারিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে সাম্যচিন্তার ইহাই উদ্ভবের মূল।

ভারতবর্ষের যে সুবৃহৎ সমাজ বৌদ্ধধর্মের সাম্যচিন্তার উপর একদিন ভিত্তি স্থাপন করিয়া সুদৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা ইতিহাসের নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া বিপর্যস্ত হইল। দেশে মধ্যযুগের প্রথম ভাগ হইতেই মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সমাজ জীবনের অখণ্ডতা আপাত দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন হইল সত্য, তথাপি মুসলমান ধর্ম একটি অখণ্ড সাম্যবাদী সমাজই গড়িয়াছিল, এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ক্রমে ভারতের দুই বৃহৎ ধর্মের মধ্যে সেতু বন্ধনের জন্য মধ্যযুগেই কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাঁহাদের প্রচার এবং সাধনার ফলে তাঁহারা যে সমাজ স্থাপন করিলেন, তাহাও দুই দিক হইতেই আসিয়া এক ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছিল। তারপর উনবিংশ শতাব্দী হইতে ধর্মের বৈষম্য অপেক্ষা অর্থ-নৈতিক বৈষম্যই সামাজিক সঙ্কটকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছিল; অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যেখানেই দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইখানে ধর্মের বৈষম্য তাহার জন্য যত দায়ী অর্থনৈতিক বৈষম্য তাহা অপেক্ষা অধিক দায়ী নহে। তারপর দেশের এই বৃহৎ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে সকল বৈষম্য দূর হইয়া গিয়া জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হইতে পারে সেইদিকে সকলেরই একাগ্র দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেইজন্য উনবিংশ শতাব্দী হইতে সাম্যচিন্তা নূতন করিয়া নূতন প্রয়োজনে ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার সমাজে দেখা দেয়। একদিন সমাজের সংহতি সৃষ্টির জন্য যাহা প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিবার কাজেও নিয়োজিত হইল। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীতে এই বৈষম্য কঠিন হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজ এবং সাহিত্যে সাম্যচিন্তার নূতন করিয়া আবির্ভাবের ইহাই কারণ। আমাদের মধ্যকার যে সাম্যের কথা আমরা ভুলিয়াছিলাম, দেশের মনীষীরা তাহার কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, এই বিষয়ে কোনও ভ্রান্ত ধারণা কাহারও থাকিলে তাহা দূর করিয়া দিতে চাহিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'সাম্য' প্রবন্ধে প্রথমেই শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের কথা উল্লেখ করিলেন। তিনিই জগতে সাম্যবাদের আদি প্রবক্তা। আসমুদ্র

হিমাচল তাঁহার সাম্যবাদী ধর্ম সেইদিন গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সমাজে সাম্যবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিল, সেদিন জ্ঞানে গরিমায় ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে সকলের পূজ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তারপরই জগতে সাম্যবাদের পরবর্তী বা দ্বিতীয় প্রবক্তা রূপে যীশুখৃষ্টের নাম করিয়াছেন, তারপর তাঁহার 'তৃতীয় সাম্যাবতার রূসো।'

হাজার বছর আগে বাঙ্গালা ভাষার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যদি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ধরা যায়, তবে দেখা যায় যে তখন হইতেই বাংলার সমাজ সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ, তখন বাংলাদেশে জনসাধারণের মধ্যে যে ধর্মমত প্রচলিত ছিল, তাহা বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধ পালরাজত্বের তখন শেষ অবস্থা। পাল সম্রাটেরা বৌদ্ধ ছিলেন, ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গেও তাঁহাদের কোনও বিরোধ ছিল না। তাঁহারা তাঁহাদের রাজ্যে হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির নির্মাণ করিতে অনুমতি দিতেন, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিষ্কর দেবোত্তর জমি দান করিতেন এবং সেই সকল মন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া তাহাদের ভরণপোষণের জন্যও নিষ্কর ভূমি ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ দান করিতেন। সুতরাং তখনকার বাংলার বৌদ্ধরাজগণ পরমতসহিষ্ণু ছিলেন, এমন কি, শেষ পর্যন্ত তাঁহারা কেহ কেহ শৈব ধর্মও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম লইয়া তখন কলহ সৃষ্টি হইবার কোনও অবকাশ হইত না।

দেশের সাধারণ লোক তখন সহজিয়া ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সহজিয়া ধর্ম মহাযান বৌদ্ধ ধর্মেরই একটি শাখা, কিংবা তাহারই একটি রূপ। তাহার সাম্যবাদের আদর্শ আরও সুস্পষ্ট ছিল। তাহারা কোনও আচার ধর্মকে স্বীকার করিত না, তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে মানুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেই আমরা সহজেই যে ধর্মের অধীন হই, তাহাই সহজ ধর্ম বা সহজিয়া ধর্ম। তাহার মধ্যে জাতি, বর্ণের কোনও বিভেদ নাই। স্বর্গ-নরকের কোনও আশা কিংবা আশঙ্কা নাই। তাহা কোনও মন্ত্রতন্ত্রের ধার ধারে না। তাহারা প্রচার করিত :

কিংতো মন্তে কিংতোরে তন্তে,
কিংতো রে ঝান বাখানে।

অর্থাৎ মন্ত্রেই কি হয়, তন্ত্রেই কি হয়, ধ্যান ব্যাখ্যানেই বা কি হইতে পারে? অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা কিছুই হয় না।

কামে জাম কি জামে কাম,
সরহ ভণই অচিন্ত্য সো ধাম।

## প্রাক্-কথন

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা বাঙালীকে দিয়াছিল নবজাগরণের মহামন্ত্র। এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বাঙালী তাহার সমাজ ও সাহিত্যকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইতে শিখিল—শিখিল মধ্যযুগের অন্ধ তমিস্রা দূর করিয়া নবোদিত সূর্যের আলোকে শুচিস্নাত হইয়া নূতন জীবনের জয়গান করিতে। বাঙালীর এই যে নবীন মন্ত্রদীক্ষা, ইহা এক হিসাবে যেমন নূতনকে বরণ করিয়া লওয়া, অপরদিকে তেমনই পুরাতনের মর্মমূলে যে সত্যবস্তু রহিয়াছে তাহাকেই নবরূপে প্রতিষ্ঠা করা। ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির চোখ-ধাঁধানো আলোকে চোখ মেলিয়া বাঙালী যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকে প্রথমে বিদেশী বলিয়া ভুল করিল, পরে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল—সে তাহার নিজেরই একান্ত পরিচিত আত্মাপুরুষ। বাঙালীর যে প্রাণসত্তা যুগ যুগ ধরিয়া নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়াও আপন স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখিতে উন্মুখ রহিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রখর আলোকে তাহাই বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। বর্তমান গ্রন্থে বাঙালীর সেই স্বাধীন প্রাণসত্তারই বন্দনা।

বাঙালীর অন্তরের গভীর ভূমিতে চিরদিনই একটি প্রেমের দীপ অনির্বাণ রহিয়াছে। এই প্রেমেরই আলোকে সে তাহার নিজের অন্তরাত্মাকে দেখিয়াছে, দেখিয়া বন্ধন-অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে; আবার তাহার এই প্রেমই বিশ্বে প্রসারিত হইয়া বিশ্বজনকে তাহার ক্ষুদ্র কুটীর-প্রাঙ্গণে টানিয়া আনিয়াছে। এই জন্যই দেখিতে পাই, উত্তর-ভারতের উন্নাসিক আর্যগণ যখন তাহাকে 'অসুর' বলিয়া 'পতিত' বলিয়া ঘৃণা করিয়াছে, সে তখন স্মিতহাস্যে নিজের ছায়া-স্নিগ্ধ অনার্য বাসভূমিকে সাজাইয়া-গুছাইয়া তাহারই মধ্যে আর্যসভ্যতাকে বরণ করিয়া লইয়াছে, এবং এইভাবে সে যেমন নিজেকে ভালবাসিয়াছে—তেমনই ভালবাসিয়াছে অপরকেও। তাহার 'সোনার বাঙলা'কে সে ভালবাসে বটে, কিন্তু বিশ্বের 'সব ঠাঁই' তাহার ঘর আছে বলিয়া বিশ্বপ্রসারিত প্রেমের অধিকারও সে ঘোষণা করে। বাঙালীর অধ্যাত্মসাধনার চরম সিদ্ধি বিশ্বহিতে; কেবল আত্মমুক্তির কামনা করিয়াই সে ক্ষান্ত থাকে নাই, 'আত্মনো রক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' বলিয়া নিজের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বমানবেরও মুক্তির জন্য সে সাধনা করিয়াছে। একই প্রেমের টানে সে ঘরমুখী হইয়াছে, আবার ঘর ছাড়িয়া বাহির-বিশ্বেও পা বাড়াইয়াছে।

সর্বতোমুখী এই প্রেমই বাঙালীকে শিখাইয়াছে জাতিধর্মের ঊর্ধ্বে উঠিয়া মানুষকে কেবল মানুষ বলিয়া ভালবাসিতে। পল্লববহুল আম্রবনের আড়ালে বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে এই প্রেমেরই স্নিগ্ধকোমল রূপটি লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু সেখানে মুসলমানকে ভাই বলিয়া প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছে, বেনেবউ তাহার প্রতিবেশিনী কৃষকবধূর দুঃখকষ্টের খোঁজ রাখিতেছে এবং কখনও বা সুদক্ষিণা হইয়া তাহার গোপন ভাণ্ডার হইতে অনুকম্পা বিলাইতেছে। পূজাপার্বণে ও যাত্রাগানে ছোটবড় সকলে মিলিয়া মিশিয়া আনন্দ করিতেছে, আবার একের মৃত্যুশীতল দুঃখের দিনগুলিতেও অপরে আসিয়া পাশে দাঁড়াইতেছে—সান্ত্বনা দিতেছে। ইহাই বাঙালীর প্রকৃত স্বরূপ। মেঘে-ঢাকা সূর্যের মতো বাঙালীর এই সমুজ্জ্বল বাঙালীত্বটুকু কখনও কখনও মানবসংসারের চিরাগত হিংসাদ্বেষে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে সত্য, কিন্তু তাহা কেবল সাময়িক বিভ্রম সৃষ্টি করিয়াই মিলাইয়া যায়। বাঙলার জনজীবনের ইতিহাসই ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। বাঙলার বুকে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইয়াছে—পাঠান আসিয়াছে—মোগল আসিয়াছে—সাগরপার হইতে ইংরাজ আসিয়াছে, কিন্তু বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে প্রেমের যে আসন প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে বিন্দুমাত্র সংকুচিত করিতে পারে নাই। বাঙালীর এই 'সাধের আসনে' উপবেশন করিয়াই নিমাই পণ্ডিত করুণাবতার শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন, গদাধর হইয়াছেন সর্বধর্মসমন্বয়ী শ্রীরামকৃষ্ণ।

বঙ্গমাতার সবুজ তৃণাঞ্চল হইতে কখন কেমন করিয়া যে এই বিশ্ববিসারী প্রেম বাঙালীর অন্তরে আশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহার ইতিহাস অজ্ঞাত। কিন্তু ইহা বাঙালীকে একটা দুর্লভ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। আর শুধু বাঙালীই বা বলি কেন, ভারতবাসীমাত্রই তো এই বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার বহন করিতেছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে তাকাইলে একটা সর্বাত্মক প্রেমের মহৎ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষ যেদিন বিশ্ববাসীকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে—ভারতবর্ষের প্রজ্ঞাপারমিত দৃষ্টি যেদিন ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত সকল কিছুরই মধ্যে আত্মার স্বরূপ লক্ষ্য করিয়াছে, সেদিন হইতে মধ্যযুগের কবীর-দাদূ-শ্রীচৈতন্যের ধারা বাহিয়া এক দুর্লভ প্রেমশক্তি ভারতবর্ষকে তাহার চলার পথে পাথেয় যোগাইয়া আসিয়াছে। ইহারই বলে সে শক-হূণ হইতে বলদর্পী ইংরাজ পর্যন্ত সকলকেই ভাই বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে—সকলেরই প্রতি একটি উদার সমদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূরে সরাইয়া রাখে নাই, বিদেশী ও বিধর্মী বলিয়া কাহারও নির্বাসন

কামনা করে নাই। তাহার অন্তর-আলো-করা প্রেমের আলোকে সে সকল মানুষের মধ্যেই অসীমের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া সকলকে সমভাবে ভালবাসিতে চাহিয়াছে। সর্বমানবে প্রসারিত এই প্রেমই ভারতবর্ষকে চিরকাল একটা উদার সাম্যবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে এই সর্বভারতীয় প্রেম ও সাম্যবোধেরই সার্থক লীলায়ন। বাঙালী জাতির এই বৈশিষ্ট্যটুকুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদিগকে উনবিংশ শতাব্দীর নবযুগচেতনার কথা চিন্তা করিতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্পর্শে আসিয়া বৃহত্তর বিশ্বের সহিত বাঙালী পরিচিত হইয়াছে। কোঁত্, বেন্থাম, মিল, রুশো প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য চিন্তানায়কদের মানবকল্যাণমুখী চিন্তাধারা বাঙালী মনীষার নিকট সমাজ ও রাষ্ট্রের নবমূল্যায়ন উপস্থাপিত করিয়াছে। ভেদবৈষম্যহীন সুন্দর সমাজব্যবস্থা ও শোষণ-পীড়ন-মুক্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থা গঠনের যে মহতী বাণী সেদিন সাগরপারের মনীষীদের কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে, ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে তাহা বাঙলার নব্যশিক্ষিত তরুণদের কাছেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার উপর আবার পাশ্চাত্ত্যের স্বাধীনতামূলক বিপুল কর্মকাণ্ডের সহিতও বাঙালীর পরিচয় ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য-ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সেদিনের বাঙালী ছাত্র লক্ষ্য করিয়াছে, কেমন করিয়া পশ্চিমের এক-একটি দেশের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার দৃঢ় সংকল্প লইয়া ইংরাজ প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে আমেরিকা যে স্বাধীনতার যুদ্ধ করিয়াছে—স্বৈরাচারী রাজার অক্টোপাস-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জীবনের নূতন স্বাদ গ্রহণের জন্য ফরাসীরা যে বিপ্লব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে, নব্যশিক্ষিত বাঙালীর মনে তাহা বিচিত্র উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছে। ফরাসী-বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অগ্নিবাণী নবযুগের নব ঋকমন্ত্রে পরিণতি লাভ করিয়া বাঙালীকে মানবকল্যাণের নিমিত্ত হোমানল প্রজ্বলিত করিতে প্রেরণা দিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালীর এই মানবকল্যাণ-ব্রতের প্রধান ঋত্বিক ছিলেন তরুণ জ্ঞান-তপস্বী ডিরোজিও। তাঁহার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ইয়ং-বেঙ্গলগণ যে সংস্কারমুক্তির আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন, তাহাতে নব-ভাবের হঠাৎ-ধাক্কায় ভাঙনের পালাটাই বড় হইয়া উঠিয়াছিল সত্য, কিন্তু পরবর্তী কালের সমাজসংস্কারমূলক সকল শুভকর্মের তাঁহারাই যে প্রথম দিশারী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা ও

সংস্কৃতি নবযুগের বাঙালীকে পূর্বাপর সকল সময়ই নব নব কর্মচিন্তার পথে চালিত করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য-প্রচারিত 'Humanity-পূজা'য় উদ্বুদ্ধ হইয়া সে-যুগের বাঙালী তাহার ভেদ-বৈষম্য-কণ্টকিত দেশেও জাতি-ধর্ম-নিরপেক্ষ মানবমৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছে; পাশ্চাত্ত্যের অনুসরণে নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘুচাইবার জন্য সে নারীর অধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে; আবার পাশ্চাত্ত্য মনীষীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া স্বাধীনতাকে সে তাহার জন্মগত অধিকার বলিয়া সোচ্চার দাবি জানাইয়াছে। এক কথায়, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর সমস্ত প্রগতিমূলক আন্দোলনের উপরই পাশ্চাত্ত্যের অনিবার্য প্রভাব পড়িয়াছে।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, এই প্রভাবকে বাঙালী সেদিন একান্তভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গেলে বাঙালী-হৃদয়ের চিরন্তন প্রেম ও স্বাধীনতাস্পৃহারই সাক্ষাৎ মিলিবে। যাহার প্রকৃতিতে যাহা নাই, তাহা তাহার উপর বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া চলে না। মরুভূমির ঊষর বক্ষে ফুলের সমরোহ কল্পনা করা যায় না। সেইরূপ, বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে যদি মানবপ্রেম ও স্বাধীনতাবৃত্তির সম্বল না থাকিত, তাহা হইলে পাশ্চাত্ত্যের শত প্রভাবও বাঙালীকে ঐবিষয়ে প্রবুদ্ধ করিতে পারিত না। বাঙালীমনের গহন তলে যে মানবমুখী প্রেম ও স্বাধীনতাবোধের বৃক্ষশিশু বিরাজ করিতেছিল, পাশ্চাত্ত্যের আলো-বাতাসে তাহাই কাণ্ডে-পত্রে পরিপুষ্ট ও পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। আবার সেই প্রেম ও স্বাধীনতাবোধ হইতে সঞ্জাত যে সাম্যচেতনা, তাহাও বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ—পাশ্চাত্ত্যের প্রভাবে তাহা পরিবর্ধিত হইয়াছে মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন বাঙালী মনীষীর রচনায় যে সাম্যচেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাতে পাশ্চাত্ত্যের লেবেল আঁটা থাকিলেও ভিতরে ভিতরে বাঙালীর চিরাগত শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুঞ্জন শোনা যাইতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার প্রথম মনীষী রামমোহন। তাঁহার বিভিন্ন রচনায় সাম্যমূলক ভাবধারার স্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম সম্বন্ধে স্বীয় অনুভূতির কথা ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি যে-সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ধর্মীয় সাম্যবোধের পরিচয় পরিস্ফুট। তাঁহার ধর্মমত কোনো বিশেষ ধর্মকে আশ্রয় করিয়া স্ফূর্তিলাভ করে নাই—কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের হইয়াও তিনি ধর্মপ্রচারে অবতীর্ণ হন নাই। সর্বধর্মের মূল লক্ষ্য যে ঈশ্বরভক্তি ও মানবপ্রেম, তাহারই শাশ্বতী বাণী তিনি সকলের নিকট

প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহাকে যদি কোনো ধর্মমতের নামে চিহ্নিত করিতে হয়, তবে তাহা সর্বজনীন ধর্মমত বা Universal Religion। ইহারই আঙিনায় তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলকেই সমভাবে আহ্বান করিয়াছেন। প্রথম জীবনে তিনি নিরাকার ব্রহ্মকেই একমাত্র উপাস্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া যুক্তির খড়্গ লইয়া সাকারবাদী পৌত্তলিকদের আক্রমণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরিণত বয়সের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে তাঁহার নিকট সাকার ও নিরাকার উপাসনার ভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে—একটি সমুন্নত উদার ধর্মবোধকে আশ্রয় করিয়া সকল মত ও সকল পথকে তিনি সমান শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। তাঁহার এই সুগভীর ধর্মবোধই আবার তাঁহাকে বিশ্বপ্রসারিত মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে যে স্রষ্টারই আত্ম-অভিক্ষেপণ রহিয়াছে—একই অনন্ত সত্তা যে বিশ্বময় সান্তরূপে বিরাজ করিতেছেন, এই বোধে উপনীত হইয়া নিখিল বিশ্বের সকল মানুষেরই সহিত তিনি একাত্মতা অনুভব করিতেন—সকলকেই সমভাবে ভালবাসিতেন। দক্ষিণ-আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশ সমূহের নবজাগরণ ও স্বাধীনতালাভে তাঁহার উল্লাস এবং স্বাধীনতাকামী নেপ্‌লসবাসীদের শোচনীয় পরাজয়ে তাঁহার দুঃখবোধ এই মহতী অনুভূতিরই সার্থক প্রকাশ। আবার স্বদেশে যখন তিনি দেশবাসীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বলিষ্ঠ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—সতীদাহ-প্রথার উচ্ছেদ কামনায় যখন আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তখন তাহাতেও এই একই অনুভূতি সক্রিয় ছিল। 'কর্মণা মনসা বাচা' সকল দিক দিয়াই তিনি ছিলেন একটি মহান সাম্যবোধের ধারক ও প্রচারক। পশ্চিমী চিন্তাধারার সহিত তাঁহার অনেক কার্যেরই হয়তো একটা সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার সমস্ত কর্মধারার মূলে যে বিশ্বাত্মবোধ, তাহা একান্তভাবেই ভারতীয় এবং তাহা বাঙালীর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদও বটে।

রামমোহনের পর বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের 'প্র্যাকটিকাল' বুদ্ধিতে হয়তো গভীর ঈশ্বরবোধের কোনো প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না, কিন্তু তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত যে করুণামন্দাকিনীর ধারা তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতিকে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহার উৎস অনুসন্ধান করিলে আমরা মানবপ্রীতির ক্ষেত্রে গিয়া পৌঁছাই, এবং ভারতীয় দৃষ্টিতে এই মানবপ্রীতি ও ঈশ্বরপ্রীতি পরস্পরের পরিপূরক মাত্র। অন্তর-নিহিত গভীর মানবপ্রীতির ফলেই নারী-পুরুষের অধিকারগত সাম্য স্থাপনে বিদ্যাসাগরের যত কিছু প্রয়াস। নারীশিক্ষা

প্রচলনের জন্য তাঁহার অতন্দ্র ক্লেশস্বীকার, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অপরিসীম আগ্রহ, বিধবাবিবাহ-প্রচলনে তাঁহার সংগ্রামী ভূমিকা—সমস্ত কিছুরই মূল প্রেরণা আসিয়াছে মানবপ্রীতি হইতে। মানুষকে তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন বলিয়াই সেই মানুষের মধ্যে নারী-পুরুষ-ভেদের গণ্ডী মানিতে পারেন নাই। নারীপুরুষে এই সাম্যবোধ যে কেবল বিদেশী শিক্ষারই ফল তাহা নহে ; 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি' বলিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে বন্দনাগাথা রচিত হইয়াছিল, তাহা পরোক্ষভাবে নারীপুরুষে সাম্যবোধেরই প্রেরণা যোগাইয়াছে। প্রাচীন ভারত নারীকে তাহার প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার দান করিয়া পুরুষেরই পাশে নারীর স্থান নির্দেশ করিয়াছে। বাঙলা সাহিত্যের গোড়ার দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেও দেখি, বাঙালী কবিরা সমুজ্জ্বল নারীচরিত্র অঙ্কিত করিয়া নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বীর রমণী কানড়া, দুঃসাহসিকা বেহুলা, সুচতুরা ফুল্লরা নারীত্বের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, তাহা মূলতঃ নারীপুরুষে বৈষম্যবোধকে আঘাত করিতেছে। বিদ্যাসাগর বাঙলা তথা ভারতবর্ষের এই নারী-পুরুষ সাম্যসাধনারই উত্তরসাধক।

উনবিংশ শতাব্দীর সর্ববিধ প্রগতিমূলক আন্দোলনকে বলিষ্ঠ রূপ দান করে ব্রাহ্মসমাজ। কি ধর্ম, কি সমাজ, কি রাজনীতি—সকল বিষয়েই ব্রাহ্মসমাজ দেশ ও জাতিকে প্রগতির পথে চালিত করে। বাঙলার জনজাগরণের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজ একটি অবিস্মরণীয় নাম।

রামমোহনের সর্বধর্মীয় মিলনসভাই কালক্রমে ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিতি লাভ করে। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম কর্ণধার—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথ যে-সময়ের লোক, সে-সময়ে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এদেশের শিক্ষিতমনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথও এই প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। ধর্মসাধনায় যুক্তি ও ব্যক্তিকেই তিনি বড় স্থান দিতে চাহিলেন। যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া শাস্ত্র পরিত্যক্ত হইল, গুরুবাদও মূল্যহীন বলিয়া গণ্য হইল। শাস্ত্র-গুরু বর্জন করিয়া ব্যক্তির 'আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'কেই ধর্মের 'পত্তনভূমি' বলিয়া গ্রহণ করা হইল। ধর্মের অন্তরঙ্গ সাধনায় এইখানেই ব্রাহ্মসমাজে সাম্যবোধের সূত্রপাত হইল—ধর্মপালনে প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃত হইল। ধর্মীয় সাম্যসাধনে ইহা দেবেন্দ্রনাথের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

দেবেন্দ্রনাথের সহযোগীদের মধ্যে দুইজন প্রধান—রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয়-কুমার দত্ত। রাজনারায়ণের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানবপ্রীতি। উচ্চনীচ-নির্বিশেষে সর্বমানবে অপরিসীম প্রীতিবোধের ফলেই দেওঘরের পাণ্ডাদের নিকট তিনি 'দোসরা বৈদ্যনাথ' হইয়াছিলেন। তাঁহার এই মানবপ্রীতিই আবার তাঁহাকে স্বদেশপ্রীতিতে উদ্বোধিত করিয়াছিল। ভেদবৈষম্য ত্যাগ করিয়া স্বদেশের সকল লোককে একই সূত্রে বাঁধিয়া একই স্বদেশ-হিতব্রতে সমর্পণ করিবার স্বপ্ন দেখিতেন তিনি। তাঁহার মানবপ্রীতি ও স্বদেশপ্রীতির একটি উদার ফল—সাম্যবোধ।

অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের সহযোগী ও দিশারী দুই-ই। ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ কার্যে ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পরিচালন-ব্যাপারে অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্র-নাথের সহযোগিতা করিয়াছেন, ঈশ্বরসত্তায় বিশ্বাস-স্থাপনেও উভয়ে একমত ছিলেন। কিন্তু কঠোর যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার ভক্তিবাদী দেবেন্দ্রনাথকে বহুক্ষেত্রেই যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যয়ের পথে চালিত করিতে চাহিয়াছেন। বেদ-বেদান্ত বর্জন করিয়া সাধারণ মানুষের আত্মপ্রত্যয়ের উপর ব্রাহ্মধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে পরিকল্পনা, তাহার প্রেরণা দেবেন্দ্রনাথকে অক্ষয়কুমারই দিয়াছিলেন। আবার বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনেও অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের অন্তর্নিহিত রক্ষণশীলতা তাঁহাকে বেশীদূর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। এইখানেই অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদী মন নির্দ্বিধায় সমাজবিপ্লবের পথে অগ্রসর হইয়াছে। তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় বাঙলার দরিদ্র কৃষকদের প্রতি ভূস্বামীদের নির্মম আচরণের উল্লেখ করিয়া, 'নৃশংস-স্বভাব হিংস্র' রাজপুরুষদের হস্তে নিপীড়িত পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিয়া, প্রজাপীড়ক নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনীর বর্ণনা দিয়া অক্ষয়কুমার জনচিত্তে সমাজবিপ্লবের বীজ রোপণ করিতে চাহিয়াছেন। দরিদ্র ও নিপীড়িত জনসমাজের প্রতি তাঁহার এই যে মমত্ববোধ, ইহা সমাজতন্ত্রবাদের গোড়ার কথা। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় কুসংস্কারের স্থান নাই। অক্ষয়কুমারও প্রকৃত সমাজবাদীর ন্যায় এদেশের বিভিন্ন কুসংস্কারকে আক্রমণ করিয়াছেন। বর্ণভেদ, কৌলীন্যপ্রথা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করিয়া সমাজকে একটা উদার সাম্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অক্ষয়কুমার সবল হস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের কর্মধারায় দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতা—কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্র প্রথমে দেবেন্দ্রনাথের একান্ত অনুগত ছিলেন। কিন্তু আদর্শভেদের ফলে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। যে সাম্যভিত্তিক ব্যক্তিস্বাধীনতাকে দেবেন্দ্রনাথ ধর্মের ক্ষেত্রে স্থান দিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুগামী প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণ তাহাকে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত করিয়া দিতে চাহিলেন। দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল ধর্মসংস্কারকের। সমাজসংস্কার-বিষয়ে তিনি বেশীদূর অগ্রসর হইতে চাহিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে মতবিরোধের প্রথম কারণ ইহাই। দ্বিতীয় কারণ—দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমতের সংকীর্ণতা। ব্রাহ্মধর্মের মূলনীতি ছিল সম্প্রদায়-নিরপেক্ষতা; অথচ দেবেন্দ্রনাথ ইহাকে হিন্দুধর্মের একটি উন্নত সংস্করণরূপে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র-প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মগণ ইহার বিরোধিতা করিলেন। বিরোধের তৃতীয় কারণ—ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের অপ্রতিহত নেতৃত্ব। যুগোচিত সাম্যাদর্শে উদ্বুদ্ধ কেশবপন্থী ব্রাহ্মদল দেবেন্দ্রনাথের এইরূপ একনায়কত্বে বিরক্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অবশেষে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'-নামক নূতন সমাজ গঠন করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সমাজ পরিচিত হইল 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে।

কেশবচন্দ্রের নূতন ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিপ্লবেরও ভূমিকা গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মমন্দিরের সংকীর্ণ গণ্ডী প্রসারিত হইয়া 'সুবিশাল বিশ্বে' পরিণত হইল—সকল ধর্মমতকেই ব্রাহ্মধর্মের উদার অঙ্গনে স্থান দেওয়া হইল—সাম্প্রদায়িক রূপ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম এবার বিশ্বজনীন হইয়া উঠিল। অন্যদিকে সমাজ-সংস্কারেও এই সমাজ অগ্রণী হইল। 'নর নারী সাধারণের সমান অধিকার' ঘোষণা করা হইল, জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিবার সর্ববিধ চেষ্টা শুরু হইয়া গেল। কেশবচন্দ্রই এইসকল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন।

কিন্তু আধুনিকতার শপথ লইয়া কাজে নামিলেও কেশবচন্দ্র ছিলেন ভিতরে ভিতরে অনেকটা দেবেন্দ্রনাথের মতই রক্ষণশীল। তাঁহার অনুগামী নবীন ব্রাহ্মগণ স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে যতদূর অগ্রসর হইতে চাহিলেন, তিনি ততদূর যাইতে রাজী হইলেন না। ইহার উপর আবার দেবেন্দ্রনাথের মতো তাঁহারও নূতন সমাজে একতন্ত্র কর্তৃত্ব চলিতে লাগিল। তাঁহার প্রচারিত মহাপুরুষবাদে অনেকেই সন্দেহ করিল যে, তিনি নিজেকে মহাপুরুষ-পর্যায়ে উন্নীত করিয়া সকলের উপর প্রভুত্ব

করিতে চাহিতেছেন। গণতান্ত্রিক আদর্শে সমাজ-গঠনের প্রতিশ্রুতি লইয়া 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' গঠিত হইয়াছিল, কেশবচন্দ্রের আচরণে এই আদর্শের অন্যথাচরণই লক্ষিত হইল। ফলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী সাম্যাদর্শী তরুণ ব্রাহ্মগণ কেশবচন্দ্রের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। অবশেষে কোচবিহার-বিবাহে কেশবচন্দ্রের আদর্শচ্যুতির চূড়ান্ত পরিচয় পাইয়া তাঁহারা অপর একটি নূতন সমাজ গঠন করিয়া বসিলেন। এই সমাজের নাম হইল 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উচ্চনীচ-নির্বিশেষে সকল সভ্যেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হইল। ব্রাহ্ম-আন্দোলন ব্যক্তি-স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করিয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রধানতঃ শিবনাথ শাস্ত্রী-এই আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করিলেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতায় তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, নরনারী-বৈষম্য ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে তাঁহার অনমনীয় মনোভাব এবং সর্বোপরি তাঁহার নিঃসীম মানবপ্রীতি ও দেশপ্রীতি নবীন ব্রাহ্মদিগকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিল। তাঁহাদের চেষ্টায় দেশে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল—বিধবাবিবাহেরও তোড়জোড় চলিল। উপবীত ত্যাগ করিয়া ও অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া তাঁহারা জাতিভেদের মূলে আঘাত করিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের কর্মসূচীতে জনসেবা বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিল। শিবনাথ প্রতিষ্ঠিত 'সাধনাশ্রম'-এর কর্মিগণ আর্ত জনগণের সেবায় আত্মাহুতি দিতে অগ্রসর হইলেন। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা মোচনের আন্দোলনেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দান উপেক্ষণীয় নহে। এই সমাজেরই কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্য বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন, অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মধ্যেও কেহ কেহ এই সমাজের সভ্য ছিলেন। মোট কথা, যুক্তিনির্ভর সাম্যবাদ, মানবপ্রীতি ও মানুষের সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতাই ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মূল আদর্শ। পরবর্তী কালে নানাকারণে এই আদর্শকে আর ব্রাহ্মসমাজ কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই; না পারিলেও ব্রাহ্ম-আন্দোলন যে বাঙলার প্রগতিশীল চিন্তাধারায় একটা স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

দৃশ্যতঃ ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে ভিত্তি করিয়া ব্রাহ্ম-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহার সহিত বাঙলা তথা ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেমন যেন একটা নাড়ীর টান লক্ষ্য করা যায়। দেবেন্দ্রনাথ যে শাস্ত্রানুশাসন বর্জন করিয়া ধর্মসাধনে ব্যক্তি-হৃদয়কে

প্রাধান্য দিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ যে মানবপ্রীতির আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার যে দরিদ্র ও নিপীড়িত প্রজাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বাঙলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস ঘাঁটিয়া দেখিলে তাহার নজীর একেবারে দুর্লভ নহে। বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্ম ব্যক্তি-হৃদয়কে উন্নত করিয়া সদাচারব্রত পালনকেই ধর্মসাধনের মুখ্য উপায় বলিয়া নির্দেশ দিয়াছে, বাঙলাদেশেও চৈতন্যধর্ম ব্যক্তিমানসে প্রতিফলিত প্রেমভক্তিকে সাধ্যবস্তু বলিয়া প্রচার করিয়াছে। মানবপ্রীতি ও মানবমৈত্রী তো এদেশের চিরকালের শিক্ষা। আবার দুঃস্থ ও দরিদ্রের প্রতি যে সহানুভূতি, তাহার দৃষ্টান্তও এদেশে বিরল নহে। বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী-করুণার বাণীতে তো দুঃস্থ মানবের সেবার আদর্শই প্রচারিত। মানুষ তো দূরের কথা, আর্ত একটি কপোতের প্রাণরক্ষার জন্য এদেশেরই এক রাজা তাঁহার নিজের গাত্রমাংস কাটিয়া দিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। ইহাই ভারতবর্ষ, আবার ইহাই বাঙলাদেশও। ইউরোপীয় শিক্ষার আড়ালে থাকিয়া ইহাই ব্রাহ্ম-আন্দোলনে বল সঞ্চার করিয়াছে। কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ যে জাতিভেদবিরোধী আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং নরনারীর অধিকারসাম্য স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহাতেও ভারতীয় সভ্যতার মূল সুরটি লাগিয়াছে। প্রাচীন ভারতে জন্মগত জাতিভেদের স্থান ছিল না—বহুপরিচারিণী নারী জবালার গোত্রপরিচয়হীন পুত্রও চরিত্রগুণে ব্রাহ্মণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। আবার মধ্যযুগীয় বাঙলাদেশে চণ্ডালদ্বিজে সমজ্ঞান করিবার যে বৈষ্ণবীয় শিক্ষা, তাহাতেও জাতিভেদ উপেক্ষিত। নরনারীর সাম্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে নারীর প্রতি ব্রাহ্মসমাজের যে মর্যাদাবোধ, তাহাও এদেশে নূতন কিছু নহে। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, যুদ্ধবিগ্রহ এমন কি যজ্ঞাদিতেও নারীকে পুরুষের পাশে সমান স্থান দেওয়া হইত। প্রাচীন ভারতের মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি বিদুষী নারীগণ ইহাই প্রমাণ করিতেছেন যে, ভারতবর্ষে একদা নারীশিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইত। মধ্যযুগের বাঙালী কবিদের রচনায়ও নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ স্পষ্ট। ভারত তথা বাঙলাদেশের এই ঐতিহ্য যে ইউরোপীয় শিক্ষার অপেক্ষা না রাখিয়াই ব্রাহ্ম-আন্দোলনের উপর মৃদু আলোক বর্ষণ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা সংগত হইবে না। আর একটা কথা। ব্রাহ্ম-সমাজের সেবা-আন্দোলনকেও কেবল ইউরোপীয় শিক্ষার ফল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তথা সাধনাশ্রমের বিস্তৃত সেবা-আয়োজনের প্রেরণামূলে

ইউরোপীয় 'ফিল্যান্থ্রপি'র চেয়ে আরও বড় কিছু একটা ছিল বলিয়া মনে হয়। জীবশিবে সমজ্ঞানের যে অদ্বৈতবাদী শিক্ষা একদা ভারতবর্ষের ঋষিকণ্ঠে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা ভারতীয় জীবনদৃষ্টিকে চিরকালই প্রভাবিত করিয়া আসিয়াছে, তাহাই ব্রাহ্মসমাজের সেবাযজ্ঞে সমিধ্ যোগাইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানবপ্রীতির উচ্ছল প্রকাশ লক্ষ্য করি বঙ্কিম-সাহিত্যে। যে-যুগে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বার বার আঘাত খাইয়া মানুষ হিসাবে বাঙালীর চিত্তবৃত্তিতে একটা বিদ্রোহের স্বর বাজিয়া উঠিতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুগে—সেই নবায়মান মানবমূল্যবোধের যুগে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। সে-লেখনী একদিকে যেমন স্বদেশমাতৃকার বন্দনা-রচনায় প্রযুক্ত হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনই সেই স্বদেশেরই মুকুরে বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বপ্রীতির মঙ্গলগাথা রচনা করিয়াছিল। স্বদেশ ও স্বজাতিকে বঙ্কিম তাঁহার সমগ্র অন্তর দিয়া ভালবাসিতেন এবং এইরূপ ভালবাসিতেন বলিয়াই স্বদেশের যাহা কিছু গ্লানি—যাহা কিছু হীনতা-দীনতা, তাহারই প্রতি অঙ্গুলি-সংকেত করিয়া দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ জাগৃতি কামনা করিয়াছেন। দেশ তখন পরাধীন। পরাধীনতা মনুষ্যত্বের সর্বাপেক্ষা বড় গ্লানি। জাতীয় জীবন হইতে এই গ্লানি দূর করিবার বলিষ্ঠ ইঙ্গিত বঙ্কিমের বিভিন্ন রচনায়। বঙ্কিমের 'সন্তানগণ' দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া স্বাধীনতালাভের মহতী উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছে, সন্তানকণ্ঠ-নিঃসৃত 'বন্দেমাতরম্' সংগীত স্বাধীনতার বোধনমন্ত্র রচনা করিয়াছে। স্বাধীনতার বেদীমূলে দাঁড়াইয়া ভারতবাসীও পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতির সহিত সমান অধিকার লাভ করুক—বঙ্কিমের সাম্যবাদী মন ইহাই নিরন্তর কামনা করিয়াছে।

আবার এই সাম্য ও মানবতার দৃষ্টি লইয়া দেশের শাসনব্যাপারে ও সমাজ-ব্যবস্থায় যখনই তিনি কোনরকম পীড়ন বা দীনতা লক্ষ্য করিয়াছেন, তখনই তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগাইয়া তুলিয়াছেন। ইংরাজের পক্ষপাতমূলক বিচারব্যবস্থার প্রতি তিনি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। ইংরাজের আইন ও আদালতে যে দুঃখী লোকেরা সুবিচার লাভ করিতেছে না, এই তথ্য তাঁহার স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গোক্তিতে প্রকাশিত। দেশের জমিদারশ্রেণীর বিবেকহীন স্বার্থ-পরতার বলি হইয়া দরিদ্র কৃষকগণ যে দুঃসহ নিপীড়ন সহ্য করিতেছে, তাহারও প্রতি বঙ্কিমের সজাগ দৃষ্টি। তাঁহার পরাণ মণ্ডল জমিদার-নিপীড়িত কৃষক-সমাজের করুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার ফলে দেশের মধ্যে

শিক্ষিত-অশিক্ষিতে যে গুরুতর বৈষম্য দেখা দিয়াছে, তাহাও বঙ্কিমের দৃষ্টি এড়ায় নাই। 'সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই' বলিয়া তিনি এই বৈষম্যের নিরসন কামনা করিয়াছেন। বর্ণভেদ এদেশীয় সমাজের একটা বড় ব্যাধি। জাতীয় সংহতিকে ইহা খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করিয়া জাতির সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। বঙ্কিমের লেখনী ইহারও বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উদ্যত করিয়াছে। তাঁহার 'আনন্দমঠে' ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্বিশেষে 'সকল সন্তান একজাতীয়'। আবার 'ধর্মতত্ত্বে' গুরু-বঙ্কিম গুণানুসারে ভক্তিপাত্র নির্বাচন করিতে গিয়া ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদ উপেক্ষা করিতেছেন। মানুষের পূজারী বঙ্কিম বর্ণগত আভিজাত্য অপেক্ষা মনুষ্যত্বকেই ঊর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন। নারী-পুরুষের যে গুরুতর বৈষম্য এদেশের সামাজিক উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ, ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু মনীষীর লেখায় তাহার প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমের লেখনীও এবিষয়ে সক্রিয়। সমাজ-জীবনে নারীর স্থান নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি নারীপুরুষের অধিকারসাম্য দাবি করিয়াছেন; বলিয়াছেন—'স্ত্রী-পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি'। বঙ্কিমের 'ভ্রমর', বঙ্কিমের 'সূর্যমুখী' ব্যক্তিত্বমহিমায় পুরুষকে হীনপ্রভ করিয়া দিয়াছে। তাঁহার 'বিমলা' ও 'শান্তি' সাহস ও বিক্রমে পুরুষেরই সমকক্ষ। তাঁহার 'প্রফুল্ল' 'দেবীচৌধুরাণী'তে পরিণতি লাভ করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পাইলে নারীও অনেক মহৎ কার্যে যোগ্যতা দেখাইতে পারে। আমাদের দেশে যে-সকল কুপ্রথা নারীজীবনকে দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছে, বঙ্কিম একান্তভাবে তাহার মূলোচ্ছেদ কামনা করিয়াছেন। স্বামিগৃহ-বিতাড়িতা প্রফুল্ল ও চিরবিরহিণী কুলীনপত্নী শ্যামাসুন্দরীর করুণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া কৌলীন্যপ্রথার নির্মম পরিণতির প্রতি বঙ্কিম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছেন। আবার শৈবলিনী ও লবঙ্গলতার জীবনকাহিনী রচনা করিয়া বঙ্কিম ইহাই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, বিবাহব্যাপারে পুরুষের ন্যায় নারীরও একটা স্পষ্ট অভিমত প্রকাশের অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। বিধবাবিবাহ হিন্দুসমাজের একটি বড় সমস্যা। মানবদরদী বঙ্কিম এই সমস্যাটির দিকেও দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। বালবিধবা কুন্দর প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি জানাইয়া এবং রোহিণীর বৈধব্যপীড়িত ব্যর্থ জীবনের করুণ আলেখ্য চিত্রিত করিয়া তিনি বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। তবে তিনি বিধবামাত্রেরই বিবাহে সমর্থন জানান নাই, বিধবার ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপরই তাহা ছাড়িয়া

দিয়াছেন। তাঁহার মতে মৃতদার পুরুষের ন্যায় বিধবা নারীরও পুনর্বার বিবাহে সমান অধিকার থাকা উচিত। সাম্যনীতির প্রবক্তারূপেই তিনি সকল সমস্যার সমাধান খুঁজিয়াছেন।

বঙ্কিমের সাম্যবোধ সম্বন্ধে অনেকে এইরূপ বিরোধী মত প্রকাশ করেন যে, তিনি তাঁহার রচনায় মুসলমান-বিদ্বেষ প্রচার করিয়া সাম্যনীতির চূড়ান্ত অপলাপ ঘটাইয়াছেন। এইরূপ অভিমত বঙ্কিমকে ভালো করিয়া না বোঝারই ফল। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, তাঁহার তথাকথিত মুসলমান-বিদ্বেষ সমকালীন ইংরাজ প্রভুশক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার কৌশল মাত্র। বস্তুতঃ হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল অপক্ষপাতী—উভয়কেই তিনি মনুষ্যত্বের তুলাদণ্ডে বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। মনুষ্যত্ববোধকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার সাম্যবোধ স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে।

অন্তরে গভীর মানবপ্রীতি ছিল বলিয়া বঙ্কিম তাঁহার রচনায় সর্বত্রই সাম্যনীতির জয়ঘোষণা করিয়াছেন। উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে বৈষম্য, তাঁহার রচনায় তাহা বিশেষভাবে তিরস্কৃত। ধনী-দরিদ্রের চিরকালীন বৈষম্যকে তিনি ন্যায়ের শাসনে দণ্ডিত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার 'বিড়াল' দরিদ্রের মর্মজালা ব্যক্ত করিয়া ধনীর ধনসঞ্চয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। এযুগের পরিকল্পিত শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থারই পূর্বাভাস বঙ্কিমের এই রচনায়।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সুবিখ্যাত 'সাম্য' প্রবন্ধে সাম্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও রুশোকে তিনি পৃথিবীর তিনজন শ্রেষ্ঠ সাম্যসংস্থাপকরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। বুদ্ধের শিক্ষায় ভারতের বর্ণবৈষম্যের মূলে আঘাত পড়ে, খ্রীষ্ট-প্রচারিত মানবপ্রীতির বাণীতে প্রভু ও দাস—উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতের বৈষম্য ঘুচিয়া যাইতে থাকে, আর রুশোর শিক্ষাগুণে মানবসমাজে শ্রেণীবৈষম্য-বিলোপের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনজনেরই প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র আলোচনায় তিনি মানবসমাজের বিভিন্ন স্তরে অধিকারসাম্য স্থাপনের কথাই বিশেষভাবে বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মিল-প্রমুখ বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর অভিমত উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এদেশের বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার যুক্তি ও মতকে যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দশা ও নারীসমাজের সর্ববিধ সামাজিক দুর্গতির কথা

তুলিয়াছেন ; তুলিয়া 'মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট' বলিয়া উদাত্ত কণ্ঠে সাম্যনীতি প্রচার করিয়াছেন।

কিন্তু বঙ্কিমের সাম্যচেতনায় ইহাই শেষ কথা নহে। পরিণত বয়সে অধ্যাত্মবোধজাত মানবপ্রীতির সমুজ্জ্বল আলোকে তাঁহার অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তখন মানুষমাত্রকেই ঈশ্বরের প্রতিরূপ বোধ হওয়ায় সকলেরই প্রতি সমভাবে প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। সর্বমানবে প্রসারিত এই প্রীতিই সাম্য-বোধকে পরিপূর্ণতা দান করে। বিদেশীয় যুক্তিশাস্ত্র মন্থন করিয়া যে সাম্যনীতির প্রচারে বঙ্কিম ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহার শেষ পরিণতি ঘটিয়াছে ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনায়। ইউরোপের শিক্ষা তাঁহাকে উদ্যোগী করিয়াছে, কিন্তু ভারতীয় আদর্শ তাঁহার হাতে ঈপ্সিত ফলটি তুলিয়া দিয়াছে।

এই ভারতীয় আদর্শের চরম বিকাশ দেখা যায় স্বামী বিবেকানন্দের বাণী রচনায়—তাঁহার বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে। সমকালীন যুগভাবনার ছাপ লইয়া নব্য-শিক্ষিত তরুণ নরেন্দ্রনাথরূপে তাঁহার প্রথম পরিচিতি। তারপর ভারতীয় ধর্মাদর্শের অনুশীলনে তিনি বিবেকানন্দ হইয়া উঠেন। বাঙালীর বিশেষরূপ মানসিক গঠনের গুণে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রে সাম্যমূলক মানবপ্রীতির প্রতিশ্রুতি ছিল। প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মসমাজের সাহচর্যে ও ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে তাহাই বর্ধিত হইয়া উঠে। পরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পবিত্র সান্নিধ্যে আসিয়া এই মানবপ্রীতি এক নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় বিবেকানন্দ বৈদান্তিক অদ্বৈতবোধে উপনীত হন। ইহার ফলে তাঁহার মানবপ্রীতি রূপ পরিগ্রহ করে বিশ্বৈকাত্মবোধে। বিশ্বের সকল কিছুই যে এক পরমাত্মার প্রতিরূপ—বহু ও এক যে অভিন্ন, এই বোধ জাগ্রত হইলে আত্মপরভেদ লুপ্ত হইয়া যায়—একটা উদার সাম্যবোধে হৃদয়ের চির-অধিষ্ঠান ঘটে। অদ্বৈতবোধপ্রসূত এই সাম্যবোধে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সার্থক উত্তরণ ঘটিয়াছিল। তাঁহার কর্ম-চিন্তা ও বাণী অদ্বৈতবোধকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত।

অদ্বৈতবাদ মানুষে মানুষে কোনরূপ ভেদ স্বীকার করে না, এবং তাহা করে না বলিয়াই মানুষের বিশেষ অধিকার [privilege] লাভের চেষ্টা অদ্বৈত-বাদের দৃষ্টিতে একান্তভাবেই নিন্দিত। বিবেকানন্দ এই বিশেষ অধিকার লাভের চিন্তাকেও 'brutal idea' বলিয়া তিরস্কৃত করিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষের

মধ্যেই দেবত্ব [divinity] আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। অতএব বিশেষ অধিকার লাভের চেষ্টায় কেহ যে কাহারও প্রতি অন্যায় বা অত্যাচার করে, ইহা তাঁহার নিকট নিতান্ত অসহনীয় ছিল। এইখানেই তাঁহার সাম্যবোধ সার্থকতা লাভ করিয়াছে; আর, সাম্যবোধই সমাজবাদের মূল কথা। এই জন্যই তিনি নিজেকে socialist বা সমাজবাদী বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

সমকালীন সমাজ-সংস্কার-আন্দোলনকে তিনি স্বাগত জানাইতে পারেন নাই। কারণ, তাহাতে যে শ্রেণীমুখিতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যাইত, তাহার প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র সমর্থন ছিল না। শ্রেণী-নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণকে মনুষ্যত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। মনুষ্যত্ব জাগ্রত হইলে মানুষ আপনার সমস্যার আপনিই সমাধান করিতে পারে, এই বিশ্বাস তাঁহার দৃঢ় ছিল। এইজন্য যখনই সমাজ-সংস্কারের কথা উঠিয়াছে, তখনই তিনি সমাজের আমূল রূপান্তর [root and branch reform] সাধনের কথা বলিয়াছেন।

তাঁহার মানবপ্রেমের প্রাথমিক প্রসার তাঁহার স্বদেশ ভারতবর্ষে। বিরাট এই দেশের প্রায় সমস্তটাই তিনি পরিক্রমণ করিয়াছিলেন এবং নানাশ্রেণীর মানুষের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি সমগ্র দেশের হৃদ্‌স্পন্দনের সহিত নিজের হৃদয় মিলাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। দেশবাসীর গৌরব ও গ্লানি, সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা—সমস্তই আত্মসাৎ করিয়া লইয়া দেশকে এমন করিয়া ভালবাসিতে খুব কম লোকই পারিয়াছেন। দেশের প্রতি তাঁহার এইরূপ ভালবাসা ছিল বলিয়াই তিনি একদিকে যেমন দেশের অতীত গৌরবে গৌরববোধ করিয়াছেন—ইহার মহান ঐতিহ্যকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছেন, অপরদিকে তেমনই ইহার দুঃখ ও গ্লানিতে বেদনা বোধ করিয়াছেন। স্বদেশের প্রতি তাঁহার এই যে প্রেম, ইহাই পরিণামে প্রসারিত হইয়া বিশ্বপ্রেমে রূপ লাভ করিয়াছে এবং তাঁহাকে অদ্বৈতসাধনায় চরম সিদ্ধি আনিয়া দিয়াছে।

এই মহান অদ্বৈতসাধক বহুর মধ্যে এককে প্রত্যক্ষ করিতেন বলিয়া কোথাও কোনপ্রকার ভেদ বা বৈষম্যকে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। ধর্মে ধর্মে যে চিরাগত বৈষম্য, তাঁহার দৃষ্টিতে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। প্রত্যেক ধর্মকেই তিনি সত্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বলিয়া মনে করিতেন, এবং বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি সকল ধর্মগুরুই যে একের বিভিন্ন উজ্জ্বলতম অভিব্যক্তি মাত্র, এইরূপ একটা দৃঢ় প্রতীতি তাঁহার ছিল।

ধর্মবিদ্বেষের ন্যায় জাতিবিদ্বেষও পৃথিবীতে গুরুতর আকার ধারণ করে।

সত্যসন্ধানী স্বামীজীর মতে এইরূপ জাতিবিদ্বেষও অর্থহীন; কারণ বিভিন্ন জাতিতে তো একই মহাশক্তির প্রকাশ-বৈচিত্র্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে যে চরিত্রগত বিভেদ লক্ষ্য করা যায়, স্বামীজী তাহাকে একই সত্যের এপিঠ আর ওপিঠ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক বল এবং পাশ্চাত্ত্যের আধিভৌতিক শক্তি—উভয়ের সমন্বয়েই মনুষ্যত্বের সমগ্র রূপটি ফুটিয়া উঠিবে।

ভারতবর্ষের বিভেদমূলক সমাজব্যবস্থাকে স্বামীজী রুদ্ররোষে অভিশপ্ত করিয়াছেন। ভারতীয় হিন্দুসমাজকে অস্পৃশ্যতার হীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার বজ্রকণ্ঠ গর্জিয়া উঠিয়াছে। 'ছুঁৎমার্গীর দল' তাঁহার নিকট তীব্র-ভাষায় ধিক্কৃত। এমন কি, হিন্দু-মুসলমানের ভেদও তাঁহার কাছে নিন্দিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মানবপ্রেমিক এই সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে ভেদ-বিভেদ-পরিচ্ছিন্ন মানুষের শাশ্বত সত্তাই বড় হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার অদ্বৈতচেতনায় ভারতীয় বর্ণভেদপ্রথাও মূলতঃ কোনো ভেদ বা বৈষম্য প্রচার করে না। তাঁহার মতে এক ব্রাহ্মণই বিভিন্ন আচরণের আবরণে তথাকথিত ভিন্ন ভিন্ন নিম্নবর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, কালের বিবর্তনে আবরণ ভঙ্গ করিয়া—সকলপ্রকার হীনতা ও তামসিকতা বর্জন করিয়া আবার তাহারা ব্রাহ্মণত্বে ফিরিয়া যাইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বর্ণ বলিতে বিবেকানন্দ গুণ-কর্মানুসারী শ্রেণীবিভাগই বুঝিতেন—জন্মগত শ্রেণীবিভাগ তাঁহার স্বীকৃতি লাভ করে নাই। এইজন্য পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির মধ্যে তিনি বর্ণ-বিভাগ লক্ষ্য করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদী এই সন্ন্যাসীর নিকট নারী-পুরুষের ভেদও অবলুপ্ত। নারী ও পুরুষের মধ্যে তিনি একই সর্বভূতময় সর্বশক্তিমান আত্মার অবস্থিতি অনুভব করিতেন। এইজন্য নারীজাগরণের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন অপেক্ষা নারীর অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনই তাঁহার নিকট অধিকতর কাম্য ছিল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নারীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিলে সে তাহার নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করিতে পারিবে।

উনবিংশ শতাব্দীর এই বজ্রসত্ত্ব পুরুষ স্বদেশকে দিয়াছিলেন 'অভীঃ' মন্ত্র। সর্বপ্রকার ক্লীবত্ব হইতে মুক্ত হইয়া বীর্যময় মনুষ্যত্ব-সাধনার পথে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বার বার দেশবাসীকে আহ্বান জানাইয়াছে। সেকালের পরাধীন ভারতবাসীর মুক্তি-সংগ্রামের ইঙ্গিতও তাঁহার বাণীতে পরিস্ফুট। তাঁহার স্বপ্নদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ভারতের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে

নিম্নবর্ণের লোকেরা ও শ্রমজীবীরা আর অবহেলিত নহে—তাহারাই অমিতবীর্যে সংগ্রাম করিয়া দেশ ও জাতিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে।

কিন্তু অদ্বৈতবোধে সুপ্রতিষ্ঠ এই প্রেমিক সন্ন্যাসী যে কেবল স্বদেশেরই চিন্তা করিয়াছেন তাহা নহে, বিদেশবাসীরাও তাঁহার ভাইবোন—তাহাদেরও কল্যাণ তিনি কামনা করিয়াছেন—ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ লইয়া তাহাদের বিলাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রেম স্বদেশ ও বিদেশকে আবার তেমনই ভালো ও মন্দকে সমভাবে বক্ষোবদ্ধ করিয়া সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। প্রবলের বিরুদ্ধে হিংসাশ্রয়ী সংগ্রাম তাঁহার কাম্য ছিল না, ছিল তাহার প্রতি প্রেম বিস্তার করিয়া তাহার দানবসত্তাকে বশে আনা—তাহার মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটানো। আবার দুর্বলের মধ্যে আত্মার শক্তিকে জাগাইয়া তোলার কথাও তিনি বলিয়াছেন। দরিদ্র ও আর্তকে তিনি নারায়ণজ্ঞানে সেবা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ধনী ও দরিদ্র, প্রবল ও দুর্বল—সকলেরই প্রতি তাঁহার প্রেম সমভাবে বর্ষিত হইয়াছে। এই-যে সর্বজনীন প্রেম, ইহাই সাম্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ। ইউরোপীয় শিক্ষাকে অতিক্রম করিয়া ভারত তথা বাঙলার বিশ্বাত্মভাবনার মধ্যেই ইহার উৎস খুঁজিতে হয়।

এই বিশ্বাত্মভাবনারই স্বচ্ছন্দ প্রকাশ রবীন্দ্র-সাহিত্যে। উনবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির যেটুকু আমরা পাই, তাহাতেও ইহার পরিচয় পরিস্ফুট। ক্ষুদ্রজীবনকে বিশ্বজীবনের সহিত মিলিত করার—সীমা ও অসীমের মধ্যে সেতুবন্ধনের একটা আকুল আকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনায়। কিশোর-বয়সে কিশোর-হৃদয় লইয়াই কবি জগতের সহিত কোলাকুলি করিতে চাহিয়াছেন। জগৎ-চরাচরকে ভাই বলিয়া জানার উল্লসিত ছন্দ তাঁহার কবিতায়। 'মানব-হৃদয়ে মিশিতে' তাঁহার হৃদয় ক্রন্দন করে। পৃথিবীর 'সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ভাষা দিয়া, তাহাদের 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে' নবজীবনের আশা ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া তিনি জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়াছেন। ভারতের অতীতকথায় তিনি যখনই মহৎ ত্যাগ লক্ষ্য করিয়াছেন, পরদুঃখ-মোচনের কাহিনী দেখিয়াছেন, আত্মপরভেদজ্ঞান-বর্জিত ন্যায়বিচারের পরিচয় পাইয়াছেন, তখনই সেই মানবিক গুণগুলির প্রশস্তি রচনা করিতে বসিয়াছেন। মনুষ্যত্বের প্রতি এই শ্রদ্ধাবোধই রবীন্দ্র-হৃদয়কে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বিশ্বমানবের প্রতি প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বপ্রেমের চরম সিদ্ধি বিশ্বের সহিত একাত্মতাবোধে। বিশ্বের সকলের ঘরে ঘরে জন্মলাভ করিবার আকুল

আগ্রহ তাঁহার। শুধু তাহাই নহে, 'শৈবালে শাদ্বলে তৃণে শাখায় বল্কলে' নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিয়া বিশ্বলীন হওয়ার যে অনির্বচনীয় আনন্দ—যাহা 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই মহতী অনুভূতিরই সগোত্র, তাহারও জন্য কবির অন্তহীন তৃষ্ণা।

কবির্মনীষী রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সর্বত্রই প্রেমাভিসারী; তাঁহার গল্প-উপন্যাসেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্রেম ও প্রতাপের দ্বন্দ্বে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রেমকেই বিজয়মাল্য পরাইয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের সর্বনাশা প্রতাপ তাঁহার জীবনকে অভিশপ্ত করিয়াছে; কিন্তু বসন্ত রায়ের সর্বজন-প্রসারিত প্রেমানুভূতি তাঁহাকে চিরকালের অম্লান দীপ্তি দিয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার প্রেমের বলেই প্রবলপ্রতাপ রাজপুরোহিত রঘুপতির উপর জয়ী হইয়াছেন। মন্দিরে জীববলি বন্ধ করিতে গিয়া তিনি তাহার ক্ষুদ্র রাজ্যটি হারাইয়াছেন বটে, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির বিশাল রাজ্য তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে। প্রতাপের উপর যখনই প্রেম জয়লাভ করে—সংকীর্ণ অহংবোধকে অতিক্রম করিয়া যখনই পরবৎসলতার প্রতিষ্ঠা হয়, তখনই সেই আত্মব্যবচ্ছিন্ন অনুভূতিতে সাম্যবোধের একটি সুর বাজিয়া উঠে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাহা কখনও পরোক্ষভাবে, কখনও বা অপরোক্ষ অনুভূতির আশ্রয় লইয়া আমাদের চিত্তে দোলা দিয়াছে।

ইংরাজ প্রভুশক্তি এবং ভয়ার্ত ও নিরুপায় বাঙালীর মধ্যে একদা যে বেদনাদায়ক বৈষম্য ছিল, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে নব্যশিক্ষিত স্বাধীনচেতা যুবক শশিভূষণের তেজস্বী মনোভাব সবল-দুর্বল-নির্বিশেষে মানুষের অধিকারসাম্য দাবি করিতেছে। নবেন্দুশেখরকে রাজ-খেতাবের স্বপ্নস্বর্গ হইতে নামাইয়া আনিয়া স্বদেশের সহজ মানুষের মেলায় স্থাপন করিয়া ইহাই প্রচার করা হইতেছে যে, রাজদত্ত গৌরব-ভোগের নির্বাসিত জীবন অপেক্ষা দেশবাসীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া যে তৃপ্তি লাভ করা যায় তাহার মূল্য অনেক গুণে বেশী। স্বামীর নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদে গ্রামবধূ চন্দরার আত্মোৎসর্গ এবং অবহেলিত দাম্পত্য জীবনের গ্লানি এড়াইবার জন্য গিরিবালার নিঃশঙ্ক বিদ্রোহ নারী-পুরুষের চিরন্তন বৈষম্যকে ধিক্কার দিতেছে। রামসুন্দর মিত্রের কন্যা নিরুপমার শ্বশুরঘরে বন্দী-জীবন এবং নিদারুণ অবহেলার ভিতর দিয়া সেই জীবনের অবসান আমাদের সম্মুখে নারী-পুরুষে বৈষম্যমূলক সমাজপ্রথার করুণ চিত্র তুলিয়া ধরে। ব্রাহ্মণ-যুবক হেমন্তের সঙ্গে কায়স্থকন্যা কুসুমের পরিণয় এবং সমাজশাসনের প্রতি

হেমন্তের সহজ উপেক্ষা জাতিগত ভেদবুদ্ধির মূলে প্রবল আঘাত করিতেছে। বাঙালী হিন্দুঘরের মেয়ে মিনির প্রতি কাবুলিওয়ালা রহমতের পিতৃস্নেহ জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে স্নেহপ্রীতির আসন নির্দেশ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের লেখনী কখনও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করিয়া, কখনও পাঠকচিত্তকে মনুষ্যত্বের উদার ভূমিতে লইয়া গিয়া প্রেম ও প্রীতি-মূলক সাম্যবাদের জয় ঘোষণা করিয়াছে।

রবীন্দ্র-মানসের এই উদার সাম্যবোধের কথা ছড়াইয়া আছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পত্র এবং প্রবন্ধেও। উনবিংশ শতাব্দীর কালসীমার মধ্যেও তাহার পরিচয় দুর্লভ নহে। জমিদারের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকিয়াও যে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে তাঁহার দরিদ্র প্রজা ও কর্মচারীদের মতই সুখদুঃখকাতর সাধারণ মানুষ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহার পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ছিন্নপত্রাবলীর একখানি পত্রে। অপর একখানি পত্রে তাঁহার দরিদ্র চাষী প্রজাদের দুঃখে কাতর হইয়া তিনি সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানাইয়াছেন। ইহা ছাড়া সমকালীন বাঙলাদেশে ইংরাজের সহিত বৈষম্য হেতু বাঙালী-মনের যে বিক্ষোভ, তাহাও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধে বাণীরূপ লাভ করিয়া মানুষে মানুষে সমজ্ঞানের ইঙ্গিতটুকু স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বমানবের সহিত বাঙালীর 'একাকার' হইয়া যাওয়ার স্বপ্নও দেখিয়াছেন কবি। কিন্তু কেবল মানুষে মানুষে সাম্যবোধই নহে, রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুভূতিলোকে বিশ্বসৃষ্টির সকল কিছুই—পশুপক্ষী, বৃক্ষ-লতা-তৃণ সমস্তই অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। এই অধ্যাত্মমুখী সাম্যবোধেরও আভাস তাঁহার কয়েকখানি পত্র-প্রবন্ধে।

উনিশ শতকে রবীন্দ্র-নাটকেও এই আধ্যাত্মিক সাম্যবোধের প্রসার দুর্নিরীক্ষ্য নহে। অসীমের সাধনায় নিমগ্ন গিরিগুহাবদ্ধ সন্ন্যাসী যখন প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার অভীষ্ট অসীমকে তিনি বিশ্ব-প্রকৃতির সকল কিছুরই মধ্যে অনুভব করিলেন—তখন তাঁহার নিকট 'বড়ো-ছোটো কিছু নাই, সকলি মহৎ'। যে-দৃষ্টিতে বিশ্বের ছোটবড় সকল কিছুকেই অসীমের প্রতিরূপ বলিয়া মনে হয়, তাহাই তো প্রকৃত সমদৃষ্টি।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিতা রাজকন্যা মালিনীর দৃষ্টিও এই মহতী সমদৃষ্টির অভিসারী। রাজগৃহের সংকীর্ণ সীমা হইতে বাহির-সংসারে আসিয়া সকলের সহিত মিলিত হইবার জন্য তাহার দুরন্ত ব্যাকুলতা। 'যত দুঃখ যেথা আছে সকলের 'পরে' 'সান্ত্বনার সুধা' বর্ষণ করিতে সে উন্মুখ। শত্রু নাই, মিত্র নাই—সকলেরই প্রতি তাহার সমান প্রেম। বিদ্রোহী ক্ষেমংকরও তাঁহার এই সর্বতোমুখী প্রেম হইতে

বঞ্চিত নহে। সর্বজনে প্রসারিত এই-যে প্রেমদৃষ্টি, ইহাই সকলপ্রকার সাম্য-বোধের মূল উৎস। রবীন্দ্র-ভাবনায় ইহাই নিরন্তর বিলসিত।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সাহিত্যসেবীরা প্রায় সকলেই সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণায় নিজ নিজ স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। কাব্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক—সাহিত্যের সকল বিভাগেই আমরা ইহার পরিচয় লক্ষ্য করি। যাঁহাদের রচনায় সাম্যচিন্তার উচ্ছল প্রকাশ, তাঁহারা ছাড়া এমনও কয়েকজন সাহিত্যরথী আছেন যাঁহাদের দান নিঃসংশয়ে সাম্যমূলক মানবধর্মকে স্পর্শ করিয়াছে।

কাব্য-কবিতায় এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং আরও কয়েকজন কবি।

মানব-পরিচয়কে আর্য-অনার্য-বিচারের ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়া মধুসূদন দেখাইয়াছেন যে, লঙ্কার অনার্য রাক্ষসেরাও আর্যদের মতই মানুষ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য—মনুষ্যত্বের বিচারে আর্যে-অনার্যে কোনো ভেদ নাই। নারী-পুরুষের বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে সমকালীন আন্দোলন, মধুসূদনের নারীচরিত্র-চিত্রণে তাহারই সমর্থন মিলিবে। নারীর 'অবলা' নামের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ মধুসূদনের 'প্রমীলা'। প্রমীলার যোদ্ধবেশ ও সাহসিকতা শক্তিসাহসের ক্ষেত্রে নারীপুরুষের অসাম্যকে উপেক্ষা করিতেছে। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা—বিশেষতঃ তারা, দ্রৌপদী, শূর্পণখা, কেকয়ী ও জনা নারীর প্রাপ্য মানবাধিকারের বাণী ঘোষণা করিয়া নারীপুরুষে অধিকারসাম্যের প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করিতেছে।

কবি হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' প্রবল ও দুর্বলের বৈষম্যের রূপকরূপে পরি-কল্পিত হইয়াছে এবং এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য দুর্বলকে শক্তিসাধনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে। কাব্যের দধীচি-চরিত্রটি আত্মবিলোপী প্রেমের মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া বিশ্বাত্মবোধের মূল সুরটি ধ্বনিত করিতেছে। হেমচন্দ্রের কয়েকটি খণ্ড-কবিতায় আবার সমকালীন সাম্যাদর্শী ভাব ও ভাবনার ছাপ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'ভারত-কামিনী', 'বিধবা-রমণী' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় নারী-নিগ্রহের বিরুদ্ধে আবেগমিশ্রিত প্রতিবাদ। 'ভারত-ভিক্ষা', 'ভারত-সঙ্গীত', 'ভারত-বিলাপ' প্রভৃতি কবিতায় পরাধীনতার মর্মজ্বালা ও ইংরাজের সহিত এদেশবাসীর অসাম্যবোধের দুঃসহ বেদনা প্রকাশিত। ইংরাজের মতো সতেজে গমন করিতে ও স্বদেশকে আপন বলিয়া ভাবিতে কবি ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। 'এ বিপুল ভবে' যে 'সবাই স্বাধীন' এই নজীরের জোরে কবি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দেশবাসীকে অধিকারসাম্য লাভের আহ্বান জানাইতেছেন।

কবি নবীনচন্দ্রের মানবমুখী কাব্যসাধনায় সকল ভেদ-বিভেদের ঊর্ধ্বে মানুষের স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে। আর্যে-অনার্যে ভেদ, ধর্মমতের ভেদ এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে সদাজাগ্রত ভেদ-বিরোধের বিরুদ্ধে তাঁহার ত্রয়ীকাব্যে সুতীব্র ধিক্কার ধ্বনিত। মহাভারতের যুগে যে নিদারুণ 'হিংসা-বিষ' ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়া ভারতীয় ঐক্য ও সংহতির বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার নিপুণ বর্ণনা দিয়া কবি একদা-সমৃদ্ধ দেশের চরম অধঃপাতের আলেখ্য আঁকিয়াছেন এবং ভারতব্যাপী দ্বন্দ্বকোলাহলের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়াছেন সাম্যস্থাপক মহামানব শ্রীকৃষ্ণকে। কবি দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রতিম ব্যক্তিত্বের প্রভাবে জাতিগত, ধর্মগত, বর্ণগত ও রাষ্ট্রগত সকল বিভেদ হইতে ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করিয়াছিল। 'এক ধর্ম, এক জাতি, এক রাজ্য, এক নীতি' প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেকালের ভারতবর্ষে সাম্যসাধনার চরম সিদ্ধি আনিয়াছিলেন। আগামী দিনের ভারতকে এই সিদ্ধি লাভ করিবার ইঙ্গিত দিয়াছেন নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্রের সাম্যদর্শী মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাঁহার অন্যান্য কাব্যগ্রন্থেও। 'খৃষ্ট', 'অমিতাভ', 'অমৃতাভ'—এই তিনখানি মহাপুরুষ-জীবনীর মূল প্রেরণা ধর্মবিষয়ে সাম্যবোধ। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের প্রেরণামূলে যে স্বাধীনতাপ্রীতি, সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে তাহাও একধরনের সাম্যকামনা হইতে উপজাত। মানবাধিকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইংরাজ ও ভারতীয়ের মধ্যে অসাম্যবোধজনিত যে বেদনা সে-যুগের পরাধীন ভারতবাসীকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল, বঙ্গ-ইতিহাসের একটি অধ্যায় আশ্রয় করিয়া নবীনচন্দ্র তাহাকেই বাণীরূপ দিয়াছেন।

উনিশ শতকের ছোট-বড় বহু কবির কণ্ঠেই এই ইংরাজ-ভারতীয়ে বৈষম্য-বোধজনিত স্বাধীনতাপ্রীতির সোচ্চার প্রকাশ। ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিভিন্ন কবিতা ও গান ইহার দৃষ্টান্তস্থল। নারীজাগরণের আন্দোলন করিয়া নরনারীর বৈষম্য ঘুচাইবার যে প্রয়াস উনিশ শতকের বাঙলায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারও আভাস কয়েকটি কবিতায়। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভারত-ললনা' জাগাইবার গান এবং আনন্দচন্দ্র মিত্রের রচনায় 'ভারতে শ্মশান-মাঝে' বালবিধবার করুণ আর্তনাদ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইহা ছাড়া দীন, পতিত ও আর্ত মানবের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার যে আত্যন্তিক আগ্রহ সাম্য ও মানবতাবোধের পরিচয় বহন করে, উনিশ শতকের কবিকণ্ঠে তাহাও

পরিস্ফুট। মহিলা-কবি মানকুমারী বসু ও কামিনী রায়ের বিভিন্ন কবিতা ইহার বিশেষ সাক্ষ্য দিতেছে। 'সকলের তরে সকলে আমরা' বলিয়া কামিনী রায়ের কবিকণ্ঠ সাম্যবাদের মূল মন্ত্রটি উচ্চারণ করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাস-সাহিত্যেও সাম্যমূলক চিন্তাধারার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ইহার সচ্ছলতা, কিন্তু বঙ্কিম-অনুসারী লেখক রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসেও ইহা অপ্রচুর নহে। রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা" উপন্যাসে বাঙালী সেনানী ইন্দ্রনাথের বীর্যবত্তা বাঙলার তরুণ-সম্প্রদায়কে শক্তি ও সাহসের ক্ষেত্রে পৃথিবীর বীর্যবান জাতিগুলির সহিত সমকক্ষতা করিতে উৎসাহ যোগায়। 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত'-এ স্বাধীনতাকামী মারাঠানায়ক শিবাজীর অম্লান বীরত্বের আলেখ্য রচনা করিয়া এবং 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'য় স্বাধীনতারক্ষার জন্য রাণা প্রতাপের সুকঠোর তপস্যার ভাষাচিত্র তুলিয়া ধরিয়া রমেশচন্দ্র চাহিয়াছিলেন পরপদদলিত বাঙালী জাতির চিত্তে সাম্যসন্ধানী স্বাধীনতার মহতী প্রেরণা সঞ্চার করিতে। সমকালীন বৈষম্যমূলক সমাজ-সমস্যা এবং তাহার সমাধানের ইঙ্গিতও রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে। 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাসে বিবাহব্যাপারে পুরুষের ন্যায় নারীরও স্বেচ্ছানির্বাচনের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত। রমেশচন্দ্রের 'সংসার' উপন্যাসখানি বাঙালী নারীসমাজের বিভিন্ন সমস্যায় মুখর। কৌলীন্যপ্রথার ভয়াবহতা, কেবল বিত্তযোগ্যতা দেখিয়া কন্যা-সম্প্রদানের শোচনীয় পরিণতি এবং বালবিধবার অবরুদ্ধ বেদনা এই উপন্যাসের বিভিন্ন কাহিনীতে অভিব্যক্ত। লেখক সহজ গল্পরসের মাধ্যমে নারীজীবনের এই সমস্যাগুলি উপস্থাপিত করিয়া কোথাও সেগুলি সমাধানের প্রয়োজনীয়তার প্রতি পাঠক-চিত্তের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন, কোথাও বা নিজে অগ্রসর হইয়া সমাধানের পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এইভাবে সমগ্র উপন্যাসেই তিনি নারীপুরুষের বৈষম্যজাত কয়েকটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া উহাদের অবলুপ্তি কামনা করিয়াছেন। তাঁহার 'সমাজ' উপন্যাসে আবার হিন্দুসমাজের অপর একটি বৈষম্যমূলক কুপ্রথার উল্লেখ দেখা যায়। হিন্দুসমাজে বহুকাল ধরিয়া জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত থাকিয়া মানুষে মানুষে একটা কৃত্রিম বৈষম্যবোধ জাগাইয়া রাখিয়াছে। রমেশচন্দ্র একটি অসবর্ণ-বিবাহের পটভূমিকায় এই কুপ্রথার অসারতা প্রতিপাদন করিয়া সাম্যদর্শী মনোভাবের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা প্রবন্ধসাহিত্যই সমকালীন বাঙালীর সাম্যচিন্তার

বড় আশ্রয়। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীরা সাধারণতঃ প্রবন্ধের ভাণ্ডারেই তাঁহাদের সাম্যচিন্তার ফসলগুলি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত সমকক্ষতা দাবি না করিলেও এমন কয়েকজন লেখকের নাম করা যাইতে পারে, যাঁহাদের দানে সাম্য ও মানবতার ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্য ঋদ্ধিযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সনাতনপন্থী ভূদেবের চিন্তাধারা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল ধ্যানধারণার অনেকাংশে বিপরীত হইলেও তাহা অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামির অপখ্যাতি কুড়াইয়া লয় না। তাঁহার বহু রচনায়ই তাঁহার বিচারশীল মুক্ত মনের পরিচয় পরিস্ফুট। তৎকালীন ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বৈষম্যবোধ মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে তিনি ইংরাজ-শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলিয়াছেন। তাঁহার মতে 'আকার-ইঙ্গিতে' ও 'আচার-ব্যবহারে' ভারতীয় মুসলমানগণ অনেকটা হিন্দুদের সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। ভারতবাসীদের মধ্যে সাম্যভিত্তিক 'জাতীয় ভাব' বা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার কথা তিনি বিশেষভাবে বলিয়াছেন। সেকালের ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালীর উন্নাসিক স্বাতন্ত্র্যবোধকে তিনি ক্ষমাহীন ভাষায় ধিক্কার দিয়াছেন। এদেশের জাতিভেদপ্রথার প্রতি তাঁহার সমর্থন ছিল বটে, কিন্তু একই বর্ণের মধ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহবিধি তিনি অনুমোদন করিয়াছেন এবং ইহাকে ভারতবর্ষের ভাষাগত বৈষম্য নিরসনের একটি উপায় বলিয়া অভিমত দিয়াছেন। এইভাবে বিভিন্ন মতামতের মধ্য দিয়া বহুক্ষেত্রে সামাজিক সাম্যের কথা বলিলেও সাম্যবোধকে ভূদেব সাদৃশ্যবোধের ফলস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভূদেব-কথিত এই সাদৃশ্যবোধ ও সাম্যবোধে মূলতঃ পার্থক্য অতি অল্পই।

সাম্যবোধের এক অভিনব পর্যায় লক্ষ্য করি সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' গ্রন্থে। কৃষ্ণকায় কোলবালক, পাহাড়িয়া একটি লতা, একটি কূজনরত পক্ষী এবং এক সুন্দরী যুবতী—সকলেই তাঁহার নিকট সমান রূপময়। প্রকৃতি ও মানবসংসারের সকল কিছুর মধ্যেই পরম রূপময়ের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া রূপানুভূতির ক্ষেত্রে তিনি ঋষিসুলভ সাম্যবোধের পরিচয় দিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আকুল আবেদন জানাইয়া মুসলমান লেখক মীর মশাররফ হোসেন হিন্দু-মুসলমানে সমদৃষ্টির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

'গো-জীবন' প্রবন্ধ-গ্রন্থটি তাঁহার এই উদার সমদৃষ্টির বাণীবহ। এই গ্রন্থে তিনি হিন্দুদের মনের দিকে চাহিয়া মুসলমান সমাজকে গোহিংসায় বিরত থাকিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও রুচির প্রতি এই সম্ভ্রমবোধ তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছে।

বলেন্দ্রনাথের রচনায়ও আমরা এই সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মনুষ্যপ্রীতির পরিচয় লাভ করি। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের যে পরধর্মদ্বেষিতার অভিযোগ, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, মুসলমান ধর্মে পরধর্মবিদ্বেষের স্থান নাই—কোরাণের উদার শিক্ষা ও মহাপুরুষ মহম্মদের উপদেশ ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। বলেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য—হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমানদের ভুল ভাঙাইয়া দিয়া এবং হিন্দুদের মন হইতে অযথা মুসলমান-বিদ্বেষ দূর করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি স্থাপন। ইহা ছাড়া, মুসলমানদের দ্বারা যে জগতের বহু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াও তিনি হিন্দুদের মনে মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানদের এই মিলন-চেষ্টায় বলেন্দ্রনাথের যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতামুক্ত উদার মানবপ্রীতিরই স্বাক্ষর বহন করে। মূলতঃ ধর্মবিষয়ে বলেন্দ্রনাথের কোনো অন্ধ মোহ ছিল না। সকল ধর্ম-গুরুর প্রচারিত চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের বাণীকে তিনি সমান শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। সর্বপ্রকার-মিথ্যাচার-বর্জিত যে মানবধর্ম, তাহাকেই তিনি মানুষের 'ভবিষ্যৎ ধর্ম' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার উদার মনের অপর একটি পরিচয় পাওয়া যায় নারীসমাজের প্রতি তাঁহার যুগোচিত শ্রদ্ধাবোধে। প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যহেতু সমাজে নারীপুরুষের স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করিলেও উভয়কে তিনি সমান মর্যাদা দিয়াছেন। ইহাকে নিঃসন্দেহে সাম্যমুখী মানবতার পরিচয় বলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের সম্পদে সম্পন্ন বলেন্দ্র-নাথের মানসিকতাকে কেবল মানবপ্রীতির নিরিখে বিচার করিলে চলিবে না। তাঁহার 'পশুপ্রীতি' প্রবন্ধে দেখি, সর্বজীবে প্রসারিত প্রীতিবোধের যে চিরন্তন ভারতীয় শিক্ষা, তাহার প্রতি তিনি পরম শ্রদ্ধা জানাইতেছেন। মনের এই বিশিষ্ট ভাবটি তো সর্বভূতে প্রীতিমূলক সাম্যবোধই সূচিত করে। বলেন্দ্রনাথের মনের পাতায় ইহার লিপি-লিখন লক্ষ্য করিতে কষ্ট হয় না।

কাব্য-উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধে প্রতিফলিত বাঙালীর এই সাম্যচিন্তা বাঙলা নাটকেও সংক্রমিত হইয়াছে। বাঙলা নাটকের আদিপর্বে সমকালীন বাঙলার

সাম্য ও মানবতা-মূলক চিন্তাধারা নাট্যবস্তুকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে—কোনো কোনো নাটকের মূল লক্ষ্যই হইয়া উঠিয়াছে বৈষম্যমূলক সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিয়া তাহার নিরসন।

বাঙালী নারীসমাজের অভিশাপস্বরূপ কৌলীন্যপ্রথার অবলোপ-কামনায় রামনারায়ণের 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নাটক রচিত হয়। তাঁহার 'নবনাটক' একটি করুণ কাহিনীর মাধ্যমে বহুবিবাহের শোচনীয় পরিণতির চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে এবং এই 'দুষ্প্রথা' দূর করিবার জন্য জনমতের নিকট আবেদন জানাইতেছে। রামনারায়ণের সমকালে তারকচন্দ্র চূড়ামণি-রচিত 'সপত্নী নাটক'ও উদ্দেশ্যমূলক। কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহরীতির নিষ্ঠুর পীড়নে বাঙলার ঘরে ঘরে কুলকামিনীগণ যে দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতেন, তাহারই একটি বাণীচিত্র এই নাটক। নাট্যকার গল্পরসের আশ্রয়ে এই দুইটি সামাজিক কুপ্রথার কুফল দেখাইয়া উহাদের বিরুদ্ধে জনচিত্ত জাগ্রত করিতে চাহিয়াছেন। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকও সপত্নী-সমস্যার আলেখ্য। সপত্নী-ঈর্ষাতুরা দেবযানীর মুখে পতিনিন্দায় ও তাহার পতিগৃহত্যাগে এই সমস্যারই মর্মপীড়া আভাসিত। সপত্নী-সমস্যার সরসতম বর্ণনা দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক' নাটকে। দুই স্ত্রীকে তৈলসেবার সমান অধিকার দানের উদ্দেশ্যে বেচারা পদ্মলোচনের 'হরগৌরী' হইয়া বসিয়া থাকার দৃশ্যটি আমাদের হাসির খোরাক যোগায় বটে, কিন্তু ইহাতে সপত্নী-সমস্যার যে ভয়াবহতা চিত্রিত হইয়াছে তাহা আমাদের চিত্তকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়।

সমসাময়িক বাঙলায় বাল্যবিবাহ-প্রতিরোধকল্পেও কয়েকখানি নাটক রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে 'সম্বন্ধ-সমাধি-নাটক', শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের 'বাল্যবিবাহ নাটক' এবং শ্যামাচরণ শ্রীমানীর 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' উল্লেখযোগ্য।

বিধবাবিবাহ-আন্দোলন সেকালের বাঙলার জাতীয় জীবনে একটি বড় সামাজিক আন্দোলনরূপে দেখা দিয়াছিল। বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন-স্বীকৃতি লাভ করিবার পরে এই বিষয় লইয়া কয়েকখানি বাঙলা নাটক রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে উমেশচন্দ্র মিত্র-রচিত 'বিধবা-বিবাহ নাটক' সর্বাগ্রগণ্য। বিধবা সুলোচনার জীবনের যৌবনসুলভ প্রবৃত্তিসংঘাত ও সমাজশাসনের ভয়ে সেই জীবনের করুণ অবসান চিত্রিত করিয়া নাট্যকার বিধবা-সমস্যার শোচনীয় রূপটি তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং এই সমস্যার সমাধানকল্পে বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন।

দীর্ঘকালব্যাপী নারীনিগ্রহের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই সমাজ-পরিবেশে নারী-পুরুষের অধিকারসাম্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাঙালীর একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা জাগিয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাহাকেই উদ্দীপিত করিয়া বিভিন্ন নারী-আন্দোলনের পথ দেখাইল। বাঙালী নাট্যকারদের রচনায় সেই পথেরই ইঙ্গিত পরিস্ফুট।

নবযুগের সাম্যবাদী চিন্তার ধারা আবার অপর একটি দিকেও প্রসারিত হইয়াছিল। প্রবল ও দুর্বলের মধ্যে যে চিরন্তন বৈষম্য—যাহা দুর্বলকে প্রবলের শক্তিদম্ভের নিকট মাথা নত করিতে বাধ্য করায়, নবযুগের শিক্ষিত বাঙালীর কণ্ঠে তাহার বিরুদ্ধে বজ্রগম্ভীর প্রতিবাদ সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল। দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' নাটকে এই প্রতিবাদের সার্থকতম প্রকাশ। অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনীর নাট্যরূপ তুলিয়া ধরিয়া দীনবন্ধু যেমন একদিকে বাঙলার দুর্বল ও নিপীড়িত কৃষকসমাজের প্রতি জনমানসের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই নীলকরদের শক্তিলীলার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধশক্তি গড়িয়া তুলিবার ইঙ্গিতও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। শক্তিসাম্য স্থাপনের যে প্রয়াস পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বার বার তাহার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে. দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে তাহাই বিশেষভাবে অভিনন্দিত। ইহার কিছুকাল পরে রচিত মীর মশার্‌রফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ' নাটকটিতেও ভিন্ন পরিবেশে এই একই প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি। জমিদার হায়ওয়ান আলীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দরিদ্র প্রজা আবুমোল্লা ও তাহার পত্নী নুরুন্নেহারের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠের প্রতিবাদ প্রবল ও দুর্বলের বৈষম্যজাত বেদনা-বোধেরই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর মনে যে এই বেদনাবোধ সঞ্চারিত হইতেছিল, বিভিন্ন বাঙলা প্রবন্ধের ন্যায় বাঙলা নাটকও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

উনিশ শতকের বাঙলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সমকালীন বাঙালী সমাজের রুচি ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি নাটক রচনা করিতে পারিতেন বলিয়াই তাঁহার এই জনপ্রিয়তা। জনচিত্তের তাগিদেই তিনি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যামূলক বিষয়কে তাঁহার নাটকে স্থান দিয়াছিলেন। সমাজ-সমস্যা লইয়া লিখিত তাঁহার এইরূপ একখানি নাটক—'বলিদান'। এই নাটকে হিন্দুসমাজে প্রচলিত পণপ্রথার ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত করিয়া নাট্যকার এই প্রথাটির বিরুদ্ধে জনমত উদ্বোধিত করিতে চাহিয়াছেন এবং এইভাবে

তৎকালীন সমাজ-সংস্কারক নেতাদের দাবির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশ্য সর্বত্রই যে তিনি এইরূপ করিয়াছেন তাহা নহে। নিজের বিবেকবুদ্ধির ভিতর যাহার সায় মিলিত না, তাহাকে কেবল পরের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই। ইহার বড় প্রমাণ তাঁহার 'শাস্তি কি শাস্তি' নাটক। এই নাটকে তিনি সমকালীন বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই স্বাধীন বিবেকবুদ্ধির ফলে তিনি হয়তো তাঁহার সময়ে সমাজ-আন্দোলনে প্রতিফলিত সাম্যভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই, কিন্তু অপর একটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সাম্যাদর্শের বিশ্বস্ত পূজারী—সেটি তাঁহার ধর্মবোধের ক্ষেত্র। তাঁহার রচিত পৌরাণিক ও ভক্তিরসাশ্রিত নাটকগুলি তাঁহার ধর্মবোধের অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে। আর এই ধর্মবোধই তাঁহাকে নটজীবনের বিলাসপূর্ণ পরিবেশেও উন্মনা করিয়া তুলিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে আনিয়া 'ভক্ত-ভৈরবে' পরিণত করিয়াছে। যুগগুরুর শিক্ষায় তাঁহার মনে যে অদ্বৈতবোধ সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল প্রকাশ তাঁহার রচিত 'বুদ্ধদেব-চরিত' নাটকে। বৃহৎ-ক্ষুদ্র-নির্বিশেষে সর্বজীবের প্রতি সমভাবে প্রেমবিস্তারই অদ্বৈতবাদের মূল শিক্ষা। গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনের রচনা এই সাম্যাদর্শী শিক্ষারই অনুবর্তন করিয়াছে। আর ইহাই যে উনবিংশ শতাব্দীর সকল সাম্যচিন্তার চরম পরিণতি, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

এখন প্রশ্ন হইল, প্রাচীন ভারতের এই আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের ভিতর বর্তমান পৃথিবীর সকলপ্রকার বৈষম্য নিরসনের প্রতিশ্রুতি আছে কিনা। কেবল ব্যবহারিক বুদ্ধি দিয়া এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গেলে ভুল হইবে। সকল বুদ্ধির উৎসমূলে মানুষের যে নিভৃত মনটি রহিয়াছে, তাহারই গভীর তলে ইহার একটি সুনিশ্চিত উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছে। আমরা যদি কান পাতিয়া তাহা শুনিতে পারি, তাহা হইলে সকলপ্রকার বিরোধ ও বৈষম্যকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বাত্ম-বোধের একটি পরম প্রজ্ঞায় গিয়া উপনীত হই। প্রাচীন ভারত এই দুর্লভ প্রজ্ঞারই বাণী ঘোষণা করিতেছে। নিরেট বস্তুবাদী হয়তো ইহাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া গর্ববোধ করিবেন। কিন্তু আমাদের কাজে-ঠাসা জীবনেও কি মাঝে মাঝে ইহার এক-একটি চমক ভাসিয়া আসে না? প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের তুচ্ছতার মধ্যে কখন কেমন করিয়া ছোট একটি ঘটনায় আমাদের ব্যক্তি-আমি বিশ্ব-আমিতে পরিণত হইয়া জীবনের মর্মমূলে দোলা দিয়া যায়।

আমরা ইহাকে ধরিয়া রাখিতে পারি না বটে, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করি কি করিয়া? ইহা যেদিন ক্ষণকালের আবরণ ভাঙিয়া আমাদের জীবনদৃষ্টির সম্মুখে নিত্য-ভাস্বর হইয়া উঠিবে, সেদিন বিশ্বের সকলকেই একান্ত আপন বলিয়া বোধ হইবে—একটা অন্তহীন উদার সাম্যবোধ জাগ্রত থাকিয়া বিশ্বমনের সহিত ব্যক্তিমনের সেতুবন্ধন রচনা করিবে। সেদিন দূরে কি নিকটে জানি না; কিন্তু তাহাকে আবাহন করিয়া লইবার জন্য একটা বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন। এযুগের বিশ্বরাষ্ট্র-গঠনের পরিকল্পনায়, পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সখ্য-স্থাপনের প্রচেষ্টায় এবং ঐশ্বর্যের বিলাসগৃহ ছাড়িয়া বস্তুবাদী মানুষের পথে পথে দীন পদচারণায় এই প্রস্তুতিরই সংকেতধ্বনি বাজিয়া উঠিতেছে। ইহা আর যাহাই হউক একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। বর্তমান রাষ্ট্র-সমাজ-পরিব্যাপী সাম্যবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে ইহা বৃহত্তর মঙ্গলের পথ নির্দেশ করিবে। এযুগে যাঁহারা ভুখামিছিল করিয়া, শ্রমিকসংঘ গড়িয়া, 'লাঙল যার জমি তার' স্লোগান তুলিয়া সমাজবিপ্লব ঘটাইতে চাহেন—যাঁহারা শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের জন্য শ্রেণী-সংগ্রামের পক্ষপাতী, তাঁহারা যে সাম্যবাদী চিন্তাধারার পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ফেলিতেছেন, তাহা অস্বীকার না করিয়াও বলা চলে যে, সাম্যবাদের পরিপূর্ণ ভাবমূর্তিটি প্রত্যক্ষ করিতে হইলে দৃষ্টিকে আরও সম্প্রসারিত করিতে হইবে। সাম্যবাদকে কেবল রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিধিবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, মানুষের হৃদয়রাজ্যে তাহার উদ্বোধন ঘটাইতে হইবে। বিশ্বদিগন্তে আজ যে মৈত্রী-ভাবনার উদয় দেখা যাইতেছে, তাহাকে সাগ্রহে সমস্ত সত্তা দিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে। 'মৈত্রী-ভাবনার আদর্শ সিদ্ধ হবে, যখন অপরকে শুধু জানব নয়—সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করব আমারই আত্ম-স্বরূপ বলে। এই অন্তরঙ্গ অনুভব তখন ফুটে উঠবে জীবনধর্মের সহজ ছন্দে, সিদ্ধ জ্ঞান রূপায়িত হবে অকৈতব আচরণে'।[১]—বিংশ শতাব্দীর ঋষিকণ্ঠের এই বাণীতে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যে সাম্যচিন্তার পরিণত রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

---

১। শ্রীঅরবিন্দ—দিব্য-জীবন [The Life Divine], ১ম ও ২য় খণ্ড [পূর্বার্ধ]—অনির্বাণ-অনূদিত [কলিকাতা: পণ্ডিচেরী-২, শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি,

# প্রথম অধ্যায়

সাহিত্য জীবনধর্মী—জীবনকে বাদ দিয়া সাহিত্য হয় না। সেইজন্য একটি বিশেষ যুগের সাহিত্যে সেই যুগের জীবনচিত্র প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে একটি যুগের সহিত তাহার পূর্ববর্তী সকল যুগেরই যোগসূত্র বিদ্যমান। কাজেই কোনও যুগের সাহিত্যকেই কেবল সেই যুগের বলিয়া চিহ্নিত করা চলে না। '…কোনও দেশের কোনও যুগের সাহিত্যই জাতীয় জীবনের সমগ্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে'।[১] অতএব কোনও দেশের কোনও যুগের সাহিত্য ভালো করিয়া জানিতে বুঝিতে হইলে যেমন সেই দেশের সেই যুগের জাতীয় জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন সেই জাতির পূর্ববর্তী আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে তথ্যনিষ্ঠ জ্ঞান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের মর্মসত্য উপলব্ধি করিতে হইলেও আমাদিগকে অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে—বাঙলাদেশের তৎকালীন ও তৎপূর্ববর্তী কালের জাতীয় জীবনধারার সহিত পরিচিত হইতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'য় ভারত-আত্মার যে চিরন্তন অগ্রগতি, তাহারও প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করিতে হইবে। উনিশ শতকের বাঙালীর সাহিত্যকর্ম বাঙলা তথা ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি সামগ্রিক ঐক্যের মধ্যেই বিধৃত। এই ঐক্যের মূল অনুসন্ধান করিলে মানবতাভিত্তিক একটা মহান সাম্যবোধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বাঙলা ভাষার ঊষালগ্নেই বাঙলা সাহিত্যে এই সাম্যবোধ সঞ্চারিত হইয়াছিল। মহাযানপন্থী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ চর্যাপদগুলির মধ্য দিয়া শূন্যতা ও করুণার সমন্বয় সাধনের যে উদার বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে একটা অদ্বয়বোধ—'নিখিল বিশ্বের সহিত নিজেকে সম্পূর্ণরূপে এক করিয়া দেখা'র কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সকল মানুষের সহিত যে একাত্মবোধ, ইহা তো সাম্যবোধেরই নামান্তর মাত্র।

মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যেও এই উদার মানবিক চেতনার অভাব পরিলক্ষিত হয় না। কৃত্তিবাসী রামায়ণে ক্ষত্রিয় রাজপুত্র রামচন্দ্রের সহিত গুহক চণ্ডালের মিতালি, কাশীদাসী মহাভারতে নীচকুলোদ্ভব সূতপুত্র কর্ণের সহিত কুরুরাজ্যের যুবরাজ মহামানী দুর্যোধনের বন্ধুত্ববন্ধন, কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর নব-

স্থাপিত গুজরাট নগরে হিন্দু-মুসলমানের সমান আদর ও মর্যাদা, এবং সর্বোপরি বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনে প্রেম-ভক্তির অমৃতধারায় চণ্ডাল-দ্বিজে অভেদজ্ঞান মানুষের সর্বসংকীর্ণতামুক্ত সমদৃষ্টির দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

অতএব দেখা যায়, মানুষে মানুষে সাম্যবোধের একটা আদর্শ বহুপূর্ব হইতেই বাঙালীর চিন্তাজগতে স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু বাঙলার এই সাম্যবোধ যে একান্তভাবে তাহার নিজস্ব সম্পদ তাহা নহে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ কী তাহা লইয়া বিচার করিতে বসিলে দেখা যায়, আত্মপর-ভেদজ্ঞান বর্জন করিয়া ভারতবর্ষ চিরকালই সকলকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। 'শকহূণদল-পাঠানমোগল' ভারতের একদেহেই লীন হইয়া গিয়াছে। 'একের অনলে বহুরে আহুতি' দান করিয়া ভারতবর্ষ সাম্যবোধে উদ্বুদ্ধ 'একটি বিরাট হিয়া' জাগাইয়া তুলিয়াছে। ভারতের তপোবনে যেদিন 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' বা 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, সেদিন হইতেই ভারত কেবল মানুষের মধ্যে নহে—জীবমাত্রের মধ্যেই শিব দর্শন করিতে শিখিয়াছে। বাঙালীর সাহিত্য-সাধনা ভারতবর্ষের এই চিরন্তন সাম্যাদর্শী ভাবধারার দ্বারাই পুষ্টি লাভ করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলেও এই সত্যের স্বীকৃতি মেলে। এই শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্য বাঙালীর নবজাগরণের সাহিত্য বলিয়া আখ্যাত। এই নবজাগরণ যে ভারতীয় ভাবধারাকে বর্জন করিয়া সম্ভব হইয়াছিল তাহা নহে—ইহা সম্ভব হইয়াছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির এক অপূর্ব সমন্বয়ের ফলে। বাঙালী এতকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছিল; 'এবার শুধু ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র বিশ্বজীবনের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল; ইংরাজের মারফতে ও ইংরাজী ভাষায় দূতীয়ালির সাহায্যে বাঙালী য়ুরোপের নবজীবন-উল্লাস উপলব্ধি করিল'।[২] একদিকে যেমন বেদান্ত-উপনিষদের সমদৃষ্টি এই শতাব্দীতে বাঙালীর চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনই য়ুরোপের মানবতাবাদ এবং সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ বাঙালীর চিন্তাধারায় প্রবল আলোড়ন তুলিয়াছিল। ঘরে-পরে মিলাইয়া বাঙালী আবার নূতন করিয়া বাঁচিতে শিখিল—পাশ্চাত্ত্যের বলদৃপ্ত জীবনের পরিচয় লাভ করিয়া সে আত্মশক্তি ও আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইল।

ঊষার অরুণালোকে চোখ মেলিয়া সে ঘরের দিকে তাকাইল—পরের দিকেও

তাকাইল। দেখিল, ঘরে তাহার লোভ ও স্বার্থপরতার উলঙ্গ প্রকাশ—রাজা প্রজাকে পীড়ন করিতেছে, ধনী দরিদ্রকে শোষণ করিতেছে, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে পদদলিত করিতেছে, নারী পুরুষের ভোগ্যসামগ্রী বলিয়া গণ্য হইতেছে। নিজের ঘরে মানুষে মানুষে এই বৈষম্য দেখিয়া সে চমকাইয়া উঠিল। কিন্তু পরের ঘরেও যে অনুরূপ বৈষম্য! পাশ্চাত্তের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, উন্নাসিক আভিজাত্য, উৎকট স্বাজাত্যবোধ, দুরন্ত প্রভুত্বস্পৃহা মানুষে মানুষে ভেদের গণ্ডীকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সর্বত্রই মানুষে মানুষে ভেদ—সর্বত্রই মানুষে মানুষে বৈষম্য।

অত্যাচার ও পীড়ন যখন কঠোর হয়—নানাবিধ সামাজিক কুপ্রথার দাসত্বে মানুষের মন যখন হাঁপাইয়া উঠে—মানুষ যখন সত্যধর্ম হইতে বিচ্যুত হয়, তখনই মানুষের আত্মাপুরুষ জাগিয়া উঠিয়া বলে,—'অয়মহং ভো'। উনিশ শতকের বাঙালী মনীষাও সেইরূপ জাতির চরম সংকটের সময়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বৈষম্যমূলক সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে এই শতাব্দীর সাহিত্যসেবীরা দৃঢ়হস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। বন্ধুর পার্বত্য-পথ অতিক্রম করিয়া নদী যেরূপ সমুদ্রের ডাকে সমতলভূমির দিকে ছুটিয়া চলে, উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সাধনাও সেইরূপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের উদাত্ত আহ্বানে সকলপ্রকার বৈষম্যের উপলবাধা দূর করিয়া সাম্য ও মানবতার সমভূমিতে উত্তরণে প্রয়াসী হইয়াছিল। এই শক্তিযজ্ঞের উত্তাপ অনুভব করিতে হইলে তৎকাল-প্রচলিত নানাপ্রকার বৈষম্যমূলক রীতিনীতির সঙ্গে কিছুটা পরিচয় থাকা আবশ্যক। আমরা এখানে এইরূপ পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করিব।

প্রথমেই ধরা যাক বর্ণ-বৈষম্যের কথা। বর্ণ-বৈষম্য কথাটি দুই অর্থে প্রযুক্ত ঃ এক. দেহবর্ণ অনুসারে—বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গ কি কৃষ্ণকায় বিচার করিয়া মানুষে মানুষে যে পার্থক্যবোধ; দুই. হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ-প্রথার অনুসরণে মানুষের মধ্যে যে উচ্চ-নীচ বা ছোট-বড় ভেদ।

পৃথিবীর শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের মধ্যে বহুকাল হইতেই একটা গুরুতর বৈষম্য বর্তমান। কবির ভাষায় যদিও 'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সবারি সমান রাঙা' [ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : জাতির পাঁতি ], তথাপি কৃষ্ণকায় লোকদের উপর শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধত প্রভুত্ববোধ ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করিয়াছে।

'কালো অবগুণ্ঠনের তলে' 'ছায়াচ্ছন্ন' 'অপরিচিতা' আফ্রিকার মাটিঘেঁষা কৃষ্ণকায় নিগ্রো-সন্তানদের উপর বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সুসভ্য শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের প্রভুত্বের কী তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে! একটা বিরাট মানবগোষ্ঠীর হাজার হাজার মানুষকে বিনা অপরাধে আপন জন্মভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমরণ কঠোর বেদনাদায়ক দাসত্ব বরণে বাধ্য করা হইয়াছে। 'সভ্যের বর্বর লোভ' 'নির্লজ্জ অমানুষিতা'র নগ্ন প্রকাশে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নাই।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আফ্রিকার কালো মানুষগুলিকে লইয়া দাস-ব্যবসায় চলিয়াছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া।[৩] নবম শতাব্দী হইতে প্রধানতঃ আরব-ব্যবসায়ীরা এই লজ্জাকর ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। আফ্রিকার নিভৃত গ্রামাঞ্চলের মাটির মানুষ কেবল কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া—কেবল সভ্যতার আলোক হইতে বঞ্চিত বলিয়া চিরকাল দাস হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে তাহারা প্রেরিত হয় দাসত্বের কলঙ্কময় জীবন বহন করিতে।[৪]

নবম শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সুদীর্ঘ হাজার বছর ধরিয়া চলে এশিয়ার হাতে আফ্রিকার এই লাঞ্ছনা। ইতিমধ্যে ইউরোপও আসিয়া যোগ দেয় এই মানুষ-ধরা ব্যবসায়ে। ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজ, স্পেনীয়, ডাচ, জার্মান, সুইডিশ, ফরাসী এবং সর্বশেষে ইংরাজ আসিয়া এই ব্যবসায়ে হাত পাকাইতে থাকে। আফ্রিকার গিনি উপকূল দাস-ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রতিবছর সেখান হইতে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার হাজার নিগ্রোদাস চালান দেওয়া হইতে থাকে।

মধ্য-আফ্রিকার নিভৃত পল্লী-অঞ্চলে হঠাৎ চড়াও হইয়া বহুদিনের 'শান্তির নীড়' ভাঙিয়া দিয়া এই কৃষ্ণকায় লোকদের ধরা হইত।[৫] যে-সকল হতভাগ্য ধরা পড়িত তাহাদের উলঙ্গ অবস্থায় শৃঙ্খলিত করিয়া লইয়া আসা হইত সমুদ্রকূলে অপেক্ষমান জাহাজে। মাইলের পর মাইল তাহাদের হাঁটিয়া আসিতে হইত নগ্নদেহে নগ্নপদে। বনপথের কাঁটায় ও উপলখণ্ডে তাহাদের পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইত। এই সুদীর্ঘ যন্ত্রণাময় পদযাত্রায় যদি কেহ অসমর্থ হইত, তাহাকে পথের মাঝে অসহায়ভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া পড়িয়া থাকিতে হইত, অথবা মাথায় গুরুতর আঘাত করিয়া তাহাকে সকল যন্ত্রণার দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হইত। দাস-চালানের বহু পথ ইহার ফলে মানুষের অস্থিখণ্ডে কণ্টকিত হইয়া থাকিত।

মৃত্যু-ভয়াল এই পথ-পরিক্রমার অবসানে নিগ্রোগণ জাহাজের গহ্বরে স্থান

লাভ করিত। জাহাজে তাহাদের থাকিতে হইত একটানা কয়েক সপ্তাহ। এই সময় তাহাদের প্রতিটি দিন কাটিত দুঃসহ নির্যাতন ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া। ইহার পরে যখন নয়া দুনিয়ার উপকূলে আসিয়া জাহাজ ভিড়িত, তখন শুরু হইয়া যাইত ক্রয়-বিক্রয়ের পালা। নিগ্রোদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া ডেকের উপর দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইত—একদিকে পুরুষ, একদিকে নারী, সকলেই উলঙ্গ। ক্রেতার দল ছুটিয়া আসিত পণ্য বাছাই করিতে। গো-মহিষাদি ইতর প্রাণীর মতই মানুষ মানুষের কাছে বিক্রী হইয়া যাইত। যাহারা এই হতভাগ্যদের ক্রয় করিত, তাহারা হইত ইহাদের সর্বময় প্রভু। তাহারা ইচ্ছা করিলে ক্রীতদাসদের হত্যাও করিতে পারিত। দেশের আইন ইহার প্রতিকূলতা করিত না।

এক-একজন শ্বেতাঙ্গের অধীনে বহু কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস থাকিত। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা মিলিয়া সকলকেই প্রভুর আজ্ঞাবাহী হইয়া জীবন যাপন করিতে হইত। নিদারুণ দুঃখের মধ্যেও তাহারা পারিবারিক বন্ধনের কিছুটা স্বস্তি ও শান্তি উপভোগ করিত। কিন্তু '...the family organization of the American Negro slave was completely unprotected by law : black children, no matter how young, could be sold away from their parents, or husbands seperated from wives, at the mere whim of their owners'[৬]

আইনের চোখে ক্রীতদাসকে মানুষ মনে করা হইত না—মনে করা হইত বস্তু-বিশেষ বলিয়া। কাজেই যখন-তখন তাহাদের বাজারে আনিয়া বিক্রয় করা চলিত।

প্রধানতঃ চাষ-আবাদের কাজেই তাহাদের লাগানো হইত। তাহা ছাড়া ধনিগৃহে ঘরসংসারের কাজেও তাহারা নিযুক্ত থাকিত। সর্বক্ষেত্রেই 'পান হইতে চুন খসিলে' তাহাদের ভাগ্যে জুটিত তীব্র কশাঘাত। চাষের কাজে তাহাদের চালক [driver] তাহাদের পিছনে সর্বদাই কশা লইয়া প্রস্তুত থাকিত। 'If a slave was late, he was whipped ; if he was lazy, he was whipped ; if he was stupid and forgetful, he was whipped ; and if by chance he was, happy and worked well and was successful, his reward was, simply, not to be whipped.'[৭] মানুষের প্রতি মানুষের কী নির্মম আচরণ! অথচ ইহাই ছিল একসময়ে আমেরিকার সভ্য জীবনযাত্রার অঙ্গবিশেষ।

পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশে যখন মানবদরদী মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের চেষ্টায় দাস-ব্যবসায় ও দাসত্বপ্রথা বিলুপ্ত হইয়া গেল,[৮] তখনও দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়াছে আমেরিকায় নিগ্রোদাসদের উপর সুতুঃসহ নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কিছুকাল ধরিয়া দাসত্বপ্রথা বিলোপের জন্য আন্দোলন চলিতে থাকিলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই আন্দোলন তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই। অবশেষে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট Abraham Lincoln কার্যভার গ্রহণ করিলে এই আন্দোলন গৃহযুদ্ধে [Civil War] পরিণত হয়। দীর্ঘ চারি বছর ধরিয়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে যুক্তরাষ্ট্র হইতে দাসত্বপ্রথার অবলুপ্তি ঘটে সত্য, কিন্তু ইহার জন্য মহামতি Lincoln-কে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে।[৯]

Lincoln-এর মৃত্যুর পরে তাঁহার সহকারী Andrew Johnson যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হন। তাঁহার সময়ে নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়। কিন্তু তাহা কেবল কথার গণ্ডীতেই আবদ্ধ রহিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে নিগ্রোগণ আজিও বঞ্চিত জীবন যাপন করিতেছে—শ্বেতাঙ্গদের ন্যায় নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা তাহারা ভোগ করিতে পারে না। বিংশ শতাব্দীর মধ্যলগ্নে পৃথিবীর সর্বত্র যখন বিশ্বমৈত্রী ও মানবতার বাণী বিঘোষিত, তখনও যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণকায় নিগ্রো অধিবাসীদের নাগরিক অধিকার [civil rights] লাভের জন্য সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।[১০] যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট মহামনা John Fitzgerald Kennedy এই বঞ্চিত মানবসম্প্রদায়ের বেদনায় বেদনা বোধ করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকে সকলপ্রকার নাগরিক অধিকার দান করিতে। কিন্তু মার্কিন ভূমি হইতে বর্ণ-বৈষম্যের অভিশাপ সহজে দূর হইবার নহে। মানবদরদী কেনেডির সকল সদিচ্ছা শ্বেতাঙ্গ এক আততায়ীর গুলিতে স্তব্ধ হইয়া গেল।[১১]

সমালোচক বলিয়াছেন: Nearly another half-century would roll before the Negro problem would again engage the concentrated attention of the nation.[১২] কিন্তু অর্ধশতাব্দী পরেও কি নিগ্রো-সমস্যার সমাধান হইবে? বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষকে এক ও অভিন্ন বলিয়া মনে করিবার মতো উদার মনোভাব পৃথিবীর শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের মনে সহজে সঞ্চারিত হইবার নহে। ইহার জন্য হয়তো আরও বহুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

বহুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে প্রচলিত বর্ণ-বৈষম্যের সমাপ্তিলগ্নের জন্যও। বর্ণ-বৈষম্য বলিতে এখানে জাতিভেদ বুঝিতে হইবে। জাতিভেদ ভারতবর্ষের একটি বিষম সমস্যা। ভারতীয় জনদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাতিভেদের বিষ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে নিরন্তর পীড়া দিতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে মানবচিত্তের একটি মৌলিক বৃত্তির কথাই আসিয়া পড়ে।

মানুষ সর্বদাই চায় নিজেরে 'গৌরব দান' করিতে—অপর সকলের নিকট নিজেকে জাহির করিবার একটা ঝোঁক মানুষের চিরকালের। ইহার জন্য কেহ আশ্রয় লয় বিদ্যার, কেহ বুদ্ধির, কেহ রূপের, কেহ শক্তির, কেহ অর্থের, কেহ বা মেকী ধর্মবোধের। কিন্তু এই সকল ছাড়া জন্মসূত্রে প্রাপ্ত একটা বিশেষ সামাজিক অধিকারের সুযোগ লইয়াও কেহ কেহ নিজেকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে প্রয়াসী হয়। ইহাতে ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত একপ্রকার অহংবোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বহুকাল ধরিয়া যে বর্ণগত অভিমান ও আধিপত্য-প্রয়াস দেখা যাইতেছে, তাহারও মূলে রহিয়াছে এই অহংবোধ। এদেশে যাহারা জন্মসূত্রে উচ্চবর্ণের হিন্দু বলিয়া পরিচিত, তাহারা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর 'মানুষের পরশেরে' প্রতিদিন দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে —চেষ্টা করিয়াছে একদল মানুষকে 'ছোটলোক' বানাইয়া তাহাদের উপর আপন আধিপত্যের লৌহদণ্ড সঞ্চালন করিতে।

কিন্তু ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ভারতীয় আর্যদের মধ্যে প্রথমে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ বলিয়া কিছু ছিল না। যেদিন উত্তর-পশ্চিম ভারতের গিরিপথ মুখরিত করিয়া বিরাট একদল মানুষের পদধ্বনি আসিয়া সিন্ধুনদের তীরে মিলাইয়া গেল, সেদিন সেই নবাগত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো ভেদের গণ্ডী টানা হয় নাই। সেদিন তাহারা সকলেই ছিল এক—সকলেই আর্য। তারপর দিন যাইতে লাগিল—সিন্ধুনদের তীরভূমি হইতে আর্যসভ্যতা ক্রমে ক্রমে উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিল—আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির মিলন ঘটিল। তখন দেখা দিল বৃত্তিভেদে বর্ণভেদ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি বর্ণে আর্য-সমাজ বিভক্ত হইয়া গেল। ধর্মানুষ্ঠান এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইল ব্রাহ্মণের বৃত্তি, দেশরক্ষা ও দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য যুদ্ধাদি কার্যে ব্যাপৃত রহিলেন ক্ষত্রিয়েরা, বৈশ্যদের কাজ হইল কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় প্রভৃতি, আর শূদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তি হইল পূর্ববর্তী তিন বর্ণের সেবা ও আজ্ঞাকারিতা।

পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশে যখন মানবদরদী মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের চেষ্টায় দাস-ব্যবসায় ও দাসত্বপ্রথা বিলুপ্ত হইয়া গেল,[৮] তখনও দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়াছে আমেরিকায় নিগ্রোদাসদের উপর সুদুঃসহ নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কিছুকাল ধরিয়া দাসত্বপ্রথা বিলোপের জন্য আন্দোলন চলিতে থাকিলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই আন্দোলন তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই। অবশেষে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট Abraham Lincoln কার্যভার গ্রহণ করিলে এই আন্দোলন গৃহযুদ্ধে [Civil War] পরিণত হয়। দীর্ঘ চারি বছর ধরিয়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে যুক্তরাষ্ট্র হইতে দাসত্বপ্রথার অবলুপ্তি ঘটে সত্য, কিন্তু ইহার জন্য মহামতি Lincoln-কে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে।[৯]

Lincoln-এর মৃত্যুর পরে তাঁহার সহকারী Andrew Johnson যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হন। তাঁহার সময়ে নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়। কিন্তু তাহা কেবল কথার গণ্ডীতেই আবদ্ধ রহিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে নিগ্রোগণ আজিও বঞ্চিত জীবন যাপন করিতেছে—শ্বেতাঙ্গদের ন্যায় নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা তাহারা ভোগ করিতে পারে না। বিংশ শতাব্দীর মধ্যলগ্নে পৃথিবীর সর্বত্র যখন বিশ্বমৈত্রী ও মানবতার বাণী বিঘোষিত, তখনও যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণকায় নিগ্রো অধিবাসীদের নাগরিক অধিকার [civil rights] লাভের জন্য সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।[১০] যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট মহামনা John Fitzgerald Kennedy এই বঞ্চিত মানবসম্প্রদায়ের বেদনায় বেদনা বোধ করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকে সকলপ্রকার নাগরিক অধিকার দান করিতে। কিন্তু মার্কিন ভূমি হইতে বর্ণ-বৈষম্যের অভিশাপ সহজে দূর হইবার নহে। মানবদরদী কেনেডির সকল সদিচ্ছা শ্বেতাঙ্গ এক আততায়ীর গুলিতে স্তব্ধ হইয়া গেল।[১১]

সমালোচক বলিয়াছেন: Nearly another half-century would roll before the Negro problem would again engage the concentrated attention of the nation.[১২] কিন্তু অর্ধশতাব্দী পরেও কি নিগ্রো-সমস্যার সমাধান হইবে? বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষকে এক ও অভিন্ন বলিয়া মনে করিবার মতো উদার মনোভাব পৃথিবীর শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের মনে সহজে সঞ্চারিত হইবার নহে। ইহার জন্য হয়তো আরও বহুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

বহুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে প্রচলিত বর্ণ-বৈষম্যের সমাপ্তিলগ্নের জন্যও। বর্ণ-বৈষম্য বলিতে এখানে জাতিভেদ বুঝিতে হইবে। জাতিভেদ ভারতবর্ষের একটি বিষম সমস্যা। ভারতীয় জনদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাতিভেদের বিষ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে নিরন্তর পীড়া দিতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে মানবচিত্তের একটি মৌলিক বৃত্তির কথাই আসিয়া পড়ে।

মানুষ সর্বদাই চায় নিজেরে 'গৌরব দান' করিতে—অপর সকলের নিকট নিজেকে জাহির করিবার একটা ঝোঁক মানুষের চিরকালের। ইহার জন্য কেহ আশ্রয় লয় বিদ্যার, কেহ বুদ্ধির, কেহ রূপের, কেহ শক্তির, কেহ অর্থের, কেহ বা মেকী ধর্মবোধের। কিন্তু এই সকল ছাড়া জন্মসূত্রে প্রাপ্ত একটা বিশেষ সামাজিক অধিকারের সুযোগ লইয়াও কেহ কেহ নিজেকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে প্রয়াসী হয়। ইহাতে ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত একপ্রকার অহংবোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বহুকাল ধরিয়া যে বর্ণগত অভিমান ও আধিপত্য-প্রয়াস দেখা যাইতেছে, তাহারও মূলে রহিয়াছে এই অহংবোধ। এদেশে যাহারা জন্মসূত্রে উচ্চবর্ণের হিন্দু বলিয়া পরিচিত, তাহারা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর 'মানুষের পরশেরে' প্রতিদিন দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে —চেষ্টা করিয়াছে একদল মানুষকে 'ছোটলোক' বানাইয়া তাহাদের উপর আপন আধিপত্যের লৌহদণ্ড সঞ্চালন করিতে।

কিন্তু ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ভারতীয় আর্যদের মধ্যে প্রথমে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ বলিয়া কিছু ছিল না। যেদিন উত্তর-পশ্চিম ভারতের গিরিপথ মুখরিত করিয়া বিরাট একদল মানুষের পদধ্বনি আসিয়া সিন্ধুনদের তীরে মিলাইয়া গেল, সেদিন সেই নবাগত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো ভেদের গণ্ডী টানা হয় নাই। সেদিন তাহারা সকলেই ছিল এক—সকলেই আর্য। তারপর দিন যাইতে লাগিল—সিন্ধুনদের তীরভূমি হইতে আর্যসভ্যতা ক্রমে ক্রমে উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিল—আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির মিলন ঘটিল। তখন দেখা দিল বৃত্তিভেদে বর্ণভেদ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি বর্ণে আর্য-সমাজ বিভক্ত হইয়া গেল। ধর্মানুষ্ঠান এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইল ব্রাহ্মণের বৃত্তি, দেশরক্ষা ও দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য যুদ্ধাদি কার্যে ব্যাপৃত রহিলেন ক্ষত্রিয়েরা, বৈশ্যদের কাজ হইল কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় প্রভৃতি, আর শূদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তি হইল পূর্ববর্তী তিন বর্ণের সেবা ও আজ্ঞাকারিতা।

আর্যদের মধ্যে এই যে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ, ইহার উদ্ভব সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে নানা মুনির নানা মত। সাধারণতঃ ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তকেই বর্ণভেদের মূল বলিয়া মনে করা হয়। তাহাতে আছে ঃ

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥'

অর্থাৎ, সেই সৃষ্টিকর্তার মুখ হইল ব্রাহ্মণ, বাহু রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, উরু বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে জন্মিল শূদ্র।[১৩]

ইহাতে দেখা যায়, জাতি লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করিল। অথচ গীতাতে আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ঃ 'গুণকর্মানুসারে আমি চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি।'—চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। [ ৪ অধ্যায়, ১৩ শ্লোক ]

এইসব পরস্পরবিরোধী মতের মধ্য হইতে সত্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তবে প্রাচীনকালের কোনো এক সময়ে যে আর্যভারতে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথার প্রবর্তন হইয়াছিল ইহা অনস্বীকার্য, এবং তখন আর্যগণ চারিটি বর্ণ বা জাতিতে বিভক্ত ছিল।[১৪]

কিন্তু '…জাতিভেদ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে সর্ববিধ কড়াকড়ি আরম্ভ হয় নাই, সেগুলি ক্রমে ক্রমে পরে আমদানী হইয়াছে।'[১৫] পরবর্তী কালে হিন্দুদের মধ্যে যে 'রোটি-বেটি'র বিচার—অর্থাৎ অন্নগ্রহণ ও বিবাহ সম্বন্ধে বিচার দেখা যায়, তাহা প্রাচীন আর্যসমাজে তেমন দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও তখন ব্রাহ্মণেতর জাতির হাতে খাইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ক্ষাত্রবীর পাণ্ডবদের বনবাসকালে বহু ব্রাহ্মণ-ঋষি আসিয়া পাণ্ডব-বধূ দ্রৌপদীর দেওয়া অন্নগ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। দাসীপুত্র বিদুরের খুদ গ্রহণ করিয়া সেকালের মানবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। অতএব দেখা যায়, সেকালে জাতিভেদ থাকিলেও খাদ্যাখাদ্য লইয়া মাথা-ফাটাফাটি শুরু হইয়া যায় নাই। বিবাহব্যাপারেও তখন সমাজে বিশেষ বিধিনিষেধ ছিল না। অনুলোম এবং প্রতিলোম—উভয়প্রকার বিবাহই তখন সমাজে প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয়-রাজা শান্তনু ধীবরকন্যা সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য ব্রাহ্মণ হইয়াও নিজ কন্যা দেবযানীকে ব্রাহ্মণেতর পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই—ক্ষাত্রবংশীয় রাজা যযাতির সহিত ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর শাস্ত্রবিহিত পরিণয় হইয়াছিল।

বৃত্তি সম্বন্ধেও যে তখন খুব একটা কড়াকড়ি ছিল তাহা নহে। সকল বৃত্তিই

সকল বর্ণের লোকের নিকট উন্মুক্ত ছিল। মহাভারত-পাঠে জানা যায়, কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য ব্রাহ্মণ হইয়াও-ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার অনেক ক্ষত্রিয়ও সেকালে তপস্যাবলে ব্রহ্মর্ষি বা মহর্ষি হইয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন।[১৬]

বহুপরিচারিণী মাতা জবালার পুত্র সত্যকামের ব্রাহ্মণত্বলাভের কথা তো অনেকেরই জানা আছে। 'ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা-অভিলাষী' 'তরুণ বালক' সত্যকাম যেদিন গুরু গৌতমের নিকট নিজেকে 'ভর্তৃহীনা জবালার' পুত্র বলিয়া পরিচয় দিল, সেদিন গোত্রপরিচয়হীন হইলেও ব্রাহ্মণোচিত সত্যভাষণের জন্য সে গুরুর নিকট সমাদৃত হইয়াছিল। সত্যনিষ্ঠ বালককে গৌতম ঋষি সেদিন স্বহস্তে উপনীত করিয়া আপন শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

কিন্তু পরবর্তী কালে 'ক্রমে এইদেশে চারিদিকের প্রভাব বশত প্রাচীন আর্যদিগের সেই সব উদার বিচারবুদ্ধি ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল।'[১৭] উচ্চকুলে বা নীচকুলে জন্মগ্রহণ দৈবায়ত্ত হইলেও তাহাই হইল ব্যক্তিত্ব-বিচারের মাপকাঠি। ব্রাহ্মণবংশজ কোনো ব্যক্তি হীন কাজ করিলেও সে ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজ্য থাকিত, আর শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ ধর্মনিষ্ঠা ও মহানুভবতার পরিচয় দিলেও তাহার শূদ্র নাম ঘুচিত না। শূদ্রগণ সকল দিকে বঞ্চিত হইয়া সমাজের অতি নিম্নস্তরে এক ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইত।[১৮]

'দক্ষিণ-দেশে ক্রমে এমন হইল যে পথে চলিবার সময় ব্রাহ্মণের অগ্রে অগ্রে লোক দৌড়াইয়া হীনজাতীয় লোককে অপসারিত করিয়া দেয়। লোকেরা ব্রাহ্মণ দেখিলে যানবাহনাদি হইতে নামিতে বাধ্য।...শূদ্রের গৃহ ও ব্রাহ্মণের গৃহ পথের ধারে এক সারিতে নির্মিত হইতে পারে না।'[১৯] শুধু ইহাই নহে, অন্তরজন্মাজাতির কোনো লোকের ছায়া পর্যন্ত বর্ণহিন্দুর নিকট অশুচি বলিয়া গণ্য হইত।[২০]

মানুষের প্রতি মানুষের এইরূপ ঘৃণ্য আচরণের কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, অথচ দক্ষিণ-ভারতের হিন্দুসমাজে ইহাই ছিল একসময়ে ধর্মপালনের অঙ্গস্বরূপ। আর শুধু দক্ষিণ-ভারতই বা কেন, সমগ্র ভারতবর্ষেই তো জাতপাতের বিচার এখনও তীব্র হইয়া রহিয়াছে। 'সুদূর প্রাচীন কাল হইতে আদি চাতুর্বর্ণ্যের যে কাঠামো ও যুক্তিপদ্ধতি অনুযায়ী বর্ণব্যাখ্যা হইয়া আসিয়াছে সেই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করিয়া হিন্দুসমাজ আজও বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ ও সংকর বর্ণের সামাজিক স্থান নির্ণয় করিয়া থাকেন'।[২১]

বাঙলাদেশেও এই সর্বভারতীয় বর্ণবিভাগ-রীতি লঙ্ঘিত হয় নাই। তবে এদেশে প্রধান বর্ণ মাত্র দুইটি—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ; ব্রাহ্মণ ছাড়া আর যে-সকল বর্ণ আছে, সমস্তই সংকর—চারিবর্ণের পারস্পরিক যৌনমিলনে উৎপন্ন, এবং তাহারা সকলেই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবার রহিয়াছে বহু উপবিভাগ—রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, গণক, অগ্রদানী প্রভৃতি। শূদ্রের উপবিভাগ আরও অনেক বেশী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শূদ্রদের দুইটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে—সৎ শূদ্র ও অসৎ শূদ্র ; এই দুই পর্যায়ে আবার ৩৬টি উপবর্ণের কথা বলা হইয়াছে—গোপ, নাপিত. মোদক, কর্মকার, কুম্ভকার, তৈলকার, শুঁড়ি, রজক প্রভৃতি। ইহা ছাড়া অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পর্যায়ে যাহাদের গণনা করা যায়, তাহাদের সংখ্যাও কম নয়—ব্যাধ, কাপালী, কোচ, হাড়ি, ডোম, জোলা, চণ্ডাল প্রভৃতি বহু অন্ত্যজ শ্রেণী বাঙলার হিন্দুসমাজের অতিনিম্নে স্থান লাভ করিয়াছে।

এইরূপ বিভিন্ন জাত-উপজাত-সমন্বিত বাঙলার হিন্দুসমাজ জাতিভেদের অভিশাপ বহন করিয়া দিনের পর দিন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। উনিশ শতকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য-বাঙলার তরুণ প্রাণ সমাজ-জীবনের এই অভিশাপ দূর করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রাণচাঞ্চল্যের স্বাক্ষর রহিয়াছে এই শতকের মনীষীদের বিভিন্ন রচনায়। অবশ্য উনিশ শতকের প্রথম হইতেই যে বাঙলাদেশে জাতিভেদ-প্রথায় বিশেষ শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল তাহা নহে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তার ও বিভিন্ন সংস্কারমূলক আন্দোলনের ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে এই বিষয়ে বাঙালীর চিন্তাধারায় ধীরে ধীরে উজান বহিতে থাকে। ইহার ফলে 'এখনকার দিনে···অনেক স্থলে লোকের মতামতের অনেকখানি নড়চড় দেখা দিয়াছে। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে উচ্চজাতির মধ্যে জন্মিয়াছেন তাঁহারাও অনেক সময়···বাছবিচার পছন্দ করেন না, আর যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে তথাকথিত নীচজাতির মধ্যে জন্মিয়াছেন তাঁহারাও আর নিজেকে একেবারে হীন বা পতিত বলিয়া মানিয়া লইতে রাজি নহেন এবং উচ্চপক্ষীয়দের সমকক্ষতা দাবি করেন।[২২]

তবে এখনও একদল বিশেষ শিক্ষিত লোক বেশ জোরের সহিতই জাতিভেদ-প্রথা সমর্থন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধারণা জাতিভেদের দ্বারা বংশগত একটি বিশুদ্ধ ধারা অর্থাৎ ethnic purity রক্ষিত হয়। গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা-বিরোধী হরিজন আন্দোলনে আত্মশক্তি নিয়োগ করিলেও বর্ণাশ্রমকে স্বাগত

জানাইয়াছেন।[২৩] স্বামী দয়ানন্দও বর্ণাশ্রম সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতে জন্মের দ্বারা নয়—গুণকর্মের দ্বারাই চাতুর্বর্ণ্য নির্ণীত হওয়া উচিত।[২৪]

বর্ণভেদ বা জাতিভেদ সম্বন্ধে বর্তমান কালে এইরূপ নানা বিতর্কের উদ্ভব হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের ক্রম-পরিবর্তনশীল সমাজমনের গতি[১] লক্ষ্য করিলে ইহা অবশ্যই আশা করা যায় যে, এদেশে জাতিভেদ-সম্পর্কিত সমস্ত বিতর্কেরই একদিন অবসান ঘটিবে। সেদিন দূরে নয়, যেদিন ভারতের প্রবুদ্ধ গণদেবতা জাতিগত ঘৃণা ও উপেক্ষার সকল গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া সাম্য ও মানবতার অমৃতধারায় অভিষিক্ত হইবে। ভারতবর্ষ সেদিন 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে' মঙ্গলঘট ভরিয়া বিশ্বমানবতার পূজায় মাঙ্গলিক রচনা করিবে।

ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ মানবমৈত্রী। এই আদর্শকে পূর্ণভাবে রূপায়িত করিতে হইলে কেবল বর্ণগত বৈষম্যের অপনোদন করিলে চলিবে না—সকল-প্রকার বৈষম্যের মালিন্য হইতে মুক্ত হইতে হইবে। মানবসমাজে বৈষম্য দেখা দেয় নানাভাবে, নানাপ্রকার ভেদবুদ্ধি হইতে। মানুষে মানুষে এই ভেদবুদ্ধির একটি বিশেষ কারণ হইল শ্রেণীগত আভিজাত্যবোধ। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন কারণে অভিজাত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। সমাজে এইরূপ অভিজাত শ্রেণীর আর অন্ত নাই—কুলীন শ্রেণী, ধনিক শ্রেণী, শিক্ষিত শ্রেণী, এবং এই প্রকার আরও কত শ্রেণী। এইসব অভিজাত শ্রেণীর পাশেই রহিয়াছে অনভিজাত সাধারণ মানুষের দল; তাহারা অভিজাত শ্রেণীর নিকট অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বিপুলা পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় এইরূপ শ্রেণী-বৈষম্য।

বঙ্গদেশে বঙ্গীয় হিন্দুর সমাজে—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক কিছুকাল পূর্বেও কুল বা বংশের বিচারে অভিজাত বলিয়া বিশেষ-ভাবে সম্মানিত হইত। ইহারা 'কুলীন' বলিয়া পরিচিত। বিভিন্ন কুলজিগ্রন্থে কুলীনের নয়টি লক্ষণ নির্দেশিত হইয়াছে:

'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥'

[ 'নিষ্ঠাশান্তিস্তপোদানং'—এইরূপ পাঠান্তরও আছে। ]

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা [ ধর্মনিষ্ঠা ], আবৃত্তি, তপস্যা, ও দান—এই নয়টি গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিই 'কুলীন' মর্যাদা লাভের অধিকারী। কিন্তু আসলে এইরূপ ব্যক্তির বংশধরগণও সমাজে কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইত।

ইহার ফলে বংশের পূর্বতম এক মহান ব্যক্তির দোহাই দিয়া পরবর্তী নিতান্ত নির্গুণ বংশধরেরাও সমাজে কৌলীন্যের মর্যাদা আদায় করিয়া লইত।

যুক্তিহীন ও বিভেদমূলক এই কৌলীন্য-প্রথাটি কবে যে বাঙলার সমাজদেহে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহার ইতিহাস অস্পষ্ট। কথিত আছে, গৌড়াধিপতি বল্লাল সেন গুণানুসারে বাঙলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের কুলীন, মৌলিক, বংশজ প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং এই শ্রেণীবিভাগ অনুসারেই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সামাজিক মর্যাদা স্থির করিয়া দেন।[২৫] কুল-পঞ্জিকার সাক্ষ্য অনুসারে বল্লাল সেন-কর্তৃক এইরূপ শ্রেণীবিন্যাসের সময় হইতেই বাঙলাদেশে কৌলীন্য-প্রথা প্রচলিত।[২৬]

বল্লাল-কর্তৃক কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তনের বহুকাল পরে ব্রাহ্মণসমাজে প্রধান প্রধান কুলীন সন্তানেরা প্রায় সকলেই নবগুণরহিত হইয়া নানাভাবে দোষাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ফলে চিরাচরিত কৌলীন্যপ্রথার মূলে ভাঙন ধরিল এবং সমপর্যায়ে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপনে অসুবিধার সৃষ্টি হইল। এই সময় বিক্রমপুরের দেবীবর ঘটক নামে এক ব্যক্তির সংস্কার-চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তিনি কৌলীন্য-মর্যাদার পুনঃসংস্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। সমদোষে পতিত ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর মধ্যে যাহাতে পারস্পরিক বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে সেইজন্য তিনি এক-এক প্রকার দোষাশ্রিত কুলীনকে এক-এক দলে রাখিলেন। দোষানুসারে বিভক্ত এইরূপ দলকে বলা হইল 'মেল'। দেবীবর সমস্ত কুলীনকে ছত্রিশটি মেলে বিভক্ত করিলেন।[২৭] কিন্তু পরবর্তী কালে দেবীবর-প্রতিষ্ঠিত দোষানুসারী মেলের মধ্যেও আবার নূতন নূতন দোষ দেখা দিতে লাগিল।

ইহাই তো স্বাভাবিক নিয়ম। 'অনেক মানুষ যেখানে আছে সেখানে বারবার নানা দোষ ঘটিতেই বাধ্য।...এমন জাতি নাই, এমন বংশ নাই, এমন মানুষ নাই, যেখানে দোষ নাই।'[২৮] আর কেবল মানুষই বা কেন? ত্রিভুবনে সকলেরই তো কোনো-না-কোনো দোষ দেখা যায়।

'খ্যাতঃ শক্রো ভগাঙ্গঃ বিধুরপি মলিনো মাধবো গোপজাতো।
বেশ্যাপুত্রো বসিষ্ঠঃ সরুজপদযমঃ সর্বভক্ষো হুতাশঃ ॥
ব্যাসোমৎস্যোদরীয়ঃ সলবণ উদধিঃ পাণ্ডবা জারজাতা।
রুদ্রঃ প্রেতাস্থিধারী ত্রিভুবনবসতাং কস্য দোষো ন জাতঃ' ॥[২৯]

—ইন্দ্র সর্বাঙ্গে ভগচিহ্নযুক্ত, চন্দ্র মলিন, কৃষ্ণ গোপকুলোদ্ভূত, বসিষ্ঠ বেশ্যা-পুত্র, বিমাতার অভিশাপে যমের চরণ শীর্ণ, অগ্নি সর্বভুক্, ব্যাস মেছুনীর পুত্র,

সমুদ্র লবণাক্ত, পাণ্ডবগণ জারজ, শিব প্রেতাস্থিধারী—ইহা তো সকলেরই জানা আছে। ত্রিভুবনবাসী কাহার না দোষ ঘটিয়াছে ?

অথচ কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তনের সময় হইতেই সমাজপতিরা কেবল দোষ খুঁজিয়া খুঁজিয়া মানুষকে ছোট করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহাদের একবার কোনো সামাজিক দোষ স্পর্শ করিত, তাহারা চিরকালের মতো সমাজে পতিত বলিয়া গণ্য হইত।[৩০] কৌলীন্যাভিমানী একই বর্ণের লোকের নিকটও তাহারা ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হইয়া থাকিত। তাহাদের সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ দেখা দিত নিজ নিজ কন্যার বিবাহদানকালে। সমাজচ্যুত বলিয়া সচরাচর তাহাদের কন্যাদের কেহ বিবাহ করিতে চাহিত না। আর কেবল তাহারাই বা কেন ? কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যাদেরও সহজে বিবাহ হইত না—হইলেও অনেক স্থলেই বিবাহের নামে কৌলীন্যের বেদীমূলে তাহাদের বলি দেওয়া হইত। কৌলীন্যের প্রতি অন্ধমোহবশতঃ কন্যাকে কুলীনের ঘরে বিবাহ দিয়া অক্ষয় পুণ্য অর্জনের লোভ তখন সমাজে বড় হইয়া উঠিয়াছিল। এযুগে যেমন কন্যার বিবাহে যোগ্য পাত্র হিসাবে পিতামাতার পক্ষে কুলের পরিবর্তে শিক্ষা-দীক্ষা ও ধনমর্যাদাই লক্ষ্য, সেযুগে তেমনি কুলই লক্ষণীয় ছিল। কুলীনের ঘরে জন্মিলে কানা-খোঁড়াও কন্দর্পের দরে বিকাইত। ইহার ফলে বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, বয়স সমস্তই তুচ্ছ হইয়া গিয়া কেবল কুলমর্যাদাই প্রাধান্য লাভ করিত। সমাজের যখন এই অবস্থা, তখন এই বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের যাহা কিছু অশুভ ফল, তাহা ভোগ করিতে হইত তরুণী কুলীন কন্যাদের। বন্দ্যবংশখ্যাত পরম-কুলীন স্বামী অতিবড় বৃদ্ধ হইলেও সেকালের তরুণী অন্নদাদের কথা বলিবার জো ছিল না—কৌলীন্যগর্বী পাষাণ বাপের কুলীনে কন্যাদানরূপ পবিত্র কর্মের বলি হইয়া বিষাদক্লিষ্ট অন্তরে তাহাদের প্রথম যৌবনের দিনগুলি অতিবাহিত করিতে হইত। কত কুলীন কন্যার জীবনের প্রভাতবেলাতেই যে সন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত, তাহার ইয়ত্তা ছিল না।

বাঙলার আগমনী ও বিজয়া গান সেকালের কৌলীন্য-নিষ্পেষিত সমাজ-জীবনের এক করুণ স্মৃতি বহন করিতেছে। অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা গৌরীকে বৃদ্ধ, দরিদ্র, নেশাখোর শিবের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিরিরাজ যে কৌলীন্যপ্রথার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, বাঙলার কুলীন সমাজে ঘরে ঘরে তাহারই পুনরাবৃত্তি দেখা গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ‘কুলীন কাহিনী’[৩১] নামক গ্রন্থে উল্লিখিত কামিনী নামে এক পরমা সুন্দরী কিশোরী কুলীনকন্যার কুলীন বরের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য :

'বরটী বাস্তবিক একখানি বৃষকাঠ। বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে; গায়ে মাংস নাই, যাহা আছে তাহা লোল হইয়া পড়িয়াছে, মাথার চুলগুলি পাকিয়া শ্বেতবর্ণ ধারণ করিতেছে, দাঁত খুঁজিলে মিলে না, রং যেন কালি ঢালা, হাত পা লম্বা লম্বা, পিঠ কুঁজা হইয়া পড়িয়াছে, বয়োধর্মে কাঁকালটা একটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আশৈশব ছিটা টানার অভ্যাসে গলাটি সরু, পেটটী মোটা, তাহার উপর কাঁচা শির বাহির হইয়াছে। সর্বগায়ে চাকা চাকা দাদ্' [ পৃ. ৩ ]।

কুলীনকুলজাত এইরূপ এক-একজন পুরুষ কত যে বিবাহ করিত তাহা মনেও রাখিতে পারিত না।[৩২] বিবাহের পর কুলীন জামাই তাঁহার কৌলীন্যের মর্যাদাস্বরূপ প্রাপ্ত অর্থাদি লইয়া সরিয়া পড়িত, আর যেখানকার কনে সেখানেই পড়িয়া থাকিত—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুলীন কন্যা বিবাহের পর শ্বশুরঘর করিতে যাইত না।

একদিকে কুলীন-ব্রাহ্মণদের সারাজীবন ধরিয়া চলিত এইরূপ বিবাহোৎসব, 'অন্যদিকে বংশজ-ব্রাহ্মণেরা বিবাহই করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী দুর্লভ হওয়ায় নানা দেশ হইতে নৌকা ভরিয়া লোকে অনেক কন্যা লইয়া বিক্রয় করিতে আনিত। সেইসব কন্যার মধ্যে কেহ বা বিধবা, কেহ বা নীচ-কুলোৎপন্না, কেহ বা হিন্দুই নয়। সকলকেই ব্রাহ্মণকুমারী বলিয়া উপস্থিত করা হইত এবং লোকে গরজের চোটে অত খোঁজ খবর না লইয়াই অল্প মূল্যে কিনিয়া লইয়া বিবাহ করিতেন। এইসব কন্যাদের পূর্ববঙ্গে 'ভরার মেয়ে' বলিত।'[৩৩]

কৌলীন্যপ্রথার কল্যাণে এইভাবে একই বর্ণের মধ্যেও ঘোরতর বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। হিন্দুসমাজে জাতিভেদের সঙ্গে সঙ্গে এই 'বল্লালী বালাই'ও মানুষের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষ ছড়াইয়া মনুষ্যত্বকে বার বার লাঞ্ছিত করিয়াছে। কিন্তু কোনো সামাজিক অনাচার বা কুপ্রথাকে চিরকাল জীয়াইয়া রাখা যায় না—যায় নাই কৌলীন্যপ্রথাকেও। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত জীবনবোধ এই বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত করিয়াছিল। এই শতাব্দীর লেখকদের লেখনী-প্রসূত আঘাতের ফলে যে সামাজিক আন্দোলন দেখা দিয়াছিল,[৩৪] তাহাই কৌলীন্যপ্রথাকে ক্রমে ক্রমে অস্তাচলপথাবলম্বী করিয়া তুলিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর সমাজমনে এই বিলীয়মান প্রথাটি হয়তো কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিতেছে; কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ অবলুপ্তির জন্য আর বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইবে বলিয়া মনে হয় না।

সামাজিক এইপ্রকার বৈষম্যের পাশে পাশেই আবার দেখা যায় রাষ্ট্রিক

ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বৈষম্য। রাষ্ট্রীয় জীবনে রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্রাধীন সাধারণ জনগণের মধ্যে বহুকাল ধরিয়াই বৈষম্যের একটা সু-উচ্চ প্রাচীর বর্তমান। রাষ্ট্রনায়কদের শক্তিমত্তার বিচিত্র লীলায় উন্নত প্রাসাদশীর্ষ হইতে নিম্নে কুটীর-প্রাঙ্গণে যে উষ্ণশ্বাস ঝটিকা ছুটিয়া আসে, তাহার বেগ প্রতিহত করা যেমন কঠিন, তেমনই সময়সাপেক্ষ। যুগে যুগে এই ঝঞ্ঝাবর্তে পড়িয়া মানুষ নিষ্পিষ্ট হইয়াছে, এবং অবশেষে দলিতফণা ফণিনীর ন্যায় উর্ধ্বে মস্তক তুলিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে।

মানবসভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, রাজাই ছিলেন এক সময় রাষ্ট্রের একমাত্র নায়ক। রাষ্ট্রপরিচালনায় তাঁহার নির্দেশ ছিল অলঙ্ঘনীয়—তাঁহার কোনো কার্যের জন্যই তাঁহাকে কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হইত না। ইহার ফলে বহুক্ষেত্রেই রাজতন্ত্র হইয়া উঠিত স্বৈরাচারী ও প্রজাপীড়ক। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই একদিন এইরূপ রাজতন্ত্র কায়েম ছিল। রোমের সম্রাট, মিশরের ফারাও, পারস্যের শাহ্, ভারতবর্ষের রাজা-নবাব-সুলতান-বাদশার দল যুগে যুগে এই রাজতন্ত্রেরই পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে। রাজকীয় আসন ঘিরিয়া চলিয়াছে বিলাস-ব্যসনের লীলা—রাজদম্ভ প্রকাশ পাইয়াছে হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটায়, আর রাজ্যের দারিদ্র্যসম্বল সাধারণ মানুষের দল দিনযাপন করিয়াছে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া—চোখের জল মুছিয়া। রাজ-রাজড়া-অধ্যুষিত পৃথিবীর ইহাই সামগ্রিক চিত্র।

রাজাকে সেকালে মনে করা হইত ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র 'মনুসংহিতায়' বলা হইয়াছে:

"বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥" [অ. ৭. শ্লো. ৮]।

[রাজা বালক হইলেও সাধারণ মানুষ বলিয়া অবজ্ঞেয় নহেন, মহান দেবতা তিনি—মানুষরূপে অবস্থান করিতেছেন]।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষেও দিল্লীর মোগল বাদশাহকে 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হইয়াছে। রাজার প্রতি অতিভক্তিবশতঃই ইংরাজের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে 'king can do no wrong' কথাটি অনুস্যূত।

একদিকে ঈশ্বরসদৃশ অসীম ক্ষমতাশালী নরপতি, অপরদিকে রাজভয়ে সতত সন্ত্রস্ত করভার-প্রপীড়িত সাধারণ নরনারী। পৃথিবীর দেশে-দেশেই ছিল রাজা-প্রজায় এইরূপ গুরুতর বৈষম্য। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে যাহা ঘটিবার

তাহাই ঘটিয়াছে। বলদৃপ্ত স্বেচ্ছাচারের কবলে পড়িয়া নিরুপায় জনগণকে বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে সীমাহীন দুঃখ ও লাঞ্ছনা। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস রাজদর্পে জনমতকে পর্যুদস্ত করিয়া এক সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ফ্রান্সের 'প্রমোদানুরক্ত, বৃথা-ভোগাসক্ত, ব্যয়শৌণ্ড, স্বার্থপর রাজা' পঞ্চদশ লুই 'অন্নাভাব-পীড়িত প্রজার জীবনোপায় অপহরণ করিয়া' রাজকীয় বিলাসভবনকে উৎসবমুখর করিয়া তুলিয়াছিলেন।[৩৫] রুশ-বিপ্লবের প্রাক্কালে রুশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস তাঁহার দুই প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীর [পোবিডোনোস্টেভ (Pobedonostev) ও প্লেহ্‌বি (Plehve)] সাহায্যে শাসনের নামে জনগণের উপর যে নির্মম অত্যাচার চালাইয়াছিলেন, তাহার তুলনা বিরল।

প্রজাপীড়নের এই যে আদিম ধারাটি, ইহা ভারতবর্ষের উপর দিয়াও অনিবার্য বেগে বহিয়া চলিয়াছে। হিন্দুযুগ হইতে মুসলিম যুগে, মুসলিম যুগ হইতে ইংরাজ যুগে ইহার গতি অব্যাহত। হিন্দু রাজা অজাতশত্রুর আদেশে তাঁহার রাজ্যের বৌদ্ধ প্রজাদের উপর যে কঠোর নিপীড়ন চলিয়াছিল, তাহা পক্ষপাতদুষ্ট রাজশক্তির উদ্ধত মনোভাবের পরিচয় বহন করিতেছে। আবার মুসলিম-যুগেও পরধর্ম-অসহিষ্ণু বহু মুসলমান শাসকের ভেদনীতির ফলে হিন্দু প্রজাদের নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই যুগে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তি কখনও কখনও সমগ্র দেশের বুকে রক্তের বন্যা বহাইয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ, হিন্দু-যুগই হউক, আর মুসলমান-যুগই হউক, ভারতের জনসাধারণ প্রায় কোনোকালেই নিরবচ্ছিন্ন সুখশান্তি ভোগ করিতে পারে নাই।[৩৬]

ইংরাজ-যুগেও এদেশে প্রভুশক্তির খেলা সমানে চলিয়াছে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জুন তারিখে পলাশীর লক্ষবাগ আমবাগানে যে প্রহসন অভিনীত হইয়া গেল, তাহার পরেই দেখিতে দেখিতে ইংরাজ-বণিকের মানদণ্ড আত্মপ্রকাশ করিল রাজদণ্ডরূপে। প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া ইংরাজের রাজদণ্ডের আস্ফালনে ভারতের জনজীবন বিপর্যস্ত হইয়াছে—রাজ্য ও রাজধানী ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কৃষক অন্নাভাবে চোখের জল ফেলিয়া দিন কাটাইয়াছে, শিল্পী যন্ত্রের নিকট নতি স্বীকার করিয়া অন্ধকারে মুখ লুকাইয়াছে, দেশের সম্পদ দেশের মাটি ছাড়িয়া সাত সাগরে পাড়ি জমাইয়াছে।

শোষণভিত্তিক এই ইংরাজ-রাজত্বের বনিয়াদ রচনা করেন ওয়ারেন হেস্টিংস নামে ইংরাজ কোম্পানীর এক জবরদস্ত প্রতিনিধি। বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, অযোধ্যার বেগমদের সঞ্চিত অর্থ অপহরণ করিয়া,

বহুজনশ্রদ্ধেয় মহারাজ নন্দকুমারকে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দিয়া এবং কুখ্যাত দেওয়ান দেবীসিংহের সহায়তায় রাজস্ব আদায়ের নামে দেশের আপামর জনসাধারণকে নিপীড়িত করিয়া হেস্টিংস সাহেব এদেশে প্রজাপীড়নের উৎস খুলিয়া দিয়াছিলেন।[৩৭] তাহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া সেই উৎস হইতে নিঃসৃত ধারাই নানানভাবে আঁকিয়া-বাঁকিয়া ভারতবর্ষের বুকে আবর্তিত হইয়াছে—কখনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্ষীণ ধারায়, আবার কখনও বা জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রবল স্রোতে ইহার গতি অব্যাহত রহিয়াছে।

রাজশক্তির পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়া সাধারণ ইংরাজ বণিকগণও বাণিজ্যের নামে এদেশের লোকদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইয়াছে। বাঙলাদেশে এইরূপ অত্যাচারের প্রধান পাণ্ডা ছিল নীলকর সাহেবেরা।[৩৮] নীলকরের অত্যাচার সম্বন্ধে সমসাময়িক সাহিত্যে লিখিত হইয়াছে '...নীলকরের জুলুম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজারা নীল বুনিতে ইচ্ছুক নহে কারণ ধান্যাদি বোনাতে অধিক লাভ, আর যিনি নীলকরের কুঠীতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন তাহার দফা একেবারে রফা হয়। প্রজারা প্রাণপণে নীল আবাদ করিয়া দাদনের টাকা পরিশোধ করে বটে কিন্তু হিসাবের লাঙ্গুল বৎসর ২ বৃদ্ধি হয় ও কুঠেলের গমস্তা ও অন্যান্য কারপরদাজের পেট অল্পে পূরে না। এইজন্য যে প্রজা একবার নীলকরের দাদনের সুধামৃত পান করিয়াছে সে আর প্রাণান্তে কুঠীর মুখো হইতে চায় না, কিন্তু নীলকরের নীল না তৈয়ার হইলে ভারি বিপত্তি।...নীলকর বেটাদের জুলুমে মুলুক খাক হইয়া গেল—প্রজারা ভয়ে, ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে'।[৩৯]

ইহা ব্যতীত ইংরাজ বণিকদের বিভিন্ন সওদাগরী অফিসেও দেশীয় কর্মচারীদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা প্রায় সর্বদাই উদ্ধত আচরণ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা নিজেদের 'রাজার জাত' ভাবিয়া স্ফীত হইতেন, আর দেশীয় লোকদের ঘৃণা করিতেন 'নেটিভ' বলিয়া। সময় সময় রাজপ্রতাপ-পরিপুষ্ট রাজার জাতদের শ্রীমুখ হইতে নেটিভদের উদ্দেশে এমন সব বিশেষণ উচ্চারিত হইত, যাহাকে মধুর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে কেবল তাহারাই যাহাদের আত্মমর্যাদা নামক বস্তুটির একান্তই অভাব।[৪০]

রাজকীয় ক্ষমতার আওতায় থাকিয়া দুর্বলের উপর সবলের এই যে অত্যাচার, ইহা পূর্ববর্তী হিন্দু ও মুসলমান-যুগের ন্যায় ইংরাজ-যুগেও ভারতবর্ষের ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছে। অথচ রাজা ও রাজকীয় আদর্শ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের

মৌলিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপেই স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ নৃপতিকে মুকুট-দণ্ড ও সিংহাসন-ভূমি ত্যাগ করিয়া দরিদ্রবেশ ধারণ করিতে শিখাইয়াছে। সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করা, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করা, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করা—ইহাই ভারতবর্ষের রাজধর্ম।[৪১] প্রিয়দর্শী অশোকের সহৃদয় প্রজাপালন, সম্রাট হর্ষের পঞ্চবার্ষিক দানযজ্ঞ, মারাঠাপতি শিবাজীর বৈরাগ্য-সূচক 'ভাগোয়া ঝাণ্ডা' ভারতের এই ত্যাগবিশুদ্ধ রাজধর্মের কথাই ঘোষণা করিতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর রেনেসাঁসধর্মী মননশীলতা সম্ভবতঃ ভারত-বর্ষের এই রাজধর্মের আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে। সত্য বটে, পাশ্চাত্ত্যের জাতীয়তাবাদ, সাম্য ও স্বাধীনতার শিক্ষা এই শতকের তরুণ মনকে প্রভাবিত করিয়াছিল, কিন্তু প্রাচ্যের উন্নত ভাবাদর্শ যে তাহাতে ছায়াপাত করে নাই তাহা জোর করিরা বলা যায় না। ইয়ংবেঙ্গলগণ যেমন রুশোর *Du Contrat Social* গ্রন্থ পাঠ করিয়া রাজা ও প্রজার পারস্পরিক কর্তব্যপালন বিষয়ে নৈতিক চুক্তিবদ্ধতার কথা জানিয়াছিলেন, তেমনই জানিতেন ভারতের প্রজা-হিতৈষী সম্রাট অশোক ও আকবরের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টার কথা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ফলেই উনিশ শতকের বাঙালী মনীষা সর্বপ্রকার বন্ধন ও দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভের পথ খুঁজিতে প্রয়াসী হইয়াছিল।

বড় রকমের কোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই শতকে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু প্রগতিপন্থী বিভিন্ন শিক্ষিত ব্যক্তির মনে ইংরাজ প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য রামমোহনের আন্দোলন, পক্ষপাতদুষ্ট বিচার-প্রহসনের বিরুদ্ধে রসিককৃষ্ণ মল্লিক [ ১৮১০-৫৮ ] ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের [ ১৮১৪-৭৮ ] সোচ্চার প্রতিবাদ, প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে অক্ষয়কুমার দত্ত [১৮২০-৮৬] ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের [১৮২০-৮৬] সুস্পষ্ট অভিমত, সাম্রাজ্যবাদী শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে শিশিরকুমার ঘোষের [১৮৪০-১৯১১] সুতীব্র মন্তব্য এবং হিন্দুমেলা, **National Association, British Indian Association, Indian League** প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সভা-সমিতির

প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া ব্রিটিশ শাসনের লৌহকবল হইতে নবজাগ্রত বাঙলার আত্ম-রক্ষার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।[৪২]

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর সাহিত্য-সাধনায়ও এই প্রয়াস পরিস্ফুট। রঙ্গলাল-রচিত 'পদ্মিনী-উপাখ্যান'-নামক আখ্যানকাব্যের 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' কাব্যাংশে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-নামক উপন্যাসে গ্রথিত 'বন্দেমাতরম্' সংগীতে, গুপ্তকবির স্বদেশপ্রীতিমূলক কবিতায় সেকালের বন্ধনপীড়িত বাঙলার মর্মবাণী উৎসারিত হইয়াছে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক-খানিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'নীলকর-নিকর-করে' লাঞ্ছিত তৎকালীন বাঙালী জীবন এই নাটকের উপজীব্য। স্বার্থান্ধ নীলকর সাহেবদের হাতে গ্রামীণ বাঙলার জনজীবন যে একদা কী নির্মমভাবে নির্যাতিত হইয়াছিল, তাহার মর্মন্তুদ চিত্র উপস্থাপিত করিয়া নাট্যকার দুর্বলের উপর সবলের চিরন্তন অত্যাচারের বিরুদ্ধে মৌন প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

এই প্রতিবাদ শুধু সাহিত্যে নয়, ইংরাজ-মুরব্বীয়ানায় উত্ত্যক্ত আত্মমর্যাদাশীল বাঙালীর কণ্ঠেও সময় সময় ইহা সোচ্চার হইয়া উঠিত।[৪৩] বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙলাদেশে Settled fact-কে Unsettle করার যে দুঃসাহসিক প্রয়াস দেখা দিয়াছিল, উনিশ শতকে তাহারই প্রস্তুতি চলিয়াছে নবজাগ্রত বাঙালীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। সেকালে প্রভুশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে বিরোধ ও বৈষম্যের অবসান ঘটাইবার জন্য যে আয়োজন শুরু হইয়াছিল, তাহারই ক্রম-বিবর্তিত পরিণতি একালের প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষ।

প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান সমস্যা হইল ধনবৈষম্য হ্রাস করিয়া শোষণহীন সমাজ গঠন। কিন্তু সমস্যাটি যে কেবল ভারতবর্ষেরই তাহা নহে। পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই এখন এই সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য পৃথিবীতে সর্বপ্রকার শোষণ হইতে মুক্তিলাভের জন্য একটা বিশেষ ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে। অবশ্য শোষণমুক্তির এই ব্যাকুলতা যে কেবল এই শতাব্দীরই বৈশিষ্ট্য, তাহা বলিলে ভুল বলা হইবে। যেদিন হইতে সমাজে শ্রেণীভেদ দেখা দিয়াছে,[৪৪] সেদিন হইতেই এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ করিতেছে, এবং এই শ্রেণী-শোষণের অবশ্যম্ভাবী ফলই হইল শ্রেণীবিরোধ—প্রবলের নাগপাশ হইতে দুর্বলের মুক্তিলাভের ব্যাকুলতা। আসল কথা, যেদিন হইতে শ্রেণীভেদ শুরু হইয়াছে, সেদিন হইতে শ্রেণীবিরোধও অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

দীর্ঘকাল ধরিয়া, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানবসমাজ প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আসিতেছে—এক শ্রেণীর লোকেরা বিনা পরিশ্রমে [ বা স্বল্প শ্রমে ] অপরের শ্রমলব্ধ ধনের অনেকখানি আত্মসাৎ করিয়া আরামে জীবন উপভোগ করে, আর এক শ্রেণীর পরিশ্রমী মানুষ কঠোর পরিশ্রমে ধনোৎপাদন করে এবং উৎপন্ন ধনের অতি সামান্যমাত্র লাভ করিয়া কোনমতে জীবিকা নির্বাহ করে। বিনা শ্রমে অপরের শ্রমোৎপন্ন ধনের উপর মালিকানা করার যে রীতি, তাহারই পারিভাষিক নাম শোষণ [ Exploitation ]। শোষণক্রিয়ার দুইটি বিপরীত ফল লক্ষ্য করা যায়—একটি ধনসঞ্চয়, অপরটি দারিদ্র্য। যাহারা শোষণ করে, তাহারা সমাজে ধনী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, আর যাহারা শোষিত হইয়া জীবনের তিক্তস্বাদ গ্রহণ করিতেছে, তাহারা সমাজের নীচের তলায় দরিদ্র বলিয়া অবহেলিত হইতেছে। সমগ্র সমাজ দুইটি বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে—ধনী ও দরিদ্র, শোষক ও শোষিত।[৪৫]

ধনী ও দরিদ্রের এই যে বৈষম্য, ইহাব অবসান ঘটাইবার জন্য আজ দেশে দেশে নানাপ্রকার আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। স্বার্থলোলুপ মানুষের অপরকে বঞ্চিত করার সকলপ্রকার অপচেষ্টা স্তব্ধ করিয়া দিয়া শোষণমুক্ত সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনের প্রয়াস আজ পৃথিবীর দিকে দিকে।

ভারতবর্ষেও সমাজবিপ্লবের এই প্রয়াস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ভাবতীয় সমাজে বহুকাল হইতেই ধনী ও দরিদ্রে বৈষম্য চলিয়া আসিতেছে সত্য,[৪৬] কিন্তু ব্রিটিশ আমলে উহা বিশেষভাবে তীব্র হইয়া উঠে। ব্রিটিশ শাসকদের ভূমিরাজস্ব-নীতি এবং দেশীয় কুটির-শিল্পকে পর্যুদস্ত করিয়া যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতিই এইরূপ বৈষম্যের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশিত।

ভারতবর্ষের ভূমিব্যবস্থার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে কৃষকগণই ছিল এদেশে জমির প্রকৃত মালিক। জমিতে যে শস্য উৎপন্ন হইত, তাহার একটা নির্দিষ্ট অংশমাত্র কৃষককে রাজকর হিসাবে দিতে হইত।[৪৭] যে-বৎসর জমিতে ফসল কম ফলিত, সে-বৎসর জমির খাজনাও কমিয়া যাইত। আর যে-বৎসর জমিতে অধিক ফলন দেখা দিত, সে-বৎসর কৃষক এবং শাসক উভয়েরই প্রাপ্তি বাড়িয়া যাইত। কর-সংগ্রহের এই আনুপাতিক ব্যবস্থার ফলে কৃষকের আর্থিক অবস্থার উপর কোনো সময়েই খুব বেশী চাপ সৃষ্টি হইত না। ইহার ফলে ধনীর পর্যায়ে না পড়িলেও কৃষকেরা কখনও মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব বোধ করিত না।

কিন্তু ব্রিটিশ আমলেই কৃষকদের—বিশেষতঃ বাঙলার কৃষকদের 'প্রথম কপাল ভাঙ্গিল'। ব্রিটিশ শাসকদের প্রসাদপুষ্ট জমিদার নামে এক শ্রেণীর হঠাৎ-রাজার দল বাঙলার ভাগ্যাকাশে মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, আর মাটির শিশু কৃষকগণ মাটির উপর তাহাদের চিরাগত অধিকার হারাইয়া জমিদারদের অধীনে ভূমিহীন দরিদ্র কৃষি-মজুরে রূপান্তরিত হইয়া গেল। অবশ্য ব্রিটিশ শাসনের যুগেই যে সর্বপ্রথম জমিদার-শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা নহে, তৎপূর্ববর্তী কালেও এদেশে জমিদার ছিল, তবে জমির উপর তাহাদের কোনো মালিকানা ছিল না—তাহারা ছিল তৎকালীন রাজসরকারের খাজনা আদায়ের প্রধান কর্মচারীমাত্র।[৪৮]

ব্রিটিশ আমলের একেবারে গোড়ার দিকে ব্রিটিশ শাসকগণ এদেশের ভূমিরাজস্ব আদায়ের প্রাচীন পদ্ধতিটাই মানিয়া লইয়াছিলেন, অর্থাৎ কৃষক-দিগকেই জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতেন। কিন্তু পূর্বে যেমন জমির বাৎসরিক উৎপাদন হইতে নির্দিষ্ট হারে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা ছিল, তাহা রহিত করা হইল; তৎপরিবর্তে জমিপ্রতি খাজনার হার নির্দিষ্ট হইল। পূর্বের ন্যায় জমিদার-নামধারী রাজস্ব-সংগ্রাহক কর্মচারীদের উপরই রহিল প্রতিবৎসর নব-নির্দিষ্ট হারে কৃষকদের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের ভার। এই সব জমিদারের মধ্যে যাঁহারা কোনো কারণে নির্দিষ্ট খাজনা যথাসময়ে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেন না, তাঁহাদিগকে নির্মমভাবে অধিকারচ্যুত করা হইত।[৪৯]

পরবর্তী কালে ভূমিকর-সংগ্রহের ব্যাপারে একটা বিরাট পরিবর্তন সূচিত হইল। ১৭৯৩ সালে ভারতের তদানীন্তন শাসনকর্তা লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভূমিরাজস্ব-সংগ্রাহকদের ভূমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া রাজস্ব বিষয়ে তাহাদের সহিত চিরকালের মতো একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। ইহাই ইতিহাসে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' [Permanent Settlement] নামে খ্যাত।[৫০] এই বন্দোবস্ত অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট খাজনা দেওয়ার শর্তে জমিদারগণ জমির সম্পূর্ণ মালিক হইলেন, জমিতে কৃষকদের আর কোনো স্বত্ব রহিল না। ফলে কৃষকদের দুঃখকষ্ট বাড়িয়া গেল; জমিদারগণ কৃষকদের নানাভাবে শোষণ করিয়া ধন সঞ্চয় করিতে লাগিলেন—রাজার হস্ত কাঙালের সমস্ত ধনই চুরি করিতে প্রসারিত হইল। শুধু তাহাই নহে, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হাতে পাইয়া জমিদারগণ [বা জমিদারের গোমস্তারা] প্রজাদের উপর কখনও

কখনও অতি সামান্য কারণেও কঠোর অত্যাচার চালাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না।[৫১] অত্যাচারী জমিদারের প্রতিকারহীন অত্যাচারের শিকার হইয়া কত গোক্ষুর জোলা, কত অভাগীর পুত্রকে যে চোখের জল সম্বল করিয়া জীবন কাটাইতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু 'এহো বাহ্য', ইহার উপর আবার মহাজনের উৎপীড়ন। 'মহাজন' শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থে মহান ব্যক্তিকে বুঝাইলেও, লৌকিক ব্যবহারে ইহা একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। যাহারা সুদে টাকা [ কখনও কৃষকদিগকে বীজধান বা চাষের যন্ত্রপাতি ] ধার দেয়, তাহারাই মহাজন [Money lender] নামে পরিচিত। গ্রাম-বাঙলার কৃষক-সমাজে মহাজন ছিল একদিকে যেমন ভীতির পাত্র, অপরদিকে তেমনই নিরুপায়ের উপায়। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির ফলে শস্যের ফলন আশানুরূপ না হইলে, অথবা চাষের গরু-মহিষের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে কৃষকের দুর্দশার আর সীমা থাকিত না। ইহা ছাড়া আরও অনেক কারণে তাহাকে প্রায়ই আর্থিক দিক দিয়া বিপন্ন হইয়া পড়িতে হইত। তখন ঋণ করা ছাড়া তাহার আর কোনো উপায় থাকিত না। ঋণের জন্য সে মহাজনের দ্বারে উপস্থিত হইত, অত্যধিক সুদে টাকা ধার করিয়া আনিত। কিন্তু ক্রমবর্ধমান অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য তাহার পক্ষে মহাজনের ঋণ শোধ করিয়া উঠা অসম্ভব হইয়া পড়িত, অথচ না করিয়াও উপায় ছিল না—মহাজন ইচ্ছা করিলে দেনার দায়ে কৃষকের সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া লইতে পারিত। সুতরাং কৃষককে অনেক সময় চাষের গরু-লাঙ্গল বিক্রয় করিয়া অথবা জীবিকার একমাত্র অবলম্বন সামান্য জমিটুকু বন্ধক রাখিয়া বা বেচিয়া দিয়া মহাজনের ঋণ শোধ করিতে হইত।

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে কিন্তু মহাজনের এতটা প্রতাপ ছিল না। তখন গ্রাম্য সমাজের ভয়ে মহাজনকে অনেকটা সংযত থাকিতে হইত। ব্রিটিশ আমলে গ্রামের সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরিলে মহাজনদের দৌরাত্ম্যও বাড়িয়া গেল। মহাজন ও জমিদারের টানাটানিতে হৃতসর্বস্ব হইয়া বাঙলার কৃষক কোনমতে তাহার 'কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ' বাঁচাইয়া রাখিতে লাগিল।[৫২]

কৃষিজীবীদের মতই দুরবস্থা এদেশে শিল্পজীবীদেরও। অথচ ভারতবর্ষের এমন দিন গিয়াছে, যেদিন ভারতীয় শিল্পের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। এশিয়া এবং ইওরোপের দূর-দূরান্তেও সেদিন ভারতবর্ষের শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী হইত। খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্বেই মিশর, রোম ও গ্রীস দেশে ভারতীয় মসলিন সমাদৃত

হইয়াছিল।[৫৩] 'বাংলার মস্‌লিন্‌ বোগ্‌দাদ্‌ রোম চীন/কাঞ্চন-তৌলেই কিন্‌তেন একদিন' [ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : 'চরকার গান' ]।

কিন্তু শুধু কি মসলিন? রেশমী, পশমী ও সূতী বস্ত্রের জন্যও ভারতের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। ইহা ব্যতীত সেকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে আরও নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইত। বারাণসী, নাসিক, পুনা, আমেদাবাদ, বিশাখাপত্তনম্‌ ও তাঞ্জোর প্রসিদ্ধ ছিল পিতল, কাঁসা ও তামার বাসনপত্র তৈরির জন্য। পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে তৈরী হইত যুদ্ধের অস্ত্রপাতি ও বর্ম। রাজস্থানের শহরে শহরে দেখা যাইত মণিমুক্তা ও পাথরে খোদাই-করা নানারূপ অপূর্ব কারুকার্য। সোনারুপার অলংকার, শ্বেতপাথরের মূর্তি, কাঠের তৈরী আসবাবপত্র, লৌহনির্মিত নানাপ্রকার দ্রব্য সেদিন ভারতের বহুস্থানেই চোখে পড়িত। এক কথায়, শিল্পলক্ষ্মীর অফুরন্ত ভাণ্ডার সেদিন ভারতবর্ষে উন্মুক্ত হইয়াছিল। দেশী ও বিদেশী বণিকগণ সেই ভাণ্ডার হইতে নানাবিধ দ্রব্য চয়ন করিয়া সমুদ্র পাড়ি দিত—মরু-কান্তার অতিক্রম করিয়া দেশ-দেশান্তরে ছুটিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের এই শিল্পসমৃদ্ধি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিল না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নির্দেশে অচিরেই ভারতীয় শিল্পের উপর খড়্গাঘাত পড়িল। সর্বাপেক্ষা বেশী আঘাত পড়িল বস্ত্র-শিল্পের উপর। ভারতীয় তাঁতীরা হাত গুটাইয়া বসিল। এদেশের কার্পাস ইংলণ্ডে গিয়া বস্ত্র হইয়া ফিরিয়া আসিল। বিলাতী কাপড়ে বাজার ছাইয়া গেল।[৫৪]

বঙ্গদেশ ভারতেরই অংশ বলিয়া এখানেও একই অবস্থা দেখা দিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মে বাঙালী বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মের অবনতি দ্রুততর হইল। ব্যবসার প্রাণকেন্দ্রে বিদেশী বণিক হস্তক্ষেপ করিল; ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি এবং বাঙলা তথা ভারতের শিল্পপ্রাধান্য হ্রাস করিবার জন্য পার্লামেন্ট হইতে আইন পাস করাইয়া দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের শ্বাসরোধ করা হইল। ফলে যে সমস্ত বাঙালী এতদিন শিল্পকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা স্থানচ্যুত হইয়া বিষম বিপাকে পড়িল, কেহ কেহ কৃষিকার্য অবলম্বন করিল; কিন্তু কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির মালিকানা স্বত্ব রায়তের অধিকারে ছিল না। ফলে ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই দেশে একটা বিরাট ভূমিহীন কৃষকসম্প্রদায় ও বৃত্তিহীন শিল্পীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল'।[৫৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেশের শিল্পক্ষেত্রে অপর একটা বিরাট পরিবর্তন সূচিত হইল। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের তরঙ্গ আসিয়া এদেশে আঘাত করিল। শ্রমসাধ্য ও সময়নির্ভর কর্মও যন্ত্রসাহায্যে অল্লায়াসে ও অল্পসময়ে সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা হইল। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি কল-কারখানা গড়িয়া উঠিল।[৫৬] যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন শিল্প [large-scale industry] ধীরে ধীরে ধ্বংসাবশিষ্ট কুটিরশিল্পকে [cottage industry] গ্রাস করিয়া ফেলিতে লাগিল। 'গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির' ছাড়িয়া ভূমিহীন কৃষক ও বৃত্তিহীন শিল্পীদের একটা বড় অংশ আসিয়া শহরের নবস্থাপিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে চাকরি লইল। যন্ত্রদানবের পায়ে জীবনের দিনগুলি অল্পদামে বিকাইয়া দিয়া তাহারা কোনমতে দুবেলা দুমুঠি অন্নের সংস্থান করিতে পারিল। দেশের মধ্যে দরিদ্র কৃষকদের পাশে পাশে দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণী গড়িয়া উঠিল।

একদিকে ধনী জমিদার ও মহাজনের দল, অপরদিকে ধনহীন ভাগ্যহত কৃষকশ্রেণী ; একদিকে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার অধিবাসী বিলাসী শিল্পপতিগণ, অপরদিকে জীর্ণকুটিরবাসী অর্ধভুক্ শ্রমিকসমাজ। বাঙলা তথা ভারতের চলমান জীবনধারায় এই বৈষম্য বহুকাল হইতেই বর্তমান। শোষণভিত্তিক এই বৈষম্য সমাজে বার বার নানা অনর্থ ঘটাইয়াছে। কখনও কৃষক-বিদ্রোহ, কখনও শ্রমিক-বিদ্রোহের মধ্য দিয়া 'নিপীড়িত-জনমন-মথিত বাণী' সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই ফলস্বরূপ সম্প্রতি জমিদারী-প্রথার বিলোপ ঘটিয়াছে, বিভিন্ন ভূমি-সংস্কার-আইন প্রণয়ন করিয়া কৃষকদের দুরবস্থা ঘুচাইবার চেষ্টা চলিতেছে, শ্রমিকসঙ্ঘ সমূহের চেষ্টায় শ্রমিকদের অবস্থার কিছু কিছু উন্নতি সাধিত হইতেছে, মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ মীমাংসা করিয়া 'শিল্পে শান্তি' স্থাপনের জন্য সরকারী উদ্যোগও পরিলক্ষিত হইতেছে। এক কথায়, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস করিয়া সাম্যনির্ভর সমাজব্যবস্থা প্রচলনের প্রতি আধুনিক ভারতের একটা প্রবল ঝোঁক পড়িয়াছে। কিন্তু ইহা যে কেবল এই শতাব্দীরই চিন্তাপ্রসূত পরিণতি, তাহা নহে। ইহার জন্য আমাদিগকে পিছন দিকে তাকাইতে হইবে। উনিশ শতকের বাঙলাদেশে যে সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণার শুভারম্ভ হইয়াছিল, তাহাই বিবর্তনের পথ ধরিয়া এযুগের সাম্যমূলক কর্ম-প্রচেষ্টায় রূপ লাভ করিতেছে।

ঋষি বঙ্কিমের সাম্যচিন্তামূলক বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাজাত নানা বক্তৃতা ও রচনায় সমাজবাদের কথা সুপরিস্ফুট

হইয়াছে। উনিশ শতকের এই দুই সমাজবাদী চিন্তানায়কের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, সেকালের শিক্ষিত বাঙালীর সমাজে অনেকেই আর্থিক বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শক্তিমান জমিদারের কবল হইতে অসহায় কৃষকদের রক্ষার নিমিত্ত রামমোহন তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের নিকট অকুণ্ঠ আবেদন জানাইয়াছিলেন। ডিরোজিও-শিষ্য রসিককৃষ্ণ মল্লিক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করিয়া দরিদ্র কৃষিশ্রমিকদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন।[৫৭] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একাধিক সংখ্যায় মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত ধনতান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া কেশবচন্দ্র সেন-প্রমুখ আরও বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির রচনায় দরিদ্র শ্রমজীবীদের প্রতি মানবিক সহানুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।[৫৮] মোট কথা, ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগ্রত বাঙালীর চিন্তারাজ্যে যে সাম্য ও মানবতাবোধের অরুণাভাস দেখা দিয়াছিল, তাহাই সমাজতন্ত্রবাদের পথে পরিভ্রমণ করিয়া বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমুজ্জ্বল কিরণ বর্ষণ করিতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার মধ্যযুগীয় চেতনাকে বজ্রানলে দগ্ধ করিয়া নবজাগরণের যে বহ্নি-উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বাঙালীকে বিভিন্ন সংস্কারমুক্তির পথে আলোক প্রদর্শন করিয়াছে। প্রাচীন অন্ধকার গলিপথ সহসা নূতন আলোকে আলোকিত হইয়া বাঙালীকে সম্মুখে চলার সংকেত জানাইয়াছে। জীর্ণ প্রথাদীর্ণ সমাজব্যবস্থাকে পশ্চাতে ফেলিয়া সমকালীন য়ুরোপের জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ বাঙালী সেদিন 'নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার' পানে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিল। সেদিনের সেই অগ্রযাত্রার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতির বিভিন্ন পথে পরিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নারীপ্রগতির পন্থাটিও বাঙালীর নিকট বিশেষভাবে ঈপ্সিত হইয়া উঠিয়াছিল—'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার' অধিকার দানের নিমিত্ত একটা সুস্থির প্রয়াস উনিশ শতকের প্রথম হইতেই বাঙালীর কর্মচিন্তার বিভিন্ন পর্যায়ে পরিলক্ষিত হইতেছিল। উনিশ-শতকীয় বাঙালীর এই নারীমুক্তি-আন্দোলনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে নারীর যুগ-বিসর্পিত বন্ধনদশার প্রতি একটু সতর্ক দৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন হইতেই নারীকে পুরুষের বশবর্তিনী হইয়া চলিতে হইয়াছে। সামাজিক রীতি ও রাজবিধি নারীর অধিকারকে পদে পদে খর্ব করিয়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহাকে পুরুষের ছন্দানুবর্তিনী হইতে বাধ্য

করিয়াছে।[৫৯] পুরুষ প্রভু, নারী দাসী ; পুরুষ দেবতা, নারী তাহার সেবিকা—প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় ইহাই ছিল নারীর একমাত্র মূল্য। 'সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী'—কেবল এই কথাটি বলিতে পারাই যেন নারীজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যাহাতে কোনপ্রকার বিরূপ মনোভাব—কোনরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ আসিয়া অন্তরায় সৃষ্টি করিতে না পারে সেইজন্য বাল্যকাল হইতেই নারীর প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হইত পুরুষের নিকট একান্তভাবে বশ্যতাস্বীকার।[৬০]

সাধারণতঃ নারীপুরুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় বিবাহের মধ্য দিয়া। বিবাহ নারীপুরুষের শুধু দৈহিক মিলন নয়—হৃদয়েরও মিলন।[৬১] স্বামী ও স্ত্রী জীবনের বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হইয়া চলিবে—ইহাই প্রত্যাশিত। অথচ প্রাচীন সমাজপরিবেশে স্ত্রীকে স্বামীর একান্ত আজ্ঞাধীন হইয়া দাসীমাত্র পরিচয়ে জীবনপাত করিতে হইত। ইংলণ্ডের প্রাচীন আইন অনুসারে '…The husband was called the lord of the wife ; he was literally regarded as her sovereign…'[৬২] আমাদের দেশেও পত্নীর নিকট পতির পরিচয় ছিল 'প্রভু' ও 'নাথ', পতিগৃহযাত্রিণী তরুণী কন্যাকে 'ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ'।[৬৩] [ স্বামী রূঢ় ব্যবহার করিলেও ক্রোধবশে বিরুদ্ধাচারিণী হইও না ] বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইত।[৬৪]

কিন্তু নারী কি কেবল পতিরই অধীন ? আমাদের শাস্ত্রে নারীকে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত পুরুষের অধীনতাপাশে বাঁধিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে ঃ

'পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'॥ [ 'মনুসংহিতা' ]

[ কুমারী-অবস্থায় স্ত্রীলোককে পিতা রক্ষা করিবেন, ( বিবাহিতা স্ত্রীকে ) যৌবনে স্বামী রক্ষা করিবেন, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা রক্ষা করিবে—কোনো অবস্থায়ই স্ত্রীলোক স্বাধীন থাকিবে না ]

স্ত্রীগণ কোনো অবস্থায়ই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারিবে না, ইহাই শাস্ত্রবিধি। যত বন্ধন আছে, সকল বন্ধনে স্ত্রীগণকে বাঁধা হইয়াছে ; পুরুষজাতির জন্য একটি বন্ধনও নাই। ইহার কারণ, শাস্ত্রকারগণ সকলেই পুরুষ—তাঁহারা পুরুষের সুখসুবিধার দিকে তাকাইয়াই এক-একটি 'ফতোয়া' জারি করিয়াছেন। 'পুরুষ বুঝাইয়াছে সহমৃতা হওয়া সতীর পরম ধর্ম!'[৬৫] কারণ পুরুষের বিশ্বাস,

সহমৃতা হইলে স্ত্রী পরলোকে গিয়া স্বামীর সেবা করিতে পারিবে। মৃত্যুর পরে পরলোকে গিয়াও যাহাতে পুরুষের কষ্ট পাইতে না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শাস্ত্রবিধি গড়িয়া উঠিল—স্ত্রীবধ ধর্মসংগত হইয়া গেল।[৬৬]

উনিশ শতকের প্রথম দিকে যখন ইংরাজের আইনবলে এই প্রথা নিষিদ্ধ হইল, তখন সমাজপতিরা সনাতন হিন্দুধর্মের বনিয়াদ রক্ষার অছিলায় পুরুষের মুখ চাহিয়া পুরাতন শাস্ত্রবাণী টানিয়া বাহির করিলেন—প্রাচীন সুকঠোর বৈধব্যরীতিকে সর্বশক্তি দিয়া আঁকড়াইয়া ধরা হইল। পরলোকে বসিয়া স্ত্রীর সেবা পাওয়ার পথ যখন রুদ্ধ হইয়া গেল, তখন ঠিক হইল ইহলোকে থাকিলেও স্ত্রীকে [ নিতান্ত বালিকা হইলেও ] পতিদেবতার আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত সর্বসুখবঞ্চিতা হইয়া কঠোর নিয়মে বৈধব্য পালন করিতে হইবে।[৬৭]

মরিয়া পরলোকে গেলেও পুরুষের অধিকার বজায় থাকিল—ইহলোকে সে প্রভু ছিল, পরলোকেও প্রভু হইয়াই রহিল। অথচ মজা এই, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হইলেও পুরুষের পক্ষে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইল না। 'দায়ে পড়িয়া', 'নিতান্ত অনিচ্ছায়', 'লোকের কথা এড়াইতে না পারিয়া' বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্যা গ্রহণের দৃষ্টান্ত বাঙলার সমাজে বড় বিরল ছিল না।

পুরুষ নিয়মের পর নিয়ম গড়িয়া নারীর 'মনুষ্য' পরিচয় চাপা দিয়া তাহাকে কেবল 'নারী' করিয়া তুলিয়াছে। যে-সব সমাজপতি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নারী-নির্যাতনের নিয়মগুলি সমাজে প্রচলিত করিয়াছেন, তাঁহারা পুরুষের অধিকার লইয়াই তাহা করিয়াছেন। 'তখন তাঁহারা পুরুষ—পিতা নন, ভ্রাতা নন, স্বামী নন। যাঁহাদের সম্বন্ধে নিয়ম করা হয়, তাঁহারাও আত্মীয়া নহে, নারীমাত্র।'[৬৮]

নারীকে পুরুষের খেয়ালখুশির কাছে বার বার নতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, এবং বার বার একই কাজ করিতে বাধ্য হওয়ায় সেই কাজে তাহার কিছুটা সহজ প্রবৃত্তিও গড়িয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই দেখা যায়, পাতিব্রত্য রক্ষার দায়ে পড়িয়া স্ত্রীগণ অনেক সময় স্বামীদের নিষ্ঠুর বাসনার বলি হইতেও দ্বিধা-বোধ করে নাই। সতী-শিরোমণি হইয়াও সীতাদেবী তাঁহার প্রজারঞ্জক স্বামীর ইচ্ছায় অগ্নিপরীক্ষার চরম লাঞ্ছনা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। স্বামীর পাশা খেলার বাজি হইয়া পাণ্ডববধূ দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ ও রাজসভায় সর্বজনসমক্ষে নিদারুণ অপমান সহ্য করিতে হইয়াছিল। আসল কথা, পুরুষ চিরদিনই

নারীকে কাঞ্চনের সঙ্গে এক কোঠায় ফেলিয়া বিচার করিয়াছে। পুরুষের নিকট নারী মানুষ নহে—Commodity মাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

মানবসমাজের সকলপ্রকার বৈষম্য দূর করিবার জন্য কত আদর্শ, কত মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। 'মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট' হওয়াই যদি কাম্য হয়, তাহা হইলে সকল কার্যে—ব্যক্তিসত্তা প্রকাশের সকল প্রয়াসে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।[৬৯]

অবশ্য কেহ কেহ এই বিষয়ে তুমুল তর্ক তুলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে বলিয়া অধিকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়। কিন্তু'...স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না...[৭০] পুরুষ সবল, নারী অবলা ; পুরুষ ক্লেশসহিষ্ণু, নারী কোমলা—সমস্তই হয়তো সত্য, কিন্তু যেখানে মানুষ হিসাবে অধিকারের ক্ষেত্র নির্ধারিত হইবে, সেখানে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্র একই হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে নারীর স্থান ছিল অতি উচ্চে। নারী তখন প্রায় সকল বিষয়েই পুরুষের সমকক্ষতা করিত। তাহারা বেদ অধ্যয়ন করিত, উপবীত ধারণ করিত, উপনয়নেব পর গুরুগৃহে থাকিয়া রীতিমত জ্ঞান-লাভ করিত। প্রাচীনকালের বিভিন্ন গ্রন্থে গার্গী, লীলাবতী, খনা প্রভৃতি বহু উচ্চশিক্ষিতা নারীর নাম পাওয়া যায়। ইহার উপর আবার সেকালের নারীদের যুদ্ধবিদ্যার পরিচয়ও অপ্রাপ্য নহে। সেকালে নারীদিগকে সভাসমিতিতে স্থান দেওয়া হইত, আবার তপশ্চর্যায়ও তাহারা অংশগ্রহণ করিত। সত্যবতী, কুন্তী, গান্ধারী, সত্যভামা প্রভৃতি নারীগণ বৃদ্ধবয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থব্রত অবলম্বনে তপশ্চর্যা করিয়াছিলেন।

বিবাহ-ব্যাপারেও প্রাচীন ভারতে নারীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। 'পূর্বে কন্যারা বড় হইয়া নিজে ইচ্ছামত পতিকে নির্বাচন করিতেন।...অনেক ক্ষেত্রে কন্যারা নিজে পছন্দ করিয়া গান্ধর্ব মতেই বিবাহ করিতেন।...বেদে, মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে গান্ধর্ববিবাহের ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়'।[৭১] কিন্তু পরবর্তী কালে পতি-নির্বাচনের এই স্বাধীনতা লোপ পাইল। 'জাতিভেদ যখন প্রবল হইয়া উঠিল তখন কন্যা বড় হইয়া কাহাকে বরণ করিবে, বর ঠিকমত জাতিকুলের হইবে কিনা, এইসব উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে জাতিভেদকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া পছন্দ-অপছন্দের বালাই জন্মাইবার পূর্বেই বাল্যকালেই কন্যাদিগকে

বিবাহ দেওয়া হইতে লাগিল। বরণের দ্বারা বিবাহের বদলে কন্যাদান গৌরীদান প্রভৃতিই প্রবর্তিত হইল।...গৌরীদান করিতে গিয়া কন্যাদিগের শিক্ষা-দীক্ষা তুলিয়া দিতে হইল'।[৭২] ইহার ফলে প্রাচীন ভারতের নারীমহিমা লুপ্ত করিয়া দিয়া নারীকে অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অন্ধসংস্কারের আবর্তে নিক্ষেপ করা হইল; সমাজে নারীর স্থান হইল পুরুষের পাশে নয়—পুরুষের অনেক নিম্নে।

উনবিংশ শতাব্দীর যখন সূচনা হইল, তখন বাঙলার নারীসমাজ সকল দিক দিয়াই বঞ্চিত, উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত। বাল্যবিবাহ, অশিক্ষা, সতীদাহ ও সময় সময় অকালবৈধব্যের ফলে বাঙালী নারীর চরম দুর্দশা উপস্থিত। উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙলা মাতৃজাতির এই দুর্দশা মোচন করিয়া তাহাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। রামমোহনের সময়োচিত চেষ্টায় সতীদাহ নিবারিত হইল, ব্রাহ্মসমাজের উদার মনোভাবের ফলে স্ত্রী-জাতিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হইল, বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ পৌরুষকে অবলম্বন করিয়া বালবিধবারা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইল। ইহা ছাড়া বাঙালী নারী যাহাতে পুরুষের মতই শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতে পারে তাহার জন্যও নানাভাবে চেষ্টা চলিতে লাগিল। বিদ্যাসাগর-প্রমুখ সমাজসেবীরা কেবল স্ত্রীশিক্ষায়তন স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহারা লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়া স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা বুঝাইয়া বালিকাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।[৭৩]

বাঙালী সাহিত্যিকেরাও এই বিষয়ে নীরব ছিলেন না। স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য গৌরমোহন বিদ্যালংকার 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। মদনমোহন তর্কালংকারও ছিলেন এই বিষয়ে একজন উৎসাহী লেখক। এই যুগে প্রকাশিত 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র একটি সংখ্যায় [২য় সংখ্যা—আশ্বিন, ১৭৭২ শক] 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে তাঁহার একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। এই প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা 'কুসংস্কার ও ভ্রান্তি জালে মুগ্ধ ও ভ্রান্ত হইয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের ভাবি উপাদেয় ফল বোধগম্য করিতে পারিতেছেন না। কেবল কুসংস্কারমূলক কতকগুলিন কুতর্ক ও অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উপস্থাপিত করিয়া এই মঙ্গল ব্যাপারের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন'। প্রবন্ধকার বিরোধী পক্ষের সমস্ত আপত্তিই একে একে খণ্ডন করিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে একস্থানে তিনি মন্তব্য করিতেছেন: 'বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ

সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যূনাধিক্য স্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে, বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবে?' বালক ও বালিকা—পুরুষ ও নারী, উভয়ের মধ্যে অধিকারগত সাম্য স্থাপনের এই প্রশ্নই সেদিন বাঙালী মনীষাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল।

কবি ঈশ্বর গুপ্তকে অনেকে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী বলিয়া জানেন। তৎকালীন স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র কটূক্তি বর্ষণ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন :

"'আগে মেয়ে গুলো, ছিল ভালো,
ব্রত ধর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।
একা 'বেথুন' এসে, শেষ কোরেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়ী গুলো, তুড়ী মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে।
তখন 'এ, বি,' শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে" ॥ ['দুর্ভিক্ষ']

কিন্তু ইহা কেবল নিছক রঙ্গরস সৃষ্টির জন্যই। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তৎসম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামক পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত তাঁহার বিভিন্ন রচনায়। 'সংবাদ প্রভাকরে' স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন : 'আহা! স্ত্রীলোকেরা জ্ঞানশিক্ষা করণের উপায় প্রাপ্ত না হওয়াতে কত বিষয়ে আমারদিগের ক্লেশ হইতেছে তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না। আমরা যদ্যপি গৃহবিচ্ছেদ, ভ্রাতৃ-বিরোধ ইত্যাদি অনিষ্ট ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করি তবে স্ত্রীজাতির অজ্ঞানতাকেই তাহার মূলীভূত [মূল রচনায়—'মূলিভূত'] বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তাহারা বিদ্যাবতী হইলে ঐ সকল অনিষ্ট অনায়াসে নিবারণ হইতে পারে, আর সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতাও [মূল রচনায়—'স্বাচ্ছন্দতাও'] ক্রমে বৃদ্ধি হয়' [৭ই আগস্ট ১৮৫০]।

'সংবাদ সাধুরঞ্জনে'ও তিনি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে বিভিন্ন রচনা প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রের একটি সংখ্যায় [৯২ সংখ্যা—২৮ মে, ১৮৪৯ সাল] 'স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ে দুইজন স্ত্রীলোকের কথোপকথন'-শীর্ষক উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক একটি রচনায় স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ সমর্থনসূচক মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই

রচনায় দুইজন স্ত্রীলোকের একজনে প্রশ্ন করিতেছে : '···আমরা কি চিরকাল আঁধারে থাক্‌ব, পৃথিবীর কিছুই জান্‌ব না, শুধু চিরকাল বাঁদিপানা কোরে কাল কাট্‌ব ? আমাদের কি কেতাব পোড়ে দশ্‌টা দেখ্‌তে শুন্‌তে সাদ যায় না ?' এই প্রশ্নের ভিতর দিয়া একদিকে যেমন সেকালের অশিক্ষিত বাঙালী নারীর শিক্ষালাভের উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে, অপরদিকে তেমনই উহার প্রয়োজনীয়তাও বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে।

উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে এই-যে নারীজাগরণের বাণী, ইহাই বঙ্কিম-মধুসূদনের রচনায় আরও সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সূর্যমুখী ও ভ্রমর নারীত্বের মহিমাকে উচ্চে তুলিয়া পুরুষের স্বেচ্ছাচারকে তীব্র কশাঘাত করিয়াছে। তাঁহারই হাতে পড়িয়া গৃহস্থকন্যা প্রফুল্ল রূপান্তরিত হইয়াছে বহুজনবন্দিতা 'দেবী চৌধুরাণী'তে—তিনি দেখাইয়াছেন, উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা পাইলে অবলা নারীও প্রচণ্ড-শক্তিশালিনী হইয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারে। বঙ্কিমের ন্যায় মধুসূদনও নারীমহিমার জয়গান করিয়াছেন। মধুসূদনের 'প্রমীলা' চরিত্রটি নারীত্বের এক সুমহান্ আদর্শ প্রচার করিতেছে। নারী যে কেবল পুরুষের নর্মসহচরী নহে, প্রয়োজন হইলে তাহাকে যে অমিত তেজবিক্রম দেখাইতে হইবে—'প্রমীলা' চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়া ইহাই যেন লাঞ্ছিত নারী-সমাজের প্রতি মধুকবির সুস্পষ্ট নির্দেশ। তাঁহার 'জনা'-চরিত্র সৃষ্টিতেও নারীত্বের মহিমা বিঘোষিত। স্বামীর অসঙ্গত আচরণের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া বীরাঙ্গনা জনা যে স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় দিয়াছে, বাঙলার নারীসমাজের নিকট তাহা এক গভীর ইঙ্গিত বহন করিতেছে। 'জনা'-চরিত্র সৃষ্টি করিয়া মধুসূদন যেন দৃপ্তকণ্ঠে প্রচার করিতেছেন—'বিধির বিধানে পরাধীনা' হইলেও কুলনারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রকাশের অধিকার আছে।

নারীর এই ব্যক্তিস্বাধীনতালাভই নারীজাগরণের মূল কথা। উনিশ শতকের বাঙলা-সাহিত্যে ইহার উদ্বোধন ঘটিয়াছিল বলিয়াই আজ বাঙালীর সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। নদী যেমন দুই তীরে আবদ্ধ থাকিয়াই তাহার উচ্ছল লাবণ্য প্রকাশ করে, নারীজীবনও তেমনই সংযম ও শালীনতার বন্ধন স্বীকার করিয়াই কল্যাণশ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে।

কেবল যে নারীজাতির পক্ষেই এইরূপ বন্ধন প্রয়োজন তাহা নহে, নারী-

পুরুষ সকলকেই ব্যক্তিস্বাধীনতার যথার্থ মূল্যায়নের নিমিত্ত আচার-আচরণে কিছুটা বন্ধন স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এই ধরনের বন্ধন আছে বলিয়াই সমাজে আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারি। সমাজে সকলকে একসঙ্গে বাস করিতে হইলে একের প্রতি অপরের আচরণে সংযম ও সহিষ্ণুতার বন্ধন অপরিহার্য। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম দেখা দেয়—যেখানে অসংযত অহংবোধ ও উদ্ধত প্রাধান্যস্পৃহা মাথা তুলিয়া উঠে, সেখানেই কল্যাণের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়—সেখানে আমরা- আত্মবিস্মৃত হইয়া পরস্পর হানাহানিতে মাতিয়া উঠি।

ভারতবর্ষে ধর্মের ক্ষেত্রে অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামির শিকার হইয়া কতবার যে আমরা এইরূপ হানাহানিতে লিপ্ত হইয়াছি তাহার অন্ত নাই। ভারতের ধর্ম-চর্চার ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, একদিকে যেমন সাধু-মহাপুরুষদের উদার ধর্মনীতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছে, অপরদিকে তেমনই মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ঘৃণা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া ধর্মীয় বৈষম্যকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে।

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, বিপুল ইহার জনমণ্ডলী। 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান' লইয়া এই জনমণ্ডলী মহাকালের গতিপথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই সুদীর্ঘ যাত্রার ইতিহাসে দেখা যায়, সুপ্রাচীন কাল হইতেই কত নূতন নূতন জাতি আসিয়া ভারতীয় সমাজে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে ; আবার নূতন জাতি আসিয়াছে নূতন ধর্ম ও জ্ঞান-চিন্তা লইয়া ; তাহারাও কালক্রমে ভারতবর্ষীয় সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এইভাবে বহিরাগত 'কত মানুষের ধারা' আসিয়া ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্লীন ধারাটিকে স্ফীত হইতে স্ফীততর করিয়াছে।

এই মহান্ সভ্যতার ধারাটি ধর্ম ও চিন্তার রাজ্যে চলিতে চলিতে কখনও কখনও বাঁক ফিরিয়াছে ; তখন দেখা দিয়াছে নূতন নূতন ধর্মমত, নূতন নূতন জ্ঞান ও চিন্তার ফসল। এইভাবেই সনাতন হিন্দুধর্মের পাশে পাশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আবার ইতিহাসের রথচক্রের আবর্তনে পরবর্তী কালে শক্তিশালী বিদেশী জাতিরাও ভারতবর্ষে নূতন নূতন ধর্মমত বহন করিয়া আনিয়াছে। মধ্যযুগে মুসলমান বিজেতাদের সহিত আগত ইসলামধর্ম ইহার একটি বড় উদাহরণ, অপর উদাহরণ খ্রীষ্টধর্ম। ইসলামধর্ম নানা কারণে ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, খ্রীষ্টধর্মও উনিশ শতকের ভারতীয়

জনজীবনে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। ইহা ছাড়া আছে জরথুস্ট্রপন্থী পারসিক ধর্ম, নানকপন্থী শিখধর্ম ইত্যাদি। ভারতবর্ষে ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায়ের যেন আর শেষ নাই।

কোনো কোনো ধর্মসম্প্রদায় আবার কালক্রমে বিভিন্ন উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ কত যে উপ-সম্প্রদায় আছে তাহার সংখ্যা নির্দেশ করা কঠিন। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, বাউল, নাথপন্থী, অঘোরপন্থী, কর্তাভজা ইত্যাদি বহু ভিন্ন ভিন্ন উপ-সম্প্রদায়ে হিন্দুসমাজ বিভক্ত। ইহার উপর আবার আধুনিক যুগে হিন্দুধর্মের সুসংস্কৃত রূপ লইয়া ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব ঘটিয়াছে। হিন্দুদের ন্যায় বৌদ্ধ, মুসলমান ও গ্রীষ্টানদের মধ্যেও অল্পবিস্তর সম্প্রদায়-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—হীনযান ও মহাযান। মুসলমানদের মধ্যে সিয়া ও সুন্নী নামে দুইটি সম্প্রদায় তো আছেই, তাহার উপর আবার আছে উদারমতাবলম্বী সূফী সম্প্রদায়। গ্রীষ্টানগণ বিভক্ত দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ে—ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট্।

একই ভারতীয় সমাজে এইরূপ বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায় থাকায় দেখা গিয়াছে যে, এক ধর্ম অপর ধর্মকে সরাইয়া জনগণের মধ্যে অধিকতর প্রতিপত্তি লাভের প্রয়াসী হইয়াছে। প্রধানতঃ ইহার ফলেই সময় সময় সাম্প্রদায়িক সংঘাত, সংঘর্ষ, বিরোধ দেখা দিয়েছে।

হিন্দু-বৌদ্ধযুগে হিন্দুদের হাতে বৌদ্ধদের লাঞ্ছনার বহু নজীর পাওয়া যায়। এই যুগের বাঙলার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়,—বঙ্গাল-দেশের সৈন্য-সামন্তরা সোমপুর মহাবিহারে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল. বর্মণ রাজবংশের জনৈক প্রধান রাজকর্মচারী ভট্ট-ভবদেব বৌদ্ধ পাষণ্ড বৈতণ্ডিকদের উপর জাত-ক্রোধ ছিলেন, সেন-রাজ বল্লাল সেন নাকি 'নাস্তিক [ বৌদ্ধ ]-দের পদোচ্ছেদের জন্যই কলিযুগে জন্মলাভ' করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া বাঙলার হিন্দু রাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ তো সর্বজনবিদিত। তাঁহার বৌদ্ধ-বিরোধিতা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। তিনি গয়ার বোধিদ্রুম কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলেন, বুদ্ধ-প্রতিমাকে অন্য মন্দিরে স্থানান্তরিত করিয়া সেই স্থানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, কুসীনারার এক বিহার হইতে ভিক্ষুদিগেকে তাড়াইয়া দিয়া বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করেন।[৭৪] বৌদ্ধদের উপর হিন্দুদের এইরূপ নির্যাতন চলিয়াছিল বহুকাল পর্যন্ত।

পরবর্তী কালে দেখা যায়, বৌদ্ধগণও সুযোগ পাইয়া হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ

প্রকাশ করিয়াছে। বৌদ্ধ লামা তারানাথের বিবরণী হইতে জানা যায়, বাঙলায় মুসলিম আক্রমণের সময় 'একদল বৌদ্ধ ভিক্ষু মুহম্মদ বখ্‌ত্‌-ইয়ারের গুপ্তচরের কাজ করিয়াছিলেন, এবং বাংলার সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন'।[৭৫] ইহা ছাড়া মধ্যযুগে রামাই পণ্ডিত-রচিত 'শূন্যপুরাণ' নামক গ্রন্থটিতে 'শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা' নামে যে ছড়াটি পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, মুসলমান আক্রমণকারীদের হাতে নবদ্বীপবাসী হিন্দুদের লাঞ্ছনায় বৌদ্ধগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল। ছড়াটির কিয়দংশ এইরূপ:

'নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলেত দম্বদার।
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হৈল মহাঁমদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল স্থলপানি।
গণেশ হইআ গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইল্যা জত মুণি'॥ [ নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত ]

'নিরঞ্জন নিরাকার' অর্থাৎ বুদ্ধদেব এবং অপরাপর দেবদেবীরা মুসলমানের বেশ ধরিয়া বৈদিক হিন্দুদের নির্যাতিত করিয়াছিলেন—ইহাই ছড়াটির তাৎপর্য। এই ছড়াটির মধ্য দিয়া বৌদ্ধদের হিন্দু-বিদ্বেষ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাঙলার বৌদ্ধগণ যাঁহাকে হিন্দু-নির্যাতন করিতে দেখিয়া উল্লসিত হইয়াছিল, সেই বখ্‌তিয়ার খিলজীর হাতেই অনতিকালপূর্বে বিহার-অঞ্চলে বৌদ্ধ-বিহার বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং প্রচুর বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবনাবসান ঘটিয়াছিল।[৭৬] হিন্দু-নিগ্রহকারী বখ্‌তিয়ার যে বৌদ্ধরক্তে হস্ত রঞ্জিত করিয়া আসিয়াছিলেন, বাঙলার বৌদ্ধগণ তাহা বুঝিয়াও বুঝে নাই —জানিয়াও জানিতে চাহে নাই। হিন্দু-বিদ্বেষ তাহাদিগকে এমনই পাইয়া বসিয়াছিল যে, বিদেশী শত্রুকে সমর্থন করিতেও তাহারা দ্বিধাবোধ করে নাই। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এইভাবেই মানুষকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করিয়া তোলে।

বখ্‌তিয়ারের নবদ্বীপ-বিজয়ের পর হইতেই ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকার বিস্তৃতি লাভ করে। প্রথমে পাঠান সুলতানগণ এবং পরে দিল্লীর মুঘল বাদশাহের অধীন সুবাদারগণ বঙ্গদেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।[৭৭] ইহাদের শাসনকালে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দানা বাঁধিয়া

এবং মুসলমান শাসকদের হাতে হিন্দু প্রজারা প্রায়ই নানাভাবে নিগৃহীত হইত। 'মুসলমান সুলতান ও সুবাদারগণ শুধু রাজ্য পরিচালনা করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন না, হিন্দুসমাজকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে যেন একটা মহৎ কর্তব্য সমাধা হইল মনে করিতেন।···হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা, মঠ-মন্দির ভাঙিয়া তাহার মালমসলার দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা সে যুগের অধিকাংশ মুসলমান শাসকের নিত্যকর্মে পরিণত হইয়াছিল'।[৭৮]

এই সময়ে হিন্দুর উপর মুসলমানের নির্যাতনের বিভিন্ন কাহিনী পাওয়া যায় : 'বর্ধমানের আগুরি-সম্প্রদায় কারারুদ্ধ হইয়াও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাই, ফলে অনেকেই নিহত হইয়াছিল। এক ব্রাহ্মণ যুবক মুসলমান হইতে অসম্মত হন, ফলে তিনি নির্যাতিত ও অসম্মানিত হইয়া গৌড় হইতে বিতাড়িত হন। দিনাজপুরের দেবতলা ও দেবকোটের মন্দির ভাঙিয়া মসজিদ নির্মিত হয়। দেবকোটের নিকট দমদমায় একটি স্থায়ী সেনাছাউনি ছিল। ইসলাম-প্রচারকারী ফকিরদের অস্ত্রসাহায্য ও অন্যভাবে সাহায্য করাই ছিল ইহাদের একমাত্র কাজ। এই অঞ্চলের হিন্দুগণ দ্রুতবেগে মুসলমান হইয়া যায়।···ধর্মত্যাগের ভয়ে সম্পন্ন গৃহস্থগণ হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে পলাইয়া গিয়া ধর্ম ও প্রাণ রক্ষা করিত, কিন্তু সাধারণ লোকে বাধ্য হইয়া ধর্মত্যাগ করিত'।[৭৯]

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যেও মুসলমানহস্তে হিন্দু-নিগ্রহের বহু উল্লেখ আছে। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে' আছে, হোসেন কাজীর শ্যালক হিন্দুর উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেও দ্বিধাবোধ করিত না :

'যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয়-কাজীর সাক্ষাৎ॥
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল।
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল॥···
যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তার কান্ধে।
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে॥
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে'॥

[ হাসেন-হোসেন সংবাদ ]

হিন্দু-নিগ্রহের অনুরূপ উল্লেখ বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে'ও পাওয়া যায়। কিন্তু একটা কথা এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গোটা মধ্যযুগ ধরিয়া সর্বদাই

যে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক তিক্ত হইয়া থাকিত তাহা নহে। বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণের দৃষ্টান্ত এযুগে খুব বেশী ছিল সত্য, কিন্তু স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াও অনেকে ধর্মান্তর গ্রহণ করিত। অনেক হিন্দু রাজপ্রসাদ লাভের আশায় স্বেচ্ছায় নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়া যাইত। অনেকে আবার মুসলমান পীর-ফকির, সূফীসাধক ও উলেমাদের বাণীতে মুগ্ধ হইয়া ইসলামকে বরণ করিয়া লইত। অন্যদিকে পল্লীবাঙলার শান্ত পরিবেশে হিন্দু-মুসলমান প্রায়ই 'একে অপরের সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিত'। তাহা ছাড়া বাঙলার অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত বলিয়া হিন্দুদের সঙ্গে আচার-আচারণে তাহাদের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যাইত'।[৮০] সুতরাং একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, মধ্যযুগে যেমন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সময় সময় তীব্র আকার ধারণ করিত, তেমনই মানবধর্মের তাগিদে উভয় সম্প্রদায়ই মিলিয়া মিশিয়া একসঙ্গে বাস করিতে চাহিত।

উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাজশক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনের অভাবে মুসলমানদেব ধর্মান্তরীকরণের ব্যাপক প্রয়াস স্তব্ধ হইয়া যায়—হিন্দু-মসলমানের সাম্প্রদায়িক কলহও অনেকটা স্তিমিত হইয়া আসে। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গাহাঙ্গামা যে একেবারেই হইত না তাহা নহে। মিশনারীদের প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ'-নামক পত্রিকায় ১৮২০ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার খবর পাওয়া যাইতেছে।[৮১] মাঝে মাঝে এইরূপ দাঙ্গা হইয়া হিন্দু-মুললমানেব সম্পর্ক তিক্ত করিয়া তুলিলেও বিদেশী রাজশক্তির প্রবল প্রতাপে উহা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিত না।

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে মুসলমানদের দ্বারা বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ বন্ধ হইয়া যায় সত্য, কিন্তু এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবাগত খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ দেশীয় লোকদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত কারার জন্য বিপুল আয়োজন আরম্ভ করিয়া দেন। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।[৮২] ভারতীয় 'হীদেনদের' মধ্যে পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিলাতের নরদামটন সায়ারের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রথমে উইলিয়ম কেরী নামে এক ধর্মপ্রচারককে সপরিবারে এদেশে প্রেরণ করেন, কেরীর সঙ্গে জন টমাস নামে অপর এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিও আসিয়াছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে টমাস ও কেরী কলিকাতায় পদার্পণ করেন। ইহার পরে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে আসেন

জে. ওয়ার্ড, জে. মার্শম্যান, ডি. বার্নস্‌ডন ও ডবলিউ. গ্র্যাণ্ট্‌ নামে অপর কয়জন মিশনারী। কেরী ও তাঁহার সঙ্গী মিশনারীরা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী কলিকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুর-নামক স্থানে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।[৮৩] ইহাই সুবিখ্যাত শ্রীরামপুর মিশন।

শ্রীরামপুর মিশনের প্রোটেস্টাণ্ট্‌ মিশনারীরা এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের নিমিত্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। 'India must be won to Christ'—এই সংকল্পকে সফল করিবার জন্য তাঁহারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাইবেল অনুবাদ করিয়া বিলি করেন, হিন্দুধর্মের অসারতা বুঝাইবার জন্য সংস্কৃত শাস্ত্র-পুরাণ ও প্রচীন বাঙলা কাব্য মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন, সাময়িক পত্র সম্পাদনা করিয়া উহার মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে ব্রতী হন। ইহা ছাড়া আরও বিভিন্ন ভাবে তাঁহারা দেশীয় লোকদের ধর্মান্তরীকরণের চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকায় রামমোহন মিশনারীদের প্রচারপদ্ধতির বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন: '…ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা-সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রিষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে'।[৮৪]

কিন্তু মিশনারীদের এত যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় তাহা সমস্তই পর্বতের মূষিক প্রসবের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর হইয়া গিয়াছিল। "বৌদ্ধ ধর্ম যেমন বৈদিক কর্মকাণ্ডপ্লাবিত দেশে মানসমুক্তির বাণী আনিয়াছিল, ইসলাম আনিয়াছিল বলিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বের সাম্যনীতি,—কেরী ও তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত 'ভ্রাতৃগণের' প্রচারিত বাণীর মধ্যে সেইরূপ কোন বৃহদ্‌ মানবধর্মের উদার আহ্বান ছিল না। কাজেই জনসাধারণ দূর হইতে মিশনারী সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারণা সকৌতুকে লক্ষ্য করিয়াছে মাত্র, তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই;…।"[৮৫] তৎসত্ত্বেও কিছু কিছু

লোক যে মিশনারীদের পাল্লায় পড়িয়া খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু 'যাহারা স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের সেই মনোভাবের অন্তরালে ধর্মনিষ্ঠা অপেক্ষা ঐহিক স্বার্থই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছিল কিনা, চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে'।[৮৬]

শ্রীরামপুরের মিশনারীরা তাঁহাদের প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ'-নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় এবং বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকার মারফতে খ্রীষ্ট-মহিমা প্রচারচ্ছলে পরধর্ম-দ্বেষণার বিষবাষ্প ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজকে আক্রমণ করাই ছিল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। হিন্দুধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁহাদের আক্রমণ এতই তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে সেকালের সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা উহার প্রতিবাদ না করিয়া পারেন নাই। ফলে দেশের মধ্যে এক প্রচণ্ড ধর্মকলহ শুরু হইয়া গিয়াছিল। এই ধর্মকলহের প্রধান বাহন হইল সাময়িক পত্র। রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি বিশিষ্ট হিন্দুগণ 'ব্রাহ্মণ সেবধি', 'সম্বাদ কৌমুদী', 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করিয়া মিশনারীদের আক্রমণের যথাযোগ্য উত্তর দিতে লাগিলেন।[৮৭] পরবর্তী কালে-মিশনারীদের ধর্মান্তরীকরণ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আরও অনেকে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরধর্ম-অসহিষ্ণু খ্রীষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে বাঙালী হিন্দুর এই ধর্মকলহ চলিয়াছিল বেশ কিছুকাল ধরিয়া।

হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের এই ধর্মকলহ এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মমতাবলম্বীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনৈক্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালী সমাজে ক্ষোভ ও অশান্তির ঝড় তুলিয়াছিল। কিন্তু অন্যদিকে আবার তৎকালীন বাঙলার মনীষীদের কণ্ঠে সর্বধর্মসমন্বয়ের উদার বাণী ধ্বনিত হইয়া সম্প্রদায়নিরপেক্ষ এক মহান্ ধর্মচেতনার দিকে বাঙালীকে অঙ্গুলিসংকেত করিতেছিল। রামমোহনের সর্বজনীন ধর্মের [Universal religion] আদর্শ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি অপক্ষপাত দৃষ্টি এবং সর্বোপরি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভের অনন্যসাধারণ শক্তিমত্তা যেন সকল-প্রকার ধর্মকলহের মূলে প্রবলভাবে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকগণ যখন শাশ্বত মানবধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া কেবল অন্ধ গোঁড়ামি প্রচার করিতেছিলেন, ধর্মবিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত

*বাঙালী-মানস তখন শান্তি ও সান্ত্বনার পথ খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ শুনিতে পাইল* দক্ষিণেশ্বরের আম্রকুঞ্জ হইতে পাগল ঠাকুরের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে—যত মত তত পথ। ধর্ম ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ এই উদার মতবাদ উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। রামমোহনের ধর্মসম্বন্ধীয় বিভিন্ন আলোচনা ও বিচারে তাহার উদ্বোধন এবং রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দের প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় তাহার পরিণতি।

এপর্যন্ত আমরা কয়েক-প্রকার বৈষম্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, মানুষের স্বার্থান্ধ প্রকৃতি চাহিতেছে মানবসমাজে নিরন্তর বৈষম্যের প্রাচীর তুলিয়া মানবধর্মকে পদে পদে অবদমিত করিয়া রাখিতে। মানুষ মানুষকে বঞ্চিত করিয়া ধনসঞ্চয় করিতে চাহে—মানুষ মানুষকে পীড়িত করিয়া কেবল স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজিয়া বেড়ায়—মানুষের চোখের জলের উপর মানুষ তাহার সুখ ও সমৃদ্ধির ইমারত গড়িয়া তোলে। ইহার ফলে যুগ যুগ ধরিয়া নিপীড়িত মানবতার ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর হইয়া উঠিয়াছে। সে-ক্রন্দন আজিও থামে নাই—কোনোদিন থামিবে কিনা তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

কিন্তু কেন এমন হয়? পৃথিবীর সকল মানুষই নাকি ঈশ্বরের শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তবে মানুষে মানুষে বৈষম্য দেখা যায় কেন? কেহ প্রভু, কেহ দাস; কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ শূদ্র; কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; কেহ শোষক, কেহ শোষিত—এমনটি হয় কেন? এই 'কেন'-র উত্তর দিতে গেলে অনেক কথাই আসিয়া পড়ে। তবে সকল কথার উৎস অনুসন্ধান করিতে গেলে একটি কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, মানুষের আদিম লোভ ও স্বার্থপর বুদ্ধিই সকল বৈষম্যের মূল কারণ।

সভ্যতাগর্বী বর্তমান পৃথিবী মানবসমাজের সকল-প্রকার বৈষম্য দূর করিয়া সাম্য স্থাপনের জন্য কত-না বড় বড় মতবাদ খাড়া করিয়াছে—কত বিপ্লব ও আন্দোলন চালাইতেছে! কিন্তু যাহার জন্য এত কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহার স্বরূপ কী তাহা বুঝিয়া উঠা ভার। অর্থাৎ 'সাম্য' বলিতে যে ঠিক কী বুঝায় তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা শক্ত। এ বিষয়ে নানাজনে নানা তর্ক তুলিয়াছেন। আমরা সেই সকল কূটতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া 'সাম্য' কথাটির মোটামুটি একটি ব্যাখ্যা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

'সাম্য' বলিতে বুঝায় সমাবস্থা। অতএব মানবসমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত

করার অর্থ হইল সকল মানুষকে একই অবস্থায় থাকিতে বাধ্য করা। কিন্তু ইহা তো প্রাকৃতিক নিয়মেই অসম্ভব। কারণ সংসারে সকল মানুষই আর সমান শক্তি-সামর্থ্য লইয়া জন্মে না, আবার 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ'—সকল মানুষেব রুচিরও সমতা নাই। কাজেই সকল মানুষই সাধু হইবে, সকল মানুষই শিক্ষিত হইবে, সকলেই সকল কাজ করিতে পারিবে—ইহা আদৌ প্রত্যাশিত নহে। রুচি ও সামর্থ্য বিষয়ে যতদিন মানুষে মানুষে ভেদ থাকিবে, ততদিন মানব-সমাজে একের সহিত অপরের বৈষম্য থাকিবেই। প্রকৃতিব এই অমোঘ বিধানেব কাছে আমাদের মাথা নত না করিয়া উপায় নাই।

কিন্তু দুঃখ এই, প্রাকৃতিক বৈষম্য ছাড়াও কতকগুলি কৃত্রিম বৈষম্য সৃষ্টি করিয়া মানুষ চাহিতেছে 'খোদার উপর খোদকারি' করিতে। কখনও গায়েব জোরে, কখনও বুদ্ধির জোরে, কখনও টাকার জোরে মানুষ মানুষকে বলিতেছে—'তফাৎ যাও'। কেমন করিয়া কী কৌশলে একে অপরকে দাবাইয়া রাখিয়া জীবনচর্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ অধিকাব [special privilege] ভোগ করিবে তাহার জন্য মানবসমাজে চেষ্টার অন্ত নাই। সুস্থ জীবনযাপনেব ন্যায়সংগত অধিকাব হইতে আফ্রিকাব কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের বঞ্চিত করিয়া পশ্চিমের শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা চাহিয়াছেন ধরণীব সুখসম্পদ আহবণ করিবার নিষ্কণ্টক অধিকাব ভোগ কবিতে। শাস্ত্রবিধিব দোহাই দিয়া ব্রাহ্মণ-নামক বিশেষ একটি সম্প্রদায় হিন্দুসমাজে প্রাধান্য লাভের অপ্রতিহত অধিকার ভোগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অর্ধভুক্ কৃষক-শ্রমিকের শ্রম-কিনাঙ্কিত হস্তের সেবা আদায় করিয়া যাহাবা 'বাবু' হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাবা নির্দ্বিধায় জীবনের সমস্তটুকু সোমবস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবার বিশেষ অধিকার দাবি করিতেছেন।

এই যে বিশেষ অধিকার, ইহাই সকল বৈষম্যের নিদর্শন। সাম্যবাদ মানুষের এই বিশেষ অধিকার স্বীকার করে না।[৮৮] জন্মগত, উত্তরাধিকারসূত্রে [by reason of paternal accident] প্রাপ্ত সম্পত্তির বলে করায়ত্ত, সামাজিক প্রথাবিশেষের সহায়তায় অর্জিত অথবা প্রাধান্যলাভের স্পৃহা হেতু অপরকে বঞ্চিত করিয়া বলপূর্বক গৃহীত কোনো বিশেষ অধিকার ভোগ করা সাম্যতত্ত্বের বিরোধী। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সকল মানুষের সমান অধিকাব থাকিবে—ইহাই সাম্যনীতির মূল কথা। 'পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই—তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ

আইনের দোষে পিতৃ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড-প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ এবং তাঁহার ভ্রাতা।.........যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী'।[৮৯]

সাম্যনীতির অপর একটি কথা হইল এই যে, সকলকেই 'মানুষ' হইয়া উঠিবার মতো যথোপযুক্ত সুযোগ [adequate opportunities] দিতে হইবে।[*] শিক্ষক বা অধ্যাপকের একটি ছেলে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করুক ক্ষতি নাই, কিন্তু দেখিতে হইবে যে, চাষীর ঘরে যে প্রতিভাবান ছেলেটি জন্মগ্রহণ করিল, যথোচিত সুযোগের অভাবে তাহার প্রতিভা-বিকাশের পথ যেন রুদ্ধ হইয়া না যায়। অনেকে এই প্রসঙ্গে সকলকে সমান সুযোগ [equal opportunities] দেওয়ার কথা তুলিয়া থাকেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সকলের পক্ষে সমান সুযোগ বা সুবিধা প্রযোজ্য নহে। কারণ, সকল মানুষের জন্মগত গুণ ও প্রবৃত্তি [native endowments] এক হইতে পারে না। কেহ জন্ম হইতেই অসাধারণ প্রতিভাশালী, কাহারও মূর্খতা জীবনে ঘুচিবার নহে। অতএব গুণ ও প্রবৃত্তি অনুসারেই মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে। সকল মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিই সাম্যবাদের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে যেমন অধিকারসাম্যের প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন ঘটাইয়া মানুষকে মানুষের মতো জীবনধারণের ও সমাজসেবার উপযোগী করিয়া তোলা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজীবন-উদ্বোধনের পটভূমিকায় রচিত বাঙলা সাহিত্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ পর্যন্ত বেশ কয়েকজন মনস্বী লেখকের রচনায় তৎকালীন বাঙলার বৈষম্যপীড়িত সমাজ-মানসে সাম্যাদর্শের প্রেরণা সঞ্চার করিবার প্রয়াস পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কখনও ধর্মীয় বৈষম্য দূর করিয়া সর্বজনীন ধর্মবোধের প্রতিষ্ঠায়, কখনও নারী-পুরুষের অধিকারগত বৈষম্য ঘুচাইয়া সাম্যমূলক মানবধর্মের উজ্জীবনে, আবার কখনও বা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূলে আঘাত করিয়া সাম্যবাদের উদার বাণী প্রচারে এই শতাব্দীর লেখকগণ উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রতিক্ষেত্রেই একদিকে যেমন অধিকারসাম্যের কথা বলা হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই আত্ম-শক্তির জাগরণের জন্য উদাত্ত আহ্বান ঘোষিত হইয়াছে। সাম্যনীতির এই

দুইটি মূল আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সাধনায় সাম্যবাদের সূচনা।

সাম্যচিন্তা মানুষের সুস্থ ও উন্নত মনের পরিচয় বহন করে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমরা প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারি না—লোভ, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, দ্বেষ আমাদের নিত্যসঙ্গী হইয়া থাকে। কিন্তু ইহারই মধ্যে কদাচিৎ এমন এক-একটি শুভ মুহূর্ত আসিয়া দেখা দেয়, যখন আমাদের কাজের সংসারে কপাট পড়িয়া যায়—আমরা জীবনের সমস্ত কলরব হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্তরলোক তাকাইয়া দেখিবার সুযোগ লাভ করি। সেই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে বিশ্বসত্তার যে অংশটুকু বিরাজ করিতেছে তাহা অকস্মাৎ সম্প্রসারিত হইয়া বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতিকে বক্ষে ধরিয়া বলিতে চাহে—এই তো আমি, ব্রহ্ম হইতে ভুবনের প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত সমস্ত কিছুতেই তো আমি। নিখিল বিশ্বের সহিত এই যে অনির্দেশ্য একাত্মতাবোধ, ইহাতেই সাম্যবাদের মূল মন্ত্রটি নিহিত।

বিশ্বপ্রকৃতিও আপন বিচিত্র লীলায় নিরন্তর সাম্যবাদ প্রচার করিতেছে।[১০] সূর্য তাহার আলোকধারায় বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত করিয়া রাখে; রাজার প্রাসাদ ও দরিদ্রের পর্ণকুটীর সমভাবেই আলোকের আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হয়। চন্দ্রের বিমল কিরণ যেমন ধনিগৃহের গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া তন্দ্রামগ্না লক্ষপতি-কন্যার ললাটে চুম্বন আঁকিয়া দেয়, গ্রামপ্রান্তের দরিদ্র কুটীরেও তেমনই ভাঙা চালের ফাঁকে ফাঁকে পথ খুঁজিয়া লইয়া সারাদিনের কর্মভারে অবসন্না কৃষকবধূর জীর্ণবাসপরিহিত মলিন দেহটিকে স্নেহসিক্ত করিয়া তোলে। শ্রাবণের আকাশ হইতে যে অশ্রান্ত বর্ষণধারা নামিয়া আসে তাহাতে কেবল স্বপ্নবিলাসী কবিচিত্তই নাচিয়া উঠে না, ক্ষেত্রসম্বল নিরক্ষর কৃষকের মনেও শস্যপ্রাপ্তির আশায় আনন্দের দোলা লাগে। বিশ্বচরাচরে প্রকৃতির সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়া এই আনন্দধারা বহিয়া চলিয়াছে।

আবার প্রকৃতির রুদ্রলীলার অভিঘাত হইতেও ছোট-বড় কাহারও নিস্তার থাকে না। ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, মহামারীর ক্ষুধিত ভয়াল মূর্তি ধনী-দরিদ্র ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলের দ্বারেই 'ম্যয় ভুখা হুঁ' বলিয়া হাজির হয়। প্রকৃতির এই প্রলয়ংকর রূপের মধ্য দিয়াও সাম্যের মর্যাদা রক্ষিত হইতেছে। প্রকৃতির সংসারে সৃষ্টি যেমন সত্য, ধ্বংসও তেমনই। সৃষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যুর মহাচক্রে বিশ্বসংসার গ্রথিত। জীবনের এক কোটিতে জন্ম, অপর কোটিতে মৃত্যু।

জন্ম যেমন শুভ্র ও নির্মল, মৃত্যু তেমনই উদার ও পবিত্র। জন্মে সাম্য, মৃত্যুতেও সাম্য। জন্মমৃত্যুর মাঝখানে যে জীবনটুকু, যত বৈষম্য সেইখানেই। জীবনের কর্মবহুল দিনগুলির অবসানে যেদিন মহাপ্রস্থানের পথে পা বাড়াইতে হয়, সেদিন রাজা-প্রজা ধনী-দরিদ্র ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেই এক পথের যাত্রী—সকলেই সমান। মানুষের নশ্বর দেহ যেখানে তাহার অন্তিম পরিণতি লাভ করে, সেই শ্মশানভূমি সাম্যের এক মহাপীঠস্থান। 'এইখানে আসিলে, সকলেই সমান হয়। পণ্ডিত, মূর্খ; ধনী, দরিদ্র; সুন্দর, কুৎসিৎ; মহৎ, ক্ষুদ্র; ব্রাহ্মণ, শূদ্র; ইংরাজ, বাঙালী; এইখানে সকলেই সমান। নৈসর্গিক অনৈসর্গিক সকল বৈষম্য এইখানে তিরোহিত হয়। শাক্যসিংহ বল, শঙ্করাচার্য বল, ঈষা বল, রুসো বল, রামমোহন বল; কিন্তু এমন সাম্যসংস্থাপক এ জগতে আর নাই! এ বাজারে সব এক দর—অতি মহৎ এবং অতি ক্ষুদ্র, মহাকবি কালিদাস এবং বটতলার নাটকলেখক, একই মূল্য বহন করে'।[৯১]

প্রকৃতির মৌন কণ্ঠ হইতে প্রতিনিয়তই সাম্যের উদার বাণী উচ্চারিত হইতেছে।

ভারতের অধ্যাত্ম সাধকগণ বার বার নানাভাবে এই সাম্যের বাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উদাত্ত কণ্ঠ রহিয়া রহিয়া কেবল এই কথাই প্রচার করিয়াছে যে, মানুষ তুচ্ছ নয়, ক্ষুদ্র নয়, মানুষে মানুষে কোনো ভেদও নাই—সকল মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ—সকল মানুষই সমান।

প্রাচীন ভারতের হোমাগ্নি-আলোকিত তপোবনের কুটীরপ্রাঙ্গণ হইতে সত্যদ্রষ্টা আর্যঋষি একদিন ঘোষণা করিলেন ঃ

'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"
[ঈশোপনিষৎ ঃ শ্লোক ১]।

['বিশ্বজগতে যাহা কিছু চলিতেছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখিতে হইবে—এবং তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে, অন্যের ধনে লোভ করিবে না'—রবীন্দ্রনাথকৃত বঙ্গানুবাদ ঃ 'ধর্ম']। সাম্যাদর্শের ইহা একটি বড় কথা। এই একটি কথার দ্বারাই জগতের সমস্ত বৈষম্যের নিরসন হইতেছে।

'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং—অর্থা ঈশ্বর সর্বব্যাপী। সর্বদেশে সর্বকালে সর্বজীবে ঈশ্বরের আবির্ভাব—'সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্ম'। এই উপলব্ধি লইয়া যদি আমরা বিশ্বজগতের দিকে তাকাই, তবে দেখিব—ধনী বা দরিদ্র বলিয়া কেহ নাই,

ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল একই মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। তখন অপরের প্রতি পীড়ন বা শোষণের তীর নিক্ষেপ করিতে গেলে 'শরস্তম্ভ' হইবে, মনে হইবে— কাহাকে পীড়ন করিতেছি? যাহাকে পীড়ন করিতে উদ্যত হইয়াছি, সেও তো আমারই মতো মানুষ—তাহার মধ্যেও তো ঈশ্বর স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন। লোভ তখন সংকুচিত হইয়া স্মরণ করিবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্'। তিনি যাহা ত্যাগ করিতেছেন, তিনি যাহা দিতেছেন, তাহা ভোগ করিয়া পরিতুষ্ট থাকিবার বাসনাই তখন বড় হইয়া উঠিবে—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'।

ভারতবর্ষ একদিন তাহার অধ্যাত্ম সাধনার বলে ধূলিমলিন এই পৃথিবীকে —লোভ ও স্বার্থপরতা-পরিকীর্ণ এই সংসারকে দিব্যধামরূপে দেখিবার মতো উদার দৃষ্টি লাভ করিয়াছিল। ভারতের যে প্রাচীন ঋষিরা তপস্যায় সিদ্ধকাম হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন: 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' [ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ: অধ্যায় ৩, শ্লোক ৮ ], তাঁহারা তাঁহাদের সেই প্রত্যক্ষলব্ধ সত্যকে প্রচার করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ [ তদেব: অধ্যায় ২, শ্লোক ৫ ]—দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা সকলে শ্রবণ কর। তাঁহাদের সত্য-সমুজ্জ্বল দৃষ্টিতে ধরণী দিব্যধাম হইয়া উঠিয়াছিল, ধরণীবাসী মানবগণ হইয়াছিল অমৃতের পুত্র।[৯২]

যে-দৃষ্টিতে বিশ্বকে বাসনা-মোহ-পরিচ্ছিন্ন একটি দিব্যধাম বলিয়া মনে হয়— যে-দৃষ্টিতে নিখিল মানবকে অমৃতময় ঈশ্বরের সন্তান ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না, ভারতবর্ষ একদিন সেই উদার দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল বিশ্বের দিকে —বিশ্বমানবের দিকে। সাম্যসাধনার এত বড় দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর আছে বলিয়া মনে হয় না।

ভারতবর্ষে একদিন ভগবান শংকরাচার্য তাঁহার অলৌকিক জ্ঞানদীপ্তির বলে সমস্ত বিরুদ্ধ যুক্তি ও তর্কের নিরসন করিয়া বেদান্তের অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত বেদান্তধর্মের গূঢ় তত্ত্ব হয়তো সেদিন খুব অল্পলোকই সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সেদিন হইতে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় এই একটি কথা বিশেষভাবে অনুস্যূত হইয়াছে যে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—সমস্ত কিছুতেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান।[৯৩] জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্মই জীব, জীবই ব্রহ্ম। কেবল মানুষ নয়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক্ষুদ্র একটি কীটও ঈশ্বরের রূপান্তরমাত্র। সর্ব বস্তুতে—সর্ব মানবে—সর্ব জীবে এই যে ঈশ্বরবোধ, ইহা আমাদের চিন্তার রাজ্যে সমদৃষ্টির এমন এক আলোক সম্পাত

করে, যাহার প্রখর দীপ্তিতে সকল-প্রকার বৈষম্যের কুহেলিকাজাল ছিন্ন হইয়া যায়। আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে বসিয়া কে একজন যেন বলিয়া চলে,—হিংসা নয়, দ্বেষ নয়, শোষণ নয়, পীড়ন নয়—প্রেমের পথই একমাত্র পথ। বিশ্বের সকলকেই সমজ্ঞান করিয়া সকলের প্রতি প্রেম বিস্তার করিতে পারিলেই যথার্থ ঈশ্বরসেবা হইবে। বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের শিক্ষায় এই যে প্রেম ও সাম্যের গান উদ্‌গীত হইতেছে, তাহার গভীর সুরটি যেদিন বিশ্বমানবের কর্ণে গিয়া পৌছিবে, সেদিন বিশ্বরাষ্ট্র বা 'world state' গঠনের কল্পনা আর অবাস্তব বলিয়া মনে হইবে না—মানুষ মানুষকে সেদিন 'ভাই' বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মনুষ্যত্বের সিদ্ধি অর্জন করিবে।

শংকরাচার্যের বহু পূর্বে ভারতবর্ষের মাটিতে একজন সাম্যাবতার মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব। "...শাক্যসিংহ অনন্তকাল-স্থায়ী মহিমা বিস্তার পূর্ব্বক, ভারতাকাশে উদিত হইয়া, দিগন্তপ্রধাবিত রবে বলিলেন,'...তোমরা সবই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই সমান। সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণবৈষম্য মিথ্যা।... কে রাজা, কে প্রজা, সব মিথ্যা। ধর্ম্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলেই সত্যধর্ম্ম পালন কর'।"[৯৪]

বুদ্ধদেবের এই যে সাম্যের বাণী, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে তৎপ্রচারিত একটি বিশেষ দার্শনিক প্রত্যয় বা মতবাদ। বৌদ্ধদর্শন আমাদের এই কান্নাহাসির সংসারের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। বৌদ্ধদর্শন বলে, 'যাহা কিছু পরি-দৃশ্যমান বা অনুভূয়মান, যাহা কিছু প্রত্যয়গোচর, তাহা ভ্রান্তি—তাহার মূল অজ্ঞান বা জ্ঞানের অভাব। স্পর্শ-বেদনা, জন্ম-মৃত্যু, ইহকাল-পরকাল, সুখ-দুঃখ, যাহা কিছু প্রত্যয়ের বিষয়, তাহা কেবল সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে উৎপন্ন। উহার ভিতরে কিছুই নাই। সমস্ত শূন্য ও মরীচিকা। সংসার অস্তিত্বহীন'।[৯৫] সংসারই যদি না থাকে—সমস্তই যদি শূন্য হয়, তাহা হইলে সংসারের যত কিছু বৈষম্য তাহাও অর্থহীন হইয়া পড়ে। বুদ্ধশিষ্যগণ এই 'শূন্যতাবাদ'কে অবলম্বন করিয়া নির্বাণলাভের পথ খুঁজিয়াছেন।[৯৬] কাজেই তাঁহাদের নিকট রাজাও যাহা, প্রজাও তাহাই, ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভু-ভৃত্য একই মূল্য বহন করে; অর্থাৎ সমস্তই শূন্যতার মহান্ধকারে নিমজ্জিত, ফলে সমস্তই একাকার—সমস্তই সমান। বৌদ্ধদর্শনের এই যে সাম্যতত্ত্ব, ইহার সমস্তটাই নেতিমূলক। তথাপি ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, বৌদ্ধগণ সংসারের কোনো বৈষম্যই স্বীকার করিতে

চাহেন না, তাঁহাদের নিকট মানুষের একমাত্র পরিচয়—সে মানুষ, যদিও সে শূন্যতা-সমুদ্রের অলাক জলবুদ্বুদ ছাড়া আর কিছুই নহে।

ধর্মের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক সাম্যবোধ ভারতবর্ষের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের উদার প্রাঙ্গণে দেশ-বিদেশের কত বিভিন্ন ধর্মের পতাকা উড্ডান হইয়াছে, ভারতের জনসমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া এক-একটি পতাকার তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছে ; এক সম্প্রদায়ের সহিত আবার অপর সম্প্রদায়ের সংঘর্ষও হইয়াছে। সমস্তই সত্য। কিন্তু ইহাও দুর্লক্ষ্য নহে যে, সকল ধর্মের মূল সুর মিলিয়া ভারতবর্ষের অন্তরলোকে একটা মহান্ ঐকতান সংগীত উত্থিত হইতেছে। ভারতবর্ষ চিরদিন এই ঐক্যের সাধনাই করিয়াছে। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ইসলাম খ্রীষ্টান—কোনো ধর্মকেই ভারতীয় জনসমাজ প্রত্যাখ্যান করে নাই। সকল ধর্মের মূলে যে শাশ্বত মানবধর্ম রহিয়াছে, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া চলিয়াছে ঐক্য ও সামঞ্জস্য স্থাপনের একটি সুস্থির প্রয়াস।

ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই ঐক্য ও সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী করিয়া দেখা দিয়াছিল মধ্যযুগে। তখন একদিকে যেমন বিভিন্ন আচার-বিচার ও সংস্কারকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুসম্প্রদায় বহুধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, অপর-দিকে তেমনই ইসলামের প্রচণ্ড আঘাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মজীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমান বাহিনীর আক্রমণে কত হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্তি ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল, কত মঠ-মন্দির লুণ্ঠিত হইয়াছিল, কত ধর্মপ্রাণ হিন্দু নরনারীর জীবনে ধর্মান্তর গ্রহণের দুর্ভোগ নামিয়া আসিয়াছিল। ঐক্য ও সংহতি-হীন দুর্বল হিন্দুসমাজ ইহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু ধ্বংসের মধ্য দিয়া যেরূপ নবসৃষ্টির আভাস পরিলক্ষিত হয়, মুসলমান আক্রমণেরও সেইরূপ একটা সুফল দেখা দিয়াছিল। 'মুসলমান-আক্রমণে তীর্থমন্দির ও নানাবিধ ধর্মক্ষেত্র বার বার বিপন্ন হইল সত্য, কিন্তু ধর্মের প্রধান স্থান হৃদয়-মন্দির ক্রমে জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল'।[৯৭] ভারতীয় ধর্মগুরুগণ 'আচারের মরুবালিরাশি' অতিক্রম করিয়া সাম্য ও মানবতার শ্যামল প্রান্তরে উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াসী হইলেন, এবং সেই সঙ্গে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মর্যাদা রক্ষার জন্যও উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন —সকল ধর্মকে তাল পাকাইয়া একটা কৃত্রিম ঐক্য নয়, সর্বদলের সুসমাবেশে 'সাধনার একটি শতদল কমল' ফুটাইয়া তোলাই ছিল এই ঐক্যের প্রকৃত স্বরূপ।

রামানন্দ, কবীর, রবিদাস, দাদূ প্রভৃতি মধ্যযুগের ধর্মগুরুদের শিক্ষা ও জীবন-চর্যায় আমরা এইরূপ সাম্য ও ঐক্যবোধের সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ করি।

মধ্যযুগের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই যাঁহার কথা বলিতে হয়, তিনি হইলেন গুরু রামানন্দ। মধ্যযুগের গুরুই তিনি। কবীর, রবিদাস, দাদূ প্রভৃতি পরবর্তী অনেক ধর্মগুরুই ছিলেন তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য। রামানন্দ রামানুজী সম্প্রদায়ের লোক। এই সম্প্রদায়ে রন্ধন, ভোজন, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে এত বাঁধাবাধি যে ইহাকে আচারী সম্প্রদায় বলিতে হয়। রামানন্দ যখন 'ভক্তির ব্যাকুলতায়' ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান, তখন তিনি এইসব আচার-বিচার মানিয়া চলিতে পারেন নাই। ইহার ফলে তাঁহার সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু তিনি ইহার পরে এক শুচি-সুন্দর নূতন জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে 'বর্ণাশ্রম-বন্ধন' অর্থহীন হইয়া পড়িল—ছোট-বড সকলের মধ্যেই ঈশ্বরসত্তা অনুভব করিয়া সকলকে তিনি সমদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। রামানুজী সম্প্রদায়ে আচারের বেডাজালে বদ্ধ রামানন্দ যেন এতদিন 'অচেতন' হইয়া ছিলেন—তাঁহার চিত্ত ছিল 'ধূলায় মলিন', এইবার প্রেম-ভক্তির আলোকে ধর্মের নূতন পথে তিনি যাত্রা শুরু করিলেন এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকেই ধর্ম-উপদেশ দিতে লাগিলেন। মধ্যযুগীয় ধর্মের ক্ষেত্রে বৈষম্যের নিগড ভাঙিয়া সাম্যের জয়যাত্রা শুরু হইল।

রামানন্দের প্রধান শিষ্য কবীর। তিনি ছিলেন মুসলমান জোলার পুত্র। কিন্তু তাঁহার উন্নত জীবনচর্যা, উদার ধর্মমত ও ঐকান্তিক ভাগবতী সাধনায় জনচিত্তে শ্রদ্ধা-ভক্তির এক দুর্লভ আসন তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। উচ্চ-নীচ সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকের নিকটই তিনি প্রণম্য ছিলেন। জাতিভেদ-কলুষিত মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে জোলা কবীর ছিলেন জাতিভেদের এক জীবন্ত প্রতিবাদ। জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, তীর্থ, ব্রত, মালা, তিলক প্রভৃতি কোনো কিছুরই তিনি ধার ধারিতেন না। অর্থহীন বাহ্য আচার ও কুসংস্কারের মূলে তিনি প্রবল বেগে আঘাত করিয়াছিলেন। ভক্ত-হৃদয়ের সহজ সরল ভক্তিই ছিল তাঁহার সাধনার একমাত্র উপজীব্য। ছোট-বড় উচ্চ-নীচ সকল মানুষকেই তিনি প্রেমের দৃষ্টিতে দেখিতেন—সকলের মধ্যেই ঈশ্বর সমভাবে প্রকাশমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রেম ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন ছিল কবীর-জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। তৎকালে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বৈষম্য দেখা যাইত

তাহা মহামানব কবীরকে নিরন্তর পীড়া দান করিত। এই দুইটি বিরোধী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় সাম্য সংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি বহু দোঁহা রচনা করিয়া গিয়াছেন। একটি দোঁহায় তিনি বলিতেছেন :

'জো খোদায় মসজীদ বসতু হ্যায় ঔর মুলুক কেহি কেরা।
তীরথ-মূরত রাম-নিবাসী বাহর করে কো হেরা।
পূরব দিসা হরী কী বাসা পচ্ছিম অলহ মুকামা।
দিল মেঁ খোজ দিলহি মেঁ খোজো ইহেঁ করীমা-রামা।
জেতে ঔরত-মরদ উপানী সো সব রূপ তুম্‌হারা।
কবীর পোঁগড়া অলহ-রামকা সো গুরু পীর হমারা।'

[ যোগেশচন্দ্র মজুমদার কৃত-বঙ্গানুবাদ ]

'মসজিদে যদি রহেন আল্লা
অসীম বিশ্ব ভুবন কার ?
তীর্থ দেউলে রামেরে ভাবিলে
বহির্বিশ্ব দেখে কে আর ?
পশ্চিমে হেরি খোদার আবাস
পূবেতে হেরি হরির ধাম,
হৃদয়-মাঝারে খুঁজিলে দেখিবে
যেথায় করীম সেথায় রাম।
এই ধরাতলে যত নর নারী
প্রকাশে রূপ সদা তাঁহার.
আল্লা ও রামের পুত্র আমি যে
তিনিই গুরু পীর আমার !'

কবীরের উদার মতবাদ উত্তর-ভারতের অনেক ধর্মগুরুকেই প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় আর একজন উদার মতাবলম্বী সাধক ছিলেন রবিদাস। তিনিও রামানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচিত। কাশীর এক মুচি বা চামারের ঘরে তাহার জন্ম হয়। বহুজন-পূজিত সাধুপুরুষ হইয়াও তিনি জুতা সেলাই করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। চিতোরের রানী ঝালী এবং পরম-ভক্তিমতী মীরাবাঈ ছিলেন রবিদাসের শিষ্যা।

রবিদাস অত্যন্ত সেবাপরায়ণ ছিলেন। মানুষকে তিনি ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করিতেন। যে দিব্যদৃষ্টি থাকিলে সংসারের সকল কিছুতেই ঈশ্বরোপলব্ধি ঘটে,

রবিদাস ছিলেন সেই দিব্যদৃষ্টির অধিকারী। তিনি বলিতেন : 'সব ঘট অংতর রমসি নিরংতর মৈঁ দেখন নাহি জানা'। [ সকল ঘটে তুমি সর্বদা বিরাজমান রহিয়াছ ; আমিই কেবল তোমাকে দেখিতে শিখি নাই ]।

সর্ববস্তুতে সাধকের এই যে ঈশ্বরবোধ, ইহা তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টির সম্মুখে এমন এক প্রেমের জগৎ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, যেখানে আপন-পর শত্রু-মিত্র বলিয়া কিছু থাকে না—সকল মানুষকেই ভাই বলিয়া মনে হয়।

মধ্যযুগের অপর একজন মহাপুরুষ ছিলেন দাদূ। জাতিতে তিনি ছিলেন মুসলমান ধুনকর। কবীরপন্থী এক সাধুর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। এক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া সকলকে ভাইবোনের মতো থাকিতে তিনি উপদেশ দিতেন। হিন্দু-মুসলমানকে মৈত্রী-বন্ধনে বাঁধিবার একটা বড় আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল। তিনি বলিতেন : 'সব দেখ্যা হম সোধি করি দূজা নহি আন।/সব ঘঠ একৈ আতমা ক্যা হিংদূ মুস্লমান'॥ [ 'সব আমি দেখিলাম খোঁজ করিয়া, কেহ আর নয় ভিন্ন, কেহ আর নয় পর ; কি হিন্দু কি মুসলমান একই আত্মা বিরাজমান সব ঘটে'।—ক্ষিতিমোহন সেন-কৃত বঙ্গানুবাদ ]।

কবীর, দাদূ, রবিদাস প্রভৃতি ধর্মগুরুদের সঙ্গে মধ্যযুগের এক শ্রেণীর মুসলমান সাধকদেরও নাম করিতে হয়। তাঁহারা ধর্মসাধনার একটি বিশেষ মতবাদ প্রচার করিয়া সেযুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচারিত এই মিলনমূলক ধর্মের নাম সুফীধর্ম।[৯৮] ইসলামের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই সুফীধর্মের উদ্ভব ঘটে। ইহাকে মহাপুরুষ হজরত মহম্মদের হৃদয়ের ধর্ম বলিয়া অভিহিত করা হয়।[৯৯] স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য ও আত্মলোপ [self-annihilation] এবং সেই সঙ্গে ঈশ্বরভীতি এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য।

সুফী সাধকগণ বিশ্বাস করেন,—'ভগবান কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের সম্পত্তি নহেন', বিশ্বের সমস্ত কিছুতেই তিনি প্রকাশমান, তাঁহাকে পাইতে হইলে অহম্‌কে সম্পূর্ণরূপে লোপ করিয়া সাধনা করিতে হইবে। অহম্-লোপের এই যে সাধনা, সুফীধর্মে ইহাকে বলা হয় 'ফনা'।[১০০] এইরূপ অহম্-বিনাশের শিক্ষা দিয়া সুফীধর্ম মানুষের সকল-প্রকার বৈষম্য নিরসনের পথ প্রদর্শন করিয়াছে, কারণ অহম্‌বোধই হইল সকল বৈষম্যের মূল কারণ। ইহা ছাড়া সুফীগণ যে **pantheism** বা সর্বেশ্বরবাদ-তত্ত্ব প্রচার করেন,[১০১] তাহাতেও জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখিবার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এক কথায়,

সূফীধর্ম এক উদার অধ্যাত্মবাদের আলোকে মানুষকে সাম্যবোধের পাঠ গ্রহণ করিতে বলিতেছে। ভারতবর্ষে ঠিক কবে হইতে যে সূফীধর্মের প্রচার আরম্ভ হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে মুসলিম-বিজয়ের বহু পূর্বেই যে সূফী মতবাদের সহিত ভারতবর্ষের পরিচয় ঘটে, ইহা অনেকটা অনুমান করা চলে।

ভারতের প্রাচীন সূফী সাধকদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও জনশ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মখদুম সৈয়দ আলি অল্-হুজরীরী। তিনি সাধারণতঃ দাতা গঞ্জ বখ্‌ষ নামেই পরিচিত। তাঁহাকে অল্-জুল্লাবীও বলা হয়। অনেকের মতে ভারতে সূফীদের আদিগুরু তিনিই। তাঁহার একটি বড় উপদেশই হইল নিরভিমান হইয়া সকল মানুষের সেবা করা। মানবমাত্রেরই সেবা করার এই যে উপদেশ, ইহাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিই মহাপুরুষ হুজরীরীর সমদর্শিতার পরিচয় পরিস্ফুট।

পরবর্তী সূফীসাধকদের মধ্যে খ্বাজা মুইন অলদীন চিশ্‌তী, নিজাম অলদীন ঔলিয়া, মীয়াঁ মীর, শাহ ইনায়ত, শাহ লতীফ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সকলেই সমদর্শিতার জন্য সমভাবে হিন্দু ও মুসলমানের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সূফী ধর্মগুরুদের মধ্যে অনেকে আবার হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের সাধনা ও সংস্কারের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে বহুক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে :-'প্রেমের ধর্মে সাধকদের কাছে এই দুই ধর্মের যেরূপ উচ্চ ভাবের মিলন আছে, আবার সাধারণ লোকের কাছে এই দুই ধর্মের প্রচলিত আচার ও সংস্কারগুলি তেমনি মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে।'[১০২]

ভারতবর্ষে সূফী ধর্ম হিন্দু ভাবধারা ও হিন্দু সাধনার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হইয়াছিল। সূফী পীর ও হিন্দু গুরুর সঙ্গে একটা চমৎকার সাদৃশ্য দেখা যায়।[১০৩] আবার ঈশ্বর সম্বন্ধেও সূফীদের ধারণা অনেকটা হিন্দু দর্শনের ব্রহ্মতত্ত্বের অনুরূপ।[১০৪]

সূফীধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে এইরূপ নিকট সাদৃশ্য থাকার ফলে অনেক সূফী সাধক মুসলমান হইলেও হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি অপ্রত্যাশিত উদারতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পরমতসহিষ্ণু ও পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এই সূফী সাধকগণ যে উদার ভাব ও ভাবনার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা মধ্যযুগের গণ্ডী ছাড়াইয়া এযুগেও সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ও মিলনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিতেছে।

মধ্যযুগ হইতেই ভারতবর্ষের একটি প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমানকে লইয়া। উভয় সম্প্রদায়কে 'ভেদবুদ্ধির অহংকার' হইতে মুক্ত করিবার জন্য সেযুগে হিন্দু ও মুসলমান লোকশিক্ষকদের চেষ্টার অন্ত ছিল না—এযুগেও সেই চেষ্টা সমানে চলিয়াছে। আধুনিক ভারতে বহুপ্রচারিত 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম' এই গানের কলিটি যেন মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান-মিলন-প্রয়াসী সাধু-সন্তদের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে মহাকালের হস্তাবলেপ তুচ্ছ করিয়া এযুগের ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান—এই দুইটি সম্প্রদায়ের বিভেদ ও বৈরিতা চিরদিনই ভারতবর্ষে সাম্য-সংস্থাপনের একটি বড় অন্তরায় হইয়া দেখা দিয়াছে। যেদিন আমরা হিন্দু-মুসলমানের ভেদ অতিক্রম করিয়া 'এক জাতি এক প্রাণ একতা'র মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতের সকল লোককেই কেবল ভারতবাসী বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিব, সেদিন আমাদের সম্মুখে সাম্য-সাধনার এক নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এক ধর্মের সহিত অপর ধর্মের বহুবিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ একটি সুরেই সকল ধর্মের ধর্মসংগীত বাজিয়া উঠিয়াছে। সর্বধর্মের এই মূল সুরটি হইল মানবপ্রেম। কি হিন্দুধর্ম, কি বৌদ্ধধর্ম, কি জৈনধর্ম, কি ইসলামধর্ম ও সুফীধর্ম—সকল ধর্মই শিক্ষা দেয় মানুষকে ভালবাসিতে—মানুষের প্রতি মৈত্রী ও প্রেমের কল্যাণপূত হস্ত প্রসারিত করিতে।

আধুনিক যুগে পশ্চিম সমুদ্রপার হইতে এদেশে নবাগত যে খ্রীষ্টধর্ম, তাহাও এইরূপ একটি মানবপ্রেমমূলক ধর্ম। খ্রীষ্টধর্ম-প্রবর্তক ভগবান যীশু ছিলেন ক্ষমা ও প্রেমের অবতার। শত্রুকেও প্রীতি করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন।[১০৫] প্রাচীনকাল হইতেই চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত তুলিবার যে হিংসাশ্রয়ী ব্যবহারিক বুদ্ধিটি মানুষকে পাইয়া বসিয়াছে, যীশুর বাণী ছিল তাহারই সুতীব্র প্রতিবাদ। আঘাতকারীকে প্রত্যাঘাত না করিয়া বশে আনিবার যে দুশ্চর প্রেমতপস্যা, যীশুর ভাগবতী বাণী তাহারই প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করিতেছে।[১০৬]

মানবসমাজে দাঁড়াইয়া যীশু ঈশ্বরকে পিতা বলিয়াছেন। 'পুত্র পিতারই আত্মস্বরূপের প্রকাশ'; তাই সকল মানুষের যিনি পিতা, তিনি তো সকল মানুষের মধ্যেই স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন। মানবপুত্র যীশু এই কথাই নানাভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

'মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ—যিশুর এই বাণী কেবলমাত্র তত্ত্বকথারূপে কোনো-একটি শাস্ত্রের শ্লোকের মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করিতেছে না। তাঁহার জীবনের মধ্যে তাহা একান্ত সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল বলিয়াই আজ পর্যন্ত তাহা সজীব বনস্পতির মতো নব নব শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। মানব-চিত্তের শত সহস্র সংস্কারের বাধা প্রতিদিনই সে ক্ষয় করিবার কাজে নিযুক্ত আছে। ক্ষমতার মদে মাতাল প্রতিদিন তাহাকে অপমান করিতেছে, জ্ঞানের গর্বে উদ্ধত প্রতিদিন তাহাকে উপহাস করিতেছে, শক্তি-উপাসক তাহাকে অক্ষমের দুর্বলতা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, কঠোর বিষয়ী তাহাকে কাপুরুষের ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে—তবু সে নম্র হইয়া নীরবে মানুষের গভীরতম চিত্তে ব্যাপ্ত হইতেছে, দুঃখকেই আপনার সহায় এবং সেবাকে আপনার সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে—যে পর তাহাকে আপন করিতেছে, যে পতিত তাহাকে তুলিয়া লইতেছে, যাহার কাছ হইতে কিছুই পাইবার নাই তাহার কাছে আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে' [ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'খৃষ্ট' ]।

মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গের এই যে আদর্শ, ইহা একদিকে যেমন মানুষের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা জাগরূক করিয়াছে—অপরদিকে তেমনই ধনী-নির্ধন-উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সকল মানুষকে 'ভাই' বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিবার প্রেরণা যোগাইয়াছে। ইহাতেই সাম্যতত্ত্বের মূল কথাটি বিধৃত।

'সাম্যাবতার যীশুখ্রীষ্ট' একদা জেরুজালেমের পর্বতশিখরে দাঁড়াইয়া যে প্রেম ও শান্তির বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই পরে স্থান ও কালের গণ্ডী ছাড়াইয়া বিশ্বমানবের হৃদয়ে মুক্তির মন্ত্ররূপে অনুরণিত হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারিত এই মুক্তি অহংবুদ্ধিজনিত সকল-প্রকার পাপ হইতে মুক্তি—মনুষ্যত্বের অবলোপকারী সকল-প্রকার বৈষম্য হইতে মুক্তি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই মুক্তিমন্ত্র একদিন অত্যাচারী প্রভুর হৃদয়ে করুণার প্রস্রবণ বহাইয়া দিয়াছিল, ভোগাসক্তকে ভোগাভিলাষ ত্যাগ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।[১০৭]

কিন্তু 'কালস্য কুটিলা গতি'। খ্রীষ্টধর্ম সাম্যাত্মক হইলেও কালে কালে ইহাতে এক নূতন-প্রকার বৈষম্যের কুফল ফলিতে আরম্ভ করিল। ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি ইউরোপের কয়েকটি রাজ্যে ধর্মযাজকদিগের প্রভুত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল। তাঁহারা তাঁহাদের চারিপাশে আত্মাভিমানের প্রাচীর খাড়া করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার খেলা দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বোপরি ছিলেন 'পোপ'। 'রোম-মহানগরীতে এই পোপ-নামধারী ধর্মযাজকগণ থাকিতেন।

তাঁহাদের পদ সকল খৃষ্টান সম্রাট হইতে শ্রেষ্ঠ ও তাঁহাদের কর্তৃত্ব সমগ্র খৃস্টান-মণ্ডলীর উপর ছিল। রোমান্ ক্যাথলিক খৃষ্টান-সম্প্রদায়ে তাঁহারা সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের কথায় ও উদ্যমে 'ক্রুজেড' বা ধর্ম্মযুদ্ধ সংঘটিত, কত রাজ্যেশ্বর সিংহাসনচ্যুত ও কত কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।'[১০৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে শ্রীরামপুরের প্রোটেস্টাণ্ট মিশনারীগণ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পবিত্র কর্ম সম্পাদন করিতে গিয়া অপর একপ্রকার বৈষম্যের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এদেশের লোকদের 'heathen' আখ্যায় অভিহিত করিয়া ঘৃণা ও অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিতেন, এবং প্রচার করিতেন যে একমাত্র খ্রীষ্টধর্ম ছাড়া অপর কোনো ধর্মেই মানুষের মুক্তি-লাভের উপায় নাই।

পরধর্ম-অসহিষ্ণু ধর্মান্ধ এই মিশনারীগণ একটিবারও ইহা ভাবিবার অবকাশ পান নাই যে, খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করিতে গিয়া তাঁহারা খ্রীষ্টকেই আঘাত করিতেছেন। যে মহাপুরুষ বলিয়াছেন, 'আমরা সকলে বিশ্বপিতার সন্তান'—যিনি নিখিল মানবকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাকে একটি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার আবর্তে টানিয়া আনিয়া মিশনের 'ভ্রাতৃমণ্ডলী' তাঁহার প্রতি চরম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহুদীরা খ্রীষ্টকে একবারমাত্র ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিল, তথাকথিত খ্রীষ্ট-অনুগামীরা খ্রীষ্টকে বার বার ক্রুশবিদ্ধ করিয়া ধর্মের ধ্বজা উড়াইয়াছেন।

তাহা ছাড়া সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি-প্রণোদিত বলিয়া মিশনারীদের প্রচার-কার্যে তেমন সুফলও ফলে নাই। রাজপথে দাঁড়াইয়া পরধর্মের নিন্দা-কুৎসা করিয়া এবং কয়েকখানি প্রচার-পুস্তিকা বিলি করিয়া তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে বাঙালীরা দলে দলে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া যীশু ভজিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। মিশনারীদের প্রচারিত বাণীর মধ্যে 'বৃহদ্ মানবধর্মের উদার আহ্বান ছিল না' বলিয়া এদেশের জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। তথাপি ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচ্ছদপটে অবস্থান করায় খ্রীষ্টধর্ম সেকালের শিক্ষিত বাঙালীর মনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষা, ইংরাজের আদবকায়দা ও ইংরাজের ধর্ম খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া

পুরাপুরি সাহেব বনিয়া যাইবার একটা প্রবল ঝোঁক উনিশ শতকের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের মস্তিষ্কে পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। ইহার সর্বাগ্রগণ্য দৃষ্টান্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইহা ছাড়া রাজার ধর্ম গ্রহণ করিলে সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি লাভের সম্ভাবনা থাকায় কিছু কিছু সুযোগসন্ধানী বাঙালী আবার সাগ্রহে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। তবে খ্রীষ্ট-প্রচারিত উদার নীতি ও আধ্যাত্মিক ভাবধারায় আকৃষ্ট হইয়া খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের দৃষ্টান্ত যে মোটেই ছিল না তাহা নহে। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র ঘোষের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। '……তাঁদের খ্রীষ্টানী কোনো সামাজিক বা আর্থিক পুরস্কার-প্রণোদিত নয়।……ধর্মনিষ্ঠ দৃঢ়চিত্ততায় এঁরা নিজস্ব অভিরুচি-অনুযায়ী খ্রীষ্টান হয়েছিলেন'।[১০৭]

বাঙালীর মানসলোকে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারিলেও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। খ্রীষ্টধর্ম যে জাতিভেদ-বিবর্জিত সাম্যবাদ ও মানবতার বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহা বাঙলার মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের মূলে আঘাত করিয়া বাঙালীর চিত্তে নূতন জীবনবোধ সঞ্চারে সহায়তা করিয়াছিল। ইহার ফলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙলার শিক্ষিত হিন্দুর সমাজে অনেকেই পৌত্তলিকতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সংস্কারমুক্ত জীবনের আস্বাদ লাভের জন্য আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়া বঙ্কিম, বিবেকানন্দ প্রভৃতি যুগনেতাদের চেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে নব্য হিন্দু-সংস্কৃতির [Nec-hinduism] উত্থান ঘটিয়াছিল, তাহার পশ্চাতে খ্রীষ্টধর্মের পরোক্ষ প্রভাব আছে কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। মোট কথা, বাঙালীর চিত্তে ধর্মীয় সাম্যবোধ সঞ্চারে খ্রীষ্টধর্ম যে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ধর্ম-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বাঙালীর ধর্মচিন্তায় ঔপনিষদিক হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম—প্রধানতঃ এই তিনটি ধর্মের ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটিয়াছিল। ইহার সহিত বৌদ্ধধর্ম, সূফীধর্ম ও কবীর-দাদূ-প্রচারিত ধর্মমতের কয়েকটি ছোট-বড় ধারাও আসিয়া মিলিয়াছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের সমন্বয়জাত একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ফলে নবজাগ্রত বাঙালীর ধর্মচেতনা একটা উদার সমুন্নতি লাভ করিয়াছিল। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্মনেতাদের ভাব-চিন্তায় সংকীর্ণ

ভেদবুদ্ধি হইতে মুক্ত এই ধর্মীয় উদারতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের রচিত সাহিত্যেও ইহার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটিয়াছে।

১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য' [১৯৬৫], 'ভূমিকা': পৃ. ॥০

২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ. ২৪।

৩। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কেবল আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোগণই যে দাসত্বের কলঙ্ক বহন করিয়াছে তাহা নহে। সুপ্রাচীন কালে গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে বহু শ্বেতাঙ্গ যুদ্ধবন্দীকে চিরজীবনের মতো দাস করিয়া রাখা হইত। ইহা ছাড়া বাজিতে হারিয়া বা ঋণশোধে অসমর্থ হওয়ায় অনেককে চিরদাসত্বের যন্ত্রণাময় জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব-প্রথা যে কবে হইতে প্রচলিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া বলা যায় না।

৪। '....from the ninth century it was mainly Arab traders who supplied the demand of the Moslem world for slaves. Nor was it only in the markets of the Arab or, later on, the Turkish Empire—at Fez, Tunis, Cairo, Damascus, Mecca, Bagdad—that they sold their human wares. From the East African ports, especially Kilwa, a steady stream of slaves was carried across the Indian Occan to the Persian Gulf and thence inland to Persia or along the coast to India'. Reginald Coupland: *The British Anti-Slavery Movement* [London, 1964], pp. 13-14.

৫। 'The methods of the slave-hunters were at once crude and wasteful, no doubt because they were robbers and not warriors. Their practice was to surround some village which they had marked down for their prey, silently and at night. It was a collection of primitive mud huts thatched with bamboos and palm leaves, all highly inflammable, which they set alight without compunction, generally at early dawn. As the inhabitants woke to the crackling of flames and struggled into the open, they were rounded up and made prisoners. Any who resisted were cut down; the slave-hunters had no mercy for them. Nor had they any use for the old or infirm or for babes, all of whom they killed out of hand. Only men

and women in their prime and adolescent boys and girls were spared, to be carried off into slavery, leaving behind them dead bodies and dying ashes where once there had been happy homes and a living settlement'. O. A. Sherrard : *Freedom from Fear* [London, 1959], p. 61.

৬। Kenneth S. Lynn [ed.]—*Uncle Tom's Cabin or, Life among the lowly* : Harriet Beecher Stowe [Cambridge, 1962] : 'Editor's Introduction', p. viii. এই সুবিখ্যাত পুস্তকটিতে আমেরিকায় নিগ্রোদের দাসজীবনের একটি করুণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীসমাজে বর্ণবৈষম্য ও দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জাগিয়া উঠে। তাহারই ফল—বিপ্রচরণ চক্রবর্তীর 'টমখুড়ো' [১৮৬৩] এবং চণ্ডীচরণ সেনের 'টমকাকার কুটীর' [প্রথম ভাগ ১২৯১]। বাঙলায় অনূদিত এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

৭। O. A. sherrard : *Freedom from Fear* [ London, 1959 ], p. 72.

৮। প্রধানতঃ Quaker-নামক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের আন্দোলনে এবং মনীষী Wilberforce-এর আমরণপ্রচেষ্টায় ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দাস-ব্যবসায় ও দাসত্বপ্রথা বিলুপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপের অন্যান্য দেশও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে।

৯। '…he [Lincoln] was shot while attending a performance at Ford's Theatre [April 14, 1865]. The assassin was a demented actor, John Wilkes Booth…' Vera Brown Holmes : *A History of the Americas*, Vol. 2 [New York, 1964], p. 185.

১০। 'Under the leadership of Dr. Martin Luther King, Jr. the Negroes of Birmingham had decided at last to stand up for their rights. They organized freedom parades and demonstrations to demand the desegregation of schools, restaurants and other facilities'. : I. E. Levine : *Young Man In The White House : John Fitzgerald Kennedy* [New York, 1965], p. 177.

১১। ১৯৬৩ সালের ২২শে নভেম্বর বেলা সাড়ে বারোটার সময় যুক্তরাষ্ট্রের Texas প্রদেশের Dallas-নামক স্থানে কেনেডি গুলিবিদ্ধ হন। নিকটবর্তী

Parkland Memorial Hospital-এ তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার আততায়ী Lee Harvey Oswald ধরা পড়ে। কিন্তু তাহাকেও বন্দী অবস্থায় এক ব্যক্তি [Jack Ruby] গুলি করিয়া হত্যা করে। ইহার ফলে কেনেডির হত্যারহস্য চিরদিনের মতই অনুদ্‌ঘাটিত রহিয়া যায়।

১২। Vera Brown Holmes: *A History of the Americas*, Vol. 2 [New York, 1964], p. 189.

১৩। 'ঋগ্বেদ রচনা কালের অনেক পর এই অংশ রচিত হইয়া ঋগ্বেদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের অন্য কোনও অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই, এই শব্দগুলি কোনও স্থলে শ্রেণীবিশেষ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ঋকের ভাষাও বৈদিকভাষা নহে। ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। জাতিবিভাগ প্রথা ঋগ্বেদের সময় প্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে এই কুপ্রথার একটী প্রমাণ সৃষ্টি করিবারজন্য এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।' রমেশচন্দ্র দত্ত [ -সম্পাদিত ]: 'ঋগ্বেদ সংহিতা': ১৫৭২ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

১৪। 'জাতি বলিতে শাস্ত্রানুসারে বুঝায় চতুর্বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র। মুখে আমরা এখনও বলি বটে 'চাতুর্বর্ণ্য' কিন্তু জাতির যে আর অন্ত নাই। ভারতের সেন্সাস দেখিয়া জানা গিয়াছে যে এদেশে তিন হাজারেরও অধিক জাতি আছে।' ক্ষিতিমোহন সেন: 'জাতিভেদ' [১৩৫৩], পৃ. ২০।

১৫। তদেব। পৃ. ২৫।

১৬। রাজা বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সঙ্কৃতি, কপি, পুরুকুৎস, সত্য, অনূহবান, ঋথু, আর্ষ্টিষেণ, অজমীঢ়, কক্ষীব, শিজয়, রথীতর, রুন্দ, বিষ্ণুবৃদ্ধ প্রভৃতি রাজারা ক্ষত্রিয়বংশজ হইয়াও তপস্যাবলে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন। 'বায়ুপুরাণ': অধ্যায় ৯১, শ্লোক ১১৫-১১৭।

১৭। ক্ষিতিমোহন সেন: 'জাতিভেদ' [ ১৩৫৩ ], পৃ. ৫৩।

১৮। 'Shudra trying to hear the Vedic texts shall have his ears filled with molten tin or lac; if he recites the Veda his tongue shall be cut off, and if he remembers it he shall be dismembered. If he assumes a position of equality with twice-born men, either in sitting, conversing, or going along

the road, he shall receive corporal punishment.' G. S. Ghurye : *Caste and Race in India*

১৯। ক্ষিতিমোহন সেন : 'জাতিভেদ' [ ১৩৫৩ ], পৃ. ৫৪।

২০। 'It is recorded that under the rule of the Marathas and Peshwas, the Mahārs and Māngs were not allowed within the gates of Poona after 3 p. m. and before 9 a. m. because before nine and after three their bodies cast too long a shadow, which falling on a member of the higher castes —especially Brahmin—defiles him.' G. S. Ghurye : *Caste and Racc in Indian*

২১। নীহাররঞ্জন রায় : 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', আদিপর্ব [ ১৩৫৬ ], পৃ. ২৫৮।

২২। ক্ষিতিমোহন সেন : 'জাতিভেদ' [ ১৩৫৩ ], পৃ. ৭।

২৩। 'I do regard Varnashrama as a healthy division of work based on birth. The present ideas of caste are a perversion of the original. There is no question with me of superiority or inferiority. It is purely a question of duty'. : M. K. Gandhi : *Young India*, 23-4-1925, P 145.

২৪। 'At present he deserves to be a Brahmin who has acquired the best knowledge and character, and an ignorant person is fit to be classed as a Shudra or with the servant class. This natural classification will hold good in future'. : Swami Dayananda : *Satyarth Prakash* [Eng. Tan.-1908], P. 135.

২৫। অনেকের ধারণা—যে-বল্লাল বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্তন করেন, তিনিই বৈদ্যজাতির মধ্যেও কৌলীন্য নিরূপিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বল্লাল নামে দুইজন রাজা ছিলেন—তাঁহাদের একজন বৈদ্যজাতীয়। 'গৌড়েশ্বর মহারাজ বল্লালসেনদেব ন্যূনাধিক ১০৪১ হইতে ১০৬৪ শকের মধ্যে কোন সময়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে এবং বৈদ্যরাজ বল্লাল তাহার বহু পরে ১২৬৪ হইতে ১৩০০ শকের মধ্যে বৈদ্যসমাজে কৌলীন্য-প্রথা প্রচারিত করিয়াছিলেন।' নগেন্দ্রনাথ বসু-সংকলিত 'বিশ্বকোষ', ৪র্থ ভাগ, পৃ. ৩৫১।

২৬। 'কুলপঞ্জিকার কিংবদন্তী অনুসারে সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন [ আনুমানিক ১১৫৮-৭৯ খ্রীঃ ] কর্তৃক বাংলার সমাজে কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু সেন আমলের কোনো গ্রন্থ বা তাম্রশাসনাদিতে কৌলীন্য প্রবর্তন বিষয়ক কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাই খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ কুলপঞ্জিকার সাক্ষ্যে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই।' দীনেশচন্দ্র সরকার : 'আদিশূরের কাহিনী', বিশ্বভারতী পত্রিকা

পৃ ১৩১।

২৭। দেবীবর-প্রতিষ্ঠিত ছত্রিশ মেলের নাম : ১. খড়দহ, ২. ফুলিয়া, ৩. বল্লভী, ৪. সর্বানন্দী, ৫. সুরাই, ৬. আচার্যশেখরী, ৭. পণ্ডিতরত্নী, ৮. বাঙ্গালপাশী, ৯. গোপালঘটকী, ১০. ছায়া-নরেন্দ্রী, ১১. বিজয়পণ্ডিতী, ১২. চাঁদাই, ১৩. মাধাই, ১৪. বিদ্যাধরী, ১৫. পরিহাল, ১৬. শ্রীরঙ্গভট্টি, ১৭. মালাধরখানী, ১৮. কাকুৎস্থী, ১৯. হরিমজুমদারী, ২০. শ্রীমন্তখানী, ২১. প্রমোদিনী, ২২. দশরথঘটকী, ২৩. শুভরাজখানী, ২৪. নড়িয়া, ২৫. রায়, ২৬. চট্টরাঘবী, ২৭. দেহাট্যা, ২৮. ছয়ী, ২৯. ভৈরবঘটকী, ৩০. আচম্বিতা, ৩১. ধরাধরী, ৩২. রাঘবঘোষালা, ৩৩. শুঙ্গসর্বানন্দী, ৩৪. সদানন্দখানী, ৩৫. চন্দ্রপতী, ৩৬. বালী।

২৮। ক্ষিতিমোহন সেন : 'জাতিভেদ' [ ১৩৫৩ ], পৃ. ২১৭-২১৮।

২৯। ধ্রুবানন্দ মিশ্র-ধৃত উদ্ভট কবিতা : লালমোহন বিদ্যানিধি-প্রণীত 'সম্বন্ধনির্ণয়' [ ১৩০৩ ], পৃ. ৫১৩।

৩০। বঙ্গদেশে মুসলমান শাসনকালে হিন্দুগণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা, প্রায়ই এক ধরনের দোষে সমাজচ্যুত হইতেন। ইহাকে বলা হইত যবনদোষ; তখন মুসলমান স্পর্শ করিলে বা মুসলমানের খাদ্যদ্রব্যের ঘ্রাণ লইলেও দোষ বলিয়া গণ্য হইত। ইহার উপর আবার গ্রামে গ্রামে মৌলভী ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের উপর ন্যস্ত ছিল সাধারণ বিচারের ক্ষমতা। পণ্ডিতগণ কাহারও উপর অপ্রসন্ন হইলেই তাহাকে সমাজচ্যুত ও পতিত হইতে হইত।

৩১। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত এই স্বল্পায়তন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বাঙলা ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে। গ্রন্থমধ্যে কৌলীন্য-প্রথার বীভৎস রূপটি চিত্রিত করিয়া লেখক তৎকালীন হিন্দুসমাজের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। প্রিয়বন্ধু নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশে লিখিত গ্রন্থের উপহার-পৃষ্ঠায় লেখক গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্যটি নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন : 'এই

উনবিংশ শতাব্দীর দিনে আজও এই সর্বনেশে ব্যাপার অবিকল সত্য ঘটিতেছে বলিয়াই ইহা প্রকাশের আবশ্যকতা আছে।'

৩২। 'রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে এক-একজন পুরুষ অসংখ্য বিবাহ করিতেন। অনেক সময় খাতায় শ্বশুরবাড়ির নাম লিখিয়া রাখিতেন। স্ত্রীদের চিনিতেনও না। ক্ষিতিমোহন সেন: 'জাতিভেদ' [ ১৩৫৩ ], পৃ. ১৭৯।

৩৩। তদেব। পৃ. ১৭৯।

৩৪। উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারপন্থী এই সকল লেখকের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্নের নাম এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটক [১৮৫৪] সেকালে বাঙলার শিক্ষিত সমাজে কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই নাটকটি সম্বন্ধে বাঙলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 'উনবিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইয়া আমরা এক দিক দিয়া যেমন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবের ফলটুকু লাভ করিয়াছিলাম, আবার আর এক দিক দিয়া তেমনই সুদীর্ঘকালব্যাপী কুসংস্কারের প্রতি অন্ধতার বিষক্রিয়ার ফল ভোগ করিতেছিলাম।...উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে কুলীনের বহুবিবাহ প্রথার উপর এই দুই দিক হইতেই আঘাত আসিয়াছিল, দুইটি আঘাতেরই শক্তি সমান ছিল। একদিকের আঘাতের তাডনায় রামনারায়ণ তাঁহার 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের রূপ দিয়াছিলেন, আর একদিকের আঘাতের ফলে সেদিন ইহার অভিনয় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজে বার বার অভিনন্দিত হইয়াছে'। সম্পাদিত 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' গ্রন্থের 'ভূমিকা' [ ১৯৫৯ ], পৃ. ১৩।

৩৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'সাম্য' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৩৬। 'Early Hindu governments seldom succeeded in securing settled peace even in the great central region of the country for any extended period of time; but matters became much worse when the flood of Muhammadan invasion came at the end of the twelfth century. When the nineteenth century dawned, India had scarcely known peace for six hundred years. Even under the best of the Mughals there was frequent fighting, and a good deal of injustice; under all other Muslim rulers there was prctically constant war and

frequent outbreaks of barbarity.' J. N. Farquhar: *Modern Religious Movements in India* [New York, 1915], p. 2.

৩৭। বিলাতে হেস্টিংসের বিচারকালে পার্লামেন্ট-সভায় মনীষী এডমণ্ড বার্ক হেস্টিংস-কৃত অপরাধ সম্বন্ধে যে ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার অংশবিশেষ এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে: 'The crimes of Mr. Hastings are crimes not only in themselves, but aggravated by being crimes of contumacy. They were crimes not against forms, but against those eternal laws of justice, which are our rule and our birthright. His offences are, not in formal, technical language, but in reality, in substance, and effect, high crimes and high misdemeanours.' *Burke's Speech at the Impeachment of Warren Hastings* [Calcutta, 1903], p. 10

৩৮। 'রাসায়নিক নীল আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে উদ্ভিজ্জ নীল দ্বারাই রঙের কার্য চলিত। বাংলাদেশের জমি এই নীল চাষের উপযোগী ছিল বলিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতেই এ দেশে ইংরেজ বণিকগণ বাঙ্গালী কৃষকদের সহায়তায় নীলের চাষে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা বাংলাদেশেব বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে কুঠি নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিল. কৃষক-দিগের জমি দাদন দিয়া তাহাদের সাহায্যেই নীল চাষ কবিয়া প্রভূত ধনশালী হইয়া উঠিল। ক্রমে ইহাদের লোভ বাড়িতে লাগিল এবং লাভেব পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য নানাভাবে কৃষকদিগের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল।' আশুতোষ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'নীলদর্পণ' [ ১৯৪২ ]: 'ভূমিকা', পৃ ৬।

৩৯। টেকচাঁদ ঠাকুর: 'আলালের ঘরের দুলাল' [১৩৪৭]. পৃ. ১৫০, ১৫২।

৪০। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে ছিল না তাহা নহে। ইংরাজ আমলের প্রথম দিকে এদেশে আগত অনেক সাহেবই দেশীয় লোকদের সহিত সুব্যবহার করিতেন। 'সে কালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন সদয় ছিলেন যে, শুনা গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের ছেলে-দিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি খাইতেন। তাঁহারা অন্যান্য আমলাদের বাসায়ও যাইয়া, কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিতেন।' রাজনারায়ণ বসু: 'সে কাল আর এ কাল' [১৩৬৩], পৃ. ৪-৫।

শুধু ইহাই নহে, সেকালের অনেক সাহেব আবার এদেশের লোকদের

উন্নতির জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল সদাশয় সাহেবের কথা দেশবাসী চিরদিনই কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। সেকালে রচিত একটি শ্লোকে তাঁহাদের প্রতি পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইয়াছে : 'হেয়ার্ কল্বিন্ পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা।/ পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥ কিন্তু সমাজের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের মতই ইঁহারা সাহেবকুলে সংখ্যাল্প।

৪১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রাজর্ষি'।

৪২। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কেবল সাধারণ দাবিদাওয়ার মধ্যেই এদেশে রাষ্ট্রচিন্তা সীমিত ছিল : 'The great problem which confronted the well-wishers of India in the first half of the nineteenth century was not autonomy for India but the bare recognition of the principles of justice and security of life and property for the citizens'. Bimanbehari Majumdar : *History of Political Thought*', Vol 1 [C. U., 1934], p. 20.

কিন্তু এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া লইল জাতীয়তাবোধ ও স্বাজাত্যগর্ব : 'শিক্ষিত বাঙ্গালী তখন মনে প্রাণে অপূর্ব্ব উন্মাদনা অনুভব করিতেছে। বাঙ্গালী সকল বিষয়েই যে ইংরেজের কাছে হীন নয় এবং সুযোগ সুবিধা পাইলে যে সে তাহাদের সমকক্ষ —ইহা প্রতিপন্ন করিতে যেন হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। এই উত্তেজনার প্রথম বাহ্য প্রকাশ হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে, যাহার মূলে ছিল নবগোপাল মিত্রের উৎসাহ, রাজনারায়ণ বসু, মনোমোহন বসু প্রভৃতির উত্তেজনা এবং জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ীর সর্ব্বাঙ্গীণ সহযোগিতা। হিন্দুমেলার জের টানিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হইল, এবং সেই কংগ্রেসকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় চেতনা ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইতে লাগিল।' সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড [ ৩য় সং ], পৃ. ১৮০।

৪৩। প্রসঙ্গতঃ দেরাদুনে সরকারী কর্মে রত মনীষী রাধানাথ শিকদারের সহিত H. Vansittart নামে উচ্চপদস্থ এক ইংরাজ রাজকর্মচারীর কলহের কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য : তখন ১৮৪৩ সাল। রাধানাথ দেরাদুনে সরকারী জরীপ-বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত। ঐ অঞ্চলের 'সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট' Vansittart সাহেবের কর্মচারীরা- জরীপ-বিভাগের কুলীদের জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া মালপত্র টানিবার কাজে খাটাইতে লাগিল। রাধানাথ কুলীদের উপর এইরূপ

যথেচ্ছাচার বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কিছু কিছু মালপত্র আটক করিয়া রাখিলেন। সাহেব তাহার ভৃত্যদের পাঠাইয়া মালগুলি খালাস করিয়া লইতে চাহিলেন। কিন্তু সাহেবের লিখিত আদেশ ছাড়া রাধানাথ তাহাতে রাজী হইলেন না। সাহেব তখন নিজেই উচ্চপদস্থ এক সামরিক কর্মচারীকে [Lt. Pattinson] সঙ্গে লইয়া জরীপ-অফিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পরবর্তী ঘটনাটি রাধানাথের নিজের লেখা হইতেই উদ্ধৃত হইল: "One of these gentlemen called out, 'who has detained my property ?' I answered : 'It has been detained by my orders.' He continued, 'what business had you to detain my property ?' I replied : 'just as much as you had in pressing and maltreating my people to convey your baggage ; and I intend to take legal measures.' He rejoined, 'I certainly gave orders to my people to procure coolies, but not to press private servants ; and I shall discharge the whole set of my burkundazes'. He now beckoned to Mr. Keelan [an officer of the Survey Department] and asked him to persuade me to give up the property. Mr. Keelan replied, 'but what security shall we have against the recurrance of the proceeding complained of ?' I then observed, 'there is no regulation authorizing the forcible seizure and employment of anybody'. Upon which the gentleman in question in a loud and authoritative tone said : 'Do you know who I am ?' At this moment, the other gentleman, who had hitherto remained silent, sprang forward and questioned me, 'who the devil are you ?' I answered, 'A man, and so are you.' *The Bengal Spectator*, Sept. 1, 1843, p 253.

৪৪। পশুমাংসভোজী ও ফলমূল-আহারী আদিম অসভ্য মানুষের সমাজে এক-একটি দলের সকলে মিলিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিত, সকলে মিলিয়া তাহা ভোগ করিত। কেহ কাহারও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া আরামে দিন কাটাইতে পারিত না। ইহার ফলে সকলেরই মূল্য ছিল সমান—বড়ও কেহ ছিল না,

ছোটও কেহ ছিল না। শ্রেণীহীন এই আদিম সমাজ অবশ্য বেশীকাল টি঺কিয়া থাকিতে পারে নাই। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেবল পশুমাংস ও ফলমূল আহরণ করিয়া সকলের প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হইল না। তখন আরম্ভ হইল কৃষিকার্য। কৃষিকার্য আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও আরম্ভ। সভ্যতাই বহন করিয়া আনিল মানবসমাজের দুরপনেয় অভিশাপ আর্থিক শ্রেণীভেদ—ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য।

৪৫। ইহা ছাড়া 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী' বলিয়া অপর এক শ্রেণীর নাম করা যায়। যাঁহাদের আর্থিক সঙ্গতি মধ্যম—অর্থাৎ যাঁহারা প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক নহেন, আবার নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের পীড়নও যাঁহাদের সহ্য করিতে হয় না, তাঁহারাই মধ্যবিত্ত। তাঁহারা পরশ্রমজীবী নহেন, পরিশ্রম তাঁহারা করেন। তবে সে পরিশ্রম ঠিক কায়িক নয়—মস্তিষ্কের। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি ও মনোধর্মের বিকাশের পথে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে।

৪৬। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সমাজে ধনী ও দরিদ্র উভয় শ্রেণীর লোকই বর্তমান ছিল। বৌদ্ধযুগের সাহিত্য পাঠ করিলে জানা যায়—সেযুগে যেমন একদিকে রত্নাকর শেঠ ও সামন্ত জয়সেনের দল ভিড় জমাইত, অন্যদিকে আবার তেমনই ভিক্ষুণী সুপ্রিয়ারও দর্শন মিলিত। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যেও এইরূপ ধনী-দরিদ্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। বণিকশ্রেষ্ঠ চাঁদসদাগর ও ধনপতির ঐশ্বর্যের পাশেই চিত্রিত হইয়াছে 'ভেরেণ্ডার খাম' ও 'তালপাতার ছাউনি' দেওয়া কুঁড়েঘরের অধিবাসী ব্যাধ-দম্পতি কালকেতু ও ফুল্লরার দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের চিত্র। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সেকালের ভারতবর্ষে কেবল দরিদ্র হইলেই সামাজিক অবহেলা কুড়াইতে হইত না। ভারতীয় সমাজের একটি বড় আদর্শ ছিল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। Plain living and high thinking—এই নীতিটি সেকালে অনেকের জীবনেই অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইত। সমাজে ধনী-দরিদ্র উভয় শ্রেণীর লোক থাকিলেও বিত্তবান ব্যক্তির নিকট চিত্তবান ব্যক্তি সর্বদাই শ্রদ্ধা লাভ করিতেন। বিত্ত হইতে চিত্ত বড়—ইহাই ছিল ভারতের মর্মবাণী।

৪৭। 'In the traditional land system of India before British rule the land belonged to the peasantry, and the Government received a portion of the produce, which under

the Hindu Kings varied from one-sixth to one-twelfth of the produce and under the Mogul Emperors was raised to one-third.' R. Palme Dutt: *India Today and Tomorrow* [Delhi, 1955.], p. 78.

৪৮। 'প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে জমীদার ছিল না। প্রজারা ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইত,···মুসলমানদিগের সময় প্রথম জমীদারের সৃষ্টি।···তাঁহারা [মুসলমান শাসকগণ] পরগণায় পরগণায় এক এক ব্যক্তিকে কর-সংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। তাহারা একপ্রকার করসংগ্রহের কণ্ট্রাক্‌টর হইল। "রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতেই জমীদারীর সৃষ্টি, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের সৃষ্টি, এই কণ্টাক্‌টরেরাই জমীদার।' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: 'বঙ্গদেশের কৃষক'।

৪৯। 'The revenue farmers—a wealthy class who then stood forth as the visible government to the common people—being unable to realize the land-tax, were stripped of their office, their persons imprisoned, and their lands, the sole dependence of their families, re-let.': W. W. Hunter: *The Annals of Rural Bengal*

৫০। প্রথমে কেবল বাঙলা, বিহার ও ওড়িশায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রচলিত হয়, পরে মাদ্রাজের উত্তর অঞ্চলেও ইহা প্রসারিত হইয়া থাকে। সমসাময়িক কালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে 'স্বল্পমেয়াদী জমিদারী প্রথা' এবং 'রায়তওয়ারি প্রথা'র প্রচলন হয়।

৫১। 'প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, কেবল খাজানা বাকির জন্য হয়, এমত নহে। যে সে কারণে হয়। আজি গোপাল মণ্ডল গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া নালিশ করিয়াছে যে, 'পরাণ আমাকে লইয়া খায় না'—তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আসিল। আজি নেপাল মণ্ডল ঐরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া নালিশ করিল যে, 'পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে প্রসক্তি করিয়াছে'—অমনি পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। আজি সম্বাদ আসিল, পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতী হইয়াছে—অমনি পরাণকে ধরিতে ছুটিল। আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য

দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল।' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: 'বঙ্গদেশের কৃষক'। পৃ. ৩৭৫।

৫২। 'বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছু অধিক নহে। তাহা হইতে প্রথমতঃ চাষের খরচ কুলাইতে হয়। তাহা অল্প নহে। বীজের মূল্য পোষাইতে হইবে, কৃষাণের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে; এ প্রকার অন্যান্য খরচও আছে। তাহা বাদে যাহা থাকে, তাহা প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্ষাকালে ধার করিয়া খাইয়াছে, মহাজনকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। কেবল পরিশোধ নহে, দেড়ী সুদ দিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে দুই বিশ ধান লইয়াছে বলিয়া, পৌষ মাসে তিন বিশ দিতে হইবে। যাহা রহিল—তাহা অল্প। তাহা হইতে জমীদারকে খাজানা দিতে হইবে। তাহা দিল। পরে যাহা বাকি রহিল—অল্পাবশিষ্ট, অল্প খুদের খুদ, চর্ব্বিত ইক্ষুর রস, শুষ্ক পল্বলের মৃত্তিকাগত বারি—তাহাতে অতি কষ্টে দিনপাত হইতে পারে, অথবা দিনপাত হইতে পারে না।' তদেব। পৃ. ৩৭৩।

৫৩। 'Egyptian mummies dating from 2000 B. C. have been found wrapped in Indian muslin of the finest quality. Rome consumed Indian manufactures on a large scale and the Dacca muslins were known to the Greeks as the Gangetika'. G. B. Jathar & S. G. Beri: *Indian Economics*, Vol. 1 [London, 1949], p. 109.

৫৪। 'India in the eighteenth century was a great manufacturing as well as a great agricultural country, and the products of the Indian loom supplied the markets of Aisa and of Europe.

It is, unfortunately, true that the East Indian Company and the British Parliament, following the selfish commercial policy of a hundred years ago, discouraged Indian manufacturers in the early years of British rule in order to encourage the rising manufactures of England. Their fixed policy, pursued during the last decades of the eighteenth century and the first decades of the nineteenth, was to make India sub-

servient to the industries of Great Britain, and to make the Indian people grow raw produce only, in order to supply material for the looms and manufactories of Great Britain. This policy was pursued with unwavering resolution and with fatal success; orders were sent out, to force Indian artisans to work in the company's factories; commercial residents were legally vested with extensive powers over villages and communities of Indian weavers; prohibitive tariffs excluded Indian silk and cotton goods from England; English goods were admitted into India free of duty or on payment of a nominal duty.' Romesh Dutt: '*The Economic History of India.*

৫৫। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য'

৫৬। প্রথমে বোম্বাই, কানপুর ও হুগলী নদীর তীরে তীরে কয়েকটি কলকারখানা স্থাপিত হইল। বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প, শর্করাশিল্প প্রভৃতি কয়েকটি শিল্পের প্রসার ঘটিল। এই সব শিল্পে কেবল ব্রিটিশ শিল্পপতিরাই মূলধন [capital] বিনিয়োগ করিতেন। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরে জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষে শিল্পায়নের বিশেষ প্রবণতা দেখা দেয়। ব্রিটিশ মূলধনের পাশে ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগ আরম্ভ হয়। ক্রমে ভারতীয় শিল্পপতিরা বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে থাকেন।

৫৭। এই প্রসঙ্গে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা হইতে ১৮৩৩ সালের ১০ই মে তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এ উদ্ধৃত রসিককৃষ্ণ মল্লিকের মন্তব্য স্মরণীয়: 'The permanent settlement in Bengal, though perhaps concocted and set to work with the best motives imaginable, has, in consequence of glaring defects in the judicial system, betrayed an utter neglect of the rights of the humble classes The Govt. limiting its own demand to a certain fixed ratio, the Zemindars are rendered secure against any further encroachment upon their profits; while the poor labourer is still left

*in a precarious position with regard to his rights, which are* wholly dependant upon the arbitrary will of his superior.'

৫৮। মনীষী কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার পরিচালিত 'সুলভ সমাচার' নামক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন : '...বাস্তবিক বড় মানুষ কাহারা ?...এদেশের ছোট লোকেরা। তাহারা না থাকিলে কার বা ভাত জুটিত, কে বা গাড়ী চড়িয়া ঘোড়দৌড় দেখিতে যাইত, আর কেই বা তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিত। দেখ সামান্য লোকেরা আমাদের সর্বস্ব দিতেছে। তাহাদের ধনে আমরা বড়মানুষী করিতেছি'। 'বড় লোক' : 'সুলভ সমাচার', ১ম খণ্ড, ৪০ সংখ্যা, ৩১শে শ্রাবণ, ১২৭৮ সাল, পৃ. ১৫৯।

৫৯। '...from the very earliest twilight of human society, every woman [owing to the value attached to her by men, combined with her inferiority in muscular strength] was found in a state of bondage to some man. Laws and systems of polity always begin by recognising the relations they find already existing between individuals. They convert what was a mere physical fact into a legal right, give it the sanction of society, and principally aim at the substitution of public and organised means of asserting and protecting these rights, instead of the irregular and lawless conflict of physical strength. Those who had already been compelled to obedience became in this manner legally bound to it.' : John Stuart Mill : *The Subjection of Women*

৬০। 'All women are brought up from the very earliest years in the belief that their ideal of character is the very opposite to that of men ; not self-will, and government by self-control, but submission, and yielding to the control of others.'—Ibid, p. 16.

৬১। হিন্দুর বিবাহমন্ত্র বলিতেছে : 'যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব'।

৬২। J. S. Mill : *The Subjection of women* [Cambridge,

৬৩। মহাকবি কালিদাস-রচিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে কণ্বমুনি পতিগৃহগামিনী শকুন্তলাকে উপদেশ দিতেছেন :

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিনীপদং যুবতয়ো বামা কুলস্যাধয়ঃ॥

['তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে; সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার করিবে; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে; সৌভাগ্যগর্বে গর্বিত হইবে না; স্বামী কার্কশ্য-প্রদর্শন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না; মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়; বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপ'।] : বিদ্যাসাগর-কৃত বঙ্গানুবাদ।

৬৪। কেবল প্রাচীন সমাজই বা কেন, একালের সমাজেও পতি-পত্নীর মধ্যে বহুক্ষেত্রেই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক প্রাধান্য লাভ করিতে দেখা যায়। পরম দেবতার আসনে নিজেদের নিশ্চিত অধিষ্ঠান ধরিয়া লইয়া আত্মপ্রসাদমুগ্ধ পতিরা পত্নীদের সেবা আদায় করিবার জন্য এযুগেও কম চেষ্টা করেন না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে : 'আমাদের একমাত্র অবাধ অধিকারের ক্ষেত্র আমাদের স্ত্রী। সেখানে আমাদের যোগ্যতার কোনো নিশানা দাখিল করতে হয় না। সেখানে আমরা দেবতা, তাই স্ত্রী নামক লাখেরাজ স্বর্গের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সীমানা সম্বন্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ সংশয় বাধলে আমাদের সস্তা দেবত্ব ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আমরা মন্ত্র পড়ে নিজের মূর্তি স্থাপন করে স্ত্রীকে আমাদের দেবত্র সম্পত্তি করে বসে আছি'। 'সমাজ'।

৬৫। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'নারীর মূল্য'।

৬৬। কিন্তু সতীদাহের পিছনে একটি অর্থনৈতিক কারণও ছিল বলিয়া মনে হয়। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে তাহার বিধবা স্ত্রীকে বঞ্চিত করিবার একটা নির্মম কৌশল বলিয়াও ইহাকে ধরিয়া লওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অভিমত প্রণিধানযোগ্য : '...the Bengal School of Hindu law called Dayabhaga of Jimutavahana gives a widow's right in the form of life-interest to the widow of a sonless person. Further, this right

can be sold out by the widow in lieu of cost of maintenance, pilgrimages, etc. Hence, the legal provision was gall and worm wood to the reversiones of the deceased person. A way must be found out to avoid the effects of the unpleasant law. The priesthood must find a solution to it. Hence, the great Nibandha-writer Raghunandan was requisitioned to find out a solution. He ransacked the scriptural texts but did not find any answer to his query. The nibandhakar Paithinasi and Apararka of the latter middle ages have sanctioned it. But the Smritis and the Srutis are silent about the custom. As no Hindu will abide by the decision of the nibandhakaras, hence Raghunandan had to forge the Rig-vedic sentence which says, 'All those women, well-dressed ascend the room in front of them.' But he forged it as, 'enter the fireroom' i. e., the pyre; [Vide Suddhitattva]. Thus a way was found to get rid of unpleasant widows !' Bhupendranath Datta: *Swami Vivekananda Patriot-Prophet—a study* [Calcutta, 1954], p 39.

৬৭। অবশ্য আহারাদিতে বিশেষভাবে সংযমের ব্যবস্থা করিয়া বিধবা নারীর জৈব বুভুক্ষাকে অবদমিত করিয়া রাখার দিকেও শাস্ত্রকারদের লক্ষ্য ছিল। বিধবার এইরূপ সংযত জীবনযাত্রায় সামাজিক দুর্নীতির আশংকা অনেকটা কমিয়া যাইত।

৬৮। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: 'নারীর মূল্য'।

৬৯। 'স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত।' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: 'সাম্য'।

৭০। তদেব।

৭১। ক্ষিতিমোহন সেন: 'জাতিভেদ' [ ১৩৫৩ ], পৃ. ১২২-১২৩।

৭২। তদেব। পৃ. ১২৩।

৭৩। এই প্রসঙ্গে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারক একজন বিদেশীর নামও

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি জন্ এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮৪৯ সালে বেথুন বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় বাঙালী মেয়েদের উচ্চশিক্ষালাভের পথ প্রশস্ত হইয়া যায়।

৭৪। নীহাররঞ্জন রায়ঃ 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', আদি পর্ব [ ১৩৫৬ ], পৃ. ৬১০।

৭৫। তদেব। পৃ. ৫২৮।

৭৬। '…বখ্‌ত্‌-ইয়ার হঠাৎ একদিন হিসার-ই-বিহার বা বিহার-দুর্গ আক্রমণ এবং অধিকার করিয়া বসিলেন এবং তাহার অধিবাসীদের প্রায় সকলকেই হত্যা করিলেন, প্রচুর ধনরত্ন লুটিয়া লইলেন এবং প্রচুর গ্রন্থ পোড়াইলেন [১১৯৯]। বস্তুত, যে দুর্গ-নগরটি তিনি অধিকার করিলেন তাহা দুর্গই নয়, এক বিরাট বৌদ্ধ-বিহার, এবং এই বিহারই প্রখ্যাত ঔদণ্ড্ বা ওদণ্ডপুর বিহার; যে-অধিবাসীদের তিনি হত্যা করিলেন তাঁহারা সকলেই মুণ্ডিতশির বৌদ্ধ ভিক্ষু।' তদেব। পৃ. ৫০৮।

৭৭। অবশ্য মুঘল আমলে কিছুকালের জন্য বাঙলায় বারো ভুঁইয়ার রাজত্ব চলিয়াছিল। ভুঁইয়াগণ স্বাধীনভাবেই বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি কয়েকজন হিন্দু রাজাও ছিলেন।

৭৮। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ২য় খণ্ড

৭৯। তদেব। পৃ. ২৮।

৮০। 'যাহারা দুই এক পুরুষ পূর্বে হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল, তাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ* করিয়াই যে রাতারাতি কোরাণ-হাদিস পাঠ করিয়া খাঁটি মুসলমান বনিয়া গেল তাহা মনে হয় না। তাহাদের বাহিরের ধর্ম পাল্টাইলেও অন্তরে বীজাকারে হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ভগ্নাবশেষ বজায় ছিল।…ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজও আচারে বিচারে, ধর্মমতে, বিশ্বাসে কিছু কিছু হিন্দুয়ানী মানিয়া চলিত—মুসলমান শ্রোতাও ভক্তিভরে রামায়ণ-মহাভারত শুনিত।' তদেব,

৮১। 'গত দুর্গোৎসবে হিন্দুরা সপ্তমী পূজা দিবসে প্রাতঃকালে নবপত্রিকা স্নান করাইতে গঙ্গাতীরে আনিয়াছিল পরে স্নান করাইয়া বাদ্যাদি সমেত বাটী যাইতেছিল যখন তাহারা চক চাঁদনীতে পঁহুছিল তখন অনেক মুসলমান

সেস্থানে একত্র হইয়া তাহারদিগের সহিত কলহ করিল ও তাহারদিগের মারিপীট করিল এবং ঢোলপ্রভৃতি সকল ভাঙ্গিল ও নবপত্রিকার কলার গাছ কাটিল তখন হিন্দু লোকেরা থানাতে সমাচার দিলে সেখানকার বরকন্দাজ আসিয়া যত২ মুসলমানেরদিগকে পাইল সে সকলকে বাঁধিয়া পুলিসে চালান করিল। সেখানকার বিচারে অপরাধ বিশেষে কাহারো তিন মাস কাহারো পাঁচ মাস মেয়াদে কয়েদের আজ্ঞা হইল এবং সংভ্রান্ত মুসলমান যে যে ছিল তাহারদিগের ভারি জরিপানা হইল···।' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত ও সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড [১৩৪৪], পৃ. ১৯১।

৮২। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বে পূর্ববঙ্গের ভাওয়াল অঞ্চলে নাগরী গ্রামে পর্তুগীজ মিশনারীগণ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তববুদ্ধির অভাবে তাঁহাদের ধর্মপ্রচার-প্রচেষ্টা মূলতঃ ব্যর্থ হইয়া যায়। তাঁহারা রোমান হরফে যে-সব প্রচারপুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় চতুর্থ দশকের ইংরাজী-অক্ষরজ্ঞান-বর্জিত বাঙালী জনসাধারণের নিকট তাহা নিতান্তই দুর্বোধ্য ছিল। ইহার ফলে এদেশের লোকেরা তাঁহাদের কথা জানিতে ও বুঝিতে সুযোগ পায় নাই। অবশ্য পর্তুগীজ মিশনারীরা কথ্য বাঙলা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না, এবং নাগরী গ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কৃষকসম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। এই কৃষকদের মধ্যেই তাঁহারা যাহা কিছু প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন।

৮৩। মধ্যযুগে মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণ যেরূপ রাজশক্তির সহায়তা লাভ করিতেন, উনিশ শতকের খ্রীষ্টান মিশনারীরা সেইরূপ কোনো সহায়তা বা সমর্থন পান নাই। তৎকালীন বাঙলার ভাগ্যবিধাতা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা ধর্মপ্রাণ মিশনারীদের সুনজরে দেখিতেন না। তাঁহাদের প্রতিকূলতার জন্যই মিশনারীগণ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া দিনেমার কেন্দ্র শ্রীরামপুরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন।

৮৪। রামমোহন-গ্রন্থাবলী, ৫ম খণ্ড [১৩৫৮], পৃ. ৩।

৮৫। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা

৮৬। তদেব।

৮৭। প্রথমে প্রগতিবাদী রামমোহন ও ভবানীচরণ-প্রমুখ রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ মিলিতভাবে তাঁহাদের প্রকাশিত সাময়িক পত্রে মিশনারীদের আক্রমণ প্রতিহত

করিতেছিলেন, পরে রক্ষণশীল দল রামমোহনের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করিলেন এবং একই সঙ্গে মিশনারীদের হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষ ও রামমোহনের প্রচলিত-সংস্কার-বিরোধী বৈদান্তিক একেশ্বরবাদের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।

৮৮। 'Equality···means first of all the absence of special privilege.' Harold J. Laski : *A Grammar of Politics* [London, 1941], p. 153.

৮৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'সাম্য'।

৯০। বৈষম্য ও সাম্য উভয়ই প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির অনন্ত লীলায় বৈষম্যের পাশেই সাম্যের চিরন্তন রূপ ফুটিয়া উঠে।

৯১। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় :

৯২। 'মহান্তং পুরুষম্—মহান পুরুষকে, মহৎ সত্যকে, যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা আর তো দরজা বন্ধ করে থাকতে পারেন না। এক মুহূর্তেই তাঁরা একেবার বিশ্বলোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ান ; নিত্যকাল তাঁদের কণ্ঠকে আশ্রয় করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন ; দিব্যধামকে তাঁরা তাঁদের চারিদিকেই প্রসারিত দেখেন ; আর, যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত করেন—সে মূর্খই হোক আর পণ্ডিতই হোক, সে রাজচক্রবর্তী হোক আর দীন দরিদ্রই হোক—অমৃতের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'নবযুগের উৎসব' : 'শান্তিনিকেতন'।

৯৩। বাঙলার অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত বাউলও তাহার একতারাটির সুর চড়াইয়া গান ধরে : 'জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তার অবতার'।

৯৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'সাম্য'।

৯৫। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : 'মুক্তি' : 'জিজ্ঞাসা' : রামেন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড [ ১৩৫৬ ], পৃ. ৩৭৯-৩৮০।

৯৬। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কেবল শূন্যতাকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্মসাধনার পন্থা তাহাকে পরবর্তী কালে 'হীনযান' বলা হইয়াছে ; কারণ ইহাতে বিশ্ববিমুখ একটা হীন আত্মকেন্দ্রিকতাই স্থান পাইয়াছে। হীনযানের বিরুদ্ধ যে মতবাদ তাহাকে বলা হয় 'মহাযান'। মহাযান-বৌদ্ধধর্মের মূল কথা এই যে, কেবল শূন্যতাকে আশ্রয় করিলে চলিবে না—শূন্যতার সহিত করুণার অভেদে মিলন প্রয়োজন। মহাযানী বৌদ্ধগণ শূন্যবাদকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়াও

বলিতে চাহেন যে, শূন্যতাকে অবলম্বন করিয়া নির্বাণলাভের যোগ্য হইলেও নির্বাণকে উপেক্ষা করিয়া অবিদ্যামুক্ত চিত্তে দুঃখপীড়িত প্রাণিগণের হিতে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। ইহাই ধর্মসাধনার মহান্ পন্থা—ইহাই মহাযান্।

৯৭। ক্ষিতিমোহন সেন: 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা'

৯৮। 'সুফী' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। কিন্তু আরবী 'সুফ্' অর্থাৎ পশম হইতে 'সুফী' নাম হইয়াছে বলিয়া যে মতটি আছে, তাহাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয়। '…the word…can be traced with greater certainty to Suf, wool, inasmuch as we know that in the early davs of Islam, woolen garments were frequently worn by ascetics, not only as their distinctive garb, but also as a symbol of their voluntary poverty, and renun-citaion of the world and all its pleaeures.': Bishop John A. Subhan: *Sufism—Its Saints and Shrines* [Lucknow, 1960], p. 7.

৯৯। 'It is asserted by Muslims that Sūfism had its rise in Muhammad himself,…He is said to have been the recipient of a two-fold revelation, the one embodied in the contents of the Quran, the other within his heart. The former was meant for all and is binding on all; the latter was to be transmitted to the chosen few…'. Ibid, p. 7.

১০০। "সুফীদের মধ্যে 'ফনা' হইল সাধনার অতি গভীর কথা। 'ফনা' হইল জীবন্তে মরণ বা অহম্‌কে লোপ করিয়া দেওয়া।…সাধনার জগতে 'গরীবী' হইল জগতের সর্ববস্তু হইতে বিমুখ হইয়া সম্পূর্ণ অহম্ বিলোপ করিয়া সেই পূর্ণ একেকে দেখা। এই সাধনার দ্বারা সাধক নিত্যজীবনের পূর্ণতা লাভ করে। তখন তাহার অহমিকা-আচ্ছাদিত জীবধর্ম বিলীন হইয়া যায় এবং ভগবানের কৃপায় ভগবদ্‌ভাবে সে পূর্ণ হইয়া উঠে। তখন তাহার সকল স্বত্ব ও সম্বন্ধের অবসান হইয়া যায়। ইহাই হইল 'ফনা'।" ক্ষিতিমোহন সেন: 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা'

১০১। বিখ্যাত সুফী কবি শেখ সাদীর রচনায় ঈশ্বরের সর্বময়তার কথা:

উল্লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার রচিত 'বুস্তাঁ' কাব্যগ্রন্থের একটি অংশের ইংরাজী অনূদিত রূপ এখানে দেওয়া হইল:

'The way of reasoning is nothing but a maze ;

In the opinion of the gnostics there is nothing else but God.

All that is, is less than He ;

For by His being, they bear the name of being.'

Bishop John A. Subhan : '*Sufism—Its Saints aud Shrines*'

১০২। ক্ষিতিমোহন সেন: 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা'

১০৩। 'As no one can become a Sufi without the help of a *pir* so it has been the custom among the Hindus from time immemorial that a person desirous of leading a religious life must seek a *guru* for himself.' Bishop John A. Subhan: *Sufism—Its Saints and Shrines*

১০৪। Similarity between the Sufi conception of God and Hindu teaching about Brahman is very striking. It not only exists in the general trend of the pantheistic thought in both but also,···in some of the exposition of their respective doctrines.'—Ibid, p 143.

১০৫। '···Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you.' *The Gospel according to St. Mathew* [In 'The Holy Bible'—Chicago II, Illinois, The Gideons International,

১০৬। '···whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.' : Ibid, p. 853.

১০৭। 'যে সময়ে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়, তখন ইউরোপ ও পশ্চিম আসিয়া রোমক-রাজ্যভুক্ত।···রোমকসাম্রাজ্যে চিরদাসত্বজনিত বৈষম্য সাংঘাতিক

রোগস্বরূপ প্রবেশ করিয়াছিল। এক এক ব্যক্তির সহস্র সহস্র চিরদাস থাকিত।···তাহারা গোরু-বাছুরের ন্যায় ক্রীতবিক্রীত হইত। গোরুবাছুরের উপর প্রভুর যেরূপ অধিকার, দাসের উপর সেইরূপ অধিকার ছিল। প্রভু মারিলে মারিতে পারিতেন, কাটিলে কাটিতে পারিতেন, বধ করিলেও দণ্ডনীয় হইতেন না।···রোমকসাম্রাজ্যের লোক দুই ভাগে বিভক্ত—প্রভু এবং দাস। এক ভাগ অনন্ত ভোগাসক্ত—আর এক ভাগ অনন্ত দুর্দশাপন্ন।

'এই সময় খ্রীষ্টধর্ম্ম রোমকসাম্রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। খ্রীষ্টের উচ্চারিত মহতী বাণী লোকের মর্ম্মভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি বলিয়াছিলেন, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। সকল মনুষ্যই ঈশ্বরসমক্ষে তুল্য।··· তিনি বলিয়াছিলেন, ইহলোকে আমার রাজত্ব নহে—ঐহিক সুখ সুখ নহে—ঐহিক প্রাধান্য, প্রাধান্য নহে।···

'এই সকল তত্ত্ব ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তি বলিয়া পরিগৃহীত হইতে লাগিল, দাসের বন্ধনশৃঙ্খল মোচন হইতে লাগিল। ভোগাভিলাষী ভোগাভিলাষ ত্যাগ করিতে লাগিল।' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ 'সাম্য'।

১০৮। নগেন্দ্রনাথ বসু-সংকলিত 'বিশ্বকোষ'-১২ [১৩০৮], পৃ. ২০৮।

১০৯। প্রণবরঞ্জন ঘোষ: 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য'

## দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের রথচক্র ছুটিয়া চলে অতীত হইতে ভাবীকালের দিকে। ভালো-মন্দ অভিজ্ঞতার পাথেয় কুড়াইয়া রথ যতই সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ইহার পিছনে-ফেলিয়া-আসা মৃত্তিকা-বৈচিত্র্যের ছাপ ফুটিয়া উঠে আগামীকালের নানা ঘটনায়, আগামীদিনের মানবমনীষার বিচিত্র চিন্তা ও কল্পনায়। আর, কেবল ইহাই নহে, রথের সম্মুখে প্রসারিত অন্তহীন পথের উপর একদা যে চক্র-চিহ্ন অঙ্কিত হইবে তাহারও একটা ক্ষীণ অভাস পাওয়া যায় অতীত ও বর্তমানের পথের দিকে তাকাইলে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত—একটি হইতে অপরটিকে পৃথক করিয়া দেখিবার উপায় নাই। কাজেই কোনো একটি জাতির ইতিহাসে কোনো একটি ঘটনা বা কোনো বিশেষ ধ্যানধারণাকে বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক বলিয়া ধরা যায় না। প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক মননকর্মের সহিত পূর্বাপর একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মানসলোকে যে সাম্যবোধের প্রসার লক্ষিত হয়, তাহাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই—তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে সাম্যধর্মী ভাব-কল্পনা ও কর্মকাণ্ডের ইতিহাস, তাহার সম্মুখে পরিস্ফুট হইতেছে শ্রেণীহীন সাম্যাদর্শী মানবসমাজের প্রত্যাশা।

উনিশ শতকের বাঙালীর এই সাম্যচিন্তার ভূমিকা রচিত হইয়াছে ঐ শতকের পূর্ববর্তী কয়েক শতক ধরিয়া—কয়েক হাজার বছর ধরিয়া। ঐ সময়কার বাঙালীর দেহগঠন, ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মকর্মের হিসাব লইলে দেখা যায় যে, সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বিপরীতধর্মী অথবা পরিচিত ও অপরিচিত কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় বা সামঞ্জস্য বিধানের একটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রয়াস প্রায় সর্বদাই অব্যাহত রহিয়াছে।

এই যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য, ইহাকে ঠিক সাম্য বলিয়া চিহ্নিত করিতে না পারিলেও একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইহারই মধ্যে একটি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট রেখায় সাম্যদেবতার চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে—পরবর্তী কালে অনুকূল জলবায়ুতে তাহাই ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালীর রক্তে, বাঙালীর ভাষা সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে, বাঙালীর ধর্মকর্ম ও দেবদেবী-পরিকল্পনায় এমন একটা সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হইতেছে, যাহা তাহার সমাজ ও সাহিত্যে সাম্যচিন্তার ফসল ফলাইবার দাবি রাখে।

বাঙালী প্রকৃতপক্ষে একটি মিশ্র জাতি। 'বিচিত্র' জীবনধারার রাসায়নিক সংমিশ্রণে' বাঙালী জাতির উৎপত্তি। নৃতত্ত্ববিদ্‌-ও ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ বিস্তর গবেষণা করিয়া বাঙালী জাতির এই মিশ্র সত্তার বহু উপাদান আবিষ্কার করিয়াছেন—বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ দিয়া তাঁহারা দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, বর্তমান বাঙালী জাতি পূর্বতন নানা বিচিত্র নরগোষ্ঠীর এক সমন্বিত রূপ। কিন্তু এই সব নরগোষ্ঠীর অধিকাংশেরই পরিচয় বিলীন হইয়া রহিয়াছে ছায়াধূসর প্রাগৈতিহাসিক কালে। কাজেই বহুক্ষেত্রেই ইতিহাস-সুলভ পাথুরে প্রমাণের অভাবে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রায়ই পরস্পরবিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় আমরা সেই সকল বিরোধ-বিতর্ক এড়াইয়া বাঙালী জাতির মধ্যে নরসাংকর্যের একটা মোটামুটি পরিচয় লইতে চেষ্টা করিব।

বাঙালীর দেহগঠনে বিভিন্ন মানবধারার প্রভাব বর্ণনা করিতে হইলে ভারতীয় জনতত্ত্বের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। কারণ উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন নরগোষ্ঠীই কালক্রমে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল—কখনও স্বতন্ত্রভাবে, কখনও অন্য নরগোষ্ঠীর সহিত মিশ্রিত হইয়া মিশ্র সত্তা লইয়া।

ভারতের এই সব নরগোষ্ঠীর কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জনের কথা। নৃতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতদের ধারণা, ভারতীয় জনসৌধের প্রথম স্তরই এই নেগ্রিটো জন। কিন্তু তাহাদের দেহবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই, বহুকাল পূর্বেই ভারতবর্ষের মাটিতে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার ফলে তাহাদের সম্বন্ধে এইটুকুমাত্র অনুমান করা যায় যে তাহারা ছিল ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণাভ ঘনশ্যাম, ঊর্ণাবৎ কেশযুক্ত ও দীর্ঘমুণ্ড। 'বাংলার পশ্চিম প্রান্তে রাজমহল পাহাড়ের বাগ্‌দীদের মধ্যে, সুন্দরবনের মৎস্যশিকারী নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে, মৈমনসিংহ ও নিম্নবঙ্গের কোনও কোনও স্থানে কচিৎ কখনও, বিশেষভাবে সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকদের ভিতর, যশোহর জেলার বাঁশফোড়দের মধ্যে মাঝে মাঝে যে কৃষ্ণাভ ঘনশ্যামবর্ণ, প্রায় ঊর্ণাবৎ কেশ, পুরু উল্টানো ঠোঁট, খর্বকায়, অতি চ্যাপ্টা নাকের লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তো নিগ্রোবটু রক্তেরই ফল বলিয়া মনে হয়।'[১]

বাঙলার নিম্নবর্ণের লোক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যে-জনের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী, নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাদের নাম দিয়াছেন আদি-অস্ট্রেলীয়

[Proto-Australoid]। নৃতত্ত্ববিদ্দের ধারণা, এই জন এক সময়ে মধ্যভারত হইতে সুদূর অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সব আদিবাসী আছে, তাহাদের অধিকাংশই এই নরগোষ্ঠীর লোক। আদি-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর লোকেরা সাধারণতঃ খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাস ও তাম্রকেশ। বাঙালীর দেহগঠনে ইহাদের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়।

আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর পরে একে একে তিনটি দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠী ভারতবর্ষের জনপ্রবাহ স্ফীত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় ধারার নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে আবার একটি বিশেষ জনপ্রবাহ গড়িয়া উঠে। অনুমান, এই জনপ্রবাহের পূর্বতন লোকেরাই বর্তমান দ্রাবিড়ভাষী লোকদের পূর্বপুরুষ। বাঙালী জাতির মধ্যে যে দ্রাবিড়-প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহা এই সমন্বিত জনেরই দান বলিতে হইবে।

দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠী যে জনপ্রবাহ সৃষ্টি করিল, তাহার সহিত উত্তর-পশ্চিম হইতে আগত এক গোলমুণ্ড নরগোষ্ঠীর ধারা আসিয়া মিলিত হইল। নৃতাত্ত্বিকগণ এই জনধারার নাম দিয়াছেন অ্যাল্পাইন [Alpine] নরগোষ্ঠী। ইহাদের অ্যাল্পো-দীনারীয় বা 'ব্র্যাকিড্' নরগোষ্ঠীও বলা হয়। এই নরগোষ্ঠীর লোকেরা সাধারণতঃ শ্বেতাঙ্গ, গোলমুণ্ড, উন্নতনাস ও দেহদৈর্ঘ্যে মধ্যমাকৃতি। ভারতবর্ষে ইহারা গুজরাট, কর্ণাট, কুর্গ, মহারাষ্ট্র, মধ্যভারত, বিহার ও বাঙলাদেশে ছড়াইয়া আছে। বাঙলাদেশে উচ্চবর্ণের লোকদের দেহবৈশিষ্ট্য অনেকাংশে এই নরগোষ্ঠীরই দান।

অ্যাল্পাইন জাতির পরে ভারতবর্ষে যে মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব হইল, তাহাদের নৃতত্ত্ববিদ্দত্ত নাম আদি-নর্ডিক [Proto-Nordic]। এই জনই ভারতবর্ষে 'বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টিকর্তা'। ইহারা ভারতের পূর্বতন সংস্কৃতির আমূল রূপান্তর সাধন করিয়া সম্পূর্ণ নূতন এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিল। যতদূর জানা গিয়াছে, ইহাদের মুখাবয়ব ছিল দীর্ঘ, সুগঠিত ও সুদৃঢ়, নাসিকা সু-উন্নত ও সংকীর্ণ, মুণ্ডের আকার দীর্ঘ হইলেও গোলের দিকে প্রবণতা স্পষ্ট, দেহবর্ণ বাদামী অথবা রক্তিম গৌর। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের জনগণের মধ্যে ইহাদের ধারাচিহ্ন বর্তমান—যদিও তাহা সর্বত্র খুব স্পষ্ট নহে। বাঙালীর রক্তধারায় ও দেহবৈশিষ্ট্যে ইহাদের দান নিতান্তই অল্প। তাহা ছাড়া বাঙলা-দেশে যখন আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর প্রবাহ আসিয়া পৌছিল, তখন তাহার রক্ত-ধারার বিশুদ্ধতা বজায় ছিল না—ইতিমধ্যেই অন্য নরগোষ্ঠীর রক্তধারার সহিত তাহার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল।

বস্তুতঃ, বাঙলাদেশে কোনো নরগোষ্ঠীই অবিমিশ্র থাকিতে পারে নাই। নরতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যের এমন চমৎকার জৈব মিশ্রণ বাঙলাদেশ ছাড়া ভারতের আর কোথাও তেমন দেখা যায় না। বাঙলার কোনো বিশেষ বর্ণ বা কোনো বিশেষ স্থানের অধিবাসীদের একান্তভাবে স্বতন্ত্র বলিয়া চিহ্নিত করিবার উপায় নাই। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, বাঙলার জনসৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে প্রধান প্রধান চারিটি নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে। 'আদিমতম স্তরে আদি-অস্ট্রেলীয়, তারপর দীর্ঘমুণ্ড ভূমধ্য নরগোষ্ঠী, গোলমুণ্ড অ্যাল্‌পো-দীনারীয় নরগোষ্ঠী এবং সর্বশেষে উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশের মিশ্র আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর ক্ষীণ ধারা—এই কয়েকটি ধারার মিলনে বাঙালী জনের সৃষ্টি।'[২] অবশ্য পরবর্তী কালে বাঙালী জনের রক্তে আরও কিছু কিছু শীর্ণ ক্ষীণ রক্তধারার স্পর্শ লাগিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঙলার মাটিতে এইভাবেই জাতি-সমন্বয় চলিয়াছে—চলিতেছে।

জাতি-সমন্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতির ভাষাগুলিও সমন্বয়ধর্মিতা এড়াইতে পারে নাই। সুদূর অতীত কাল হইতে বাঙলাদেশে যেরূপ, সমগ্র ভারতেও সেইরূপ এই ভাষা-সমন্বয় অব্যাহত রহিয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদের গবেষণা অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, কোনো নরগোষ্ঠীর ভাষাই বেশীদিন বিশুদ্ধ থাকিতে পারে নাই—তাহার মধ্যে কালক্রমে অন্যান্য ভাষার শব্দ, পদরচনা ও ব্যাকরণরীতি ঢুকিয়া পড়িয়া এক সমন্বিত ভাষারূপ সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া প্রথমে আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠী-কথিত অস্ট্রিক ভাষা, তারপর দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর দ্রাবিড় ভাষা এবং পরে অ্যাল্‌পো-দীনারীয় গোষ্ঠীর ব্যবহৃত বেদবহির্ভূত একপ্রকার আর্যভাষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এক ভাষার প্রাধান্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে অপর ভাষার বিলুপ্তি ঘটে নাই। প্রত্যেকেই স্ব স্ব অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া পারস্পরিক লেনদেনের ভিত্তিতে নবকলেবর ধারণ করিয়াছে।

সর্বশেষে আসিল বৈদিক আর্যভাষার তল্পী লইয়া আদি-নর্ডিকেরা। ভারতবর্ষের ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহারা এক বিপ্লবের ঝড় বহাইয়া দিল। '...অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও বেদ-বহির্ভূত আর্য ভাষা-প্রবাহের উপর তরঙ্গের পর তরঙ্গে আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল বৈদিক আর্যভাষা-প্রবাহের প্রবল স্রোত! একদিনে নয়, দু-দশ বৎসরে নয়, শত শত বৎসর ধরিয়া এবং কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই ভাষা সমস্ত পূর্বতন ভাষা-প্রবাহকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের নবরূপ দান

করিয়া তাহাদের সংস্কৃতিকরণ সাধন করিয়া নিজের এক স্বতন্ত্র রূপ গড়িয়া তুলিল। তাহার ফলে যে সংস্কৃত ভাষার বিকাশ হইল তাহাতে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় শব্দ, পদরচনারীতি, ব্যাকরণ-পদ্ধতি সমস্তই কিছু কিছু ঢুকিয়া পড়িল।'[৩] বৈদিক আর্যভাষা তাহার মৌলিক বিশুদ্ধতা হারাইয়া সমন্বিত রূপ ধারণ করিল।

বাঙলাভাষা এই নবকলেবরপ্রাপ্ত আর্যভাষারই বংশধর। হিন্দী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, মারাঠী প্রভৃতি অন্যান্য নব্য ভারতীয়-আর্যভাষার মতই প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষা হইতে প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠের স্তর পার হইয়া বাঙলা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষাবিবর্তনের এই সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় কেবল সংস্কৃতে নহে, প্রাকৃতে এবং অপভ্রংশেও অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা হইতে অনেক শব্দ, পদ-রচনা ও ব্যাকরণরীতি ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে আর্যভাষাসম্ভূত হইলেও বাঙলা ভাষায় অনার্য ভাষার যথেষ্ট স্পর্শ লাগিয়াছে—আর্যে-অনার্যে মিলিয়া বাঙলা ভাষার রূপ দান করিয়াছে। আর কেবল ইহাই বা বলি কেন, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতই পাঁচফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে বাঙলাভাষার সাজি। দেশীয় অনার্য ভাষা ছাড়া বিদেশীয় গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসী, পোর্তুগীজ, আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষা হইতেও বাঙলাভাষা তাহার শব্দশক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। বাঙালী জনের মতো বাঙলাভাষায়ও উপকরণ-সমন্বয় ঘটিয়াছে।

বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত। অবশ্য উত্তর-ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি কালক্রমে যে সমন্বিত রূপ ধারণ করিয়াছে, বাঙলার জনজীবনে তাহারই তরঙ্গাভিঘাত ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাঙালীর কতকগুলি আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াকর্ম একান্তভাবেই স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে—যদিও এই স্বাতন্ত্র্যের পিছনেও সমন্বয়ের ক্রিয়া সমানভাবেই কার্যকর হইয়াছে।

বাঙলা তথা সমগ্র ভারতের সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে দেখা যায়, এই সভ্যতা বিশেষভাবেই কৃষিনির্ভর। আর, এই কৃষিনির্ভর সভ্যতাকেই আমরা সাধারণতঃ আর্যসভ্যতা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। অথচ আর্য ভাষা ও সভ্যতার ধারক আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর নিকট প্রথমে কৃষিকার্য ছিল সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞাত।[৪] অষ্ট্রিক-ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর লোকেরাই এদেশে কৃষিকার্যের প্রচলন করে বলিয়া অনুমান করা হয়। কৃষিকার্যের প্রধান সহায় 'লাঙ্গল'; এই শব্দটি আর্যভাষাসম্ভূত নহে—অনার্য

অষ্ট্রিকভাষা হইতে গৃহীত। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ধান সর্বাগ্রগণ্য। অষ্ট্রিকভাষী লোকেরাই প্রথমে ধানের চাষ করে এবং এই ধানই ছিল তাহাদের প্রধান আহার্য। সভ্যজগতে আজ যে সুতী বস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার ও বিপুল আয়োজন দেখা যায়, তাহার জন্যও আমাদিগকে অষ্ট্রিকভাষী লোকদের নিকট ঋণ স্বীকার করিতে হয়। তুলার কাপড়ের ব্যবহার মূলতঃ তাহাদেরই দান, তাহারাই সর্বপ্রথম কার্পাস উৎপাদন করে [এই 'কার্পাস' শব্দটিও অষ্ট্রিকভাষাজাত]। ইহা ছাড়া আরও একটি বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রাচীন ভারতে আর্যজাতীয় ক্ষত্রিয় বীরদের মধ্যে যে ধনুর্বিদ্যার প্রচলন দেখা যায়—আর্যবংশোদ্ভব রাম, লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন, কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণ যে ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা দেখাইয়া ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, সেই ধনুর্বিদ্যারও উদ্ভাবক অরণ্যচারী অনার্য অষ্ট্রিকভাষী লোকেরা। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, 'বাণ' এবং 'ধনু' বা 'ধনুক'—এই শব্দ দুইটিও মূলতঃ অষ্ট্রিক।

অষ্ট্রিকভাষী লোকদের এই যে পরিচয় পাওয়া গেল তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, তাহারা যে সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা একান্তভাবেই গ্রামকেন্দ্রিক। প্রাচীন ভারতে হস্তিনাপুর, উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র প্রভৃতি কিছু কিছু নগর গড়িয়া উঠিলেও সেকালের ভারতীয় সভ্যতা ছিল আসলে গ্রামীণ সভ্যতা। ভারতবর্ষের জনবহুল সমৃদ্ধ গ্রামগুলিতে যে শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতির আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত থাকিত, তাহাই সমগ্র দেশকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিত, এবং সমুদ্র ও পর্বতের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিয়া দূর-দূরান্তের দেশগুলিতেও আলোকসম্পাত করিত। আর্যভারতের এই আলোকোজ্জ্বল দিনগুলির অরুণাভাস পরিলক্ষিত হয় অষ্ট্রিকভাষীদের জীবনযাত্রা ও সভ্যতায়—তাহারাই ভারতীয় সভ্যতায় 'ভোরের পাখি'।

ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপকার হিসাবে অষ্ট্রিকভাষী নরগোষ্ঠীর পরেই নাম করিতে হয় দ্রাবিড়ভাষী দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর। তাহারাই 'ভারতবর্ষের নাগর-সভ্যতার স্রষ্টা'। ভারতীয় সভ্যতা প্রধানতঃ গ্রামকেন্দ্রিক হইলেও ইহাতে নাগর জীবনের স্পর্শ অস্বীকার করা যায় না। হস্তিনাপুর ও অযোধ্যার ঐশ্বর্য ও বীর্যবত্তায়, উজ্জয়িনীর কাব্যসাধনায়, পাটলিপুত্রের ধর্মপ্রচার ও মানবহিতৈষণায় ভারতীয় সভ্যতা যে বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহাকে নাগর-সভ্যতার দান বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতে গ্রাম-নির্ভর সরল সহজ জীবনযাত্রার পরিবেশে ঐশ্বর্য-মণ্ডিত নগরের বিশিষ্ট জীবনচর্যা যে

কিছুটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ দেহ ও প্রাণ লইয়া যেমন জীব-জীবন, নগর ও গ্রাম লইয়া তেমনি সভ্যতা পূর্ণ রূপ লাভ করিয়া থাকে। গ্রামের সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে কৃষিজ দ্রবের উপর, নগর সমৃদ্ধ হইয়া উঠে প্রধানতঃ খনিজ দ্রব্যের বিচিত্র ব্যবহারে। দ্রাবিড়ভাষী লোকেরাই সর্বপ্রধম ভারতবর্ষে খনিজাত বস্তুর ব্যবহার করিয়া 'উপাদান-উপকরণ-বহুল' নাগর-সভ্যতাকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা সোনা, রূপা, তামা, লোহা, সীসা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানিত। আর্য-ভারতে সভ্য মানুষের জীবনযাত্রায় যে-সকল উপকরণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল, তাহার অনেকটাই দ্রাবিড়-সভ্যতার দান।[৫] ভারতবর্ষের গ্রামীণ সভ্যতার বিরাট দেউলের চূড়ায় স্বর্ণকুম্ভ স্থাপন করিয়াছিল দ্রাবিডভাষীদের প্রবর্তিত নগর-নির্ভর সভ্যতা।

আর্য-সভ্যতা এই গ্রামীণ ও নাগর সভ্যতার—এই কৃষি-প্রধান ও শিল্প-প্রধান সভ্যতার সমন্বিত রূপ। এক কথায়, অষ্ট্রিকভাষী ও দ্রাবিডভাষী লোকদের সভ্যতার সম্মিলিত রূপই হইল আর্যসভ্যতা।

আর্যভাষী লোকদের প্রাধান্য লাভের পব ভারতবর্ষে যে সংস্কৃতি গডিয়া উঠিল, তাহাও অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড-ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ফল।

আর্য-সংস্কৃতির একটা বড কথা পুনর্জন্মবাদ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হইয়াছে যে, জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র ধারণের মতই আত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তি ঘটে।[৬] কিন্তু ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, গীতা ও মহাভারতের যুগের বহুপূর্বে অষ্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়দের সমাজেই সর্বপ্রথম আত্মার অবিনশ্বরতা ও দেহান্তরগ্রহণ সম্বন্ধে একটা বিশেষ প্রত্যয় দেখা দিয়াছিল। মৃতব্যক্তির আত্মা কোনো বৃক্ষ বা কোনো পর্বত বা কোনো জীবকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে, ইহাই ছিল অষ্ট্রিকভাষী লোকদের ধারণা। পরবর্তী কালে এই ধারণাই হিন্দু পুনর্জন্মবাদে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অষ্ট্রিকভাষীদের মধ্যে প্রচলিত মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে আহার্যদানের প্রথাটিও কালক্রমে আর্যীকৃত হইয়া গিয়াছে অষ্ট্রিকভাষী লোকেরা মৃতদেহ গাছে ঝুলাইয়া রাখিত অথবা মাটির নীচে কবর দিত এবং মৃতব্যক্তিকে মাঝে মাঝে খাদ্যও দান করিত। এই রীতিই কালক্রমে হিন্দুসমাজে প্রচলিত শ্রাদ্ধাদি কার্য ও পিণ্ডদান প্রভৃতি ব্যাপারে রূপান্তর লাভ করিয়াছে।

অষ্ট্রিকভাষীদের মতো দ্রাবিড়ভাষীদের অনেক প্রথা এবং বিশ্বাসও আর্য-

সভ্যতাকে প্রভাবিত করিয়াছে। 'আর্য এবং পরবর্তী পৌরাণিক হিন্দুধর্মে মূর্তি-পূজা, মন্দির, পশুবলি, অনেক দেবদেবী, যথা, শিব ও উমা, শিবলিঙ্গ, বিষ্ণু ও শ্রী প্রভৃতি যে স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার মূলে দ্রাবিড়ভাষী লোকদের প্রভাব অনস্বীকার্য।'[৭] ইহা ছাড়া হিন্দু সমাজের জাতিভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতা-বোধের মূল অনুসন্ধান করিলেও দ্রাবিড়-সংস্কৃতির কথা উঠে। প্রাচীন দ্রাবিড়-সমাজ ছিল কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই সকল শ্রেণীর প্রত্যেকটির মধ্যেই আবার বহু বিভাগ ছিল। দ্রাবিড়ভাষী লোকদের মধ্যে শ্রেণীগত উচ্চ-নীচ-ভেদ ছিল খুবই বেশী। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোকদের অস্পৃশ্যবোধে ঘৃণা করিত। দ্রাবিড়সমাজের এই শ্রেণীভেদ এবং অস্পৃশ্যতাই পরবর্তী কালে হিন্দু-সমাজকে প্রভাবিত করিয়া বংশানুক্রমিক জাতিভেদপ্রথা ও ছুঁৎমার্গের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল।

অষ্ট্রিকভাষী ও দ্রাবিড়ভাষীদের সাংস্কৃতিক জীবনের এই সামান্য পরিচয়ই বলিয়া দিতেছে যে, আর্যসংস্কৃতি—যাহাকে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি বলিয়া আখ্যা দিই—তাহা মূলতঃ আর্যপূর্ব দুই প্রাচীন সংস্কৃতির সমন্বিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নহে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক হইতে উত্তর-ভারতের এই আর্যসংস্কৃতি এবং সেই সঙ্গে আর্যসভ্যতার ধারাও বাঙলাদেশে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহার ফলে বাঙালীর সমাজ-বিন্যাসে, বাঙালীর ধ্যানধারণায়, বাঙালীর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে আর্যপ্রভাব অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাই বাঙালীর সমগ্র পরিচয় নহে। বাঙালীর জীবনচর্যায় আর্যসংস্কৃতি অপেক্ষা অনার্য-সংস্কৃতিই অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।[৮] বাঙলাদেশের আর্যীকরণের সঙ্গে সঙ্গেই অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় সমন্বয় হইতে উদ্ভূত আর্যসংস্কৃতির মধ্য দিয়া বাঙালীর জীবনধারায় আর্যেতর সংস্কৃতির গৌণ অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু তৎপূর্বেই অনার্য অষ্ট্রিকভাষীদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাঙলার প্রাণকেন্দ্রে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।[৯] এই কারণেই উত্তর-ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেকটা প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। উত্তর-ভারতের জনসমাজ যখন গম ও যবকে প্রধান আহার্যরূপে বাছিয়া লইল, বাঙালী তখন অষ্ট্রিকভাষীদের আহার্যরীতির অনুবর্তনে বলয়শোভিত কোমল হস্তের পরিবেশনে ওগরা ভাত খাইয়া তুষ্ট :

'ওগ্‌গর ভত্তা রংভঅ পত্তা
গাইক ঘিত্তা দুগ্‌ধ সজুত্তা।

মোইণি-মচ্ছা ণালিচ গচ্ছা
দিজ্জই কংতা খা পুণবংতা ॥' [প্রাকৃতপৈঙ্গলম্]

অর্থাৎ: ওগরাভাত কলাপাতায় ঢালা, তাহাতে গব্যঘৃত ও সুস্বাদু দুগ্ধ, মৌরল্যা মাছ আর নালতে শাক রন্ধন করিলেন কান্তা, দিতেছেন কান্তকে, আহার করিতেছেন পুণ্যবান। ভাত-ভক্ষণের এই অভ্যাস ও সংস্কারে বাঙলাদেশ উত্তর-ভারত হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ একটা অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। ইহা ছাড়া মৎস্য-প্রীতির জন্যও বাঙালী উত্তর-ভারত হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র;[১০] মাংসের প্রতিও বাঙালীর কোনদিনই বিরাগ ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের লীলাভূমি উত্তর-ভারত বা আর্য-ভারতে মাছ-মাংসের প্রতি একটা সাধারণ অনীহা বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মে খাদ্যের জন্য প্রাণি-হত্যার প্রতি একটা নৈতিক আপত্তি দানা বাঁধিয়া ওঠায় আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষ কালক্রমে নিরামিষ আহার্যেরই পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙলাদেশেও আর্যসভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যসমাজের এই আমিষ-বিরোধী মনোভাব বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু চিরাচরিত ও অভ্যস্ত প্রথার বিরুদ্ধে তাহা বিশেষ কার্যকর হইয়া উঠিতে পারে নাই। আমিষ আহারের প্রতি, বিশেষভাবে মৎস্যাহারের প্রতি বাঙালীর স্বাভাবিক প্রবণতা চিরদিনই সমান রহিয়া গিয়াছে। আসল কথা, বাঙালী কোনদিনই উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির নিকট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিকাইয়া দেয় নাই। উত্তর-ভারতে যখন বৈদিক ধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি, বাঙলাদেশ তখন লৌকিক দেবদেবীর পূজা-অর্চনা ও ব্রতানুষ্ঠান লইয়া মাতিয়া রহিয়াছে।[১১] উত্তর-ভারতের হরিদ্বার, প্রয়াগ, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থস্থানের আকাশ যখন যজ্ঞধূমে ধূমায়িত ও বেদগানে মুখর, বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে তখন চণ্ডী-মনসার পূজানুষ্ঠান চলিয়াছে—বাঙালীর ঘরে ঘরে মেয়েরা সঙ্কটা, নাটাই, লোটন ষষ্ঠীর ব্রত করিয়া অভীষ্টসিদ্ধির পথ খুঁজিতেছে।

বাঙালীর এই বেদবিরোধী আচার-আচরণের জন্য উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ্যধর্ম-প্রভাবিত উন্নাসিক জনসমাজের নিকট বাঙালী 'ব্রাত্য' ও 'পতিত' বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে, তথাপি সে তাহার নিজস্ব গৃহকোণটি বিলাইয়া দিয়া জনতার ভিড়ে হারাইয়া যায় নাই।[১২] তাহার ছায়াশীতল গৃহপ্রাঙ্গণে সে নবাগত আর্য-সংস্কৃতিকে বরণ করিয়া লইয়াছে, আবার সুপ্রাচীন অনার্য-সংস্কৃতিকেও 'দূরং গচ্ছ' বলিয়া বিতাড়িত করে নাই। আর্য ও অনার্যের প্রতি সমান আকর্ষণবশতঃই

বাঙালীর পক্ষে ইহা সম্ভব হইয়াছে। বাঙালীর সংস্কৃতি-সমন্বয়ে তাহার চিরন্তন সাম্যবোধেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বাঙালীর ধর্মকর্ম ও দেবদেবী-পরিকল্পনার গোড়াকার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও দেখা যাইবে যে, সেখানেও একটা সাম্যভিত্তিক সমন্বয়-সাধনা অব্যাহত রহিয়াছে। বাঙালীর ধর্মজগতে আর্য-অনার্য প্রভাব মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়াছে—পৌরাণিকতা ও লৌকিকতার গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম ঘটিয়াছে।

বাঙলাদেশে ধর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়-ক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করে খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে। ইহার পূর্বে বিস্মৃত যুগের অন্ধকার হইতে বাঙালীর সমাজে যে পূজা-অর্চনা, ভয়-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছিল, তাহা একান্ত-ভাবেই বাঙলার আদিবাসী অনার্যদের দান। বাঙলাদেশে আর্য-অনুপ্রবেশের পর হইতে বিভিন্ন সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম চাহিয়াছে বাঙলার অনার্যপ্রসূত নিজস্ব ধর্মকর্মকে বিলুপ্ত করিতে বা নির্জিত করিয়া রাখিতে, কিন্তু বহুক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়িয়া দিয়া আপস করিতে বাধ্য হইয়াছে। অফুরন্ত প্রাণশক্তির জোরে বাঙলার অধিকাংশ সুপ্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ধর্মবিশ্বাস আজও পর্যন্ত আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে—সমন্বয়ের যুগে তাহাব উপরে আর্য ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মকর্মের চন্দনানুলেপন হইয়াছে মাত্র। অবশ্য এই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঙলার অনার্যপ্রভাবিত ধর্মকর্মময় সংস্কৃতি আর্য ধর্মকর্মের সাধনা ও অনুষ্ঠানের নীচে চাপা পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া মরিয়া গিয়াছে, আবার কোথাও কোথাও অনার্য ধর্মকর্মই আপন প্রাণশক্তির প্রবলতায় আর্য ধর্মকর্মের ভাব ও রূপকে বদলাইয়া দিয়াছে। গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়া এইভাবেই বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির একটা সমন্বিত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙলার ধর্মকর্মের চলমান ধারায় এই সমন্বয় প্রায় সর্বত্রই। উদাহরণস্বরূপ এখানে মাত্র দুই-একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

বাঙালী হিন্দুর নিকট তুলসীগাছ অতি পবিত্র। পল্লীবাঙলার বহু গৃহে আজও সন্ধ্যাবেলায় তুলসী-তলায় প্রদীপ ধরাইয়া দিয়া কুলবধূরা ভক্তিনম্রচিত্তে প্রণাম জানায়—ছোট্ট তুলসী গাছটি তখন এক অপূর্ব দেবমহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। কিন্তু এই যে প্রণাম, এই যে ভক্তি, ইহা কোন্ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করিতেছে? বলা বাহুল্য, বৃক্ষের উপর এইরূপ দেবত্ব আরোপ করিয়া বৃক্ষপূজক অনার্য আদিবাসীদের সংস্কৃতিরই পাদমূলে নতি জানানো হইতেছে।[১৩] অথচ

মজা এই, ইহা কেবল অনার্যগন্ধী হইয়াই থাকে নাই—আর্য-অনার্য সমন্বয়-ক্রিয়ার প্রভাবে তুলসীকে পৌরাণিক মহিমা দান করিয়া সুপ্রাচীন অনার্য-সংস্কৃতির আর্যীকরণ নিষ্পন্ন হইয়াছে।[১৪] দুর্গাপূজায় কলাবৌ, শুভানুষ্ঠানে ঘটের উপর প্রদত্ত আম্রপল্লব, লক্ষ্মীপূজায় ধানের ছড়া, আশীর্বাদীরূপে ব্যবহৃত ধানদূর্বা প্রভৃতিও এই সমন্বয়ের ইতিহাস বহন করিতেছে।

বাঙলার গ্রাম্য সমাজে মেয়েদের মধ্যে যে-সকল ব্রতানুষ্ঠান প্রচলিত আছে, সেগুলির ইতিহাসও অনেক ক্ষেত্রে সমন্বয়েরই ইতিহাস।" এই সকল ব্রতের বেশির ভাগই মূলতঃ 'অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য'। কিন্তু পরবর্তী কালে এই সকল লৌকিক ব্রতানুষ্ঠানের অনেকগুলিই ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুমোদন লাভ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণ বিনা দ্বিধায় ঐসব অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যও করিতেছেন। বাঙলা তথা ভারতের বহু লোকায়ত ধর্মানুষ্ঠানই এইরূপ অনার্য-সমাজ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া দীর্ঘকাল পরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম-স্বীকৃত হইয়া পৌরাণিক আভিজাত্য প্রাপ্ত হইয়াছে। রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোল-যাত্রা প্রভৃতি ধর্মোৎসবের মূল অনুসন্ধান করিলে এই সত্যেরই স্বীকৃতি মিলিবে।

হিন্দুর ধর্মোৎসব হিন্দুর দেবদেবীকে লইয়া। ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্রা-বরুণ [ মিত্র ও বরুণ ], উষা, সরস্বতী, পূষা [ সূর্যদেব ], মরুৎ, রুদ্র, যম প্রভৃতি দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী কালে অনার্য-সংস্রবের ফলে আর্য-সমাজের বৈদিক দেবদেবীদের অনেকেই অনার্যপূজিত লৌকিক দেবদেবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়া রূপান্তর লাভ করিলেন। ইহা ছাড়া অনেক অনার্য দেবতাও আবার আর্যব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বীকৃতি লাভ করিয়া জাতে উঠিলেন ; আর্যে-অনার্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় 'অনার্য দেবতাকে বেদের প্রাচীন মঞ্চে তুলিয়া লওয়া হইল'।

ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে পূজিত দেবাদিদেব শিব এইরূপ এক আর্যীকৃত দেবতা। প্রাগার্য সমাজে অনার্য দেবতারূপেই শিব পূজা পাইতেন, কিন্তু কালক্রমে সমন্বয়ধর্মী আর্যসমাজে বৈদিক রুদ্রদেবতারূপে শিব আর্যদেবতাদের মধ্যে স্থান পাইলেন। 'বৈদিক রুদ্র দেবতার মধ্যেই অনার্য্য উপকরণ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। অতএব দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈদিক দেবসমাজের মধ্যেই এই অনার্য্য দেবতা নিজের স্থান করিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পরবর্তী পৌরাণিক সাহিত্যে রুদ্র দেবতার এই বৈদিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানী বুদ্ধের অনুকরণে তাঁহার এক শান্ত সমাহিত শিবমূর্তির পরিকল্পনা করা

হইয়াছিল।'[১৫] মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যে শিবের এই 'শান্ত সমাহিত' মূর্তির এক চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। হিমালয়ের সানুদেশে শিব বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানমগ্ন। দূর হইতে তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মদনদেবের মনে হইল :

'অবৃষ্টি-সংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।

অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥' [৩।৪৮]।

অর্থাৎ : তিনি [শিব] দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু সমূহকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বর্ষণাড়ম্বরহীন মেঘ, তরঙ্গ-সংঘাত-বিহীন প্রশান্ত জলাশয় এবং বায়ুপ্রবাহ-বর্জিত স্থানের নিশ্চল প্রদীপ-শিখাটির মতো দেখাইতেছিল।

এই যে বর্ষণাড়ম্বরহীন জলপূর্ণ গম্ভীরাকৃতি মেঘ অথবা তরঙ্গ-সংঘাত-বিহীন প্রশান্ত বারিধি কিংবা বায়ু-প্রবাহ-বর্জিত স্থানে অবস্থিত নিশ্চল প্রদীপশিখার মতো ধ্যানমগ্ন শিবমূর্তি, ইহা প্রাগার্য সমাজে পূজিত যোগাসীন এক দেবমূর্তির প্রভাবজাত বলিয়াও অনেকে মনে করেন।[১৬] অতএব দেখা যায়, বৈদিক রুদ্র, অনার্য শিব এবং ধ্যানী বুদ্ধ বা প্রাগার্য সমাজের যোগাসীন দেবতা—ইহাদের সমন্বিত রূপই পৌরাণিক শিব-পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে। 'সেইজন্য একদিকে এই দেবতা ঘোর, ভৈরব এবং রুদ্র, আবার তেমনই অন্যদিকে অঘোর, শিব এবং দক্ষিণ—আবার তিনিই যোগীশ্বর ও যোগীন্দ্র।'[১৭]

বাঙলাদেশে আর্যধর্ম প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর্য ও অনার্য উপাদানের সমন্বয়ে উদ্ভূত পৌরাণিক দেবতা শিবের উপাসনাও এই দেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল। প্রথমে ইহা কেবল সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, পরে তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচার লাভ করে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচারিত হইয়া শৈবধর্ম ইহার পৌরাণিক আদর্শ হারাইয়া ফেলিল। উন্নত মানসিকতা ও সুপরিণত ধর্মবোধের অভাবে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাহাদের নিজস্ব সংস্কারের ভিত্তিতে পৌরাণিক শিবকে নূতনরূপে পুনর্গঠিত করিয়া লৌকিক রূপ দান করিল।[১৮] ইহা ছাড়া বৌদ্ধ, জৈন ও নাথ-ধর্মের বহু উপাদান লইয়াও বাঙলার লৌকিক শিব-চরিত্র গড়িয়া উঠিল। এইভাবে সাধারণ বাঙালীর সমাজে যে শিবের প্রতিষ্ঠা হইল, তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ ও অনার্য আদর্শের এক সমন্বিত রূপ গ্রহণ করিলেন। এইজন্যই বাঙলার শিব একদিকে যেমন নিরাসক্ত ও যোগী, অপরদিকে তেমনই পত্নী-পুত্র-কন্যা-পরিবৃত্ত সংসারের কর্তা—'দাম্পত্য জীবনের আদর্শ স্বামী', একদিকে যেমন মঙ্গলময় আশুতোষ—

অল্পেই সন্তুষ্ট হন, অপরদিকে তেমনই দক্ষযজ্ঞবিনাশী রুদ্র ভৈরব। তিনি ভোলানাথ, পাগল, ভাঙ্ ও গাঁজায় তাঁহার অত্যাসক্তি ; আবার তিনিই ত্রিকালজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী। বাঙলার মাটির গুণে শিব-চরিত্রে বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয় ঘটিয়াছে।

বাঙলার দেবদেবী-পরিকল্পনায় এইরূপ সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত আরও অনেক পাওয়া যায়। বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় পরিমণ্ডলে চণ্ডী বা চণ্ডিকা এক বিশেষ দেবী। মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে সংকলিত 'চণ্ডী'-নামক গ্রন্থে চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্যের কথা পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি প্রাচীন আর্যসমাজের বহুবন্দিতা এক সর্বশক্তিময়ী দেবী। কিন্তু আসলে প্রাচীন আর্যদেবতাদের মধ্যে চণ্ডীর কোনো স্থানই ছিল না। 'চণ্ডী বৈদিক দেবতা নহেন ; রামায়ণ, মহাভারত কিংবা প্রাচীন কোন পুরাণে এই দেবতার উল্লেখ মাত্র নাই।...আর্য্যেতর কোন সমাজ হইতে এই দেবী কালক্রমে পূর্ব্বভারতীয় আর্য্যসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন।'[১৯]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত কালকেতুর উপাখ্যানে চণ্ডীদেবীকে স্পষ্টতঃই ব্যাধ ও পশুকুলের দেবতা বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। '...অস্পৃশ্য ব্যাধ-সমাজে জন্ম লাভ করিয়া ক্রমে আর্য্যসমাজের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে এই দেবতার প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল, এবং ক্রমে পৌরাণিক একটি প্রসিদ্ধ স্ত্রীদেবতার চরিত্র পার্ব্বতীর সঙ্গে এক হইয়া এই চণ্ডী পরবর্ত্তী হিন্দুর দেব-সমাজে এক বিশেষ স্থানাধিকার করিয়া লইয়াছেন।'[২০] ইহা ছাড়া চণ্ডী-পরিকল্পনায় ছোটনাগপুরের ওরাওঁ-নামক উপজাতির উপাস্যা 'চাণ্ডী' দেবী এবং বৌদ্ধ 'আদ্যা' দেবীরও প্রভাব রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নাটাই চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, মঙ্গল চণ্ডী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির লৌকিক চণ্ডীর পূজা প্রচলিত আছে। মনে হয়, এই সব ভিন্ন ভিন্ন চণ্ডীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংহত হইয়া পৌরাণিক স্ত্রীদেবতা পার্বতীর চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং তাঁহার 'চণ্ডী' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

এইভাবে দেখা যায়, 'চণ্ডী' এই নামটির মধ্যে বাঙলার বিভিন্ন সমাজের শক্তিদেবতার পরিকল্পনা সমন্বিত হইয়া সর্বশেষে 'পৌরাণিক পার্বতী, অন্নদা বা অন্নপূর্ণায় শেষ পরিণতি' লাভ করিয়াছে। ইহার ফলে লৌকিক চণ্ডীর মধ্যেও অনেক সময় মার্কণ্ডেয় পুরাণের দনুজদলনী মহাশক্তিময়ী চণ্ডীদেবীর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু-উপাখ্যানে চণ্ডী ব্যাধ ও পশুদের পূজিতা লৌকিক দেবী হইয়াও কালকেতুর নিকট আপন রূপ প্রকাশের জন্য :

'মহিষমর্দিনী-রূপ ধরেন চণ্ডিকা।
অষ্ট দিকে শোভা করে অষ্ট যে নায়িকা॥
সিংহ-পৃষ্ঠে আরোপিলা দক্ষিণ চরণ।
মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোপণ॥
বাম করে মহিষাসুরের ধরি চুল।
ডানি করে বুকে তার আরোপিলা শূল॥
চারিদিকে লম্বমান শোভে জটাজূট।
গগনমণ্ডলে লাগে মাথার মুকুট॥
বামে শিখিবাহন দক্ষিণে লম্বোদর।
বৃষ-আরোহণে শিব মাথার উপর॥
দক্ষিণে জলধি-সুতা বামে সরস্বতী।
আনন্দে পূরিত দেবগণে করে স্তুতি॥
অঙ্গদ-কঙ্কণযুঁতা হইলা দশভুজা।
যেইরূপে অবনীমণ্ডলে নিলা পূজা॥' [ কবিকঙ্কণ চণ্ডী ]

বাঙালীর সমন্বয়ধর্মী মনোভাবের জন্যই চণ্ডীদেবীর প্রকৃতিতে এইরূপ লৌকিক ও পৌরাণিক উপাদানের সমন্বয় হইয়াছে।

বাঙলার অপর এক বহুপূজ্যা দেবী হইলেন মনসা। পল্লীবাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহুকাল ধরিয়া মনসাদেবীর পূজা প্রচলিত। মধ্যযুগে বাঙলার বহু কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়া মনসাদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন, দেবী মনসার পূজাও দীর্ঘকাল হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু মূলতঃ এই দেবীর 'প্রাচীন বৈদিক বা পৌরাণিক কোনো ঐতিহ্যই ছিল না'। মনসাদেবী আসলে অনার্যদেবী। পরবর্তী কালে বিভিন্ন উপাদান সমন্বিত হইয়া মনসাদেবীকে পৌরাণিক মর্যাদা দান করিয়াছে।

বাঙলাদেশ ও দাক্ষিণাত্যের অনার্য-প্রভাবিত সমাজে বহুকাল হইতেই স্ত্রী-সর্পদেবতার পূজা চলিয়া আসিতেছে। আর্য-অনার্য সমন্বয়ের যুগে এই অনার্য-পূজিতা সর্পদেবীই আর্যসমাজে স্থান করিয়া লইয়াছেন। এই জন্যই দেখা যায়, পূর্ব-ভারতীয় মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'জাঙ্গুলী' নামে এক সর্পদেবীর পূজা প্রচলিত রহিয়াছে। জাঙ্গুলীর সঙ্গে বাঙলার সর্পদেবী মনসার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহা হইতে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বৌদ্ধ জাঙ্গুলীদেবীই কালক্রমে মনসাতে পরিণত হইয়াছেন। 'বৌদ্ধ পাল-

রাজত্বের অবসানে যখন সেনরাজগণ কর্তৃক এ'দেশে হিন্দুরাজবংশ স্থাপিত হয় তখন এ'দেশে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় হয়, সেই সময় বৌদ্ধধর্ম নানাভাবে আত্মগোপন করিতে আরম্ভ করে। বৌদ্ধধর্ম তখন এ'দেশের সমাজে সামাজিক প্রতিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট হওয়ার ফলে বৌদ্ধ দেবদেবীগণও তাঁহাদের বৌদ্ধপরিচয় পরিত্যাগ করিয়া নূতন পরিচয় গ্রহণ করিতে থাকেন। বাংলার বৌদ্ধ রাজত্বের অবসান ও হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠার যুগেই মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়কর্তৃক পূজিত সর্পদেবী জাঙ্গুলীর মনসা নামকরণ হয়।'[২১] ইহার পর হইতেই মনসাকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ পৌরাণিক মর্যাদা দানের চেষ্টা চলিতে থাকে। 'সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এই কয়খানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপপুরাণে মনসা নামটির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।'[২২] 'এই সমস্ত পুরাণগুলিতে মনসার জন্ম-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহাতে এই দেবীর আভিজাত্য কোন দিক দিয়া খর্ব্ব না হয় সেইজন্য নাগকুলের পিতা কশ্যপের সঙ্গেও তাঁহার সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে।'[২৩]

অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণগুলিতে মনসা কশ্যপ-দুহিতা বলিয়া বর্ণিত হইলেও বাঙলার মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে তাঁহাকে শিবের কন্যা বলা হইয়াছে। কিন্তু শিবপত্নী গৌরী বা মহামায়া মনসার মাতা নহেন—মনসা শিবের মানস-কন্যা।' 'মা নাহি পদ্মাবতীর বাপে করে দয়া।/বিক্রম জানিয়া পালন করে মহামায়া॥' [ বিজয় গুপ্ত : 'পদ্মাপুরাণ' : 'মনসার বিবাহ' ]।

মনসার এই 'পদ্মাবতী' নামটির সঙ্গে একটু ইতিহাস জড়িত। 'কেহ কেহ জৈন দেবী পদ্মাবতীকে মনসার সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। বাংলাদেশে মনসার এক নাম পদ্মা বা পদ্মাবতী। মনে হয় যে, জৈন ধর্ম্ম হইতে পদ্মাবতীর ঐতিহ্যের ধারাটি আসিয়া কালক্রমে মনসার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।'[২৪]

অনার্যদেবী মনসাকে এইভাবে কখনও কশ্যপ-দুহিতা, কখনও শিব-তনয়া বলিয়া বর্ণনা করিয়া পৌরাণিক আভিজাত্য দানের প্রয়াস হইয়াছে। ইহার উপর আবার মনসার সর্পদেবী পরিচয়টি পরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহাকে মহাভারতে বর্ণিত জরৎকারু-কাহিনীর পটভূমিকায় স্থাপন করা হইয়াছে। মহাভারতে আছে, সর্পরাজ বাসুকির ভগিনীর [তাঁহার নামও জরৎকারু] সহিত জরৎকারু মুনির বিবাহ হইয়াছিল এবং আস্তিক নামে বাসুকি-ভগিনীর একটি পুত্রও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আর্যপ্রভাববশতঃ মনসাকে এই বাসুকি-ভগিনীর

সহিত 'এক করিয়া দেওয়া হইয়াছে'। মনসা-প্রণামের মন্ত্রেও মনসার এই পরিচয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে :

'জরৎকারুমুনেঃ পত্নৈ ভগিনৈ বাসুকেরপি।
আস্তিকস্থ মুনের্মাত্রে বিষহর্ষৈ নমোঽস্তুতে॥'

অতএব দেখা যাইতেছে, বাঙলার মনসা-পরিকল্পনায় অনার্য-সংস্কৃতির সঙ্গে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একটা চমৎকার সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

ধর্মঠাকুর, কালী, শীতলা প্রভৃতি বাঙালীর অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর রূপ ও প্রকৃতি পরিকল্পনায়ও এইপ্রকার বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয় ঘটিয়াছে। এই সমন্বয়-সাধনের মধ্যেই বাঙালীর সাম্যপ্রয়াসী মনোধর্মের পরিচয়টি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

বাঙালীর সাহিত্য-চিন্তায়ও প্রথম হইতেই সাম্যবোধের আভাস পাওয়া যায়। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদগুলিতে বাঙালীর সাম্যচেতনার কিছুটা বিক্ষিপ্ত পরিচয় মিলিবে। চর্যার গানগুলির ভিতর দিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সহজধর্মের সাধনতত্ত্ব ও সাধনরীতির ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। সাধারণের নিকট তাঁহাদের এই গূঢ়ার্থবহ ধর্মমত তুলিয়া ধরিবার জন্য তাঁহাদিগকে বহু স্থলেই রূপকের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।[২৫] এই রূপকগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপ পাইয়াছে বাঙলার তৎকালীন সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীকে লইয়া। রূপকচ্ছলে সহজানন্দের কথা বুঝাইতে গিয়া চর্যাকারগণ বহু ক্ষেত্রেই সহজানন্দকে অস্পৃশ্যা নারীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সহজানন্দ-রূপিনী নৈরাত্মা-দেবী কোথাও শুণ্ডিনী, কোথাও ডোম্বী, কোথাও চণ্ডালী, কোথাও শবরী বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন। একটি পদে আছে : 'এক সে শুণ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধঅ।/চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ॥' [৩নং পদ] [অর্থ : এক শুঁড়িজাতীয়া নারী দুইজনকে ঘরে প্রবেশ করাইয়া চিকণ (চকচকে) বাকল দিয়া বারুণী মদ্যকে বাঁধিতেছে]।

আর একটি পদে পাই : 'নগর বাহিরিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।/ছই ছোই যাই সো ব্রাহ্ম নাড়িআ॥' [১০ নং পদ] [অর্থ : ডোম্বি, তোমার কুঁড়েঘরখানি নগরের বাহিরে, তুমি ব্রাহ্মণ নেড়াকে ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাও]।

অপর একটি পদে অস্পৃশ্যা শবরজাতীয়া স্ত্রীর বাসস্থান ও পরিধানের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে : 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।/মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী॥' [২৮ নং পদ] [অর্থ : উঁচা উঁচা পর্বত,

সেখানে বাস করে শবরী বালিকা; ময়ূরের পুচ্ছ পরিধানে শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা ]।

সত্য বটে, প্রতিক্ষেত্রেই স্থূল বক্তব্যের আড়ালে সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্বের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করা হইতেছে—ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি সহজানন্দকে বুঝাইবার জন্য অস্পৃশ্যা নীচকুলোদ্ভবা নারীকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহার অপর একটি দিকও চিন্তার অপেক্ষা রাখে। সিদ্ধাচার্যদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙালী এবং অনেকেই সমাজের অভিজাত শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ কায়স্থ, কেহ রাজবংশজাত।[২৬] অতএব স্বাভাবিকভাবেই সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকদের প্রতি তাঁহাদের পক্ষপাতিত্ব থাকার কথা। কিন্তু তাহা না হইয়া তাঁহাদের রচনায় ভিড় জমাইয়াছে তথাকথিত হীনজন্মা লোকেরা—শবর, চণ্ডাল, ডোম প্রভৃতি। এযুগের সাম্যাদর্শী কবির মতই তাঁহারা যেন ছিলেন 'কবি যত ইতরের'। জন্মগত কৌলীন্যের উচ্চ মঞ্চে আরূঢ় থাকিয়া নীচের তলার অবহেলিত জনগণের প্রতি করুণাবারি সিঞ্চন করিয়া তাঁহারা কর্তব্য শেষ করেন নাই, অথবা মাটির কাছাকাছি কোনো কবির জন্য প্রতীক্ষায়ও বসিয়া থাকেন নাই—একেবারে মাটির বুকে নামিয়া আসিয়া মাটির শিশুদের লইয়া ধর্মসংগীত রচনা করিয়াছেন। হয়তো অনেকে ইহাকে জাতিবর্ণভেদহীন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ফল বলিয়া নির্দেশ করিবেন। কিন্তু বাঙালীর রক্তে, বাঙালীর মনের নিভৃততম প্রদেশে যে সাম্য ও সমন্বয়ের সুর রণিত হইতেছে, তাহা কি একেবারেই উপেক্ষণীয়? পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যধর্ম-পরিপোষিত বাঙলা সাহিত্যেও তো বাঙালীর এই সাম্যচেতনার অসদ্ভাব দেখি না।

পঞ্চদশ শতাব্দীর একখানি বাঙলা অনুবাদ-কাব্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ।[২৭] ইহাতেও বাঙালী কবির সাম্যধর্মী মনোভাব অপরিস্ফুট হইয়া থাকে নাই। ব্রাহ্মণবংশজাত পণ্ডিত-কবি কৃত্তিবাস এই কাব্য রচনা করেন। বাল্মীকি-প্রণীত সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনীকে কৃত্তিবাস বাঙলা পয়ারছন্দে রূপদান করিয়াছেন; কিন্তু তিনি বাল্মীকির রচনার আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। 'মূল বাল্মীকি হইতে কাহিনীর সারভাগ গ্রহণ করিয়া কৃত্তিবাস স্বীয় কল্পনার সহিত পুরাণ ও অন্যান্য রামায়ণের ঘটনা মিশাইয়া দিয়া পুরাতনী রামায়ণীকথাকে বাঙলা দেশের মনোভাবের অনুকূলে বর্ণনা করিয়াছেন।'[২৮] ইহার ফলে তাঁহার কাব্যের বহু স্থলেই তাঁহার মৌলিকতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী-জীবনের মূল

সুরটির সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য তিনি কাব্যমধ্যে এমন সব কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, যাহাকে একান্তভাবেই তাঁহার স্বকপোলকল্পিত বলিতে হয়। কৃত্তিবাসের স্বকীয় কল্পনা হইতে উদ্ভূত এইরূপ একটি কাহিনী 'গুহক-মিতালি'। ইহাতে চণ্ডালরাজ গুহকের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিতালির কথা বর্ণিত হইয়াছে। রাজা দশরথ একদিন পুত্রদের সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে গুহক আসিয়া সদলবলে দশরথের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। গুহকের অভিপ্রায় রামচন্দ্রকে দেখিবে। দশরথ ইহাতে রামচন্দ্রের সমূহ অনিষ্ট আশংকা করিয়া তাঁহাকে রথের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন এবং পথের বাধা দূর করিবার জন্য গুহকের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। যুদ্ধে গুহক পরাজিত ও বন্দী হইল। কিন্তু শেষপর্যন্ত রামচন্দ্রের অনুরোধে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। চণ্ডাল গুহকের সঙ্গে তখন রামচন্দ্র অগ্নি সাক্ষী করিয়া মিত্রতা স্থাপন করিলেন:

'শ্রীরাম বলেন অগ্নি জ্বালহ লক্ষ্মণ।
গুহকের সঙ্গে করি মিত্রতা এখন ॥
লক্ষ্মণ জালেন অগ্নি অগ্নি যে সাক্ষাতে।
গুহ বলে মিত্রতা করেন রঘুনাথে ॥
গুহ সনে ঘুচাইতে নারি নিজ নাম।
যেই তুমি সেই আমি বলেন শ্রীরাম ॥
শ্রীরামের জগতে হইল ঠাকুরালী।
প্রথমে করেন রাম চণ্ডালে মিতালী ॥' [ আদি কাণ্ড ]

পঞ্চদশ শতকের ব্রাহ্মণ্যধর্ম-প্রভাবিত বাঙালী-সমাজের একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কল্পনায় সূর্যপ্রভব বংশের যুবরাজ রামচন্দ্রের সহিত অস্পৃশ্য চণ্ডালের মিত্রতা স্থাপনের কথা কেমন করিয়া স্থান পাইল তাহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। যে-যুগে কেবল বর্ণভেদ নয়, বল্লাল-প্রবর্তিত কৌলীন্যপ্রথাও সমাজে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, সেই যুগের কবির পক্ষে প্রচলিত সংস্কারের বিরোধিতা করিয়া ধর্মপুস্তকের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও চণ্ডালে মিত্রতার কাহিনী সন্নিবেশিত করা যথেষ্ট দুঃসাহসের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আবার বাঙালী পাঠকও কিন্তু ইহাতে বিদ্রোহ করে নাই, বরং এই কাহিনীর ভিতর দিয়া শ্রীরামচন্দ্রের অসীম মহানুভবতার কথা স্মরণ করিয়া ভক্তিনতচিত্তে ইহাকে মানিয়া লইয়াছে। ইহার কারণ বাঙালীর জীবনসমুখ একটা উদার মানবিকতাবোধ। এই মানবিকতা-

বোধই তাহাকে সময় সময় ভেদবিভেদহীন মৈত্রী ও প্রীতির পথে আকৃষ্ট করিয়াছে। তাহার বহির্সত্তায় সে ভেদ-সর্বস্ব ও কলহপ্রিয় বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তাহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে বহিয়া চলিয়াছে সাম্য ও শান্তির অমৃতধারা। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙলাদেশে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইয়াছে, সিংহাসনকে কেন্দ্র করিয়া রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাতে বাঙলার জনজীবনে বিশেষ তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই। বাঙলার গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করিয়াছে, কলহ-বিরোধ যে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু আবার একের বিপদে অপরে আসিয়া বুক দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, গ্রামের যাত্রা, মেলা ও কথকতার আসরে সকলে মিলিয়া একযোগে আনন্দ উপভোগ করিয়াছে। বাঙালীর সমাজ জাতিভেদ লইয়া মাতামাতি করিয়াছে, কৌলীন্যের বেদীমূলে মনুষ্যত্বকে আহুতি দিয়াছে, আচারসর্বস্ব হইয়া প্রগতির সকল পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু বাঙালীর আন্তর সত্তা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বলিয়াছে— 'নেতি, নেতি'। তাহার হৃদয় মথিত করিয়া আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে এমন একটি পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের—যাহার উদাত্ত আহ্বানে সমস্ত ভেদের প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া সাম্য ও মানবতার আলোকধারায় নবজীবনের পথ-সংকেত পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। বাঙালীর এই অন্তর্লীন আকাঙ্ক্ষারই মহতী পরিণতি— শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ। কবি কৃত্তিবাসের সারস্বত সাধনায় এই আকাঙ্ক্ষারই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। আবার তাঁহার বাঙালী পাঠকও এই আকাঙ্ক্ষারই বাণীমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া তৃপ্তিবোধ করিয়াছে।

প্রাচীন বাঙলার সাহিত্য লইয়া কথা বলিতে গেলে মঙ্গলকাব্যকে বাদ দিলে চলে না। পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের দরবারে মঙ্গলকাব্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তৎকালীন বাঙলাদেশে মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গল দেবতাদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত দেবদেবীর পূজা ও মাহাত্ম্যগাথার মধ্যে বাঙালী তাহার দুঃখতাপক্লিষ্ট জীবনে শান্তি ও সান্ত্বনার পথ খুঁজিয়াছে। এই সকল দেবদেবীর রূপায়ণে যেমন লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কারের মিশ্রণ ঘটিয়াছে, ইহাদের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক মঙ্গলকাব্যগুলিও তেমনই লৌকিক ভাবধারার সহিত পৌরাণিক আদর্শের মিশ্রণে মিশ্ররূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আর্যেতর বাঙলার আর্যীকরণের যুগে সর্বক্ষেত্রে যে সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস চলিতেছিল, তাহারই ক্রমপরিণতিতে মঙ্গলকাব্যের লোকধর্মাশ্রয়ী কাহিনীকে পৌরাণিক

খাতে বহাইয়া দিয়া লৌকিক ধর্মের উপর একটা পৌরাণিক আভিজাত্য আরোপের চেষ্টা চলিয়াছে।

মঙ্গলকাব্যগুলির উৎপত্তির মূলে রহিয়াছে বাঙলার লৌকিক ব্রতকথা, ছড়া ও পাঁচালী। যে-যুগে বাঙলাদেশে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে নাই—আর্যেতর অষ্ট্রিকভাষী নরগোষ্ঠীর ভাবধারা ও রীতিনীতিই বাঙলার সর্বত্র, বিশেষতঃ গ্রামীণ সমাজে, প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সেই যুগ হইতেই বাঙালী তাহার পরিবেশজাত 'আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য' চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি উৎপাতের দেবদেবীর পরিকল্পনা করিয়া ভয়ে-ভক্তিতে তাঁহাদের পূজা ও মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়াছে।[২৯] লৌকিক দেবতাদের এই মাহাত্ম্যকীর্তনই ব্রতকথা, ছড়া ও পাঁচালীর মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। মুসলমানযুগে বাঙলার এই ব্রতকথা-ছড়া-পাঁচালী ধরনের লৌকিক দেবমাহাত্ম্যকথায় আর্যের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মদর্শনের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এই সময় হইতেই বাঙলার লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক সংক্ষিপ্ত কথা-উপকথাকে সংস্কৃত পুরাণের ছাঁচে রূপদান করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ইহারই ফলে মঙ্গলকাব্যগুলির উৎপত্তি ঘটে।

মঙ্গলকাব্যের ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রসমাবেশ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বহু-ক্ষেত্রেই উচ্চ-নীচ-প্রভেদ ঘুচাইয়া সাম্যাদর্শী একটা সমাজ-মানস গঠনের সজ্ঞান প্রয়াস পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অনার্যপ্রধান প্রাচীন বাঙলার লোককথা ও লোকগাথায় নিম্নবর্ণ বা অন্ত্যজশ্রেণীর জীবনালেখ্য থাকা কিছু অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু আর্যপ্রভাবিত সমাজে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আওতায় থাকিয়াও মঙ্গলকাব্যের কবিগণ যে এইসকল নিম্নশ্রেণীর চরিত্র লইয়া পুরাণকল্প গ্রন্থ রচনায় সংকুচিত হন নাই তাহাই আশ্চর্যের কথা। শুধু তাহাই নহে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার কবিগণ অনার্য বা ইতর শ্রেণীর সামাজিক ব্যাপারকে 'ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি-সাধনার আদর্শে পরিমার্জিত' করিয়া দুই বিপরীত কোটির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি যে প্রীতিস্নিগ্ধ সমদৃষ্টি, মঙ্গলকাব্যের কবিকুল তাহারই পথরেখা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্যই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই কাব্যের বিষয়বস্তু হইল মনসাদেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনা ও তাঁহার পূজা প্রচার। কাব্যমধ্যে বণিক চন্দ্রধর বা চাঁদসদাগরই প্রধান ব্যক্তি-রূপে চিত্রিত। কথা ছিল, চাঁদের হাতের পূজা ব্যতীত মর্ত্যধামে মনসাদেবীর পূজা প্রচারিত হইবে না। দেবী

মনসা তাই ছলে-বলে-কৌশলে চাঁদের নিকট পূজা আদায় করেন। ভাবিলে বিস্ময় লাগে, ব্রাহ্মণ্যধর্মস্বীকৃত যে-দেবীর পূজায় পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত না হইলে চলে নাই, তাঁহাকে মর্ত্যবাসীর পূজাস্পদা হইবার জন্য শূদ্র-জাতীয় এক বণিকের দেওয়া ফুলটির অপেক্ষায় থাকিতে হইয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্য ব্যতীত চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির উপাখ্যান, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাহিনীতেও দেখিতে পাই, বণিকজাতীয় লোকই সাধারণতঃ দেবতাদের পূজা প্রচারের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। মন্ত্র-তন্ত্র-শাসিত পুরোহিত-প্রথার বজ্র-আঁটুনির ফাঁক দিয়া এই-যে ব্রাহ্মণেতর জাতিকে দেবদেবীর পূজা-প্রচারকের মর্যাদা দানের চেষ্টা, ইহার পশ্চাদ্‌পটে একটা উদার সমদৃষ্টির আলোক বিচ্ছুরিত হইবার অপেক্ষায় কম্পমান।

মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদসদাগর ব্যতীত অপর দুই-একটি নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের সমাবেশেও এইরূপ সমদৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়। চাঁদের পূজা লাভ করিবার পূর্বে মনসাদেবী এখানে-সেখানে কিছু কিছু পূজা পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ঝালু-মালুর পূজাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঝালু ও মালু দুই ভাই, জাতিতে তাহারা জেলে। মনসাদেবী এই দুই অন্ত্যজের পূজা গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। মনসাদেবীকে সহচরীরূপে যিনি সর্বদা নানারূপ পরামর্শ দিতেন, তিনিও অন্ত্যজশ্রেণীয়া—রজককুমারী। দেবাদিদেব মহাদেবের কন্যার দেব-আভিজাত্য এই রজককুমারীর সাহচর্যে বিন্দুমাত্র সংকুচিত হয় নাই। উভয়ের কথোপকথনের মধ্যে তাঁহাদের সৌহার্দ্যের ভাবটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে :

'বুদ্ধি বল ওগো নেতা রজকের ঝী।
মর্ত্যলোকে না হইল পূজা মোর হৈল কি ॥
নেতা বলে শুন বাক্য মনসা কুমারী।
মর্ত্যলোকে পূজা লইতে যুক্তি দিতে পারি ॥' [ বিজয় গুপ্ত : পদ্মাপুরাণ ]

দেবী মনসা ও রজককুমারী নেতার এই কথাবার্তায় যে আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে উচ্চনীচ-ভেদের সকল গণ্ডী ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

মনসামঙ্গলের ন্যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও বাঙালী কবির ভেদ-বৈষম্য-বর্জিত মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু-উপাখ্যানে অনার্য ব্যাধ কর্তৃক চণ্ডীদেবীর পূজার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ প্রচলিত লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে এই উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। কাহিনী-নির্বাচনে তাঁহাদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না সত্য, কিন্তু যেরূপ অকপট

আন্তরিকতার সহিত তাঁহারা ব্যাধ-জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়, আর্যসংস্কৃতি-পরিপুষ্ট হইয়াও আর্যেতর মানবশ্রেণীকে তাঁহারা যথেষ্ট প্রীতির চক্ষেই দেখিতেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে আবার এই প্রীতির সহিত একটা গভীর সহানুভূতিও মিলিত হইয়াছে। ফুল্লরার বারমাস্যা বর্ণনায় কবি-হৃদয়ের এই সহানুভূতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ফুল্লরা যখন বলে :

'শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবসরজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে পড়ে মাংস-জল।
কত মাছি খায় অঙ্গে করমের ফল॥
অভাগ্য মনে গুণি অভাগ্য মনে গুণি।
কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী॥' [ কবিকঙ্কণ চণ্ডী ]

তখন ফুল্লরার এই উক্তির মধ্য হইতে মুকুন্দরামের 'একটি দুঃখকাতর কবিমন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে'—ফুল্লরার অশ্রুজলের সহিত কবিও যেন নীরবে দুই ফোঁটা অশ্রু মিশাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ মুকুন্দরামের মধ্যে ছিল একটি সহানুভূতিশীল কবি-হৃদয়। তাহারই জারকরসে অভিষিক্ত হইয়াছে বলিয়া ফুল্লরার বারমাসের দুঃখবর্ণনা আমাদের নিকট এত উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সামান্যা ব্যাধ-রমণীর দুঃখময় জীবনের প্রতি ব্রাহ্মণ-কবি মুকুন্দরামের এই যে সহানুভূতি, ইহা কেবল কবিজনসুলভ সংবেদনশীলতার পরিচয় বহন করে না—পরন্তু সেকালের ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রয়ী অভিজাত বাঙালীর মনেও যে অনভিজাত নিম্নশ্রেণীর প্রতি একটা মমত্ববোধ সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহারই ইঙ্গিত দিতেছে। মধ্যযুগীয় বাঙালী কবিগণ যখনই এই মানবিক অনুভূতির স্তরে দাঁড়াইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, তখনই যেন তাঁহারা শ্রেণী-বৈষম্যের অনেকটা উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন। তাই কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দেখিতে পাই, কালকেতুর নবস্থাপিত নগরে মুসলমান আগমনের বর্ণনা দিতে গিয়াও নিষ্ঠাবান হিন্দু-কবি মুকুন্দরামের চিত্তে কোনো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা স্থান পায় নাই।[৩০] মুসলমানের ধর্মনিষ্ঠাকে কবি মুকুন্দরাম গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া লিখিয়াছেন :

'বড়ই দানিসবন্দ না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।'

'হিন্দু-রচিত কাব্যে মুসলমানের এই অপক্ষপাত ও সহৃদয় চিত্রণ বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়।'[৩১]

ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে বাঙলার সামাজিক জীবন ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে মুকুন্দরামের কাব্যখানি অপরিহার্য। কালকেতু-নির্মিত গুজরাট নগরে নানাজাতির বসতি স্থাপনের বর্ণনায় দেখা যায়, মুকুন্দরাম সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কলু, জেলে, বাগদি, ছুতার, ধোপা, দরজী, পাটনি প্রত্যেকেই যে সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ—কেহ যে হীন, অস্পৃশ্য ও পতিত নহে—এই সত্য উপলব্ধি করিবার মতো উদার দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার ছিল। নির্যাতিত মানুষের প্রতিও মুকুন্দরামের গভীর সমবেদনা ছিল। 'নির্য্যাতিত পশুকুলের ভিতর দিয়া কবি অত্যাচারিত সমাজেরই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।'[৩২] সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি এই যে দরদ—অত্যাচার ও অবিচারকে ধিক্কৃত করিবার মতো এই যে মনোবল, ইহাই তো সমাজব্যবস্থায় সাম্য স্থাপনের পথসংকেত।

মুকুন্দবাম তাঁহার কাব্যে কেবল যে একটা সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছেন তাহা নহে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার দুই বিপরীত সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের ইঙ্গিত দিয়া মানবমিলনের মহাসংগীত শুনাইয়াছেন। অনার্য ব্যাধের আচারব্যবহার ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির আরোপ করিয়া তিনি আর্য-অনার্যের ভেদরেখা মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে ব্যাধ-দম্পতি ধর্মকেতু ও নিদয়া ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির অনুসরণে পরিণত বয়সে কাশীবাসী হইয়াছে :

'জায়া-সঙ্গে ধর্ম্মকেতু ভাবিয়া মুক্তির হেতু
বারাণসী করিলা পয়াণ ॥' [কবিকঙ্কণ চণ্ডী]

কালকেতুর জন্মের পর জাতকর্মের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও 'ভদ্রঘরের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর' লক্ষিত হয় :

'গোমুণ্ড স্থাপিল ষষ্ঠী দ্বার-ডানি-ভাগে।
পূজা করি ধর্ম্মকেতু তারে বর মাগে ॥
তিন দিনে নিদয়ার সুপথ্যি পাচন।
ছয় দিনে ষাটিয়ারা কৈল জাগরণ ॥
আটদিনে অষ্টকলাই কৈল ধর্ম্মকেতু।
নয়দিনে নবনত্রা কৈল শুভ হেতু ॥' [ঐ]

আবার কালকেতুর বিবাহ-অনুষ্ঠানেও 'ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের নিখুঁত ব্যবস্থার প্রবর্তন' করা হইয়াছে। ফুল্লরার অধিবাস বর্ণনায় দেখি :

'ব্রাহ্মণ বসিয়া পীঠে বেদমন্ত্র পড়ি ঘটে
গণেশেরে কৈল আবাহন।
দিয়া পঞ্চ উপচারে পূজা কৈলে দিবাকরে,
শুভক্ষণে গন্ধাধিবাসন॥' [ ঐ ]

অন্যদিকে আবার বরবেশী কালকেতুর শ্বশুরালয়ে অভ্যর্থনার সময় দেখা যায়:

'ছায়ামণ্ডপের তলে বসাল্য কুঞ্জরছালে
বন্ধুগণ মেলি কুতূহলে।
স্বস্তিবাক্য দ্বিজে করে বরণ করিলা বরে
বীর-ধড়া স্ফটিক-কুণ্ডলে॥' [ ঐ ]

এইভাবে অনার্য-সমাজে আর্য-সমাজের রীতিনীতি আমদানি করিয়া মুকুন্দরাম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের যে-চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে তাহা এক দ্বন্দ্বহীন মহান্ মানবতার পরিচয় বহন করিতেছে।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ন্যায় ঘনরাম, রূপরাম প্রভৃতি কবিদের রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যেও সংস্কৃতি-সমন্বয়ের স্বাক্ষর পরিস্ফুট। ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় যেরূপ লৌকিক ও পৌরাণিক আদর্শের সমন্বয় ঘটিয়াছে,[৩৩] ধর্মমঙ্গল কাব্যেও সেইরূপ এই সমন্বয়ধর্মিতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী অনার্য-প্রভাবিত রাঢ় অঞ্চলের একটি লৌকিক দেবতার কাহিনী। কিন্তু এই কাহিনীকে সাহিত্যের কোঠায় স্থান দান করিবার প্রাথমিক চেষ্টায়ই দেখা যায়, ইহার উপর পুরাণের একটা স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে। প্রাচীনতম ধর্ম-সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য ছিল পৌরাণিক রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী। পরবর্তী কালে লাউসেনকে লইয়া ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইলেও তাহাতে 'হরিশ্চন্দ্র পালা' নামে একটি অধ্যায় অনুস্যূত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে কৃত্তিবাসী রামায়ণেরও প্রভাব লক্ষিত হয়। ময়ূর ভট্ট হইতে আরম্ভ করিয়া ঘনরাম, রূপরাম প্রভৃতি ধর্মমঙ্গলের সকল কবির রচনায়ই 'মায়ামুণ্ড পালা' নামে একটি অধ্যায় পাওয়া যায়। 'ধর্মমঙ্গলের এই মায়ামুণ্ড পালাটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের একটি কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত। রামায়ণের কাহিনীটি এই যে, রাবণ রামচন্দ্রের এক মায়ামুণ্ড রচনা করিয়া অশোকবনে সীতার নিকট উপস্থিত করিলেন। সীতা ইহা দেখিয়া স্বামীর শোকে কাঁদিয়া অধীর হইলেন। অতঃপর হনুমানের নিকট হইতে প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইলেন। মায়ামুণ্ড পালাতেও লাউসেনের একটি মায়ামুণ্ড রচনা করিয়া,

তাহা তাঁহার পত্নীদিগের সম্মুখে আনিয়া স্থাপন করার কাহিনী আছে। অতএব দেখিতে পাইতেছি, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ই রামায়ণের কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রামায়ণের ছোট বড় কত ঘটনা যে ধর্ম্মমঙ্গলের মধ্যে গিয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।'[৩৪] ইহার উপর আবার ভাগবতেরও কিছুটা প্রভাব ধর্মমঙ্গলে পড়িয়াছে। ধর্মমঙ্গলের মহামদ চরিত্র চিত্রণে ভাগবতোক্ত কংস চরিত্রের ছায়াপাত ঘটিয়াছে। ধর্ম-মঙ্গলের উপর এই সকল পৌরাণিক প্রভাব লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই কাব্যকে পৌরাণিক আখ্যানের আধারে স্থাপিত করিবার একটি সচেতন প্রয়াস চলিয়াছে। লৌকিক দেবতাকে লইয়া কাব্য রচনা করিতে বসিয়া পুরাণ-বর্ণিত কাহিনীর আশ্রয় লওয়ার এই যে কৌশল, ইহাতে মধ্যযুগীয় বাঙালী কবির সমন্বয়ধর্মী মনেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে কেবল যে এইরূপ লৌকিক ও পৌরাণিক আদর্শের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চলিয়াছে তাহা নহে, জাতিবর্ণনির্বিশেষে মানুষকে মানুষ বলিয়া মর্যাদা দানেরও একটা ইঙ্গিত এই কাব্যে দুর্নিরীক্ষ্য নহে। গৌড়েশ্বরের প্রসাদপুষ্ট সামন্তরাজপুত্র মহাবীর লাউসেনের সহিত অস্পৃশ্য কালু ডোমের সম্প্রীতি স্থাপনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া ধর্মমঙ্গলের কবিগণ এক সাম্যাদর্শী মানবধর্মের নজীর তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহা ছাড়া, ঘনরাম-বিরচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যে ইছাই ঘোষের নগরপত্তনের বিবরণ পাঠ করিলে দেখা যায়, বিভিন্ন বৃত্তির বিভিন্ন লোকের একত্র সমাবেশ ঘটাইয়া সামাজিক বৈষম্যের অচলায়তনকে কিছুটা শিথিল করার চেষ্টা হইয়াছে। ইছাইয়ের নবস্থাপিত নগরে উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোকই সমভাবে আশ্রয় লাভ করিয়াছে।[৩৫] 'ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং কুলীন কায়স্থ ঘোষ বসু মিত্র বাস করিয়াছে। উত্তর-রাঢ়ী সিংহ দাস দত্ত এবং পাল ঘোষ ইত্যাদি গোপগণ বসতি স্থাপন করিয়াছে। তাম্বুলী, তাঁতী, তেলি, মালী, বণিক, কুমার, শাঁখারী, কর্মকার প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তির লোক ছিল। ইহা ব্যতীত পল্লবাদি গোপ, স্বুবর্ণবণিক, কলু, কৈবর্ত, ছুতার, বাইতি, জালু, রজক, মদক এবং অপার অন্ত্যজ জাতি বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এমন কি বহু গণিকাও ছিল।'[৩৬] আর, কেবল হিন্দু নয়, মুসলমানেরাও এই নগরে বাস করিতে আসিয়াছে :

'পুরীর অন্তর গড়ে স্বতন্তর
বসিল যবন যত।

পাইয়া মর্য্যাদা কত মীর্‌জাদা
সৈয়দ পাঠান কত ॥
সমরকুশল বসিল মোগল
সেখজাদা যত জনা।
পেলে এক রুটী সবে খায় বাঁটি
রণে পাশরে আপনা ॥' [ ঢেকুর পালা ]

'এখানে হিন্দু-মুসলমানের কোন বিরোধ নাই, সদ্ভাবে পাশাপাশি নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছে।'[৩৭]

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি এইভাবে মানবমৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া মধ্যযুগীয় ভেদজর্জর সমাজদেহকে সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিবার পথ্য প্রদান করিয়াছে।

প্রাচীন বাঙলাসাহিত্যের বৌদ্ধগানে, রামায়ণকথায় ও মঙ্গলকাব্যের বিপুল বিস্তারে মানবমৈত্রীর যে ধারাটি ক্ষীণস্রোতা তটিনীর ন্যায় কুলু-কুলু নাদে বাঙালীর মনোজগতে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাই কূলপ্লাবী রূপ ধারণ করিয়াছিল বাঙলার এক নবোদিত সংস্কৃতির পুণ্যস্পর্শে। বাঙলাসাহিত্যেব ইতিহাসে মধ্যযুগের এই নব সংস্কৃতিকে 'চৈতন্য-সংস্কৃতি' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বাঙালীর রক্তে, বাঙালীর ভাষায়, বাঙালীর সংস্কৃতি সভ্যতা ও সাহিত্যে বহুকাল হইতেই সমন্বয়নির্ভর একটা সাম্যবোধ মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল প্রভাতসূর্যের আলোকে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তুলিবার বাসনায়। চৈতন্য-সংস্কৃতি বাঙালীর ভাবরাজ্যের সেই প্রভাতসূর্য। ইহার আলোকসম্পাতে বাঙালীর বিকাশোন্মুখ হৃদয় যেন সহসা পূর্ণ বিকশিত হইয়া মানবপ্রেমের এক অনন্তলোকে উন্নীত হইয়া গেল। বাঙালী দুই হাত তুলিয়া এই সূর্যকে স্বাগত জানাইল।

কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্বে চলে আলো-আঁধারের খেলা। ষোড়শ শতাব্দীতে নবোদিত চৈতন্য-সংস্কৃতির স্পর্শে বাঙালীর যে মানস-জাগরণ ঘটিয়াছিল,[৩৮] তাহার পূর্বেও তেমনই একদিকে দেখা যাইতেছিল বাঙালীর সমাজ ও সাহিত্যে সাম্য ও মানবতা-বোধের অরুণাভাস, অপরদিকে চলিয়াছিল সর্বধ্বংসী এক অন্ধ তামসিকতার রাজত্ব। অনেকেই মুসলমান-শাসনের প্রভাবজাত বিলাস-ব্যসনের স্রোতে ভাসিয়া গেল, কুসংস্কার ও কু-প্রথার দাসত্ব করিয়া বাঙালীর দিন কাটিতে লাগিল ;[৩৯] জাতিভেদ ও শ্রেণী-বৈষম্য প্রবল হইয়া উঠিল। 'একদিকে অশনে বসনে অনুকরণপ্রিয় রাজানুগ্রহপুষ্ট কর্ম্মচারী, জায়গীরদার এবং নিয়োগী

চৌধুরী সরখেল তরফদারের দল। সাধারণের সঙ্গে সম্পর্কহীন, সাধারণের সুখ-দুঃখে উদাসীন, ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা-মদমত্ত এই সম্প্রদায় সাধারণকে কৃপার চক্ষে দেখিতে লাগিল। অন্যদিকে জাতিলোপ ভয়ে সন্ত্রস্ত, ভীরু, শুষ্ক আচার-নিয়মের কঙ্কালালিঙ্গনে নিষ্পিষ্ট, রুদ্ধশ্বাস বদ্ধজলার অধিবাসী মণ্ডুকবর্গ! এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিলেই মানুষকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, মানুষ দলে দলে ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিতেছে, ইহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশের উপক্রম ঘটিল, বাঙ্গালী জাতিটাই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এমন আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া উঠিল।'[৪০]

এই দুর্দিনে বাঙালীর আন্তর সত্তা—যাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া সাম্য ও মানবতার স্বপ্ন দেখিতেছিল—তাহা অকস্মাৎ সম্প্রসারিত হইয়া এমন একটি পরিমণ্ডল রচনা করিল যাহাতে এক যুগন্ধর মহামানবের আবির্ভাব সম্ভব হইয়া উঠিল। বাঙালীর 'হিয়া-অমিয় মথিয়া' চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার প্রচারিত প্রেম-ধর্মের আলোকে বাঙালী নূতন করিয়া জন্মলাভ করিল। তাঁহার অলৌকিক ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে, তাঁহার মানবপ্রেমমূলক শিক্ষায় বাঙালীর সমাজ-জীবন হইতে সকলপ্রকার বৈষম্যের অভিশাপ ঘুচিয়া গেল—বিশ্বব্যাপী প্রেমের জাদুস্পর্শে বাঙালীর অভিনব 'চিত্তবিস্ফোরণ' ঘটিল।[৪১]

মানুষ যে তুচ্ছ নয়, ক্ষুদ্র নয়, ঘৃণ্য নয়—সকল মানুষের মধ্যেই যে ভাগবত সত্তা বিদ্যমান, মানুষে মানুষে যে কোনো পার্থক্য নাই, ইহাই শ্রীচৈতন্যের প্রেমপরিশুদ্ধ জীবনচর্যার মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিল। ভগবৎ-প্রেমাবেশে আচণ্ডাল সকল মানুষকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তিনি সকলের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিলেন এবং নিজের মধ্যে সকলকে আবাহন করিয়া লইলেন। নিখিল মানবের সহিত এই যে একাত্মতাবোধ, ইহাই তাঁহাকে সর্বকালের মহামানব-সত্তায় উন্নীত করিয়া দিল।

তিনি নিজে কোনো গ্রন্থ বা বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তাঁহার জীবনই ছিল তাঁহার বাণী। সেই অলিখিত মহতী বাণীই পরবর্তী কালে বাঙালীর সমাজ ও সাহিত্যে মানবপ্রেমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আর তাহাই অনন্তকাল ধরিয়া বাঙালীকে হিংসাদ্বেষবিহীন মনুষ্যত্বের তীর্থভূমিতে যাত্রা করিবার প্রেরণা যোগাইবে।

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা'—শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত প্রেমধর্মের এই অমূল্য শিক্ষা মানুষকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, ধনের গর্ব, শক্তির দম্ভ, পাণ্ডিত্যের অহংকার সমস্তই অর্থহীন। যশোপ্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিষ্ঠার মতো

পরিত্যাগ করিয়াই মানুষকে মনুষ্যত্বলাভের পথে পা বাড়াইতে হয়। মনুষ্যত্ব সাধনলব্ধ ধন। ঈশ্বরপ্রেম ও জীবে প্রেম সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রকৃষ্ট পথ—প্রেমই মানবজীবনের পঞ্চম পুরুষার্থ। প্রেমহীন জীবনে ব্যর্থতাই একমাত্র সম্বল।

জীবনের এই নূতন ভাষ্য শুনিয়া অত্যাচারী অকস্মাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল—রাজপুরুষ তাহার প্রাসাদশীর্ষ ত্যাগ করিয়া পথের ধূলায় নামিয়া আসিল—সাকর মল্লিক ও দবীর খাস রূপ-সনাতন হইয়া গেল. হিংসাদ্বেষ ও জাতিবৈষম্য ভুলিয়া মানুষ মানুষকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। হিন্দুসমাজে দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহারা পতিত ও লাঞ্ছিত হইয়া দুঃখময় জীবন যাপন করিতেছিল—মানুষ হিসাবে সামান্যতম মর্যাদা লাভ করিতে না পারিয়া যাহারা স্বেচ্ছায় ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল—যবনদোষ বা স্পর্শদোষের পরিণামে যাহাদের ইসলাম-ধর্মের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছিল, তাহারা অনেকেই চৈতন্য-প্রচারিত ধর্মের মধ্যে শান্তি ও স্বস্তির নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়া পাইল। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইলে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্বিশেষে সকলকেই সম-মর্যাদা দেওয়া হইতে লাগিল। সাম্য ও প্রেমের অভিনব আলোকসম্পাতে বাঙালীর সমাজ-জীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সমাজের এই অবস্থারই প্রতিবিম্ব পড়িল সাহিত্যে। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করিয়া ধর্মের উদার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইলেন, রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদে প্রেমভক্তির প্রাধান্য ঘটিল, মানুষের জীবনকথা অবলম্বনে সাহিত্যের নূতন দিগন্ত উদ্ঘাটিত হইল, কান্ত-কোমল পদাবলীর মধুর রসের প্লাবনে জাতিকুলমান সমস্তই ভাসিয়া গেল। 'দেবতারে প্রিয়' এবং 'প্রিয়েরে দেবতা' করিয়া যে বৈষ্ণবসাহিত্য রচিত হইল, তাহার আবেদন হইয়া দাঁড়াইল মানবিকতার আবেদন—সাম্য ও প্রেমের আবেদন।

বাঙালীর জীবনে এই আবেদন কোনদিনই ব্যর্থ হইয়া যায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর সমাজ ও সাহিত্যে যে সাম্যবোধের প্রসার লক্ষিত হয়, তাহাকে হয়তো কোনমতেই চৈতন্যসংস্কৃতির এই মানবিক আবেদনের প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু আবার একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে বাঙালী তাহার মানসলোকে সাম্য ও মানবতাকে বরণ করিয়া লইবার একটা প্রচণ্ড শক্তি লাভ করিয়াছিল চৈতন্যযুগে; পরবর্তী কালে নানা কারণে এই শক্তি অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিলেও একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

উনিশ শতকের অনুকূল পরিবেশে বাঙালীমনের এই শক্তিই বাঙালীকে সকলপ্রকার ভেদবৈষম্যের উর্ধ্বে দাঁড়াইয়া শতাব্দীর নবোদিত সূর্যকে প্রণাম জানাইবার প্রেরণা যোগাইয়াছে।

---

১। নীহাররঞ্জন রায়ঃ 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', আদিপর্ব [১৩৫৬], পৃ. ৪০-৪১।

২। তদেব। পৃ. ৭৮।

৩। তদেব। পৃ. ৬৪।

৪। 'বৈদিক আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল একান্তই প্রাথমিক স্তরের। খড়, বাঁশ, লতাপাতার স্বল্পকালস্থায়ী কুঁড়ে ঘরে অথবা পশুচর্মনির্মিত তাঁবুতে ইহারা বাস করিত, গো-পালন জানিত, পশুমাংস পোড়াইয়া তাহাই আহার করিত এবং দলবদ্ধ হইয়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত।' তদেব। পৃ. ৭১-৭২।

৫। 'পাথরের হলমুখ, চকমকি পাথরের ছুরি ও কুঠার, নানাপ্রকার ধাতু ও মাটির থালাবাটি ইত্যাদি বিচিত্র রূপের নিত্যব্যবহার্য গৃহোপকরণ, মাটির তৈয়ারি নানাপ্রকারের খেলনা, তামা ও ব্রোঞ্জের দেহসজ্জোপকরণ, খেলার জন্য গুটি, গুলি ও পাশা ইত্যাদি অসংখ্য বিভিন্ন ও বিচিত্র উপাদান এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য।' তদেব। পৃ. ৬৯।

৬। 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥' [অ. ২ঃ শ্লোক ২২]

৭। নীহাররঞ্জন রায়ঃ 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', আদি পর্ব [১৩৫৬], পৃ. ৭৫।

৮। 'বাঙলা দেশ অনার্যপ্রধান দেশ। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় হইতে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে বাঙলা দেশে ছিটাফোঁটা করিয়া আর্য জাতি এবং তাহাদের ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আমদানি হইতে থাকে। কিন্তু এই বহিরাগত উপাদান বাঙলা দেশে প্রকারে ও পরিমাণে কখনও এমন প্রধান হইয়া উঠিতে পারে নাই যাহাতে তাহা স্থানীয় সকল উপাদানকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া একেবারে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে পারে।' শশিভূষণ দাশগুপ্তঃ 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি'

৯। বাঙালীর জীবনে অষ্ট্রিক প্রভাব মুখ্য হইলেও দ্রাবিড়ভাষীদের প্রত্যক্ষ

প্রভাবও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। '...মনে হয়, বাঙালীর টাট্‌কা ও শুকনা মৎস্যাহারে অনুরাগ, মৃৎশিল্প ও অন্যান্য কারুশিল্পে দক্ষতা, চারুশিল্পের অনেক জ্যামিতিক নক্সা ও পরিকল্পনা, নগর-সভ্যতার যতটুকু সে পাইয়াছে তাহার অভ্যাস ও বিকাশ, বিলাসোপকরণের অনেক সামগ্রী, জলসেচনে উন্নততর চাষের অভ্যাস প্রভৃতি দ্রাবিড়-ভাষাভাষী নরগোষ্ঠী প্রবাহেরই ফল।' নীহাররঞ্জন রায় : 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', আদিপর্ব [ ১৩৫৬ ], পৃ. ৭১।

১০। 'বাংলাদেশের এই মৎস্যপ্রীতি আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনোদিনই প্রীতির চক্ষে দেখিত না, আজও দেখে না; অবজ্ঞার দৃষ্টিটাই বরং সুস্পষ্ট।' তদেব। পৃ. ৫৩৮।

১১। 'বাঙলাদেশ কোনদিনই বৈদিকধর্মের দেশ নয়, বেদাচার-শাসিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাঙলাদেশে আগমন অনেক পরবর্তী কালে। গুপ্তসাম্রাজ্যের সময় হইতে বাঙলাদেশের আর্যীকরণ আরম্ভ হইলেও ঠিক বেদবিধি বাঙলাদেশে কোন দিনই খুব প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই।' শশিভূষণ দাশগুপ্ত : 'বৌদ্ধ-ধর্ম ও চর্যাগীতি'

১২। 'আজ পর্যন্তও বাঙালী জাতি এবং বাঙালীর সভ্যতা-সংস্কৃতি তাহার একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। আর্য জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্পষ্ট বিপুলায়তনের পিছনে বাঙালী জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গাধাবোটের মতন সর্বদা বাঁধিয়া না দিয়া তাহাকে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে যদি একটু স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারি তবে তাহাকে আমরা হয়ত আরও বেশি এবং আরও ভাল করিয়া দেখিতে পাইব।' তদেব। পৃ. ১১৪-১৫।

১৩। '...ভারতীয় আদিবাসীরা, অন্যান্য দেশের অনেক আদিবাসীদের মতো, বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল, ফুল, পশু, পক্ষী, বিশেষ বিশেষ স্থান ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিত; এখনও খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী, বুনো, শবর ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাহাই করিয়া থাকে।' নীহাররঞ্জন রায় : 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', আদিপর্ব [১৩৫৬], পৃ. ৫৭৬।

১৪। তুলসীর পৌরাণিক মহিমা সম্বন্ধে দুইটি কাহিনী পাওয়া যায় : ক. বিষ্ণুপুরাণমতে, তুলসী পূর্বজন্মে কালনেমি-নামক অসুরের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হয় বৃন্দা। প্রবল-প্রতাপ অসুররাজ জলন্ধরের সহিত বৃন্দার বিবাহ হয়। জলন্ধর শিবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইলে পতিপ্রাণা

বৃন্দা পতির মঙ্গলকামনায় বিষ্ণুর আরাধনা করিতে থাকেন। বিষ্ণু জলন্ধরের বেশ ধারণ করিয়া বৃন্দার নিকট উপস্থিত হইলে বৃন্দার তপোভঙ্গ হয়। সেই সময় জলন্ধরও শিবের হস্তে নিহত হন। সাধ্বী বৃন্দা সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইলে বিষ্ণু তাঁহাকে বর দেন যে, তাঁহার দেহভস্ম হইতে যে বৃক্ষ জন্মিবে তাহা বিষ্ণুস্বরূপ হইবে—সেই বৃক্ষকে পূজা করিলে বিষ্ণু পরিতুষ্ট থাকিবেন। বৃন্দার ভস্ম হইতে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ এই চারিটি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। খ. ব্রহ্মপুরাণমতে, তুলসী পূর্বে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার সখী ছিলেন। কোনো কারণে শ্রীমতী তুলসীর প্রতি রুষ্টা হইয়া অভিশাপ প্রদান করায় তুলসী রাজা ধর্মধ্বজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্খচূড় নামে এক অসুরের সহিত তুলসীর বিবাহ হয়। একসময়ে শঙ্খচূড়ের সহিত দেবতাদের যুদ্ধ বাধিলে তুলসী স্বামীর কল্যাণার্থে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে থাকেন। তুলসীর তপস্যায় শঙ্খচূড় যুদ্ধে অজেয় হইয়া উঠেন। কিন্তু দেবগণের অনুরোধে বিষ্ণু শঙ্খচূড়ের বেশ ধরিয়া তুলসীর সতীত্ব নাশ করিলে শঙ্খচূড় দেবতাদের হস্তে নিহত হন। পতিপরায়ণা তুলসী পতিবিরহে শোকাকুল হইয়া বিষ্ণুপদে পতিত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলে তাঁহার শরীর হইতে গণ্ডকী শিলার এবং কেশ হইতে তুলসী-বৃক্ষের উদ্ভব হয়।

১৫। আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' [১৩৫৭], পৃ. ৬৩।

১৬। 'মহেঞ্জোদরোতে আবিষ্কৃত শীলমোহরগুলির মধ্যে যোগাসনারূঢ় এক দেবমূর্ত্তির পরিচয় হইতে মনে হয় যে যোগীন্দ্র শিবের পরিকল্পনা প্রাগার্য্য [Pre-Aryan] সমাজ উদ্ভূত; কালক্রমে তাহাও আসিয়া পৌরাণিক পরিকল্পনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়।' তদেব। পৃ. ৬৩।

১৭। তদেব।

১৮। 'নিম্নতর সমাজ নিজস্ব সংস্কারের ভিত্তির উপর উচ্চতর সমাজ হইতে সর্ব্বদা তাহার সকল বিষয়ে প্রেরণা লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত মানসিক শিক্ষার অভাবে যে সকল উপকরণ উচ্চতর সমাজ হইতে তাহাতে গৃহীত হয়, তাহার মধ্যে তাহাদের যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হইতে পারে না—নিম্নতর সমাজের সংস্কারানুযায়ী তাহারা নূতন রূপে পুনর্গঠিত হয়। অনেক সময় তাহা এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে, তাহাদের মৌলিক পরিচয়ই উদ্ধার করা কঠিন হইয়া পড়ে।' তদেব। পৃ. ৬৩-৬৪।

১৯। তদেব। পৃ. ২৯৯।

২০। তদেব। পৃ. ৩০৪।

২১। তদেব। পৃ. ১৩৫-৩৬।

২২। তদেব। পৃ. ১৪৩।

২৩। তদেব। পৃ. ১৪৯।

২৪। তদেব। পৃ. ১৪৮।

২৫। 'ধর্মমতের ভিতরে আছে চিন্তা ও অনুভূতি—দুই-ই অমূর্ত; এই অমূর্তকে মূর্ত করিয়া তুলিতে না পারিলে সাহিত্য হয় না। তাহা করিতেই চাই রূপক, চাই অন্যান্য অলংকার। জীবন ও তাহার পারিপার্শ্বিকের রূপ ব্যতীত রূপক তাহার রূপ পাইবে কোথায়? অতএব তৎকালীন বাঙালী-জীবন এবং তাহার পারিপার্শ্বিক বাঙলা দেশকে পদে পদে এই দোহাগানগুলির ভিতরে আসিতে হইয়াছে। দর্শনের জটিলতম তত্ত্ব, সাধনার সূক্ষ্মতম অনুভূতিগুলিকেও প্রকাশ করিতে হইয়াছে স্থূলজীবনের চিত্রে ও ভাষায়।' শশিভূষণ দাশগুপ্ত: 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি'

২৬। 'তেঙ্গুর গ্রন্থমালায় সরহপাদকে মহাব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে, কুক্কুরীপাদও ছিলেন বাঙলার ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত। বিরূপাকে তেঙ্গুর তালিকায় যেভাবে 'আচার্য-মহাচার্য' 'মহাযোগী যোগীশ্বর' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে উচ্চবংশজাত বলিয়াই অনুমিত হয়। ইনি ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন। তিল্লোপা চট্টগ্রামের এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কাহ্নপা সম্ভবতঃ কায়স্থসন্তান ছিলেন। বীণাপার জন্ম হয় গৌড়ের ক্ষত্রিয়বংশে। লুইপা কায়স্থ, ডোম্বীপা ক্ষত্রিয়, নাড়োপা ও ভদ্রপা ব্রাহ্মণ, ভুসুকু রাজবংশজাত—ইঁহারা সকলেই উচ্চবর্ণে জন্মলাভ করিয়াছিলেন।' অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ১ম খণ্ড [ ১৯৫৯ ], পৃ. ১৯৭।

২৭। কৃত্তিবাসী রামায়ণ মূলতঃ 'শ্রীরাম পাঁচালী' নামে অভিহিত। সেকালে কৃত্তিবাস পাঁচালীকার বলিয়াই পরিচিত ছিলেন।

২৮। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ১ম খণ্ড [ ১৯৫৯ ], পৃ. ৫৫০।

২৯। 'আর্দ্রভূমির দেশ বাঙলা—এখানে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর এবং সর্বত্র সাপ। সুতরাং মনসার বন্দনা করিলে সর্পাঘাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, চণ্ডীর উপাসনা করিলে সমস্ত আপদ কাটিয়া যাইবে, দক্ষিণরায়-কালুরায়ের পূজা-শীর্ণি দিলে ভক্তকে আর বাঘ-কুমীরের আক্রমণে প্রাণ হারাইতে

হইবে না। এমনি করিয়া উপক্রুত অসহায় কৃষিসমাজ, নিম্নবর্ণ এবং স্ত্রীমণ্ডল ভয়ে-ভক্তিতে মনসার ভাসান গাহিয়াছে, চণ্ডীর মঙ্গলগান বাঁধিয়াছে, রঞ্জাবতী-লাউসেন-কানাড়া-কলিঙ্গার অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়াছে।' তদেব, ২য় খণ্ড

৩০। 'তিনশত বৎসরের একত্রাবস্থানের ফলে মুসলমান জাতি যে বাঙ্গালী সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছে···তাহার সরস বর্ণনা আমরা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে মুসলমানের উল্লেখে কোন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বা তিক্ত মনোভাবের চিহ্নমাত্র নাই।' শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' [১৯৫২]: 'ভূমিকা'।

৩১। তদেব।

৩২। আশুতোষ ভট্টাচার্য: 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' [ ১৩৫৭ ], পৃ. ৪০১।

৩৩। ধর্মঠাকুর মূলতঃ অনার্যদেবতা। রাঢ় অঞ্চলের আর্যেতর আদিবাসীরা এই দেবতার পূজা প্রচলন করে। কিন্তু পরবর্তী কালে এই লৌকিক দেবতাকে পৌরাণিক আভিজাত্যে মণ্ডিত করিবার জন্য ইহাকে কোথাও বিষ্ণু, কোথাও শিব, কোথাও যম, আবার কোথাও সূর্য বলিয়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

৩৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য: 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' [ ১৩৫৭ ], পৃ. ৫৯৭-৯৮।

৩৫। ঘনরামের কাব্যে ইছাই ঘোষের ঢেকুর গড়ে নগরপত্তনের বর্ণনা মুকুন্দরাম-রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর নবস্থাপিত গুজরাট নগরে বিভিন্ন জাতির বসতি স্থাপনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

৩৬। পীযূষকান্তি মহাপাত্র-সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচিত 'শ্রীধর্মমঙ্গল' 'ভূমিকা'।

৩৭। তদেব।

৩৮। '···বাংলা সাহিত্য, বাঙালী-মানস ও সমাজে চৈতন্যসংস্কৃতির যথার্থ প্রভাব আরম্ভ হইয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং তাহা পরিপূর্ণ চিত্তবৈশিষ্ট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এই শতাব্দীর সমাপ্তির দিকে।' অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', দ্বিতীয় খণ্ড

৩৯। চৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডে বৃন্দাবনদাস এই সময়কার নবদ্বীপ-সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়া সমগ্র বাঙলাদেশেরই সমাজচিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন :

'ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥...
...বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥'

৪০। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : 'পদাবলী-পরিচয়'

৪১। " 'চণ্ডালো'পি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ'—সদ্‌বংশজাত সুপণ্ডিত এক ব্রাহ্মণের মুখে ব্রাহ্মণ্যের এই নূতন সংজ্ঞার উদাত্ত প্রচারে, মুষ্টিমেয় গোঁড়া ব্রাহ্মণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেও, সাধারণ মানুষ আপনার এক নূতন রূপের সন্ধান পাইয়াছিল এবং জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এই উদার সমুন্নত মানবতার ক্ষেত্রে মুক্তি লাভ করিয়াছিল।" শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী : 'বৈষ্ণব পদাবলী—চয়ন' [ক. বি. সংস্করণ, ১৯৫৮] : ভূমিকা।

## তৃতীয় অধ্যায়

১৭৫৭ সাল। পলাশীর রক্তরাঙা প্রান্তরে ইংরাজ বণিকের বিজয়পতাকা উড়িল। 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে।' ইংরাজ বাঙলা অধিকার করিল, অধিকার করিল ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষই। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়া ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রায় সমস্তটাই লাল হইয়া গেল। কিন্তু এই লাল রঙের আড়ালে কত-যে কালো রঙের ছড়াছড়ি, তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস বোধ হয় এখনও লোকমানসের অগোচরই রহিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের মাটিতে আধিপত্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজ বণিকের স্বার্থান্ধ লোলুপতার জঘন্য প্রকাশ দেখা গেল। দেশীয় কালা আদমীর জীবনরস শোষণ করাই তাহাদের শাসনক্রিয়ার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। শাসনের নামে শোষণযন্ত্রের বেপরোয়া ব্যবহার করিয়া হঠাৎ-প্রভু শ্বেতাঙ্গ বণিকগণ দেশের জনসাধারণকে দারিদ্র্যের ধূলিমলিন পথপ্রান্তে নামাইয়া দিল। ইংরাজের ভূমিরাজস্ব ও শিল্প-সংক্রান্ত আগ্রাসী নীতির ফলে দেশজোড়া 'ভূমিহীন কৃষকসম্প্রদায় ও বৃত্তিহীন শিল্পীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল'।

বাঙলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক চিরস্থায়ী অকল্যাণ সূচিত করিল। একদিকে ইংরাজ-প্রসাদ-পুষ্ট মুষ্টিমেয় জমিদারশ্রেণীর লোকেরা বিলাস-ব্যসনের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্তে দিনপাত করিতে লাগিল, অপরদিকে পরাণ মণ্ডল হাসিম শেখের দল— যাহাদের লইয়া দেশ—তাহারা নিজগৃহে পরবাসী হইয়া কেবল নিজেদের অতিক্ষুদ্র অস্তিত্বটুকু বজায় রাখিবার জন্য কঠোর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হইল। ইহার উপর আবার দেখিতে দেখিতে শুরু হইল নীলকর সাহেবদের অত্যাচার। তাহাদের 'শ্যামচাঁদ'-এর আস্ফালনে নিরুপায় প্রজারা ধানের জমিতে নীলের দাদন লইয়া সংবৎসর অনশন ও অর্ধাশন বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইল। নীলকুঠির বিষবাষ্পে বাঙলার কত-যে 'সোনার স্বরপুর' উৎসন্ন হইয়া গেল—কত গোলোকচন্দ্র ও সাধুচরণের পরিবারে যে দুর্ভাগ্যের করাল ছায়া নামিয়া আসিল —কত-যে ক্ষেত্রমণির নারীত্ব লাঞ্ছিত হইল, তাহার হিসাব কে রাখে?

বাঙলাদেশে ইংরাজ-শাসনের অপর একটি কলঙ্কময় চিত্র পাওয়া যায় শিল্পের ক্ষেত্রে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশের শাসনক্ষমতা হাতে পাইয়া দেশীয়

শিল্পকে পর্যুদস্ত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। শিল্পসমৃদ্ধ বাঙলাকে ছন্নছাড়া করিয়া দিয়া কোম্পানীর বণিকগণ ইংলণ্ড হইতে আনীত শিল্পদ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায় শুরু করিয়া দিল। ইহার উপর আবার ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নূতন নীতির ফলে ইংলণ্ডের সাধারণ ইংরাজও এদেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভ করিল।[১] 'একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর!' একেই তো কোম্পানীর বণিকগণ দেশীয় শিল্পের উপর খড়্গাঘাত করিতেছিল, তাহার উপর আবার আসিয়া জুটিল সাগরপারের অর্থলোলুপ সাধারণ ইংরাজ ব্যবসায়ীর দল। এই সকল ব্যবসায়ীর অনেকে আবার এদেশে আসিয়া বড় বড় কলকারখানা খুলিয়া বসিল। ফলে এদেশের যেটুকু শিল্পসমৃদ্ধি অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিনষ্টির পথ ধরিল—'যন্ত্রের প্রভাবে দেশের কারিগর শ্রেণীর মানুষ সহসা বৃত্তিচ্যুত হইল'। কিন্তু বৃত্তিহীন এই দরিদ্র শিল্পীদের পাশে পাশেই আবার সমাজে একদল লোক ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়া উঠিল। তাহাদের কেহ কেহ ইংরাজ ব্যবসায়ীদের মুৎসুদ্দিগিরি করিয়া, কেহ কেহ ইংরাজের বাণিজ্য-সহায়ক নানাপ্রকাব ব্যবসায় ফাঁদিয়া প্রচুর ধনোপার্জন করিতে লাগিল। ইহা ছাড়া, এদেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তৃতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সরকারী বিভাগে ও সওদাগরী অফিসে যে-সকল দেশীয় ইংরাজী-জানা লোকের কর্মসংস্থান হইল, তাহারাও মোটামুটি আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যেই দিন কাটাইতেছিল। মারা পড়িল কেবল দেশের অগণিত কৃষক ও কারিগরের দল। ইংরাজেব অপরিমিত স্বার্থবুদ্ধি দেশের ভিতর গুরুতর শ্রেণীবৈষম্যের সৃষ্টি করিল।

প্রভুত্বগর্বী ইংরাজ যে কেবল দেশের কৃষি ও শিল্পের উপর আঘাত হানিয়াই নিরস্ত রহিল তাহা নহে—শাসনব্যাপারেও যথেচ্ছচারিতার পরিচয় দিতে লাগিল। মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়া, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া, পক্ষপাতদুষ্ট বিচারপ্রথার প্রচলন করিয়া ইংরাজের স্বৈরাচার ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া চলিল।

কিন্তু মজা এই, ইংরাজ-শাসনের প্রথম দিকে ইংরাজের কোনো দোষক্রটিই বাঙলার সাধারণ জনচিত্তে তেমন দাগ কাটিতে পারে নাই। 'ইংরাজ দেশে শান্তি আনিয়াছে। চোর ডাকাতের ভয় নষ্ট করিয়াছে,...। এই সকল দেখিয়া বাঙ্গালী ইংরাজকে ভালবাসিতে ও ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল।'[২] সাধারণ বাঙালী তো দূরের কথা, বাঙলার শিক্ষিত ও গণ্যমান্য লোকেরাও এই সময়ে

ইংরাজ-শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলিয়া মনে করিতেন। ইংরাজ-শাসনের স্থায়িত্ব কামনা করিয়া স্বয়ং রামমোহন একদা বলিয়াছিলেন: 'Among other objects, in our solemn devotion, we frequently offer up our humble thanks to God, for the blessings of British Rule in India and sincerely pray, that it may continue in its beneficent operation for centuries to come.'[৩]

সমসাময়িক কালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিম্নোদ্ধৃত ইংরাজস্তুতিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'If we were to be asked, what Government we would prefer, English or any other? We would one and all reply, English by all means—ay even in preference to a Hindoo Government.' [*India Gazette* : July 4, 1831]।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত ইংরাজ-সরকারের প্রতি বাঙালীর এই শ্রদ্ধা প্রায় সমভাবেই অবিচলিত ছিল। কিন্তু ইহার পর হইতেই ক্রমে ক্রমে 'শিক্ষিত বাঙালীর স্বপ্নভঙ্গ হইতে লাগিল'। শিক্ষিত বাঙালীর মন ইংরাজ-সরকারের নখদন্ত দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। ইংরাজ যে শাসনের নামে শোষণ করিতেছে—নূতন নূতন বিধি-বিধানের রক্তচক্ষু দিয়া দেশের কোটি কোটি লোককে দাবাইয়া রাখিতে চাহিতেছে—প্রভুশক্তির রূঢ় আস্ফালনে দেশবাসীকে সন্ত্রস্ত করিয়া দিয়া নিজের নবলব্ধ অধিকারকে কায়েম করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ইংরাজের এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তখন বাঙলার শিক্ষিতকণ্ঠে প্রতিবাদের স্বর ধ্বনিত হইল। শাসক ও শাসিতে যে গুরুতর বৈষম্য প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রতিরোধকল্পে পত্রে, প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় বাঙালীর একটা বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। দেশের মধ্যে কিছুটা রাজনীতির আবহাওয়া সৃষ্ট হইল। কিন্তু ঠিক রাজনৈতিক চেতনা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা তখনও বাঙালীর মনে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই—তখনও বাঙালীর স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত হয় নাই। ইহার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

বাঙলার শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনের এই যে পরিবর্তন, ইহাকে প্রধানতঃ ইংরাজীশিক্ষার ফল বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। ইংরাজের সাহচর্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই ইংরাজীশিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে

প্রবেশলাভ করিতেছিল। তাহা ছাড়া, দেশের প্রাচীন অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়ায় জীবিকার তাড়নায় একদল বাঙালী ইংরাজের অধীনে বিভিন্ন কর্মসংস্থানের প্রয়াসী হইয়া উঠিয়াছিল; তাহারা কতকগুলি ইংরাজী শব্দ আয়ত্ত করিয়া কাজচালানো গোছের একপ্রকার ইংরাজী শিখিয়া লইতেছিল।[৪] প্রধানতঃ কলিকাতা শহরেই এইরূপ ইংরাজীশিক্ষার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতার বহু সম্রান্ত গৃহস্থই তাঁহাদের সন্তান-দিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে কলিকাতায় সেরবার্ন [Sherburne], মার্টিন বৌল [Martin Bowle], আরটুন পিট্রাস [Arratoon Petres] প্রভৃতি ফিরিঙ্গীর কয়েকটি ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। সম্রান্ত বাঙালী ঘরের ছেলেরা এইসব ফিরিঙ্গী-বিদ্যালয়ে গিয়া 'ফিলজফার—বিজ্ঞলোক, প্লৌম্যান—চাষা।/ পমকিন—লাউ কুমড়ো, কুকুম্বার—শশা॥'[৫] প্রভৃতি কতকগুলি ইংরাজী শব্দ ও তাহাদের অর্থ কণ্ঠস্থ করিয়া ইংরাজীশিক্ষা সমাপ্ত করিত।

এদেশে ব্যাপকভাবে ইংরাজীশিক্ষা বিস্তারের কাজ শুরু হয় ইহার আরও অনেক পরে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়ার সময় ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে বার্ষিক একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। '১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ সাল পর্য্যন্ত কিছুই করা হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঐ বৎসরে, ১৭ই জুলাই, কমিটী অব পাবলিক ইনষ্ট্রকশন [Committee of Public Instruction] নামে একটি কমিটী গঠিত হয়। ঐ কমিটীর সভ্যগণ সেই এক লক্ষ টাকা প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ, পণ্ডিতদিগের বৃত্তি ও সংস্কৃতশিক্ষার্থীদিগের বৃত্তি প্রভৃতিতে ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন।'[৬] অবশ্য এই সময়ে ডেভিড হেয়ার, রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের চেষ্টায় ইংরাজীশিক্ষা প্রসারের কাজ কিছু কিছু অগ্রসর হইতে থাকে।[৭] সুবিখ্যাত হিন্দু কলেজ [১৮১৭] স্থাপিত হয়, কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি [১৮১৭] ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি [১৮১৮] গঠিত হইয়া নবস্থাপিত কয়েকটি ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইংরাজীশিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেয়। ইহা ছাড়া, মিশনারীদের চেষ্টায় শ্রীরামপুর কলেজ [১৮১৫] এবং বিশপ্‌স্ কলেজের [১৮২০] প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু সরকারপক্ষ হইতে ইংরাজীশিক্ষা প্রচলনের কাজ শুরু হয় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল। তাঁহার নবনিযুক্ত

প্রধান ব্যবস্থা-সচিব লর্ড মেকলে পার্লামেণ্ট-অনুমোদিত বার্ষিক এক লক্ষ টাকা কেবল এদেশে ইংরাজীশিক্ষার প্রচারকল্পেই ব্যয় করার সুপারিশ করেন এবং এই মর্মে সরকারের নিকট একটি দীর্ঘ মন্তব্যপত্র পেশ করেন।[৮] ইহার পর হইতেই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বিপুল উদ্যমে স্কুল-কলেজ স্থাপিত হইতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিলগ্নের পূর্বেই বাঙলার সুদূর পল্লী-অঞ্চলেও ইংরাজীশিক্ষার বিস্তৃতি ঘটে।

বাঙলা তথা ভারতবর্ষের সর্বত্র ইংরাজীশিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য ইংরাজ সরকার যে বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিষয়ে একটি কথা ভাবিবার আছে। ইংরাজ যে এদেশের 'নেটিভ'দের প্রতি প্রীতিবশতঃ ইংরাজীশিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা নহে। ভারতবর্ষে ইংরাজীশিক্ষা প্রচারের পিছনে ইংরাজের অন্যপ্রকার অভিসন্ধি ছিল। 'দূরদর্শী ইংরাজ মনীষীরা ইহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন যে কেবল ভয় দেখাইয়া এই বিপুল জনসমুদ্রকে বহুদিন নিজেদের শাসনাধীনে রাখা সম্ভব হইবে না। লাঠির জোরে মাটি জয় হইয়াছে বটে, এখন যদি নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বলে এদেশের লোকের চিত্তকে জয় না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রভুশক্তি কিছুতেই বেশীদিন তিষ্ঠিতে পারিবে না।'[৯] ইহা ছাড়া, ভারতবাসীকে ইংরাজীশিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিয়া বড় রকমের একটা বাণিজ্যিক সিদ্ধি লাভের দিকেও ইংরাজের লক্ষ্য ছিল। 'ইংরাজ বুঝিয়াছিল যে, ভারতবাসী কিয়দংশে ইংরাজী ধরনে শিক্ষিত না হইলে তাহাদের রুচি ও প্রয়োজনের মান বৃদ্ধি পাইবে না। জনসাধারণকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন বিলাতী দ্রব্যের প্রয়োজন বোধ করিতে পারে।'[১০]

ইংরাজের এই স্বার্থবুদ্ধিজাত অভিসন্ধি অনেক পরিমাণেই সফল হইয়াছিল সত্য ; কিন্তু জগতের বহু অমঙ্গলের মধ্যে যেমন মঙ্গলের বীজ নিহিত থাকে, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ইংরাজীশিক্ষা ভারতবাসীর পক্ষে শাপে বর হইল। বাঙলার উর্বর মাটিতেই এই শিক্ষার ফল ফলিল সর্বাপেক্ষা বেশী। ইংরাজীশিক্ষা ও ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বাঙালী জাতির মধ্যে প্রাণের জোয়ার নামিয়া আসিল। মুক্তবেণী গঙ্গার মতোই পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবল ধারা বাঙালীকে এক অভিনব মুক্তির আশ্বাস দান করিল। সে-মুক্তি সর্ববিধ কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্তি—সে-মুক্তি মনুষ্যত্বের পরিপন্থী সকলপ্রকার বৈষম্য হইতে মুক্তি। বাঙালীর সমাজ ও সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হইল।

এই নবযুগ-চেতনার প্রধান লক্ষণই হইল যুক্তিবাদ ও মানবতাবোধ। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ধাক্কায়ই নব্যশিক্ষিত বাঙালী এদেশের চিরাগত যুক্তিহীন রীতি-নীতির সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করিল—মনুষ্যত্বকে খর্ব করার সকলপ্রকার অপচেষ্টার মূলে প্রবল আঘাত হানিতে উদ্যত হইল—বিদেশী শাসকচক্রের বৈষম্য-মূলক ও উদ্ধত আচার-আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত করিল। 'মানবজীবনের মূল্য ও মহত্ত্ব-বোধই এই যুগের প্রধানতম যুগপ্রবৃত্তি' হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে কত-না নব নব সংস্কার-আন্দোলন দেখা দিল—কত নূতন নূতন চিন্তার ফসল ফলিতে লাগিল! বহুপ্রাচীন নির্মম সতীদাহপ্রথার বিলোপ ঘটিল, বহুবিবাহ রোধের জন্য জনমত সংগঠিত হইল, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করিয়া স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবি তোলা হইল, বালবিধবার ললাটে সিন্দূরবিন্দু আঁকিয়া দিয়া তাহার অশ্রুমোচনের চেষ্টা চলিতে লাগিল। এক কথায়, নারীকে তাহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সকল রকমের উদ্যোগ শুরু হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেশের দরিদ্র ও নিপীড়িত জনসমাজের প্রতিও সমবেদনার বাণী সোচ্চার হইয়া উঠিল। বঞ্চিত কৃষককুলের দুঃখমোচনের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল, নীলকর সাহেবদের দাদনগ্রন্থি হইতে রায়তদের মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে জনসমক্ষে 'নীলদর্পণ' তুলিয়া ধরা হইল, বৃত্তিহীন শিল্পি-সমাজের ভাগ্যবিপর্যয় রোধ করিবার জন্য দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস চলিতে লাগিল। এদিকে আবার ধর্মের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইল। ধর্মবিরোধের অবসানকল্পে সর্বজনীন ধর্মমত [Universal religion] হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী উচ্চারণ করিয়া বলা হইল—'যত মত তত পথ'। ইহা ছাড়া, যখনই ইংরাজ সরকারের স্বৈরাচার অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল—যখনই দেশীয় লোকের স্বাধিকারের মর্যাদাকে পদদলিত করিয়া প্রভুশক্তির দম্ভ প্রকাশ পাইতেছিল, বাঙলার ইংরাজীশিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ তখনই তাহার প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠিতে লাগিল। শিক্ষিত বাঙালী সেদিন চাহিয়াছিল মানবতার সার্থক আত্মরূপায়ণ। তাই আইনের চোখে নিরপেক্ষতা দাবি করিয়া, পক্ষপাতদুষ্ট বিচারপ্রথার বিরুদ্ধে সুতীব্র অভিমত প্রকাশ করিয়া, নাগরিকের মৌলিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়া বিদেশী শাসকবর্গের নিকট সে আত্মমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করিয়াছিল। বাঙালীর এই যে মর্যাদাবোধ, ইহাই পরে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের মধ্য দিয়া শেষ পরিণতি লাভ করিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বাঙালী তাহার স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করিয়াছিল। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে সেই সংগ্রামের সূচনা, দ্বিতীয়ার্ধে তাহারই পরিণত রূপ। বাঙালীর এই দীর্ঘায়ত সংগ্রামী সাধনার পিছনে—সকলপ্রকার সংস্কার-আন্দোলনের মূল উৎসরূপে ছিল নব্যশিক্ষিত তরুণ বাঙালীর হৃদয়ে সহসা-উদ্বোধিত মানবমহত্ত্ববোধ। মানুষ যে ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয়—সকল মানুষেরই যে সমাজে স্বতন্ত্র মূল্য রহিয়াছে, বাঙালীর মনে এই বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় সঞ্চারিত হইয়াছিল ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে। মানবমহিমা সম্বন্ধে এই যে বলিষ্ঠ প্রত্যয়, ইহাই সাম্যবাদের উৎসভূমি।

ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত বাঙালীর মানস-অভিসার ঘটিয়াছিল পাশ্চাত্ত্যের ভাবলোকে। পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের বিভিন্ন ভাবধারার প্লাবনে বাঙালীর প্রাণসত্তায় দেখা দিয়াছিল বিচিত্র উন্মাদনা—হৃদয়ে মন্দ্রিত হইয়া উঠিয়াছিল নবযুগের ডমরুধ্বনি। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, পাশ্চাত্ত্যের এই সকল ভাবধারার অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বাঙালীকে সাম্যবোধের পথনির্দেশ দিয়াছিল।

বেকন,[১১] লক্,[১২] হিউম,[১৩] পেইন[১৪] প্রভৃতি মনীষীদের যুক্তিনিষ্ঠ মতবাদ বাঙলার শিক্ষিত সমাজে সংস্কারমুক্তির অভিনব প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। ইহার ফলে একদিকে যেমন সকলপ্রকার অন্ধবিশ্বাসের মূলে প্রবল আঘাত পড়িয়াছিল, অপরদিকে তেমনই নানাবিধ বৈষম্যের বজ্রবন্ধনও অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙালী সেদিন যুক্তি-বিচ্ছুরিত আলোকের অভিসিঞ্চনে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুপ্রথার অন্ধ তমিস্র হইতে সমাজকে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিল এবং সেই সঙ্গেই অভিযান চালাইয়াছিল বর্ণবিভেদ, ধর্মীয় বৈষম্য, ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য, এমন কি শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ ও কৃষ্ণকায় দেশীয় লোকদের মধ্যে সুপরিকল্পিত বিভেদসৃষ্টির বিরুদ্ধে। তরুণ বাঙলা সেদিন জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যুক্তিবাদের জয় ঘোষণা করিয়া সকলপ্রকার ভেদ-বিভেদ-বিনির্মুক্ত মানবমহিমার প্রতিষ্ঠাব্রত গ্রহণ করিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিল পাশ্চাত্ত্যের দুইটি বিশিষ্ট মতবাদ। একটি—বেন্থাম ও মিলের প্রচারিত উপযোগবাদ [Utilitarianism][১৫], অপরটি—ফরাসী মনীষী অগাস্ট কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ [Positivism][১৬]।

**Utilitarianism** বা উপযোগবাদে মানুষের হিতসাধনের কথাই বিশেষভাবে

বলা হইয়াছে। এই মতবাদের মূল কথাই হইল—'the greatest good of the greatest number'। রাষ্ট্রে ও সমাজে যাহা কিছু করা হইবে তাহা কেবল 'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়'। সহস্র লোকের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জনের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই, তাহাকে কোনমতেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি বলিয়া গণ্য করা চলিবে না। অর্থাৎ 'greatest number'-কে সুখী করাই দেশকল্যাণ তথা মানবকল্যাণ সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা। 'Greatest number'-এর হিতসাধনের এই যে মতবাদ, ইহাতে বিতর্কের অবকাশ থাকিলেও ইহারই ভিতর দিয়া সর্বমানবের কল্যাণসূচক সাম্যবাদের পদধ্বনি শ্রুত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর সাহিত্যচিন্তায় এই মতবাদের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রপীড়িত বঙ্গদেশের কৃষকের প্রতি বাঙলা-সাহিত্যে যে সমবেদনার বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহারও মূলে এই মতবাদের প্রেরণা ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

Positivism বা প্রত্যক্ষবাদের মূল কথা হইল এই যে, যাহা কিছু প্রত্যক্ষ-ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই একমাত্র সত্য—তদতিরিক্ত কোনো বিষয়ই আমাদের নিকট বিবেচ্য নহে।[১৭] 'It must cease to concern itself with theological myths and metaphysical abstractions, and confine itself to actual facts determined by observation and history'[১৮]

মনীষী কোঁতের এই ধর্মনিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ-মতবাদ একান্তভাবেই বাস্তববুদ্ধি-প্রণোদিত। এই বাস্তববুদ্ধিই তাঁহাকে মানবমহিমার মূল্যায়নে স্বচ্ছ দৃষ্টি দান করিয়াছে। সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনা লইয়া যে মানুষ, সেই মানুষ ও তাহার সকল সমস্যা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত। দৃশ্যমান পৃথিবীতে এই প্রত্যক্ষ মানুষের চেয়ে বড় আর কিছুই নাই। অতএব মানুষের কল্যাণসাধনই একমাত্র ধর্ম।[১৯] Positivism মতবাদের মধ্য দিয়া মানবদরদী কোঁত এই মানবসেবার আদর্শই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য ইহাকে 'Religion of Humanity' [La religion de l'humanité] বা মানবধর্ম বলা হইয়াছে। নবযুগের বাঙলায় বাঙালীর মননকর্ম ও সাহিত্যে এই 'Humanity-পূজার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার' বলিয়া মূলতঃ মানবসেবার যে-আদর্শ বাঙলা সাহিত্যে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার উৎস অনুসন্ধান করিলে হয়তো বেদান্তবাদের পাশেই মনীষী কোঁতের মতবাদের সাক্ষাৎ লাভ

করা যাইবে। কোঁত-প্রচারিত এই মতবাদকে ঠিক সাম্যবাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলেও ইহাই যে কালক্রমে বিবর্তিত হইয়া সাম্যবাদের রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা মানিয়া লইতে বাধা কোথায়?

নবযুগের বাঙলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্যের যে-সকল মনীষী সাম্যচিন্তার বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ফরাসী দার্শনিক রুশোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রুশোর সাম্যবাদী ধ্যানধারণা একদা ফ্রান্স তথা সমগ্র ইউরোপের চিন্তাজগতে এক মহাবিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। বৈষম্যপীড়িত ও শোষণত্রস্ত মানবসমাজে সাম্য ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাকল্পে রুশো লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মানুষ স্বভাবতঃ [naturally] ভালো, সভ্যতাই তাহাকে বিপথগামী করিয়াছে। প্রকৃতির কোলে লালিত স্বভাবসরল আদিম মানুষের দল পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া মহাসুখে দিন কাটাইত—লোভ, স্বার্থপরতা, বৈষম্য তাহাদিগকে স্পর্শও করিত না।[২০] সভ্যতার ফলেই মানুষের যত দুঃখ দেখা দিল—দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার আরম্ভ হইল—ধনীর অপরিমিত লালসা দরিদ্রের বক্ষোরক্ত শোষণ করিতে উদ্যত হইল—আদিম সাম্য ও শান্তির সমাধি রচিত হইল। "The first man who, after enclosing a piece of ground, bethought himself to say 'this is mine', and found people simple enough to believe him, was the real founder of civil society."[২১] এই 'civil society' বা সভ্যসমাজ গঠিত হওয়ার পর হইতেই অনন্ত পরম্পরায় চলিতেছে যুদ্ধ, হত্যা, শোষণ, ভয় প্রভৃতি মানবজাতির নানা-প্রকার দুর্দশা।[২২] মানবসমাজের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার অভিপ্রায়ে রুশো তাঁহার 'Social Contract' গ্রন্থে মানুষের সকলপ্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শৃঙ্খল ভঙ্গ করার পথনির্দেশ দিয়াছেন।[২৩] এই গ্রন্থে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার: 'To renounce one's liberty is to renounce one's quality as a man, the rights and also the duties of humanity.'[২৪]

রাষ্ট্র-পরিচালনায় তিনি জনসাধারণের অভিমতকেই [general will] সর্বোপরি স্থান দান করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতায় [sovereignty] অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ জনসাধারণের সহিত এক পবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ।[২৫] এই চুক্তি অনুসারে রাজা যদি জনমতের বিরোধী কোনো কাজ করেন, তাহা হইলে রাজাকে পদচ্যুত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে

জনগণের। অতএব মানুষ হিসাবে রাজা ও প্রজা সমান—রাজা প্রজার প্রতিনিধিমাত্র। ইহা ছাড়া, মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন তুলিয়া রুশো বলিয়াছেন : 'Every man has by nature a right to all that is necessary to him……'[২৬] রুশোর প্রচারিত এই সাম্যনীতি ঊনবিংশ শতাব্দীর [বিশেষতঃ এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের] বাঙলা সাহিত্যে মৃদু-গুরু গুঞ্জন তুলিয়া অবশেষে 'চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী'[২৭] বলিয়া সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে।

সাম্যচিন্তার এক ধরনের পরিণত ফসল এযুগের বহুল-প্রচারিত Communism বা সাম্যবাদ।[২৮] এই মতবাদের মূল আদর্শ হইল শ্রেণীহীন সমাজ [Classless Society] গঠন। মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া যে বহুমুখী শোষণ [exploitation] চলিতেছে, তাহারই অবসানকল্পে এই শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার পরিকল্পনা। মানুষের চিন্তারাজ্যে এই পরিকল্পনার উদয় হইয়াছিল বহুকাল পূর্বেই। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁহার সুবিখ্যাত 'Republic' গ্রন্থে ন্যায় [Justice]-নির্ভর একধরনের সাম্যভিত্তিক আদর্শ রাষ্ট্র [Ideal State] গঠনের কথা বলিয়া গিয়াছেন। ইহার পর হইতে পাশ্চাত্ত্যের কত মনীষী যে কতভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সাম্যাদর্শে সুগঠিত করিয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি [private property] যে সমাজে গুরুতর বৈষম্য ও অকল্যাণ সৃষ্টি করে, তাহা লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্ত্যের বহু চিন্তানায়ক সম্পত্তির অধিকার-সম্পর্কীয় সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধানের পথ খুঁজিয়াছেন।

রুশো প্রথমে বলিয়াছিলেন : 'ভূমি সর্বসাধারণের ; এই পৃথিবীর ভূমিতে রাজা ও ভিক্ষুকের সমান অধিকার'। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি তাহার এই মত পরিবর্তন করেন। 'সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি প্রথমাধিকারীকে অধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু অবস্থাবিশেষে মাত্র—প্রথম, যদি ভূমি পূর্ব্বে অধিকৃত না হইয়া থাকে ; দ্বিতীয়, অধিকারী যদি আত্মভরণপোষণের উপযোগী মাত্র ভূমি অধিকার করে, তাহার অধিক না লয় ; তৃতীয়, যদি নামমাত্র দখল না লইয়া, কর্ষণাদির দ্বারা দখল লওয়া হয়, তবে অধিকৃত ভূমি অধিকারীর সম্পত্তি।'[২৯]

জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে উপার্জিত সম্পত্তিতে উপার্জনকারীর সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। 'যে যাহা আপন পরিশ্রমে বা গুণে উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা অপর্য্যাপ্ত হইলেও তাহার যাবজ্জীবন ভোগ্য এবং তাহার জীবনান্তেও

যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিয়া যাইবার তাহার অধিকার আছে। কিন্তু যদি আপন জীবনান্তে সে কাহাকেও না দিয়া যায়, তবে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি একা ভোগ করিবার অধিকার কাহারও নাই।...যাহার সন্তান আছে, তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে সন্তানের আবশ্যকীয় ধন রাখিয়া, অবশিষ্ট জনসাধারণের অধিকার হওয়া কর্ত্তব্য। যাহার সন্তান নাই, তাহার সমুদায় সম্পত্তিতেই জনসাধারণের অধিকার হওয়া কর্ত্তব্য।'[৩০]

লুই ব্লাংক ছিলেন শ্রমানুসারে ধনসম্পত্তি বণ্টনের পক্ষপাতী। সকল মানুষই সমান পরিশ্রম করিতে পারে না ; কেহ 'অল্পশ্রমী', কেহ 'বহুশ্রমী', কেহ 'কর্মিষ্ঠ', কেহ 'অকর্মিষ্ঠ'। সকলকেই উৎপন্ন ধনের সমান অংশীদার করা অনুচিত। ব্লাংকের মতে যে যেমন পরিশ্রম করিবে তাহাকে সেই অনুপাতে পুরস্কৃত করিতে হইবে।

সেণ্ট সাইমনও অনেকটা এই মত পোষণ করেন। তাঁহার অভিমত এই যে : '...সকলেই যে সমভাবে ধনভোগী হইবে বা সকলেই এক প্রকার পরিশ্রম করিবে, বা সকলেই সমান পরিশ্রম করিবে এমত নহে। যে যেমন পরিশ্রমের উপযুক্ত ও যে যে কার্য্যের উপযুক্ত, সে তেমনি পরিশ্রম করিবে ও সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। কার্য্যের গুরুত্ব এবং কর্ম্মকারকের গুণানুসারে বেতন প্রদত্ত হইবে। যে যাহার যোগ্য, তাহাতে তাহাকে নিযুক্ত করিবাব জন্য, যে প্রকারে পুরস্কৃত হইবে, তাহা নিরূপণ এবং সর্ব্বপ্রকাব তত্ত্বাবধারণ জন্য কতকগুলিন কর্ত্তৃপক্ষ থাকিবেন। ভূমি ও ধনোৎপাদক সামগ্রী সকল সাধারণের।'[৩১]

ফুরিয়ে সীমিত অর্থে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। তিনি বলেন : '...দুই সহস্র বা তদ্রূপ সংখ্যক লোক একতন্ত্র হইয়া ধনোৎপাদন করিবে। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের দ্বারা ধনোৎপত্তি হইতে থাকিবে। তাহারা আপনাদিগের কর্ত্তৃপক্ষ আপনারা মনোনীত করিবে। মূলধনের পার্থক্য থাকিবে। উৎপন্ন ধনের মধ্য হইতে প্রথমে কিয়দংশ সমভাবে সকলকে বিতরিত হইবে। যে শ্রমে অপারগ, সেও তাহা পাইবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, শ্রমকারী, মূলধনাধিকারী, এবং কর্ম্মনিপুণদিগের মধ্যে কোন নিয়মিত পরিমাণে তাহা বিভক্ত হইবে। যে যেমন গুণবান্, সে তদুপযুক্ত পাইবে।'[৩২]

সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও ধনবৈষম্য রোধ করিয়া শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের এই সকল ভাবধারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে আধুনিক কালের মার্কসবাদে।[৩৩] মনীষী কার্ল মার্কস তাঁহার সুবিখ্যাত 'Das Kapital' গ্রন্থে

প্রচলিত উৎপাদনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তন সাধন করিয়া শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। মার্কসের মতে, উৎপাদনব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রপরিচালনায় শ্রমিকগণ—যাঁহারা দেশের majority—তাঁহারাই সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিবেন। শ্রমিকের উৎপাদনশক্তিই পণ্যে রূপান্তরিত হয়। অতএব পণ্যবিক্রয় হইতে লব্ধ মুনাফায় শ্রমিকের সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। অথচ কলকারখানায়, খামারে, কৃষিক্ষেত্রে সর্বত্রই দরিদ্র শ্রমজীবীদের বঞ্চিত করিয়া মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর লোক তাঁহাদের পুঁজি গড়িয়া তুলিতেছেন। ইহার ফলে সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দুইটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণী দেখা দিয়াছে—পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণী, Capitalist ও Proletariat. এই শ্রেণীগত বৈষম্য দূর করিয়া সাম্য স্থাপন করিতে হইলে শ্রেণী-সংগ্রাম [ class-struggle ] অনিবার্য। Proletariat শ্রেণীকেই অগ্রণী হইয়া এই সংগ্রামে জয়যুক্ত হইতে হইবে এবং রাষ্ট্রপরিচালনায়, জাতির অর্থনৈতিক রূপায়ণে, সমাজের সর্বক্ষেত্রে তাঁহাদের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার ফলেই Communism-এর আদর্শ যে শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ গঠন, তাহা সম্ভব হইবে।[৩৪]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালীর জনজীবনে সাগরপারের Communism বা সাম্যবাদের ঢেউ আসিয়া পৌছে নাই। তবে ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে এই নূতন মতবাদ ক্রমে ক্রমে বিসর্পিত হইতেছিল তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি-বিজ্ঞানের [ Political Economy ] সাম্মানিক পরীক্ষায় [ Honor Examination ] প্রশ্ন করা হয়: 'What is the aim of communism ? Describe the schemes propounded by Fourier and St. Simon respectively.'[৩৫]

এখানে যে Communism-এর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা যদিও মার্কসীয় মতবাদ হইতে স্বতন্ত্র, তথাপি ইহাই লক্ষ্য করিবার মতো যে বিশেষ একটি উপাধি-পরীক্ষার পাঠ্যসূচীর মধ্য দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাব্রতী ছাত্রদের মনে পাশ্চাত্ত্য সাম্যচিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটিতেছে। ইহা ছাড়া আবার ১৮৭৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা'র একটি সংখ্যায় পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী নেতা টিপু পাগলের সাম্যাদর্শী মতবাদ প্রচারের উল্লেখ করিয়া তাহাকে লুই ব্লাংকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।[৩৬] ইহাতে স্পষ্টই ধারণা করা যায় যে, সেকালে উচ্চশিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে কেহ কেহ পাশ্চাত্ত্যের সাম্যবাদী চিন্তাধারার

খোঁজখবর রাখিতেন। ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' প্রবন্ধে 'কম্যুনিজম' ও 'ইণ্টারন্যাশন্যাল' [ অর্থাৎ মার্কস-এঙ্গেলস-প্রতিষ্ঠিত International Working Men's Association ] শব্দ দুইটির উল্লেখ এবং স্বামী বিবেকানন্দের শূদ্ররাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভবিষ্যদ্‌বাণীতে এই সত্যেরই স্বীকৃতি মিলিবে।

আসল কথা, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙলা সাহিত্যের আনাচে-কানাচে বিলাতী সাম্যবাদ বা Communism উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল সত্য, কিন্তু বাঙালীর সাহিত্য-চিন্তায় তখনও ইহা জাঁকিয়া বসে নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় সাম্যচিন্তার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ নারীমুক্তি-আন্দোলন। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দুনারীর প্রতি হিন্দুসমাজের যে বর্ণাঢ্য প্রবঞ্চনা চলিতেছিল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই তাহার বিরুদ্ধে বাঙালীর প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে। সতীদাহ-রোধ, বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা-প্রচার—এই সকল আন্দোলনের ভিতর দিয়া নব্য-বাঙলার বিপ্লবী মনীষা নারী-পুরুষে সাম্যবোধের স্পষ্ট স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। নারীসমাজের প্রতি বাঙালীর এই সসম্ভ্রম আচরণ যে প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষারই ফল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ও পাশ্চাত্ত্য সমাজে বহুকাল হইতেই 'আদম' ও 'ঈভ'কে সমমর্যাদা দানের চেষ্টা চলিয়াছে। নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিপাদন করিতে গিয়া পাশ্চাত্ত্য মনীষী মিল তো নারীসমাজ সম্বন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছেন: 'I believe that their disabilities elsewhere are only clung to in order to maintain their subordination in domestic life ; because the generality of the male sex cannot yet tolerate the idea of living with an equal.' [৩৭]

নারীপ্রগতির এই পশ্চিমী হাওয়া বাঙালীর চিন্তারাজ্যে যে আলোড়ন তুলিয়াছিল, তাহা ক্রমেই বাঙলার সাহিত্য-দরবারে নারীকে পুরুষের সহিত একাসনে বসিবার স্বীকৃতি দিয়াছে। প্রফুল্লকে দেবীচৌধুরাণী সাজাইয়া, শান্তিকে বীর সন্তানদের সুকঠিন বাহুবলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া, রক্ষোবধূ প্রমীলাকে শত্রুপরিবৃত লঙ্কাপুরে 'নিজ ভুজবলে' প্রবেশ করিবার অমিত তেজ দান করিয়া বাঙলা সাহিত্য নারীমহিমার যে 'ইমেজ' অঙ্কিত করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে নারী-পুরুষে সাম্যস্থাপন-প্রচেষ্টার ফল বলিতে হইবে।

উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে একদিকে যেমন বিভিন্ন

পাশ্চাত্ত্য মনীষীর প্রভাব পড়িয়াছিল, অপরদিকে তেমনই পাশ্চাত্ত্যের মানবাধিকারমূলক কয়েকটি বিপ্লব ও আন্দোলনের ছায়াপাত হইয়াছিল। এই সকল অগ্নিগর্ভ জনজাগরণের মধ্যে আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ [American Independence War] ও ফরাসী-বিপ্লব [French Revolution] সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বাঙালীর স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ও সাম্যচিন্তায় এই দুইটি ঘটনা অভূতপূর্ব প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের ভ্রান্ত ঔপনিবেশিক নীতির ফলে উত্তর-আমেরিকার ব্রিটিশ-শাসিত উপনিবেশসমূহে যে স্বাধীনতালাভের সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাই 'আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ' নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সূর্যাস্তহীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি বিশেষ উন্নতিশীল অংশ ছিল তেরটি মার্কিন উপনিবেশ।[৩৮] তিন হাজার মাইল দূরে থাকিলেও এই উপনিবেশগুলির সহিত মাতৃভূমি [Mother country] ব্রিটেনেব সম্পর্ক ছিল মোটামুটি ভালোই। কিন্তু ১৭৬৩ সালের পর হইতেই এই সম্পর্কে ফাটল ধরিতে আরম্ভ করে।[৩৯] যুদ্ধবিগ্রহের ফলে এবং সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে গিয়া এই সময়ে ব্রিটেনের আর্থিক সংকট দেখা দেয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জর্জ গ্রেনভিল [George Grenville] এই সংকট নিরসনের জন্য মার্কিন উপনিবেশগুলি হইতে নূতন নূতন কর আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। ১৭৬৪ সালে চিনির উপর কব ধার্য হইল, মার্কিন ব্যবসায়ীরা প্রমাদ গণিলেন। ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে 'স্ট্যাম্প আইন' [Stamp Act] পাস হইল,[৪০] আমেরিকার উপনিবেশগুলি বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িল।

উপনিবেশবাসীরা [Colonists] সমস্বরে প্রতিবাদ জানাইল যে, মার্কিন প্রতিনিধিহীন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মার্কিনদের উপর কর ধার্য করিবার কোনো ন্যায়সংগত অধিকার নাই। সহস্র সহস্র মার্কিন কণ্ঠে ধ্বনিত হইল: 'No taxation without representation'. ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। অবশেষে ব্রিটেনের তৎকালান প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম পিটের [Willim Pitt the elder] চেষ্টায় ১৭৬৬ সালে কুখ্যাত স্ট্যাম্প আইন রহিত হইল।[৪১] কিন্তু কিছুকাল যাইতে না যাইতেই মার্কিনদের উপর আবার নূতন নূতন কর বসিল। এই সময়ে ব্রিটেনের প্রধান অর্থমন্ত্রী [Chancellor of the Exchequer] ছিলেন চার্লস টাউনশেণ্ড [Charles Townshend]। ১৭৬৭ সালে তিনি পার্লামেণ্টে চা, কাচ, কাগজ প্রভৃতি কয়েকটি বস্তুর উপর

কর আদায়ের আইন পাস করাইয়া লইলেন। তাঁহার নামানুসারে 'Townshend Acts' নামে এই আইন পরিচিত হইল। এই আইন অনুসারে কর সংগ্রহের জন্য সরকারী ব্যবস্থারও ত্রুটি রহিল না। এমনকি প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগের জন্য আমেরিকার বড় বড় শহরে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করা হইল। আমেরিকার জনগণ প্রচণ্ড রোষে জ্বলিয়া উঠিল। মার্কিন জনসাধারণের সহিত ব্রিটিশ বাহিনীর এখানে-সেখানে সংঘর্ষ বাধিল। পার্লামেণ্ট আবার চিন্তায় পড়িলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তখন লর্ড নর্থ [Lord North]। তিনি একমাত্র চা ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর উপর হইতে টাউনশেণ্ড-আরোপিত কর তুলিয়া দিলেন। মার্কিন উপনিবেশসমূহে সাময়িকভাবে শান্তি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু প্রভুত্বগর্বী পার্লামেণ্টের বিরুদ্ধে একটা চাপা বিক্ষোভ মার্কিনদের রহিয়াই গেল।

আবার নূতন করিয়া সংঘর্ষ বাধিল। লর্ড নর্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিনা শুল্কে আমেরিকার বাজারে চা বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার দিলেন, অথচ মার্কিন ব্যবসায়ীদের উপর চা-শুল্কের চাপ সমানই রহিয়া গেল। ব্রিটিশ সরকারের এই বৈষম্যমূলক আচরণে আমেরিকার জনমত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। মার্কিন জনগণের মনে এই ধারণা প্রবল হইয়া উঠিল যে, পার্লামেণ্ট তাহাদের অমতে তাহাদের উপর করভার চাপাইয়া দিয়া তাহাদের স্বাভাবিক অধিকার ও স্বাধীনতা [ Natural rights and liberties ] পদদলিত করিতেছে। পার্লামেণ্টের এই স্বৈরাচার প্রতিরোধ করিবার জন্য তাহারা দৃঢ়-সংকল্প হইল। দেখিতে দেখিতে পূর্বের বিক্ষোভ—যাহা এতদিন 'বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া' যাই-যাই করিতেছিল—তাহা আবার দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া উঠিল। নানাস্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। বিদ্রোহী মার্কিনদের দমন করিবার জন্য পার্লামেণ্ট কয়েকটি দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। মার্কিন উপনিবেশগুলি [ একমাত্র জর্জিয়া ছাড়া আর সকলে ] এবার সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ফিলাডেলফিয়ায় কংগ্রেস [ ইহা First Continental Congress নামে পরিচিত ] নামে এক মহাসভার আয়োজন করিল [১৪ই অক্টোবর,]। এই কংগ্রেসে মার্কিনদের নাগরিক অধিকারের ও স্বাধীনতার পরিপন্থী সমস্ত আইন প্রত্যাহার করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট দাবি জানানো হইল। কিন্তু ফল কিছুই হইল না, ব্রিটিশ মনোভাব অনমনীয়ই রহিয়া গেল। ঔপনিবেশিক বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার সামরিক শক্তি প্রয়োগের তোড়জোড়

করিতে লাগিলেন। ফলে ব্রিটেনের সহিত আমেরিকার ছাড়াছাড়ি আসন্ন হইয়া উঠিল। এই সময়ে মনীষী এডমণ্ড বার্ক [ Edmund Burke ] উভয় দেশের মধ্যে আপসের জন্য পার্লামেণ্টে এক সুদীর্ঘ ভাষণ দেন [ ২২শে মার্চ, আমেরিকানদের জনসংখ্যা, সম্পদ ও চরিত্রের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়া তিনি বলেন যে, তাহারা এখন শক্তিশালী ও স্বাধীনতাপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে—অতএব তাহাদের উপর দমননীতি প্রয়োগ না করিয়া ভালো ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনিয়া আপসের ব্যবস্থা করাই ব্রিটেনের পক্ষে মঙ্গল। ব্রিটিশ সরকারের মার্কিন-দলনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া তিনি উদাত্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করেন : '...a nation is not governed which is perpetually to be conquered.'[৪২]

কিন্তু কিছুতেই সমস্যার সমাধান হইল না। নিগৃহীত মার্কিন জনগণ ব্রিটিশবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিল। Lexington, Concord, Bunker Hill প্রভৃতি স্থানে ব্রিটিশ বাহিনীর সহিত মার্কিনদের রীতিমত যুদ্ধ হইল। মার্কিনগণ এক সুগঠিত সৈন্যদল লইয়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু করিয়া দিল।[৪৩] ব্রিটিশ প্রভুত্বের উচ্ছেদ সাধনের দৃঢ় সংকল্প লইয়া তাহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিল [৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬]।[৪৪]

স্বাধীনতাকামী জনগণকে আর দাবাইয়া রাখে কে? অবশেষে ১৭৮৩ সালে মার্কিনদের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল—যুক্তরাষ্ট্র [U. S.] নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র জন্মলাভ করিল। মহাকালের চলার পথে স্বার্থান্ধ প্রভুত্ববোধের সমাধি রচিত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী সাহিত্যরথীরা যখন বৈষম্যমূলক প্রভুশক্তির অবসানকল্পে লেখনী ধারণ করিতেন, তখন তাঁহাদের মনশ্চক্ষে যে-সকল ঐতিহাসিক নজীর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত—আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ তাহাদের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিত। উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্য 'নীলদর্পণ' ও 'আনন্দমঠ'-এর মধ্য দিয়া যে স্পর্ধিত প্রভুত্বের অবসান কামনা করিয়াছে, 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে প্রভুত্বকামী ইংরাজের রণবাদ্যকে উপেক্ষা করিয়া মুষ্টিমেয় দেশপ্রাণ বাঙালীর সাহসিকতার যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, হেমচন্দ্রের রচনায় 'বিংশতিকোটি মানবের বাস এ ভারত-ভূমি যবনের দাস' হইয়া গেল বলিয়া যে আক্ষেপ করিয়াছে, তাহাতে অন্যান্য প্রভাবের সহিত মার্কিন বিপ্লবেরও প্রভাব পড়িয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা ফরাসী-বিপ্লব। ফ্রান্সদেশে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রবল প্রজাবিদ্রোহ দেখা দেয়; ইহাই ইতিহাসে ফরাসী-বিপ্লব নামে পরিচিত। ফ্রান্সের জনসাধারণের বহুকালের পুঞ্জীভূত বেদনা ও অভিযোগ এই বিপ্লবের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।[৪৫] রাজা ষোড়শ লুই তখন ফ্রান্সের সিংহাসনে। দীর্ঘকালের স্বৈরাচারী শাসনে বিক্ষুব্ধ জনমনের প্রচণ্ড আক্রোশ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তিনি রাজ্য-পরিচালন-ব্যবস্থায় নানারকম পরিবর্তন সাধন করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহার কোনো চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ফলবতী হইল না। রুশো, ভল্টেয়ার, মণ্টেস্কু, দিদেরো প্রভৃতি দার্শনিকদের বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারা ও যুক্তিবাদ ফরাসী জাতির রক্তে এক অপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অগ্নিবাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ফরাসী জনগণ বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজকীয় অত্যাচারের প্রতীক ব্যাস্তিল [Bastille] দুর্গ ধূলিসাৎ হইল, রাজপ্রাসাদ টুইলারিস [Tuileries] আক্রান্ত হইল, 'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ডে' [September Massacre] বন্দীশালায় কয়েক সহস্র লোকের প্রাণনাশ ঘটিল। ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস ক্রমেই রক্তরঞ্জিত হইয়া চলিল। অবশেষে দেশদ্রোহিতার অপরাধে ষোড়শ লুইকে মৃত্যুদণ্ড দান করিয়া [১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি] রাজতন্ত্রের অবসান ঘটানো হইল। রাজা ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ডের ফলে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও স্পেনের যুদ্ধ বাধিল। ক্রমে ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সার্ডিনিয়া, নেপ্‌লস, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক বিরাট শক্তিসজ্ঘ গঠন করিল। এই সময়ে আবার ফ্রান্সের মধ্যে চলিতে লাগিল সন্ত্রাসের রাজত্ব [Reign of Terror]। ফ্রান্সের এই দুর্দিনে ফরাসী জাতিকে সংকট হইতে পরিত্রাণ করিলেন মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। তাঁহার অসাধারণ সমরকুশলতায় ও বিচক্ষণতায় ফ্রান্স সকল যুদ্ধেই জয়লাভ করিতে লাগিল, ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দুশ্চিন্তাও দূরীভূত হইল। ফরাসী জনগণ কৃতজ্ঞচিত্তে নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের সম্রাট বলিয়া বরণ করিয়া লইল। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়াও বিপ্লবী ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত রাজকীয় ক্ষমতার বেদীমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। রাজশক্তির আওতায় থাকিয়া ধনী মধ্যবিত্তশ্রেণী [moneyed bourgeoisie] মাথা চাড়া দিয়া উঠিল—সামাজিক বৈষম্যের জগদ্দল পাথরটি যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল।

আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হইবে যে ফ্রান্সের এই গণ-অভ্যুত্থান বুঝি ব্যর্থ হইয়া গেল—যাহার জন্য এত রক্ত ঝরিল সেই সাম্যাদর্শ কেবল অতীতের স্বপ্ন হইয়াই রহিল ; কিন্তু মানুষের কোনো প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবার নয়—ফরাসী-বিপ্লবও ব্যর্থ হয় নাই। মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে ফরাসী-বিপ্লবের প্রভাব অনস্বীকার্য। সর্বাত্মক রাজশক্তির পরিবর্তে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব, জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মহান্ আদর্শ—সমস্তই ফরাসী-বিপ্লবের রক্তরাগ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। বর্তমান পৃথিবীতে যে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের প্রয়াস চলিতেছে, তাহারও উপর ফরাসী-বিপ্লব এক দুর্লক্ষ্য আলোকরশ্মি বিকিরণ করিতেছে।[৪৬]

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্য 'নীলকুটির নীল মেম্‌দো'র অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের বাণী প্রচার করিয়া, রাজশক্তির উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সন্তান-সম্প্রদায়ের জন্য 'সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে' বলিয়া দেশ-মাতৃকার বন্দনাসংগীত রচনা করিয়া, 'মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী আমার ভাই' বলিয়া সাম্য ও মৈত্রীর মহাবাণী ঘোষণা করিয়া ফরাসী-বিপ্লবের ভাবমূর্তিকেই সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়াছে।

নবযুগের বাঙলাসাহিত্যে এই সকল বাস্তব ঘটনার পাশে-পাশেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্নমুখী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা। এই যুগের সূচনাপর্ব হইতেই ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত বাঙালীর পরিচয় ঘটিতে থাকে। Shakespeare-এর নাটক, Milton-এর মহাকাব্য, Cowper, Campbell, Byron প্রভৃতি কবির কবিতা পাঠ করিয়া বাঙালী তাহার কাব্যরস আস্বাদনের তৃষ্ণা মিটাইয়াছে ; Scott-এর *Ivanhoe*, Goldsmith-এর *Vicar of Wakefield*, Daniel Defoe-এর *Robinson Crusoe*, ফরাসী হইতে ইংরাজী অনুবাদ *Paul and Virginia*, George Eliot ও Reynolds-এর বিভিন্ন উপন্যাস তাহাকে স্বপ্নলোকের যাত্রী করিয়া তুলিয়াছে ; Tod-এর *Rajasthan*, Gibbon-এর *History of the Decline and Fall of the* Roman *Empire*, Lecky-র *History of Rationalism in Europe* তাহাকে অতীত যুগের অচেনা রাজ্যে লইয়া গিয়াছে ; Locke, Hume, Kant, Comte, Mill প্রভৃতি চিন্তানায়কদের জ্ঞানগর্ভ রচনা তাহাকে সত্যানুসন্ধী প্রমুক্ত বুদ্ধি দান করিয়াছে ; Newton,

**Faraday, Watt** প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের বিস্ময়কর আবিষ্কার তাহার নিকট প্রকৃতির সুগভীর রহস্যের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্যের এই বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার হইতে লুব্ধচিত্তে জ্ঞান আহরণ করিয়া নবযুগের নব্যশিক্ষিত বাঙালী তাহার চিন্তারাজ্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, কখনও কখনও বা অনুবাদ ও অনুকরণের মাধ্যমে প্রাচ্যের উদ্যানে পাশ্চাত্ত্যের ফুল ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য ফুলের শোভা ও সুগন্ধে মুগ্ধ হইয়া সে তাহার উদার দৃষ্টি মেলিয়া ধরিয়াছে সংস্কারমুক্ত মানবতার মহাকাশে। তাহার এই সংস্কারমুক্তি ও মানবতাবোধ—যাহা তাহাকে সকল বৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠিয়া মানুষকে কেবল মানুষ বলিয়া দেখিবার প্রেরণা যোগাইয়াছে—তাহার উৎস অনুসন্ধান করিলে বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানি যুগান্তকারী মহাগ্রন্থের সন্ধান মিলিবে। টমাস পেইনের *Age of Reason*, রুশোর *Social Contract*, মিলের *Subjection of Women* এবং মহিলা-ঔপন্যাসিক স্টোর লেখা *Uncle Tom's Cabin* এইরূপ চারিখানি অতিপঠিত মহাগ্রন্থ।

*Age of Reason* গ্রন্থে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের উপর তীব্র কশাঘাত হানিয়া সংস্কারমুক্ত মানবমনের যুক্তিবাদিতাকেই লেখক একমাত্র সত্যধর্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন: **'I do not believe in the creed professed by the Jewish church, by the Roman church, by the Greek church, by the Turkish church, by the Protestant church, nor by any church that I know of. My own mind is my own church.'**[৪৭]

রুশোর *Social Contract* গ্রন্থে সর্ববন্ধনমুক্ত মানবতার জয়গান করা হইয়াছে। মানুষের সকলপ্রকার দাসত্বের বিরুদ্ধে রুশোর দৃপ্ত কণ্ঠ গর্জিয়া উঠিয়া ঘোষণা করিয়াছে: **'...a convention which stipulates absolute authority on the one side and unlimited obedience on the other is vain and contradictory.'**[৪৮]

নারী-পুরুষের সামাজিক বৈষম্য যে মানবজাতির অগ্রগতির পথে বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—নারীকে তাহার আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকার দিলে সেও যে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারে, ইহাই মিলের *Subjection of Women* গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। লেখক স্পষ্টই বলিয়াছেন: **'... the principle which regulates the**

existing social relations between the two sexes—the legal subordination of one sex to the other—is wrong in itself, and now one of the chief hindrances to human improvement; it ought to be replaced by a principle of perfect equality, admitting no power or privilege on the one side, nor disability on the other.'[৪৯]

প্রখ্যাত মার্কিন লেখিকা Harriet Beecher Stowe তাঁহার *Uncle Tom's Cabin*-নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থে আমেরিকার দাসত্বপ্রথার একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া সর্বকালের স্পর্ধিত প্রভুশক্তির প্রতি তীব্র ধিক্কার জানাইয়াছেন। ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ ক্রীতদাস Tom এবং দাস-দম্পতি George ও Eliza তাহাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুর নিকট যে কিরূপ অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া লেখিকা যেন ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, মানুষের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতাকে পদদলিত করিয়া যাহারা উল্লাস বোধ করে তাহারা শুধু নিপীড়িত জনগণের নয়—সমগ্র মানবজাতিরই চিরশত্রু।

উনিশ শতকের বাঙালী মনীষা এই সকল গ্রন্থের ভিতর দিয়া ধর্মীয় বৈষম্য, নারী-পুরুষে বৈষম্য, বলবান ও বলহীনে বৈষম্য—সকলপ্রকার বৈষম্যের মূলে আঘাত করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। এই শতাব্দীর শেষের দিকে যখন ফরাসী-বিপ্লবের ফলে উপজাত ইংরাজী রোমান্টিক সাহিত্যের[৫০] ঢেউ আসিয়া বাঙালীর মানসতটে প্লাবনের সৃষ্টি করিল, তখনও সেই সাহিত্যের মধ্য দিয়া নিপীড়িত মানবতাকে মুক্তিদানের ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠিল; মানবদরদী ইংরাজ কবির কণ্ঠে শোনা গেল:

'And much it grieved my heart to think
What man has made of man.'[৫১]

ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি এইভাবেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বাঙালীকে মানবমুক্তির মন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়াছে। এই শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যে ইহার যথার্থ প্রতিফলন ঘটিয়াছে।

নবযুগে বাঙালীর উন্নত মানসিকতা গঠনে ইংরাজী শিক্ষা বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এই প্রসঙ্গে কয়েকজন উদারমনা সাহেবের সঙ্গে বাঙালীর প্রত্যক্ষ সাহচর্যের কথাও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। সেকালের বহু সাহেবই এদেশে আসিয়া এদেশীয় লোকদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন। তাঁহাদের সমুন্নত আচার-ব্যবহার অনেক সময়ই বাঙালীর উপর গভীর প্রভাব

বিস্তার করিত। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার এদেশের কল্যাণের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এই সকল সদাশয় বিদেশীর মধ্যে মাহাত্মা ডেভিড হেয়ার ও ড্রিংকওয়াটার বীটনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহারা যে কেবল শিক্ষাবিস্তার করিয়া এদেশের হিতসাধন করিয়াছিলেন তাহা নহে, ইহাদের শিশুসুলভ সরলতা, সমদর্শিতা ও মানবতাবোধ সেকালের সংকীর্ণ দেশাচার ও লোকাচারে পীড়িত বহু বাঙালীকে মানব-মহত্ত্ব-বোধের সন্ধান দিয়াছিল।

হেয়ার সাহেব ধনী-নির্ধন-নির্বিশেষে বাঙালী বালকদের শিক্ষার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।[৫২] তাঁহার স্থাপিত আরপুলি পাঠশালায় সহায়-সম্বলহীন দীনতম ছাত্রও বিদ্যালাভের সুযোগ পাইত। জন্মে ও জাতিতে সম্পূর্ণরূপে বিদেশী হইয়াও এদেশের বালকদিগকে তিনি যেভাবে আপন করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মহান হৃদয়ের সুগভীর মানবপ্রেম পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।[৫৩]

ড্রিংকওয়াটার বীটন বা বেথুন সাহেবও ছিলেন এইরূপ অপর এক উন্নতমনা লোক। উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও[৫৪] এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে তিনি সাধারণ লোকের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছিলেন। বিদেশী ও বিধর্মী হইয়াও তিনি বাঙালী বালিকাদের আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন।[৫৫] তাঁহার চরিত্রের সরলতায় ও উদারতায় মানবহিতৈষী একজন আদর্শ মানুষের রূপ প্রকাশ পাইয়াছিল।

হেয়ার এবং বেথুন এদেশের যে উপকার করিয়াছেন তাহা অবিস্মরণীয়। কিন্তু এদেশে আগত মানবহিতৈষী বিদেশীরূপে কেবল এই দুইটি নামের উল্লেখ করিলে অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। এই প্রসঙ্গে সেকালের নিত্যস্মরণীয় কল্বিন্, পামর, কেরী ও মার্শম্যান এবং পাদরী জেমস লং সাহেবের নামও অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা নানাভাবে এদেশের কল্যাণব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। লং সাহেবকে তো অত্যাচারিত নীলচাষীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য কারাবরণ পর্যন্ত করিতে হইয়াছিল। এই সকল বিদেশীর উন্নত চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালীর চিত্তে যে মনুষ্যত্বের উন্মেষ হইয়াছিল, বাঙলা সাহিত্যের দরবারে তাহা তির্যক্‌ভাবে আলোকপাত করিয়াছে। বাঙালী যখন সাম্য ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছে, তখন ইংরাজী শিক্ষায় লব্ধ ভাবচিন্তার সহিত ইংরাজ-সাহচর্যের ফলও আসিয়া ছায়ার মতো দাঁড়াইয়াছে।

এই যে ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজের সাহচর্য, ইহার ফলে উনিশ শতকের প্রথম দিকেই শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে এক মহাবিপ্লব দেখা দিয়াছিল। বাঙালী-মনীষার এই বিপ্লবযজ্ঞের প্রধান হোতা ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও [ ১৮০৯—১৮৩১ ] নামে এক উদারপ্রাণ জ্ঞানবৃদ্ধ যুবক। 'তাঁহার শিক্ষা বঙ্গে নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল, ডিরোজিওর জীবনকাহিনী এককথায় বঙ্গে নব্যশিক্ষার গোড়াপত্তনের ইতিহাস।'[৫৬]

'নবযুগের প্রবর্তক' এই তরুণ মনীষী ছিলেন জাতিতে ফিরিঙ্গী। তাঁহার অনন্য-সাধারণ কবিত্বশক্তি ও বিদ্যাবত্তার জন্য অল্পবয়সেই তিনি অনেকের শ্রদ্ধাপাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু যে-গুণটির জন্য তিনি বাঙলার নবজাগরণের প্রধান ঋত্বিকরূপে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন, তাহা তাঁহার অপূর্ব শিক্ষাদানপদ্ধতি। তিনি ছিলেন সেকালের বাঙলার একজন খ্যাতনামা শিক্ষক। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে তিনি হিন্দুকলেজের অন্যতম শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন এবং ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল অবধি এই কলেজে শিক্ষকতা করেন।[৫৭] এই পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তিনি বাঙলার শিক্ষিত সমাজের চিন্তাধারায় এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

'ডিরোজিও ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা ও মানবতার ভাবে ভরপুর ছিলেন। যে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—ইংরাজীতে যাহাকে **Rationalism** এবং **Individualism** কহে, ফরাসী বিপ্লবের মূল ভিত্তি ছিল, তাহারই উপরে ডিরোজিওর মানস-জীবন এবং চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল।'[৫৮] তাঁহার শিষ্যদের তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে সকল কিছু যাচাই করিয়া লইবার শিক্ষা দান করিতেন। ছাত্রদের মনে যাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসা দেখা দেয়—যাহাতে তাহারা সকলপ্রকার সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদের সহিত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের বিভিন্ন যুক্তিপূর্ণ মতবাদ লইয়া আলোচনা করিতেন। প্রত্যেক বিষয়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য তিনি ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে তাঁহার শিষ্যগণ সকলপ্রকার পাপের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা পোষণ করিতে শিখিয়াছিলেন।

'...শুধু কলেজের সময়টুকুই যে ডিরোজিও ছেলেদের পড়াইতেন তাহা নহে, ছুটির পর কলেজ-গৃহে বসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নানা বিষয় আলাপ-আলোচনাও করিতেন; তাঁহার গৃহেও মধ্যে মধ্যে আলোচনা-বৈঠক বসিত। এই আলোচনা-বৈঠকই ক্রমে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন বা ইনস্টিটিউশনে পরিণত হয়।'[৫৯]

এই আলোচনা-বৈঠকে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা হইত। ইহার ফলে ডিরোজিওর শিষ্যগণ সকলপ্রকার প্রথার দাসত্ব ছিন্ন করিয়া মানবতার উদার ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই সর্বসংকীর্ণতামুক্ত মানবতাবোধ—যাহা মানুষকে আচারের বন্ধন ও কুপ্রথার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে নিখিল মানবের প্রতি উদার দৃষ্টি মেলিয়া ধরিবার প্রেরণা যোগায়—তাহাই ছিল ডিরোজিওর শিক্ষার মূল কথা। তাঁহার শিষ্যগণ মনেপ্রাণে তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আপন আপন চিত্তবৃত্তির উন্মেষ সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। ডিরোজিও তাঁহার শিষ্যদের বিকাশোন্মুখ মনের আভাস পাইয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন:

'Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds,
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers,
That stretch ( like young birds in soft summer hours )
Their wings, to try their strength. O, how the winds
Of circumstances, and freshening April showers
Of early knowledge, and unnumbered kinds
Of new perceptions shed their influence ;
And how you worship truth's omnipotence.
What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity,
Weaving the chaplets you have yet to gain,
Ah then I feel I have not lived in vain'.

সত্যই ডিরোজিওর জীবনধারণ ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার শিষ্যগোষ্ঠী—যাঁহারা নব্যবঙ্গ বা Young Bengal নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা গুরুর নিকট সত্য ও মানবতার মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া চারিত্রিক সমুন্নতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন এবং নানাপ্রকার সংস্কারমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্য ও শিষ্যকল্প ব্যক্তিদের মধ্যে এই কয়জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন

মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব ও হরচন্দ্র ঘোষ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ইঁহারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহার পূর্বেই রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চেষ্টায় বাঙলায় নবজাগরণের সূচনা দেখা দিয়াছিল, এবং ইয়ংবেঙ্গলদের প্রায় সমসাময়িক কালেই বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মহারথীরা বাঙলার সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিপুল পরিবর্তন আনিয়াছিলেন। তথাপি ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, নব্যবাঙলার কূলপ্লাবী ভাববন্যার বহু ইঙ্গিতই ডিরোজিও-শিষ্যদের ধ্যানধারণা ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিহিত ছিল।

ডিরোজিও-শিষ্য ইয়ংবেঙ্গলগণ সত্যকথন ও স্পষ্টবাদিতার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুকলেজের ছাত্র ও সত্যবাদিতা যেন সেকালে সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সত্যের প্রতি এই অবিচল নিষ্ঠার ফলেই ডিরোজিওর শিষ্যগণ উত্তরকালে সর্ববিধ অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।[৬১] আবার এই সত্যপ্রিয়তাই তাঁহাদিগকে সমকালীন সর্ববিধ বৈষম্যমূলক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করিয়া, সরকারী চাকরিতে ভারতীয়-বিনিয়োগের দাবি তুলিয়া, সরকারের পক্ষপাতমূলক বিচার-পদ্ধতির সমালোচনা করিয়া সাম্যভিত্তিক মানবতাবোধের প্রতিই তাঁহারা অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছিলেন। 'কালা আইন' [ Black Acts ] আন্দোলনে রামগোপালের ভূমিকা[৬২] এবং দক্ষিণারঞ্জনের কণ্ঠে সাম্যনীতির উদাত্ত ঘোষণা বাঙলা সাহিত্যে সাম্যচিন্তার পরিমণ্ডল রচনায় অংশগ্রহণের দাবি করিতে পারে।

কিন্তু এত সত্ত্বেও 'গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়'। সমাজসংস্কার ও প্রগতির ধুয়া তুলিয়া ইয়ংবেঙ্গলগণ এমন সব বাড়াবাড়ি করিতে লাগিলেন, যাহাতে একটা কদর্য উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। 'সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধর্ম্ম ও প্রাচীন প্রথা ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, এই তাঁহাদের মনের ভাব দাঁড়াইল।' হিন্দুসমাজের প্রচলিত ধর্মমতের প্রতি তাঁহারা একটা তীব্র বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। "...ডিরোজিওর শিষ্যগণ একত্র হইয়া 'Athenium' নামে এক মাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করা ইহার এক প্রধান কাজ ছিল। এই পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে একজন ছাত্র

লিখিলেন : 'If there is any thing that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism".[৬৫] ডিরোজিওপন্থীরা যুক্তির দৃষ্টিকোণ হইতে যাহা কিছু কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতেন, তাহারই বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। '…সর্ববিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার একটা গোঁয়ার্ত্তুমি তাঁহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল।'[৬৬] উপনয়নকালে তাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিতে চাহিতেন না ; তাঁহাদিগকে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে বলিলে তাঁহারা উহার পরিবর্তে হোমারের 'ইলিয়ড' হইতে উদ্ধৃত অংশসকল আবৃত্তি করিতেন। ইহার উপর আবার গোমাংসভক্ষণ ও সুরাপানকে তাঁহারা কুসংস্কার-জয়ের প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিতেন। 'এক জন প্রসিদ্ধ ইয়ং বেঙ্গাল বলিতেন যে, প্রত্যহ এ বেলা অর্দ্ধ সের আর ও বেলা অর্দ্ধ সের গোমাংস ভক্ষণ না করিলে বাঙ্গালী জাতি কখনই বলিষ্ঠ হইবে না এবং যাহা বলিতেন, কার্য্যে তাহাই করিতেন। ইয়ংবেঙ্গলদের প্রায় সকলেই সুরাপান করিতেন। 'যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারকদলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

এইভাবে সমাজসংস্কারের নামে বহুক্ষেত্রেই ইয়ংবেঙ্গলগণ চরম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। 'বর্ষার প্রথম জলে অকর্ষিত ক্ষেত্রে জঙ্গলের মত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সমাজ-সংসর্গের প্রথম স্পর্শে বাঙালী তরুণ সম্প্রদায়ের মনে রুচিবিভ্রম ও অশিষ্টাচার উদ্দাম হইয়া উঠিল। কিন্তু কালের আবর্তনে এই উদ্দামতা ক্রমে ক্রমে প্রশমিত হইয়া আসিল। ঘোলা জল থিতাইয়া গেল, পড়িয়া রহিল 'মুক্তমানসের পলিমাটি'। এই পলিমাটির উপরই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মানবপ্রেম ও সাম্যবোধের অপর্যাপ্ত ফসল ফলিল। ইয়ংবেঙ্গলগণ যে সংস্কারমুক্ত মানবকল্যাণব্রতের সূচনা করিয়াছিলেন, বঙ্কিম-বিবেকানন্দ তাহারই উদ্‌যাপন করিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্ত্য-সংস্রবের ফলে যে নবাঙ্কুরিত যুক্তিনিষ্ঠা, সত্যানুরাগ ও 'অন্যায়-অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দুর্জয় সাহস' বাঙালীর তরুণ মনকে উদ্বোধিত করিয়াছিল, এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাহাই প্রৌঢ় ঋতুর ফসল হইয়া বঙ্কিমের যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধে, সত্যসন্ধী বিবেকানন্দের স্পষ্টবাদিতায় এবং দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসংকোচ প্রতিবাদে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রতিক্ষেত্রেই নানা ছন্দে মানবকল্যাণের কথা বলা হইয়াছে এবং মানুষ যে ক্ষুদ্র নয়—তুচ্ছ নয় ইহাই বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া আবার উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর পাশ্চাত্ত্য-সংস্রবের অপর এক নূতন পর্যায়ও দেখা দিল। এই সময়ে পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রমুখী রাষ্ট্রীয় চেতনার বিকাশ দেখা যাইতেছিল এবং নানা পথ ধরিয়া সেই সকল বার্তা আসিয়া বাঙলাদেশে পৌঁছিতে লাগিল।[৭০] ইহার ফলে বাঙালীর রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে ও সমাজ-সংস্কারের পরিকল্পনায় সাম্যনির্ভর একটা বিশেষ চেতনা সঞ্চারিত হইতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙলা পত্র-পত্রিকায় ইহার কিছু কিছু আভাসও পাওয়া যাইতেছিল। ১৮৯১ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় [বাংলা ১২৯৮ সালের মাঘ সংখ্যা] 'ক্যাথলিক সোশ্যালিজ্‌ম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের এক স্থানে আছে : 'য়ুরোপে কিছুদিন হইতে সোশ্যালিস্ট্‌ নামক এক দলের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাহারা সর্বসাধারণের মধ্যে ধন সমভাবে বিভাগ করিয়া দিতে চায়।'[৭১] পরবৎসর উক্ত পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'সোশ্যালিজম' নামে অপর একটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন সম্বন্ধে সোশ্যালিস্টদের অভিমত বিবৃত করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : 'সোশ্যালিস্ট্‌রা চাহে, যে, এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কোনো বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ে। তাহারা বলে, ধন উৎপাদন এবং বণ্টন সমস্ত সমাজের কাজ। সম্প্রতি কেবল সম্পত্তিবান ব্যক্তিদের মর্জ্জি এবং স্বার্থের উপরে তাহার নির্ভর থাকাতে জনসাধারণ স্ব স্ব অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।'[৭২]

অতএব দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই আধুনিক Socialism বা সমাজবাদের ছায়া পূর্বগামিনী হইয়া বাঙলা সাহিত্যে ধীরে ধীরে স্থান করিয়া লইতেছিল। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে যে পশ্চিমাগত মানবতাবাদ [Humanitarianism] বাঙলা সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল, তাহাই সাম্যচিন্তার পথ ধরিয়া বিবর্তিত হইয়া শতাব্দীর সূর্যাস্তের পূর্বেই সমাজবাদ বা সাম্যবাদের মূর্তিতে বাঙালী সাহিত্যিকদের নিকট মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

বাঙালীর মননশীলতায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে সাম্যচিন্তার ফসল ফলিয়াছে। পাশ্চাত্ত্যের 'মানবমুখী ভাবাদর্শ' নবযুগের বাঙালীকে নবজীবনমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সর্বপ্রকার

ধূলিমালিন্য-পরিচ্ছিন্ন মানবসত্তাকে উদার দৃষ্টি মেলিয়া অবলোকন করিতে শিক্ষা দিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও জীবনবাদ যেদিন বাঙালীর সম্মুখে মানবপূজার ডালি সাজাইয়া আনিল, সেদিন হইতে বাঙালীর ভাবকল্পনা ও জীবনচর্যায় একটা বিশেষ পরিবর্তন আরম্ভ হইল। সেদিনের জীবনজোয়ারে বাঙালীর সমস্ত প্রাক্তন সংস্কার ভাসিয়া গেল—দেবমাহাত্ম্যকীর্তন ছাড়িয়া বাঙলা সাহিত্য মানবমুখী হইয়া উঠিল—বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে 'পুরানো সঞ্চয়' লইয়া বেচাকেনার দিন ফুরাইয়া আসিল।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে অপর একটি বিষয়ও আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বাঙালীর এই যে আকস্মিক পরিবর্তন, ইহা কি কেবল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফল বলিয়াই ধরিতে হইবে? বাঙালীর কি নিজস্ব কিছুই ছিল না? সেই উপনিষদের যুগ, যখন 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্' বলিয়া সর্বভূতে সমদৃষ্টি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—সেই বৌদ্ধযুগ, যখন মৈত্রী ও করুণার বাণী ধ্যান করিয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছুটিয়াছেন বসন্তরোগাক্রান্তা গণিকার সেবা করিতে, তখন হইতেই ভারতবর্ষে মানবমহিমা স্বীকৃত হইয়াছে। বাঙলাদেশ এই সর্বভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিরই উত্তরাধিকার দাবি করে। তাই বাঙালীর সমাজ ও সাহিত্য চিরদিনই মানবমুখী—কখনও পরোক্ষভাবে, কখনও প্রত্যক্ষভাবে। আর্য-অনার্য-সমন্বয়ের যুগে বাঙালীর সমাজমানসে যে সাম্যভিত্তিক মানবমৈত্রীবোধ সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহাই শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হইয়া চৈতন্যযুগে চণ্ডালদ্বিজে সমজ্ঞান প্রচার করিয়া মানবমহিমার বিজয়বার্তা শুনাইয়াছে। চর্যাপদের যুগ হইতে ভারতচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত প্রবাহিত যে বাঙলা সাহিত্য, তাহাতে দেবকথার অন্তরালে ফল্গুধারার মতোই মানবপ্রেমের ধারা বহিয়া চলিয়াছে—শবর, ডোম, ব্যাধ, পাটনী প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরাও বাঙলা সাহিত্যের দরবারে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে সরিয়া থাকে নাই। মানুষ যে ক্ষুদ্র নয়—তুচ্ছ নয়, ইহা দেবনির্ভর বাঙলা সাহিত্যেও বার বার সংকেতিত হইয়াছে।

এই সকল তথ্য হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙালীর অন্তর্জীবনে ও সাহিত্যে বহুকাল হইতেই একটা উদার মানবতাবোধ প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল—পাশ্চাত্ত্য-সংস্রবের ফলে তাহাই উদ্বোধিত হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকে ঘুম ভাঙিয়া বাঙালী তাহার আপন প্রাণপুরুষকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। '…বাংলার পুরাতন সাধনা ও মনীষার উপরে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষার জ্যোতিঃ পড়িয়া সেই প্রাচীন প্রাণকে অভিনব ভাবে ফুটাইয়া

তুলিয়াছে। ...রূপের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কেবল, মুল বস্তু নষ্ট হয় নাই ; তাহা যেমন ছিল, তেমনই আছে।’[৭৩] আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে রূপান্তরসিদ্ধি সহজ হয়। বাঙালীর বেলায়ও তাহাই হইয়াছে।

---

১। ‘শিল্পবিপ্লবের পর ইংলণ্ডে বহু কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছিল, নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে নির্মিত হইতেছিল। এতদিন ধরিয়া ইংলণ্ডে-প্রস্তুত দ্রব্যাদি য়ুরোপের পণ্য-প্রাঙ্গণ প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছিল। কিন্তু নেপোলিয়ন ইংরাজের বলবীর্য হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে য়ুরোপের বন্দরে ব্রিটিশ দ্রব্যাদির রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া সাধারণ ইংরাজকে বাণিজ্যের অবাধ অধিকার দিতে হইল...।’ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ‘উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য’

২। বিপিনচন্দ্র পাল ঃ ‘নবযুগের বাংলা’

৩। *The English works of Raja Ram Mohun Roy*, Vol. 1 —ed. by J. C. Ghose [Calcutta, 1885], p. 230.

৪। সেকালের ইংরাজাধীন বাঙালী কর্মচারীদের কাজচালানো ইংরাজী-জ্ঞানের একটি সরস বর্ণনা ঃ “কোন ইংরাজের অধীনস্থ একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী প্রতিদিন দুপুর বেলা সাহেবের ঘোড়ার দানা খাইয়া টিফিন করিতেন। দুষ্ট সহিসগণ এই সুবিধা পাইয়া ঘোড়ার দানা চুরি করিয়া বেচিত। ক্রমে এবিষয় প্রভুর কর্ণগোচর হইলে তিনি ভৃত্যদিগকে যখন তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা বলিল—‘হুজুর! আপনার বাবু রোজ রোজ ঘোড়ার দানাতে টিফিন করেন’। সাহেবের বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। তিনি বসুজ মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন—‘নবীন! তুমি নাকি আমার ঘোড়ার দানাতে টিফিন কর?’ নবীন বলিলেন—‘ইয়েশ্‌, শার্‌ মাই হাউস মার্নিং এণ্ড ইবনিং টুয়েণ্টি লীভস্‌ ফল, লিটিল লিটিল পে, হাউ ম্যানেজ?’—অর্থাৎ আমার বাটীতে প্রাতে ও সন্ধ্যাতে কুড়ি খানা পাত পড়ে, এত কম বেতনে কিরূপে চলে!” শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’

৫। তদেব। পৃ. ৭৪।

৬। তদেব। পৃ. ৭৮।

৭। এদেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারকল্পে ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে [Lord Amherst] লিখিত রামমোহন রায়ের

একখানি পত্রের অংশবিশেষ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য : 'If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talent and learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments, and other apparatus.' : *The English works of Raja Ram Mohun Roy*, Vol. 1—ed. by J. C. Ghose [Calcutta, 1885], pp. 472-473.

৮। মেকলের [Thomas Babington Macaulay] এই মন্তব্যপত্রটির উপসংহারে ছিল : 'To sum up what I have said, I think it clear that we are not fettered by any pledge expressed or implied ; that we are free to employ our funds as we choose ; that we ought to employ them in teaching what is best worth knowing ; that English is better worth knowing than Sanscrit or Arabic ; that the natives are desirous to be taught English, and are not desirous to be taught Sanscrit or Arabic ; that neither as the languages of law nor as the languages of religion, have the Sanscrit and Arabic any peculiar claim to our engagement ; that it is possible to make natives of this country thoroughly good English scholars, and that to

this end our efforts ought to be directed.' *Minutes on Education in India* [Calcutta, 1862], p. 114.

৯। বিপিনচন্দ্র পাল—'নবযুগের বাংলা'

১০। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য'

১১। মনীষী ফ্রান্সিস বেকনের [Francis Bacon] মতে মানুষ তাহার বুদ্ধিদীপ্ত মন লইয়া লক্ষ্য করিলে অতি সাধারণ বিষয় হইতেও অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। 'Bacon explains how natural philosophy dominated by reason can progress from observing superficial details, through a knowledge of underlying transitory phenomena to an understanding of the permanent fundamentals ;…' : *Cassell's Encyclopaedia of Literature*, Vol. 1. [London, 1953], p. 641.

১২। সুবিখ্যাত দার্শনিক জন লক্ [John Locke] জীবনচর্যায় সকলকে সমান অধিকার দানের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবিশেষের অধিকার সীমিত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে: "…the 'life, liberty, and estate' of one person can be limited only to make effective the equally valid claims of another person to the same rights." George H. Sabine : *A History of Political Theory* [London, 1951], p. 447.

১৩। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও দর্শনবিদ্ ডেভিড হিউমের [David Hume] গভীর চিন্তাপ্রসূত মন্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্য। ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার একটি বিশিষ্ট মত ছিল: "Religion arises 'from the incessant hopes and fears which actuate the human mind.'" : *Cassell's Encyclopaedia of Literature*, Vol. 1 [London, 1953], p. 1052.

১৪। প্রখ্যাত চিন্তানায়ক টমাস পেইনের [Thomas Paine] বিভিন্ন রচনায় তাঁহার গভীর মানবপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। "Paine saw clearly that 'a great portion of mankind, in what are called civilized countries, are in a state of poverty and wretchedness.' To oppressive governments he laid the blame for this 'disgustful picture of human wretchedness.' 'Why is

it', he asks, 'that scarcely any are executed but the poor? The fact is a proof, among other things, of a wretchedness in their condition'." Nelson F. Adkins [ed.]: *Thomas Paine: Common sense and other political writings* [New York, 1953], 'Introduction', p. xi.

১৫। Utilitarianism বা উপযোগবাদের প্রথম প্রবক্তা জেরেমি বেন্থাম [Jeremy Bentham]। জেমস মিল [James Mill] এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। তৎপুত্র জন স্টুয়ার্ট মিল [John Stuart Mill] এই মতের অনুরাগী হইলেও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার মতে কেবল সুখই মানবজীবনের লক্ষ্য নহে—নৈতিক চরিত্র ক্ষুন্ন করিয়া বা নীতিবোধ বিসর্জন দিয়া যে সুখলাভ, তাহা কখনই কাম্য হইতে পারে না। এবিষয়ে তাঁহার একটি বিশিষ্ট উক্তি হইল: 'It is better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied.'

১৬। প্রত্যক্ষবাদ বহুকালের পুরাতন একটি মতবাদ। ভারতবর্ষে চার্বাক ঋষির 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' কথাটির মধ্যেও প্রত্যক্ষবাদের সুরই ধ্বনিত। পাশ্চাত্ত্যে লক্, হিউম, মিল ও বেনের প্রচারিত 'Empirical Philosophy'-নামক দার্শনিক মতবাদও মূলতঃ প্রত্যক্ষবাদ। কিন্তু সাধারণতঃ অগাস্ট কোঁতের Positive Philosophy [*Philosophie Positive*]-নামক দর্শন-গ্রন্থে প্রতিপন্ন প্রত্যক্ষবাদই বহুল প্রচারিত।

১৭। 'আমাদের প্রাচীনেরা বিশ্বাস করিতেন যে বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন বহির্বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ সকল-ইন্দ্রিয়-চেষ্টা নিরোধ করিতে পারিলে আত্মা সমাধি-নামক অবস্থা লাভ করে। আর সেই সমাধির অবস্থাতে যোগী বা সাধক অতীন্দ্রিয় সত্যের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিতে পারেন। সেই জ্ঞানও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বটে।' বিপিনচন্দ্র পাল: 'নবযুগের বাংলা' [১৯৫৪, ২য় সং], পৃ. ৫৮-৫৯।

১৮। William Archibald Dunning: *A History of Political Theories—From Rousseau to Spencer* John Stuart Mill

১৯। প্রচলিত ঈশ্বরারাধনার পরিবর্তে কোঁত মানবসেবার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে মানবসেবারূপ ধর্ম পালনের ইঙ্গিতটি অতি সুন্দর

ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে : 'To speak first of the banner to be used in religious services. It should be painted on canvas. On one side the ground would be white ; on it would be the symbol of Humanity, personified by a woman of thirty years of age, bearing her son in her arms. The other side would bear the religious formula of Positivists : *Love is our Principle, Order is our Basis, Progress our End*, upon a ground of green, the colour of hope, and therefore most suitable for emblems of the future.' Auguste Comte : *A general view of Positivism* [New York, 1957], p. 431.

২০। "যখন মনুষ্যগণ বন্যাবস্থায়, কাননে কাননে মৃগয়া করিয়া বেড়াইত, বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইত—অল্পমাত্র ভাষাশক্তিসম্পন্ন, এজন্য বাগ্বৈদগ্ধ্য জানিত না ; যে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, যে লোভের তৃপ্তি নাই, যে বাসনার পূরণ নাই, তাহার কিছুই জানিত না ; ইহাকে ভালবাসিব, উহাকে বাসিব না ; এ আপন, ও পর, এ স্ত্রী, ও পরস্ত্রী, এ সকল বুঝিত না—সেই অবস্থাকে স্বর্গীয় সুখ মনে করিয়া, মনুষ্যজাতিকে ডাকিয়া [ রুশো ] বলিয়াছেন, 'এই অপূর্ব চিত্র দেখ ! ইহার সহিত এখনকার দুঃখপূর্ণ, পাপপূর্ণ সভ্যাবস্থার তুলনা কর।" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'সাম্য'।

২১। 'Discours sur l' Inégalité, pt. ii, beginning' : Translated & quoted in *A History of Political Theories—From Rousseau to Spencer*, by W. A. Dunning [Allahabad,

২২। 'জগদ্বিখ্যাত Le Contrat Social-নামক গ্রন্থে রুশো [Jean-Jacques Rousseau] এই সকল মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভ্যাবস্থার তাদৃশ দোষকীর্ত্তনে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন যে, অসভ্যাবস্থায় যেখানে সহজ জ্ঞানে ধর্ম্ম নির্ণীত হয়, সভ্যাবস্থায় তৎপরিবর্ত্তে ন্যায়ানুভাবকতা সন্নিবেশিত হয়।' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'সাম্য'।

২৩। 'Social Contract' গ্রন্থের প্রারম্ভেই রুশো মানুষকে তাহার শৃঙ্খলিত অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের পথ প্রদর্শন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতেছেন : 'Man is born free, and everywhere he is in chains.

Many a one believes 'himself the master of others, and yet he is a greater slave than they. How has this change come about ? I do not know. What can render it legitimate ? I believe that I can settle this question.' *The Social Contract* : tr. by Henry J. Tozer [London, 1948], p. 100.

২৪। Ibid, p 105.

২৫। 'It is not an agreement between a superior and an inferior, but an agreement of the body with each of its members ; a lawful agreement, because it has the social contract as its foundation , equitable, because it is common to all ; useful, because it can have no other object than the general welfare ; and stable, because it has the public force and the supreme power as a guarantee. So long as the subjects submit only to such conventions, they obey no one, but simply their own will ; and to ask how far the respective rights of the sovereign and citizens extend is to ask up to what point the latter can make engagements among themselves, each with all and all with each.' Ibid, p. 127.

২৬। Ibid, p. 115.

২৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'বিড়াল' : 'কমলাকান্তের দপ্তর'।

২৮। 'Communism has become, in our own day, at once an ideal and a method. As an ideal, it aims at a society in which classes have been abolished as a result of the common ownership of the means of production and distribution. As a method, it believes that its ideal can be attained only by means of a social revolution in which the dictatorship of the proletariat is the effective instrument of change.' Harold J. Laski : *Communism* [London, 1936], p. 11.

২৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'সাম্য'।

৩০। তদেব।

৩১। তদেব।

৩২। তদেব।

৩৩। বর্তমানে মার্কসবাদ ও সাম্যবাদ—Marxism ও Communism প্রায় সমার্থক হইয়া উঠিয়াছে, যদিও সাম্যবাদের পরিধি আরও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

৩৪। আধুনিককালে মার্কসবাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির লড়াই চলিতেছে। আমরা সেই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া মার্কসবাদের মূল বক্তব্যটি অতি সংক্ষেপে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিলাম।

৩৫। Calcutta University Calendar, 1870—71, p. ClXV.

৩৬। ১৭৯৫ শকের [ ১৮৭৩ খ্রীঃ] জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় 'নূতন পুস্তকের সমালোচন'-শীর্ষক অংশে হরচন্দ্র চৌধুরি-প্রণীত 'সেরপুর বিবরণ' নামে একখানি পুস্তকের সমালোচনা করা হইয়াছে। উক্ত সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছে: 'সেরপুরের মুসলমানদিগের মধ্যে পাগলপন্থী নামক এক সম্প্রদায় আছে। সুসঙ্গ পরগণার অন্তর্গত লেটিয়াকান্দা গ্রাম বাসী টিপু পাগল এই মতের প্রবর্ত্তয়িতা। টিপু প্রথমে সামান্য কৃষাণ ছিল, সময়ে সে কেবল ধর্ম্মপ্রচারক নহে, বহুসংখ্য অনুচর প্রাপ্ত হইয়া এক জন ঘোরতর সমাজবিপ্লাবক হইয়া উঠে। তদীয় ধর্ম্মের অন্যতম মূল সূত্র এই, সকল মনুষ্যই ঈশ্বর সৃষ্ট, কেহ কাহারও অধীন নহে; সুতরাং কেহ উচ্চ, কেহ নীচ, এরূপ প্রভেদ করা অসঙ্গত। ১২৩১ সনে তন্মতাবলম্বী এ পরগণাস্থ অনেক প্রজা দলবদ্ধ ও বিদ্রোহী হইয়া জমীদার প্রভৃতিকে খাজানা দেওয়া বন্ধ করে। পরিশেষে উহারা গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে নিরস্ত হয়।'

টিপু পাগল ও তাহার সম্প্রদায়ের এই বিবরণ দিয়া সমালোচক মন্তব্য করিতেছেন: 'টিপু পাগলকে পূর্ব্ব বাঙ্গলার এক প্রকার লুই ব্লেঙ্ক (Louis Blanc) বলিলে হয়'। [ পূর্ববঙ্গের ( বর্তমান বাঙলাদেশের ) ময়মনসিংহ জেলার একটি পরগণার নাম সেরপুর। ]

৩৭। John Stuart Mill: *The Subjection of Women*

৩৮। উত্তর-আমেরিকার স্বাধীনতাপূর্ব তেরটি ব্রিটিশ-শাসিত উপনিবেশের নাম: Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delamare, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia.

৩৯। গ্রেট ব্রিটেনের সিংহাসনে তখন রাজা তৃতীয় জর্জ [ George III ]।

৪০। 'It [Stamp Act] extended to the colonies a tax···on all sorts of printed paper, including newspapers and legal documents. The stamps, sent from London, had to be affixed to every sheet, and the proceeds were to fatten the royal purse.' Oscar Handlin : *The History of the United States*, Vol. 1

৪১। স্ট্যাম্প-আইন তুলিয়া দেওয়ার জন্য মহানুভব পিট [পরে আর্ল অব চ্যাথাম] ১৭৬৬ সালের ১৪ই জানুয়ারি পার্লামেন্টে এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। তাঁহার সহৃদয়তার পরিচয়স্বরূপ এই ভাষণের অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল : 'The Americans have not acted in all things with prudence and temper. They have been wronged. They have been driven to madness by injustice. Will you (the members of the Parliament) punish them for the madness you have occasioned ? Rather let prudence and temper come first from this side. I will undertake for America, that she will follow the example. There are two lines in a ballad of Prior's, of a man's behaviour to his wife, so applicaple to you and your colonies, that I cannot help repeating them :

'Be to her faults a little blind ;
Be to her virtues very kind.'

*Great Issues in American History*, Vol. 1—ed. by Richard Hofstadter [New York, 1958], pp. 20-21.

৪২। 'Burke's speech on moving his resolutions for conciliation with the colonies, March 22, 1775' : *Works of Edmund Burke*, Vol. 1 [London, 1845], p 186.

৪৩। আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেণ্ট জর্জ ওয়াশিংটন [George Washington] ছিলেন এই সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি।

৪৪। মার্কিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশে সাম্যভিত্তিক মানবাধিকারের বাণী প্রচার করা হইয়াছে : '···we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal,

that they are endowed by their Creator with certrin unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness,—That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed,—That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness'. : *Great Issues in American History*, Vol. 1—ed. by Richard Hofstadter

৪৫। 'The French Revolution was no sudden outburst of fury against oppression. It was rather the tardy outcome of a vast assemblage of heterogeneous conditions, moral, social, economic, political, and religious—a slowly manifested revulsion against centuries of unavenged wrong. The multiform evils of the long period of autocratic government that had culminated in the reign of Louis XIV., the incalculable injury to commerce and industry resulting from perpetual wars, the overwhelming financial burdens imposed upon the people by government, nobles, and clergy, the ruthless persecutions of Huguenots and Jansenists by the ecclesiastical abettors of royal despotism, the grievous misrule of Louis XIV.'s successors and their ministers,—all these circumstances concurred with the growth of new and pregnant ideas on the various subjects of human interest to evoke that great awe-inspiring outburst of popular wrath, which proclaimed that the many should no longer be the bond-slaves of the few.': H. J. Tozer (tr.) : *The Social Contract* [London, 1948], 'Introduction', p. 1.

৪৬। The French Revolution lives in the consciousness of world opinion as a reference point for change. It retains a

remarkable contemporaneity, product of the passage from a traditionalistic, aristocratic society toward one whose contours are the focus of today's contestations.' P. H. Beik [ed.]: *The French Revolution* [London, 1931], 'Introduction,' p. x.

৪৭। Thomas Paine: *The Age of Reason, Part the First* [London, 19 8], p. 2.

৪৮। J. J. Rousseau: *The Social Contract*: tr. by H. J. Tozer [London, 1948], p. 105.

৪৯। John Stuart Mill: *The Subjection of women* [ Cambridge,

৫০। 'From about 1800,…the moral and imaginative stir caused by the great upheaval [French Revolution] enters into a new literature as one of its elements, and combines with the diverse impulses which give birth to English Romanticism in its definite form'. Emile Legouis & others: *A History of English Literature*

৫১। William Wordsworth: *Written in Early Spring.*

৫২। 'প্রতিদিন প্রাতে আহার করিয়া, একখানি পাল্কীতে আরোহণপূর্ব্বক, তিনি [ হেয়ার সাহেব —David Hare ] স্বীয় নামে প্রসিদ্ধ বর্ত্তমান হেয়ার ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইতেন। প্রথমে তাঁহার নিজেব প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা ও স্কুলগুলি পরিদর্শন করিতেন, তৎপরে যে সকল দরিদ্র বালকের পীড়ার সংবাদ পাইতেন, তাহাদের ভবনে গিয়া তাহাদিগের ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন; অবশেষে হিন্দু-কলেজে গিয়া উপস্থিত হইতেন; সেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর, বলিতে কি প্রত্যেক বালকের, কার্য্য পরিদর্শন করিতেন; এইরূপে সমস্ত দিন সহরের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; সায়ংকালে বাসভবনে ফিরিয়া যাইতেন।' শিবনাথ শাস্ত্রী: 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [ ১৩৬২ ], পৃ. ৪৯-৫০।

৫৩। 'স্কুলের বালকদিগের প্রতি হেয়ারের যে কি প্রেম ছিল তাহা বর্ণনীয় নহে। তাহাদিগকে দেখিলে তাঁহার এত আনন্দ হইত যে, তিনি আর সকল কাজ ভুলিয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে স্কুলে আসিবার সময় নিম্নশ্রেণীর শিশুদিগের জন্য খেলিবার বল কিনিয়া আনিতেন। স্কুলের ছুটি হইলে ঐ বল ঊর্দ্ধে ধরিয়া উদ্বাহু হইয়া শিশুদলের মধ্যে দাঁড়াইতেন; তাহারা চারিদিক হইতে

আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিত ; কেহ কোমর জড়াইত ; কেহ গাত্র বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিত ; কেহ বা স্কন্ধে ঝুলিত ; তিনি তাহাতে মহা আনন্দ অনুভব করিতেন।' তদেব। পৃ. ৫০।

৫৪। বেথুন [John Elliot Drinkwater Bethune] ছিলেন তৎকালীন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি ও গভর্ণর জেনারেলের মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য।

৫৫। '…হেয়ার যেমন বালকদিগের শিক্ষা লইয়া মাতিয়াছিলেন, বীটন তেমনি বালিকাদিগের শিক্ষা লইয়া একেবারে মাতিয়া যান। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন ; আসিবার সময় বালিকাদিগের জন্য নানা উপহার লইয়া আসিতেন ; মধ্যে মধ্যে বালিকাদিগকে নিজ ভবনে লইয়া গিয়া মূল্যবান উপহার সামগ্রী দিয়া গৃহে প্রেরণ করিতেন ; কখনও কখনও চারি পায়ে ঘোড়া হইয়া শিশু বালিকাদিগকে পৃষ্ঠে তুলিয়া খেলা করিতেন।' তদেব। পৃ. ১৭০।

৫৬। যোগেশচন্দ্র বাগল : 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা'

৫৭। ডিরোজিওর শিক্ষায় [Henry Louis Vivian Derozio] সমাজদ্রোহিতার কথা প্রচার করা হইতেছে মনে করিয়া হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে পদচ্যুত করা স্থির করেন। ডিরোজিও এই খবর জানিতে পারিয়া নিজেই পদত্যাগ করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখেন।

৫৮। বিপিনচন্দ্র পাল : 'নবযুগের বাংলা'

৫৯। যোগেশচন্দ্র বাগল : 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা'

৬০। 'আলোচনার বিষয় হত—স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বনাম অদৃষ্টবাদ, ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তি, পুতুল পূজা ও পুরোহিততন্ত্রের অসারতা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি। তদানীন্তন হিন্দুসমাজে সতীদাহ, স্ত্রীশিক্ষার অভাব, বিধবাদের দুর্দশা, জাতিভেদ, প্রাচীন দেশাচারের বাড়াবাড়ি—এ সব কিছুর বিরুদ্ধেই ডিরোজিওর ছাত্রদের শাণিত যুক্তি ও স্বাধীন মতামত এই সভায় প্রকাশিত হত।' প্রণবরঞ্জন ঘোষ : 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য'

৬১। 'হরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব অনেকেই ক্রমে সরকারী নানা বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তখন ইংরেজ-বাঙালী-নির্ব্বিশেষে ছোট বড় প্রায়

সকল কর্ম্মচারীই উৎকোচ গ্রহণ করিত। ডিরোজিও-শিষ্যদল স্বীয় চরিত্রবলে এই রেওয়াজ ফিরাইয়া দিলেন। বর্দ্ধমানে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের এইজন্য যেমন এক দল কর্ম্মচারী শত্রু হইয়াছিল, তেমনই এক দল তাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিত। তিনি সাধারণের শ্রদ্ধা প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রামতনু লাহিড়ীর ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। আদর্শ শিক্ষাব্রতীরূপে তিনি পরবর্ত্তীকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাধানাথ শিকদার নির্ভীক তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। পূর্ব্বে ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি পদস্থ কর্ম্মচারীরাও কুলিমজুর 'বেগার' খাটাইতেন। দেরাদুনে এবংবিধ কার্য্যের জন্য এক ম্যাজিস্ট্রেটকে রাধানাথ যথোচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার কিঞ্চিৎ জরিমানা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাতে যে আন্দোলন স্বরু হইল, তাহার ফলে ও অঞ্চলে এই আইন-বিগর্হিত বেগার-প্রথা রহিত হইয়া যায়।' যোগেশচন্দ্র বাগল: 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা'

৬২। '১৮৪৯-৫০ সালে গবর্ণর জেনেরালের ব্যবস্থাপক সভাতে কয়েকখানি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হয়। ভারতবাসী ইংরাজদিগকে এদেশীয়দিগের সহিত বিরোধস্থলে কোম্পানির ফৌজদারী আদালতেরও দণ্ডবিধির অধীন করাই এ সকল পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য ছিল। এদেশীয়দিগকে ইংরাজদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা ঐ আইনের লক্ষ্য ছিল। ইহাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ ঐ সকল পাণ্ডুলিপির 'কালা আইন' [Black Acts] নাম দিয়া তদ্বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করেন।...ইংরাজগণ গবর্ণমেণ্টের প্রতি গালাগালি বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। তখন দেশের এমনি অবস্থা যে, সেই উৎকৃষ্ট আইনগুলির সপক্ষে বলিবার জন্য কেহই ছিল না। তখন কেবলমাত্র রামগোপাল ঘোষ লেখনী ধারণ করিলেন; এবং A few Remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Acts' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন।' শিবনাথ শাস্ত্রী: 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [১৩৬২], পৃ. ১১৮-১১৯।

৬৩। "He [Dakshinaranjan] was a votary of the doctrine of Equality. He held that God 'in his impartial wisdom created all men alike equal to one another, in their birth-rights'. According to him in India as well as in other countries, originally there was natural equality and perfect freedom. Subversion of this equality has been the cause of

degradation of India. The Brahmana priests were responsible for overthrowing the original equality."—Bimanbehari Majumdar : *History of Political Thought*, Vol. I [C. U., 1934], pp. 116-117.

৬৪। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [ ১৩৬২ ], পৃ. ৯৬।

৬৫। তদেব। পৃ. ৮৭।

৬৬। মোহিতলাল মজুমদার : 'বাংলার নবযুগ'

৬৭। রাজনারায়ণ বসু : 'সে কাল আর এ কাল' [১৩৬৩], পৃ. ৪৫-৪৬।

৬৮। শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [ ১৩৬২ ], পৃ. ৮৬।

৬৯। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাঙালীর রুচি' : 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে'

৭০। 'Between 1861 and 1884, Germany, Italy, Roumania, Servia and Montenegro attained national unification. During the same period the Second and Third Reform Acts were passed in England, the Third Republic was established in France, Constitutional monarchy was set up in Italy and Spain, and for a short time Russia under Alexander II evinced a desire for a constitutional form of Government. The American constitution, too, was democratised during the same period. The influence of these movements reached Bengal not only through newspapers, magazines and books, but also through the Bengali youths who in ever-increasing number began to go to England and other western countries for study'. Bimanbehari Majumdar : *History of Political Thought*, Vol. 1 [C. U., 1934], p. 241

৭১। 'সাধনা' [ ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ ], পৃ. ২৪৯।

৭২। 'সাধনা' [১ম বর্ষ, ২য় ভাগ], পৃ. ৮৯।

৭৩। বিপিনচন্দ্র পাল : 'নবযুগের বাংলা'

## চতুর্থ অধ্যায়

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, এক-একটা জাতির চরম দুঃসময়ে এক-একজন শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁহার বজ্রকঠিন হস্তের পীড়নে জাতীয় জীবনের সমস্ত জঞ্জাল অপসৃত হইয়া যায়—জাতির সম্মুখে প্রসারিত হয় অগ্রগতির সুপ্রশস্ত রাজপথ। ইতিহাসের এইরূপ ঘটনাকে স্থূলদৃষ্টিতে আকস্মিক বলিয়া মনে হইলেও একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যুগান্তকারী একক ব্যক্তিসত্তা—তাহা যত বড়ই হউক না কেন—তাহার শুভাভির্ভাব সম্ভব হইয়া উঠে যুগের সমষ্টিগত সংহত শক্তিকামনায়। বেদনাপীড়িত যুগমানস যখন দুর্যোগের অমানিশায় আলোকের আকাঙ্ক্ষা করে—দেশ ও জাতির ইতিহাসে যখন ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়া নবজীবন উন্মুখ হইয়া উঠিতে চায়, তখন সেই জাতীয় ভাব ও কামনার মূর্ত প্রতীকরূপে আবির্ভূত হন যুগপাবক এক মহামানব। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষলগ্নে বাঙলাদেশে রামমোহনের আবির্ভাব এই ঐতিহাসিক সত্যেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

বাঙলাদেশে তখন প্রাচীন সমাজ ও রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছে, দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিও বিনষ্ট। যুগজীর্ণ প্রথা ও প্রাণহীন সংস্কার জাতির জীবনস্রোতকে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। ধর্মের নামে চলিয়াছে যুক্তিহীন গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসের রাজত্ব। সতীদাহের মতো নির্মম প্রথাও ধর্মের মুখোশ পরিয়া সামাজিক মর্যাদা লাভ করিতেছে। ধর্মশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়া ও নিজেদের সুবিধামত শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণ সমাজের শ্বাসরোধ করিবার নব নব পন্থা আবিষ্কার করিতেছেন। জাতীয় জীবনের এই নিরন্ধ্র অন্ধকারে অরুণাভাস সূচিত হইল ইংরাজের এদেশে আগমনে। পলাশীর যুদ্ধের পর বণিক ইংরাজ বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসনক্ষমতাও হস্তগত করিয়া লইতেছিল। ইংরাজের ভাব-ভাবনা ও রীতিনীতির সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালীর অবরুদ্ধ জীবনচেতনায় মুক্তিসংকেত বাজিয়া উঠিল। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে বহুকালের সুপ্তির পর বাঙালীর জীবনে একটা নবজাগরণের সূচনা দেখা দিল। অন্ধকার হইতে আলোকে উত্তরণের জন্য—মহতী বিনষ্টির মধ্যে নবসৃষ্টির দ্বার উদ্ঘাটনের নিমিত্ত বাঙলার যুগমানসে একটা অস্ফুট কামনা জাগিয়া উঠিল। রামমোহন রায় বাঙালীর এই মুক্তিপ্রয়াসী মনেরই প্রাণবান বিগ্রহস্বরূপ। বাঙালীর ভাব-কল্পনা, বাঙালী-চরিত্রের অন্তর্নিহিত ধর্মানুভূতি ও মানবতাবোধ রামমোহন রায়কে আশ্রয় করিয়া প্রকাশলাভ করিয়াছিল।

বাঙালীর সমাজচিন্তায়, রাষ্ট্রভাবনায়, জ্ঞানসাধনায় ও ধর্মচেতনায় রামমোহন নূতন নূতন মুক্তিপথের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। বাঙলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের আধুনিক চিন্তার জগতে তিনি অগ্রনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে দেশের মধ্যে নবজীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। প্রচলিত কুপ্রথা ও ভ্রান্তবিশ্বাসের কবল হইতে তিনি ধর্মকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও যুগপ্রাচীন নির্মম সতীদাহ-প্রথার উচ্ছেদসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে এদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য অগ্রণী হইয়াছেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছেন।

তাঁহার এই যে বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টা, ইহার মূল প্রেরণা তিনি লাভ করিয়াছিলেন একটি অকপট ধর্মবোধ হইতে। এই ধর্মবোধই তাঁহার অন্তরে চির-জাগ্রত থাকিয়া তাঁহাকে নিরন্তর বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।[১] তাঁহার এই ধর্মবোধের অনিবার্য ফলস্বরূপ একদিকে ছিল তাঁহার অপরিসীম ঈশ্বরভক্তি, অপরদিকে সুগভীর মানবপ্রেম। বস্তুতঃ তাঁহার ঈশ্বর-ভক্তিই তাঁহাকে মানবপ্রেমে দীক্ষা দান করিয়াছিল। 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'—ঈশ্বর সম্বন্ধে এই প্রতীতি তাঁহার চিত্তকে বিশ্বমানবের প্রতি প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। জীবের মধ্যে শিব দর্শনের যে বৈদান্তিক ঐতিহ্য, তাহা তাঁহাকে সমগ্র বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর সহিত একাত্মতাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার অন্তরে ধর্মসম্বন্ধে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত একটা উদার সাম্যবোধ সঞ্চারিত হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—সকল সম্প্রদায়ের ধর্মমতকেই তিনি সমানভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। বেদ-উপনিষদ, কোরান, বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে, সকল ধর্মেরই মূল নীতি এক।[২] ঈশ্বর একমাত্র, অদ্বিতীয় ও তিনিই সকলের উপাস্য—এই মূল মতে সকল ধর্মেরই ঐক্য আছে। সকল ধর্মই দুইটি মৌলিক সত্যকে আশ্রয় করিয়াছে; তাহাদের একটি—ঈশ্বরভক্তি, অপরটি—মানবপ্রেম। রামমোহনের নিজের কথায়—'মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এক এই যে সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা দ্বিতীয় এই যে পরস্পর সৌজন্যতে এবং সাধু ব্যবহারেতে কাল হরণ করা।'[৩]

ধর্মজগতে রামমোহন বৈষম্যের মধ্যে সাম্য স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন। তিনি

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্যের ঐক্য নির্দেশ করিয়া ধর্মের ক্ষেত্রে সাম্যভিত্তিক একটা সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম, আল্লা, গড্ প্রভৃতি নামে একই নিরাকার নির্গুণ পরমেশ্বরের উপাসনা করা হয়। অতএব সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা অনুসারে উপাসনা-পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকিলেও পারস্পরিক মিলনে কোনো বাধা থাকিতে পারে না। সম্প্রদায় থাকিলেও সাম্প্রদায়িকতা যেন না থাকে, অর্থাৎ এক সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে বিধর্মী বলিয়া ঘৃণা না করে ; উপাস্যের ঐক্য অনুভব করিয়া সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন পারস্পরিক আত্মীয়তাবোধ সঞ্চারিত হয়—ইহাই রামমোহন বিশেষভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য এই যে ধর্মমত—যাহাতে ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া নির্দেশ করা হয়—যাহাতে ধর্মসম্বন্ধে একটা উদার সাম্যবোধ সঞ্চারিত হওয়ায় কোনো সম্প্রদায়েরই প্রতি ঘৃণা বা দ্বেষভাব থাকে না, ইহাকে রামমোহন বলিয়াছেন Universal Religion বা সর্বজনীন ধর্ম।

রামমোহন সকল ধর্মের লোককে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বাধিবার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, যে-নামেই যে ঈশ্বরকে ডাকুক, ঈশ্বরভক্তি থাকাটাই হইল মূল কথা। ঈশ্বরভক্তি ও তাহার ফলস্বরূপ মানবপ্রেমকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া যে ধর্মই অবলম্বন করা হউক, সকল ধর্মই সমান। প্রত্যেক ধর্মেরই দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে একটি বিশিষ্ট পথ আছে। চিরাগত বিশেষ রূপটি রক্ষা করিয়া প্রত্যেক ধর্মই তাহার নিজস্ব পথে পরিক্রমা করিবে, কিন্তু সম্মুখে থাকিবে একটি মহান আদর্শ—সে আদর্শ সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ। অতএব কোনো ধর্মের অবলুপ্তি ঘটুক বা এক ধর্ম অপর ধর্মের সঙ্গে যুক্ত [ merged ] হইয়া এক হইয়া যাক, ইহা কাম্য নয়। পারস্পরিক ভাব-বিনিময় ও আত্তীকরণের [assimilation] পথে অগ্রসর হইলে এবং সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ গ্রহণ করিলে প্রত্যেক ধর্মই পূর্ণ হইতে পূর্ণতর রূপ গ্রহণ করিবে। দেশোচিত, কালোচিত এবং সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াও প্রত্যেক ধর্মের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটা সম্ভব—যদি তাহার লক্ষ্য থাকে সর্বজনীন ধর্মবোধ ও বিশ্বমানবতা।

বিভিন্ন আপাতবিরোধী ধর্মসাধনার অন্তর্নিহিত মূল সত্যকে রামমোহন সমন্বয়সূত্রে গাঁথিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য ঘরে-বাহিরে যখনই কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে ভক্তি ও মানবপ্রীতির পরিচয় পাইয়াছেন,

তখনই সেই সম্প্রদায়ের প্রতি আত্মীয়তার হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। তাঁহার রচনা হইতেই ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়।

ভারতবর্ষের একেশ্বরপন্থী উপাসক-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মিলনসেতু রচনার উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন,—"যাঁহারা এই বেদবাক্যে বিশ্বাস রাখেন যে 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' ; 'নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে' অর্থাৎ 'ব্রহ্ম কেবল একই দ্বিতীয়রহিত হয়েন' ; 'সেই পরমাত্মাকে বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা অথবা চক্ষুঃ দ্বারা জানা যায় না তত্রাপি জগতের মূল ও আশ্রয় অস্তিরূপ তেঁহ হয়েন এই প্রকারে তাঁহাকে জানিবেক ; অতএব অস্তিরূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানিতে না পারে তাহার জ্ঞানগোচর তেঁহ কিরূপে হইবেন ?'—এবং এই বাক্যানুসারে আচরণে যত্ন করেন 'যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে ॥' অর্থাৎ 'কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন আপনাকে সেইরূপ পরকেও দেখিবেন, সুখ ও দুঃখ যেমন আপনাতে হয় সেইরূপ পরেতেও হয় এমত জানিবেন,'—তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে স্বদেশীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তিতে এই এই নিষ্ঠা ও আচরণ দেখেন তাঁহাদের সহিত অতিশয় প্রীতি করেন, যদ্যপিও তাঁহারা ঐ সকল শ্রুতির সাক্ষাৎ অধ্যয়ন না করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থের দ্বারা পরমেশ্বরেতে তৎপর হইয়া থাকেন। দশনামা সন্ন্যাসিদের মধ্যে অনেকে, এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, ও দাদুপন্থী, ও কবীরপন্থী, এবং সন্তমতাবলম্বি প্রভৃতি, এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন ; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়।"[৪]

আবার বিদেশীয়দের মধ্যে যাঁহারা একমাত্র পরমেশ্বরকে শুদ্ধভাবে উপাসনা করেন এবং পরার্থপরতার পরিচয় দেন, তাঁহাদিগকেও রামমোহন একান্ত আপন জন বলিয়া গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন : 'বিদেশীয়দের অন্তঃপাতি ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহারি উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থসাধন জানেন তাঁহাদিগ্যেও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয়। তাঁহারা যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্য্য কহেন ইহাতে পরমার্থ বিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপে হয় এমন আশঙ্কা উচিত নহে ; যেহেতু উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।'[৫]

রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পিছনে ছিল একটি মহান উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসক, তাহাদের একত্র মিলিত করিয়া তিনি একটি সর্বধর্মীয় উপাসনাসভা গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজকে তিনি কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত করিতে চাহেন নাই। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনায় যোগদানের অধিকার ছিল। ব্রাহ্ম-সমাজের Trust Deed-এ ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে ট্রাস্টীদের প্রতি এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা '...shall and do from time to time and at all times for ever hereafter permit and suffer the said messuage or building land tenements hereditaments and premises with their appurtenances to be used occupied enjoyed applied and appropriated as and for a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly sober religious and devout manner for the worship and adoration of the Eternal Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe.'[৬] ব্রাহ্মসমাজে সকল সম্প্রদায়ের লোককে এইরূপ সমান অধিকার দানের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, পরস্পর একসঙ্গে উপাসনা করিতে করিতে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও গোঁড়ামি দূর হইবে--সকল ধর্মকেই সমান মনে হইবে এবং সর্বজনীন ধর্মবোধের দিকে মন অগ্রসর হইবে।

রামমোহন রায় যে-সকল ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সর্ব-সম্প্রদায়ের গ্রহণীয় এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের বন্দনা করা হইয়াছে। নিম্নের গানটি ইহার উদাহরণস্বরূপ :

'ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার,
আদি অন্ত নাই যার,
সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।'[৭]

এখানে স্পষ্টতঃই সর্বব্যাপী, নিরাকার, অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের কথা বলা হইতেছে। হিন্দুর ব্রহ্ম, মুসলমানের আল্লা, খ্রীষ্টানের গড্ এই ঈশ্বরকল্পনা হইতে

স্বতন্ত্র নহে। অতএব সকলেই এই উপাসনাসংগীতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। সকল সম্প্রদায়ের ধর্মবোধের এই যে সমন্বয়সাধন, ইহা রামমোহনের ধর্মবিশ্বাসেরই একান্ত অনুগত। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করিয়া রামমোহনের এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ঈশ্বর অদ্বিতীয় ও নিরাকার এবং তিনি সর্বব্যাপী। রামমোহনের ব্রহ্মসংগীতে তাঁহার এই ধর্মবিশ্বাসেরই আবেগমধুর প্রকাশ।

নিরাকার অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে বিশ্বাসই রামমোহনকে ধর্মবিষয়ে সাম্যাদর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।[৮] এই আদর্শের পরিপন্থী যে-কোনো ধর্মীয় প্রথা বা বিশ্বাসকে তিনি অস্বীকার করিতেন। এইজন্য দেখা যায় যে, হিন্দুধর্মে প্রচলিত প্রতিমাপূজা বা প্রতীকোপাসনার বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ় হস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন,—'...যাবৎ নামরূপময় মিথ্যা জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায় বস্তুত সে রজ্জুই সর্প হয় এমৎ নহে সেইরূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম তেহোঁ মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক না হয়েন এই হেতু বেদান্তে পুনঃ ২ কহেন যে ব্রহ্ম বিবর্ত্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চস্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়া দ্বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপে পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে ব্রহ্মস্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন অর্থাৎ তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বিনাশযোগ্য মূর্ত্তিমান্ কহিতে সাহস করেন। ইহা হইতে আশ্চর্য্য আর অন্য কি আছে যে ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মন এবং মন হইতে পর যে বুদ্ধি বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মন সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয় তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষু সেই চক্ষুর গোচরযোগ্য করিয়া কহেন।'

হিন্দুধর্মের মূল শিক্ষা যে নিরাকার একেশ্বরের উপাসনা, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য রামমোহন বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের আশ্রয় লইয়াছিলেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ'-নামক পুস্তকের ভূমিকায় এই বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য স্মরণীয়ঃ 'বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্তশাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন। ... যদি রূপগুণবিশিষ্ট কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্য বেদান্তশাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন তবে বেদান্ত পঞ্চাশদধিক পাঁচ শত সূত্রে কোন স্থানে সে দেবতার কিম্বা মনুষ্যের প্রসিদ্ধ নামের কিম্বা রূপের বর্ণন অবশ্য হইত কিন্তু ওই সকল সূত্রে ব্রহ্মবাচক শব্দ বিনা দেবতা কিম্বা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চ্চার লেশ নাই। যদি

বল বেদে কোন কোন স্থানে রূপগুণবিশিষ্ট দেবতার এবং মনুষ্যের ব্রহ্মত্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন অতএব তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে উপাস্য হয়েন ইহার উত্তর এই অত্যল্প মনোযোগ করিলেই প্রতীতি হইবেক যে এমত কথনের দ্বারা ওই দেবতা কিম্বা মনুষ্যের সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় নাই যেহেতু বেদেতে যেমন কোন কোন দেবতার এবং মনুষ্যের ব্রহ্মকথন দেখিতেছি সেইরূপ আকাশের এবং মনের এবং অন্নাদির স্থানে ২ বেদে ব্রহ্মত্বরূপে বর্ণন আছে এ সকলকে ব্রহ্ম কথনের তাৎপর্য্য বেদের এই হয় যে ব্রহ্ম সর্ব্বময় হয়েন তাহার অধ্যাস করিয়া সকলকে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা যায় পৃথক্ পৃথক্‌কে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বর্ণন করা বেদের তাৎপর্য্য নহে এইমত সিদ্ধান্ত বেদ আপনি অনেক স্থানে করিয়াছেন তবে অনেকেই কখন পশু পক্ষীকে কখন মৃত্তিকা পাষাণ ইত্যাদিকে উপাস্য কল্পনা করিয়া ইহাতে মনকে কি বুদ্ধির দ্বারা বদ্ধ করেন বোধগম্য করা যায় না এরূপ কল্পনা কেবল অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।'

কেবল হিন্দুধর্মই নয়, খ্রীষ্টধর্মেরও তথাকথিত একেশ্বরবিরোধী মতবাদকে রামমোহন অযৌক্তিক ও কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মে পরমেশ্বরের [Supreme Being] তিনটি প্রকারভেদের কথা বলা হয়— পিতা [ ঈশ্বর], পুত্র [ যীশুখ্রীষ্ট] ও হোলি গোস্ট বা পবিত্র আত্মা। রামমোহন অকাট্য যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া এই ত্রীশ্বরাত্মক মত [Doctrine of the Ttinity][৯] যে একান্ত অর্থহীন তাহা প্রতিপন্ন করেন। এই বিষয়ে শ্রীরামপুর মিশনের তৎকালীন মিশনারীদের সঙ্গে রামমোহনের মসীযুদ্ধ উপস্থিত হয়। রামমোহনের প্রশ্নের উত্তরে মিশনারীদের 'Friend of India'-নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ঈশ্বরের ত্রিরূপ সম্বন্ধে একটি ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়। রামমোহন তাঁহার 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা'র ছদ্মনামে খ্রীষ্টীয় মিশনারীর এই ঈশ্বরব্যাখ্যার বিরূপ সমালোচনা করেন। এই সমালোচনা রামমোহনের ধর্মীয়-সাম্য-সংস্থাপক একেশ্বরবাদ প্রচারের পুষ্টিবিধান করিতেছে।[১০] রামমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্যের পরিচয় দানের নিমিত্ত নিম্নে ইহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল :

"আপনি প্রথম লিখেন যে 'বায়বেলে আমাদিগ্যে জানান নাই যে পিতা ও পুত্র ও হোলি গোষ্ট কিরূপে স্থিতি করেন আর তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর যিনি হয়েন তিনি আপনার অনন্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব দ্বারা কি বিশেষ রূপে স্থিতি ও ক্রিয়া করেন তাহা আমাদিগ্যে জানাইবার নিমিত্ত লঘুতা স্বীকার করেন নাই'

তথাপিও বায়বেলের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহারা কি বিশেষ রূপে স্থিতি করেন ও কি কি বিশেষ ক্রিয়া করেন তাহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লিখিয়াছেন 'যে পুত্র ঈশ্বর যিনি পিতা ঈশ্বরের সহিত সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া আছেন. তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন আর তিনি পাপগ্রস্ত মনুষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপা করিয়া আপনার মহিমাকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া আপন লঘুতা স্বীকার করিয়াছেন ও ভৃত্যের আকৃতি গ্রহণ করিয়া পিতা ঈশ্বরের আরাধনা ও আজ্ঞাকারিত্ব স্বীকার করিলেন আর আপন পিতাকে প্রার্থনা করিলেন যে যে মহিমা পিতা ঈশ্বরের সহিত সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার ছিল এবং যাহাকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আপন হইতে পৃথক্ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে দেন আর তিনি স্বর্গে যেখানে পূর্ব্বে ছিলেন তথায় পিতার অনুমতিক্রমে আরোহণ করিলেন পরে তিনি পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন যে পিতা স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের তাবৎ শক্তিমধ্যস্থ যে তিনি তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন আর ঈশ্বর হোলি গোষ্ট পুত্র ঈশ্বরের উপর সাক্ষাৎ কপোতরূপে আসিয়া পুত্র ঈশ্বরের অবতার হইবাতে স্বস্তিবাদ করিলেন 'পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোলি গোষ্ট ঈশ্বর' এই তিনের পৃথক্ পৃথক্ নিবাস [ ছাপার ভুলে—'বিনাশ' ] পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া ও পৃথক্ পৃথক্ সত্তা কহিয়া পুনরায় কহেন যে তাঁহারা এক হয়েন আর বাসনা করেন যে অন্য সকলেও তাঁহাদের এক হওয়াতে বিশ্বাস করে। তিন পৃথক্ দ্রব্যকে এক জ্ঞান করা ক্ষণ মাত্রও সম্ভব হয় না সেই তিনের এক ব্যক্তি স্বর্গে থাকিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি প্রসন্নতা দেখান আর তাঁহার দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎকালে মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া ধর্ম্ম যাজন করেন তাহার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি স্বর্গ মর্ত্ত্য এ দুয়ের মধ্যে থাকিয়া প্রথম ব্যক্তির অভিপ্রায়ানুসারে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। যদি নিবাসের পার্থক্য ও আধারের ও ক্রিয়ার ও কর্ম্মের পার্থক্য বস্তু সকলের পৃথক্ হইবার ও অনেক হইবার কারণ না হয় তবে একেকে অন্য হইতে পৃথক্ জানিবার অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে পর্ব্বত পৃথক্ ও মনুষ্য হইতে পক্ষি পৃথক্ তাহার প্রমাণ কিছু রহিল না… ।"[১১]

খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া রামমোহন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, খ্রীষ্টধর্ম মূলতঃ ঈশ্বরের একত্বমূলক বা Unitarian মতবাদ প্রচার করিতেছে। এইজন্যই তিনি পাদরিদের প্রচারিত Trinity-তত্ত্ব মানিয়া লইতে পারেন নাই। খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারিত ঈশ্বরৈক্যমূলক মতবাদ বা Unitarianism রামমোহনের অন্তরে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তিনি নিজেকে 'Hindu Unitarian'

বলিতে আনন্দ পাইতেন এবং কলিকাতায় 'Unitarian Committee' নামে একটি ধর্মসংঘ স্থাপন করিয়াছিলেন।[১২]

আসল কথা, কোনো ধর্মেরই প্রতি রামমোহন বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের কুপ্রথা, ভ্রান্তবিশ্বাস ও শাস্ত্রপ্রচারিত অলীক গল্পকাহিনীকে তিনি অর্থহীন ও ক্ষতিকর বলিয়া গণ্য করিতেন। সকল ধর্মের মূল সত্যকে গ্রহণ করিয়া তিনি ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, উপলব্ধির একটি বিশেষ স্তরে আসিয়া সকল ধর্মই এক নীতি ঘোষণা করে—সকল ধর্মই সমান হইয়া যায়। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক সংস্কৃতিতে কতকগুলি ধর্মীয় লোকাচার ও কুপ্রথা দেখা যায় এবং জাতীয় সাহিত্যেও সেগুলি স্থান করিয়া লয়। শাস্ত্রপ্রচারিত মূল সত্যকে পিছনে ফেলিয়া এইগুলি ধর্মের ক্ষেত্রে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে। রামমোহন এই লোকাচার ও কুপ্রথার কদর্য প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া ধর্মকে ঈশ্বরভক্তি ও মানবপ্রেমের উদার ক্ষেত্রে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি একদিকে যেমন হিন্দুধর্মের কুপ্রথা ও ভ্রান্তবিশ্বাসের মূলে আঘাত করিয়া বেদান্ত ও উপনিষদে বর্ণিত শাশ্বত ধর্মবোধের কথা প্রচার করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের অলৌকিক কাহিনী [Miracle] ও প্রত্যাদেশ [Revelation] উপেক্ষা করিয়া মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের প্রচারিত সর্বজনহিতকর নীতি-উপদেশের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।[১৩]

কিন্তু এই প্রসঙ্গে রামমোহন সম্বন্ধে অপর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। অন্তরে গভীর মানবপ্রেম ছিল বলিয়া রামমোহন তাঁহার মতবাদের বিরুদ্ধাচারীদের প্রতিও ঘৃণা বা কটূক্তি বর্ষণ করিতে পারেন নাই। ধর্মসংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তিনি একেশ্বরবাদের মিলনভূমিতে সকল ধর্মের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেইজন্য বিপরীতগামীদের প্রতি তাঁহার কোনরূপ আক্রোশ ছিল না। যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি 'দুর্ব্বলাধিকারী' বলিয়া করুণার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং এই আশা করিয়াছেন যে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিলে তাঁহারাও ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনায় রত হইবেন। এদেশে ও বিদেশে বহু লোক ঈশ্বরের অবতারে বিশ্বাস করেন ; রামমোহন অবতারতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অবতারবাদীদের প্রতি তাঁহার কোনো দ্বেষভাব ছিল না। তাঁহার উক্তিতে তাঁহার এই উদার মানসিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট :

'…ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা য়িশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে মনে কল্পনা করেন এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, ও ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর, কিন্তু এই তিনে এক ঈশ্বর হয়েন ইহাই স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিও বিরোধিভাব কর্ত্তব্য নহে; বরঞ্চ যেরূপে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা বাহ্যেতে প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া মনেতে রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহাদের ধ্যান ধারণা করেন এবং ঐ নানা অবতারের ঐক্যতা দর্শান, তাঁহাদের সহিত যেরূপে অবিরোধিভাব রাখি, সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের প্রতিও কর্ত্তব্য হয়।

'আর যে সকল ইউরোপীয় য়িশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার নানা প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদের প্রতিও দ্বেষভাব কর্ত্তব্য হয় না; বরঞ্চ আমাদের মধ্যে যাঁহারা রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জ্ঞানে তাঁহাদেব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদের সহিত যেরূপ আচরণ কবিয়া থাকি সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের সহিত করাতে হানি নাই, যেহেতু এই দুই ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং ঐ দুই প্রকার স্বদেশীয় ইহাঁদের উপাসনার মূলে ঐক্য আছে যদ্যপিও বর্ণের প্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন উপলব্ধ হয়েন।'[১৪]

বস্তুতঃ যিনি নিখিল মানবজাতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন, তাঁহার চোখে কেহই ঘৃণ্য বা হেয় বলিয়া গণ্য হয় না।

'যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্‌সতে॥" [ঈশোপনিষৎ : শ্লোক ৬]

—যিনি আপনার মধ্যে সকলকে, সকলের মধ্যে আপনাকে দেখেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

রামমোহনের হৃদয়ে এইরূপ সর্বব্যাপী প্রীতি ছিল বলিয়া তিনি সকলকেই তাঁহার বিশাল বক্ষে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেন। এমন কি, ধর্মজীবনে প্রাগ্রসরতার ফলে সাকার উপাসকদেরও তিনি তাঁহার নিরাকার উপাসনার বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার 'অনুষ্ঠান'-নামক পুস্তিকায় শিষ্যের প্রতি আচার্যের উপদেশচ্ছলে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন: 'এ উপাসনার [নিরাকার উপাসনার] বিরোধী বিচারত কেহ নাই, যেহেতু আমরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা এই উপলক্ষ করিয়া উপাসনা করি, অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ সম্ভব হয় না, কেন না প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই ২ দেবতাকে জগৎকারণ ও জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা এই বিশ্বাসপূর্ব্বক উপাসনা করেন, সুতরাং তাঁহাদের

বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে তাঁহারা সেই ২ দেবতার উপাসনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে যাঁহারা কাল কিম্বা স্বভাব অথবা বুদ্ধ কিম্বা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা কহিয়া থাকেন তাঁহারাও বিচারত এ উপাসনার, অর্থাৎ জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তারূপে চিন্তনের, বিরোধী হইতে পারিবেন না। এবং চীন ও ত্রিবৃৎ [ তিব্বত ? ] ও ইউরোপ ও অন্য ২ দেশে যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন তাঁহারাও আপন ২ উপাস্যকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক কহেন, সুতরাং তাঁহারাও আপন ২ বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই ২ আপন উপাস্যের আরাধনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।'

সাকার উপাসনার প্রতি রামমোহনের এই সহানুভূতিকে আপাতদৃষ্টিতে স্ব-বিরোধ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা ভুলিলে চলিবে না যে, পৃথিবীর অন্য অনেক কিছুর মতই ধর্মবিশ্বাসও বিবর্তনপন্থী। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া রামমোহন যে নিরাকার উপাসনার বুদ্ধিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন, অনুভূতির উন্নত শিখরে উঠিয়া তাহাকেও বাহ্য বলিয়া মনে হইয়াছে—তখন চতুষ্পার্শ্ববর্তী সকল ধর্মমত ও সকল উপাসনারীতি, সাকার এবং নিরাকার কল্পনা এক ও অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান বিরাটের স্বরূপ চিন্তা করিতে গিয়া শাশ্বতকালের জিজ্ঞাসা অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে ঃ

তিনি সাকার কি নিরাকার
বুঝিতে শকতি কার ?

তাই নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসক হইয়াও রামমোহন আর সাকার উপাসকদের ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তর হইতে একটি সুগভীর ধর্মচেতনা উৎসারিত হইয়া ধর্মজগতের সকল পথ ও পথিককে সমভাবে অভিষিক্ত করিয়াছে। সর্বসাম্প্রদায়িকতামুক্ত যে উদার ধর্মমত রাম-মোহন প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তাহার আঙিনায় শেষ পর্যন্ত মত-পথ-নির্বিশেষে সকল দেশের সকল মানুষকেই তিনি আহ্বান করিয়াছেন।

রামমোহনের ব্যক্তিজীবনও ছিল সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত। তিনি ছিলেন একাধারে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান। নিজেকে তিনি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবি করিতেন, উপবীত ধারণ করিতেন ; অথচ খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে তাঁহার কোনো গোঁড়ামি ছিল না—মুসলমান ও খ্রীষ্টানের হস্তে স্বচ্ছন্দে আহার করিতেন। একদিকে যেমন তিনি হিন্দুসমাজে থাকিয়াই বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড ও পৌত্তলিকতা বর্জন করিয়া এক ও অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে নিষ্ঠাবান হওয়ার

উপদেশ দিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই খ্রীষ্টীয় ধর্মের সংস্কার সাধনের নিমিত্ত Unitarian Committee গঠন করিয়াছিলেন এবং প্রতি রবিবার সকালে Unitarian Service-এ যোগদান করিতেন। তিনি হিন্দুর সঙ্গে হিন্দু, মুসলমানের সঙ্গে মুসলমান, খ্রীষ্টানের সঙ্গে খ্রীষ্টানের মতো মিশিতেন। তিনি ছিলেন 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ', 'জবরদস্ত মৌলভী', আবার স্বেচ্ছাবৃত পাদরি—Rev. Adom-কে তিনি Unitarian Christianity-তে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ তাঁহাকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া দাবি করিয়াছিল। তাঁহার ধর্মবিশ্বাসে হিন্দু, খ্রীষ্টান ও ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের একটা সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বমানবতাবোধে সমস্ত ধর্মমত ও কৃষ্টি মিলিত হইয়াছিল। অতএব প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন বহুব্যক্তিক [multi-personal]।

ইতিহাসে এমন এক-একজন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁহাকে ঘিরিয়া এক-একটি সম্প্রদায় বা দল গড়িয়া উঠে। এই ধরনের ব্যক্তিত্বকে অভিহিত করা যায় কেন্দ্র [centre] বলিয়া। নানক, কবীর, চৈতন্য—প্রত্যেকেই এই অর্থে এক-একটি কেন্দ্র। কিন্তু রামমোহন? হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তিনি। কারণ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে তাহাদের সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মনে করিত। এই অর্থে তাঁহাকে বহুকেন্দ্রিক ব্যক্তি [poly-centric personality] বলা চলে। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন ব্যক্তির সাধনার মধ্যে কেমন করিয়া সকল ধর্মের শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়া বিশ্বমানবতাবোধ জাগ্রত করা যায়। বিবর্তনধর্মী মানবসভ্যতার দিকে চাহিয়া ইহা অবশ্যই আশা করিতে পারা যায় যে, মানুষের ভাবী ইতিহাসে এমন দিন আসিতেছে—যেদিন বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইসলাম ও বৈদান্তিক ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সমন্বয়ের ফলে সাম্যাদর্শী এক উদার ধর্মজগতের সৃষ্টি হইবে। এই দিক দিয়া রামমোহনকে ভাবীকালের ধর্মীয় সাম্য-সাধনার অগ্রদূত বলা চলে। মানবজাতির শান্তি ও ঐক্য কামনায় ধর্মকে সকলপ্রকার বিভেদ ও বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে স্থাপনের নিমিত্ত রামমোহন একদা প্রার্থনা করিয়াছিলেন: 'May God render religion destructive of differences and dislike between man and man, and conducive to the peace and Union of mankind.'[১৫]

তাঁহার এই প্রার্থনাবাণী যেদিন বিশ্ববিবেকের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইবে,

সেদিন—মানবসভ্যতার সেই পরম লগ্নে মানুষের অনেক দুঃখেরই অবসান ঘটিবে।

'সাম্প্রদায়িকতার বিচিত্র বেড়া' ভাঙিয়া রামমোহন ধর্মকে যে সর্বমানবিক রূপ দান করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাকে ব্যাপক অর্থে বলা যায় মানবধর্ম। ইহা যেমন একদিকে নিখিল মানবজাতিকে সকলপ্রকার বৈষম্য বর্জন করিয়া সাম্যবোধের একটি উদার ক্ষেত্রে মিলিত হইবার আহ্বান জানায়, তেমনই অপরদিকে মনুষ্যত্বের হানিকর সকল বন্ধন, লাঞ্ছনা ও অপমানকে তীব্রভাবে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেয়। মানবধর্মবাদী রামমোহনের ব্যক্তিসত্তায় এই দুইটি বিষয়েরই অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল দেশের সকল মানুষকেই তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং এইরূপ দেখিতেন বলিয়াই পৃথিবীর কোনো প্রান্তের কোনো জাতির দুঃখ-লাঞ্ছনার কথা জানিতে পারিলে মর্মাহত হইতেন—আবার কোনো জাতির স্বাধীনতা ও নবজাগৃতির সংবাদে উল্লসিত হইয়া উঠিতেন। এইজন্যই দেখিতে পাই, স্বাধিকারকামী নেপ্‌লসের গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার খবরে রামমোহন একটি বিশেষ আনন্দানুষ্ঠান উপেক্ষা করিয়া গৃহমধ্যে বিষণ্নমুখে বসিয়া আছেন,[১৬] আবার দক্ষিণ-আমেরিকায় স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতালাভে উল্লসিত হইয়া ভোজসভার আয়োজন করিতেছেন।[১৭]

বিশ্বমানবের সুখদুঃখে এই যে সহানুভূতি, ইহাই তো সকল ধর্মের বড় ধর্ম। এই মানবপ্রেমমূলক ধর্মকেই রামমোহন আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য কোনো মানুষকেই তিনি কখনও ছোট বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না, আর তাহা পারিতেন না বলিয়াই মানুষের স্বাধীন সত্তার প্রতি তাঁহার একটা গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তাঁহার সকল কর্মে, সকল চিন্তায় ও আচরণে তাঁহার এই স্বাধীনতাপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ স্বাধীনতাপ্রীতি ছিল বলিয়াই তিনি বিশপ মিড্‌লটনের বৈষয়িক লাভের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন[১৮] এবং ভগ্ন পদ লইয়াও ফরাসী জাহাজে উড্ডীন ফরাসীদের স্বাধীনতার প্রতীক ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকাকে অভিবাদন জানাইয়াছিলেন।[১৯]

রামমোহনের মানবপ্রেম ও স্বাধীনতাপ্রীতি একটি অখণ্ড ধর্মবোধ হইতে সঞ্জাত। এইরূপ ধর্মবোধের প্রেরণায়ই তিনি তাঁহার দেশবাসীকে সামাজিক দাসত্ব, রাজনৈতিক দাসত্ব, শাস্ত্রের দাসত্ব প্রভৃতি সকলপ্রকার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। সতীদাহ-নিবারণের প্রচেষ্টায় তাঁহার যে যোদ্ধবেশ,

তাহাও তাঁহার এই উন্নত মানসিকতার পরিচয় বহন করে। তিনি চাহিয়াছিলেন নারীকে তাহার মনুষ্যত্বের অধিকার ফিরাইয়া দিতে—ইহাই তাঁহার সতীদাহ-নিবারণ-প্রচেষ্টার মূল কথা। ধর্মজ্ঞান-পরিমার্জিত উন্নত বিবেক-বুদ্ধি লইয়া তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, নারী ও পুরুষের বৈষম্য কেবল সামাজিক বিধি-বিধানের ফল। সমাজশাসনের বজ্রমুষ্টি হইতে মুক্তি পাইলে চির-অবজ্ঞাত নারীসমাজও যে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা তিনি বিশেষভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহমরণ-বিষয়ক রচনায় প্রবর্তক ও নিবর্তকের উক্তি-প্রত্যুক্তির ছলে নারীজাতির প্রতি তাঁহার এই শ্রদ্ধাবোধের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

'প্রবর্ত্তক।—স্ত্রীলোককে স্বামীর সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার যথার্থ কারণ এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাহ করিবাতে আগ্রহের কারণ···লিখিয়াছি, যে স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা এবং ধর্ম্মজ্ঞানশূন্যা হয়।···

নিবর্ত্তক।—···স্ত্রীলোককে যে পর্য্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পর্য্যন্ত করা লোকত ধর্ম্মত বিরুদ্ধ হয়, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি এইরূপ নানাবিধ দোষোল্লেখ সর্ব্বদা করিয়া তাহারদিগকে সকলের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং দুঃখদায়ক জানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা তাহারা নিরন্তর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।···

প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে ২ বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।

দ্বিতীয়ত তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য

জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।

তৃতীয়ত বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক, …।

চতুর্থ যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক ২ পুরুষের প্রায় দুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতিকষ্ট যে ব্রহ্মচর্য্য তাহার অনুষ্ঠান করে।

পঞ্চম তাহারদের ধর্ম্মভয় অল্প, এ অতি অধর্ম্মের কথা, দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে।…ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন ২ স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি ২ দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন;…। দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।'[২০]

সহমরণের বিপক্ষে নিবর্তকের উল্লিখিত যুক্তিগুলি হইতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, নারী তাহার চারিত্রিক বলে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারে। নারীর এইরূপ মহিমার কথা উল্লেখ করিয়া রামমোহন বলিতে চাহিয়াছেন যে, পুরুষের প্রভুসুলভ স্বার্থপর বুদ্ধিই নারী-পুরুষে বৈষম্যের মূল কারণ।

নারী ও পুরুষ, স্বদেশীয় ও বিদেশীয়, স্বধর্মী ও বিধর্মী—সকলপ্রকার বৈষম্যের ঊর্ধ্বে অবস্থিত যে উদার ধর্মবোধ, তাহারই পাদপীঠে দাঁড়াইয়া রামমোহন বিশ্ববাসীকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের পথে অঙ্গুলিসংকেত করিয়াছেন। এযুগে যে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব [ International fraternity ] ও বিশ্বরাষ্ট্রের

[world state] পরিকল্পনার কথা শোনা যাইতেছে, রামমোহনের চিন্তাধারায় তাহার প্রথম রেখাপাত দেখা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহনই আধ্যাত্মিক সাম্য-চিন্তার আদি প্রবক্তা। তাঁহার পরবর্তী সর্বশ্রেণীর বাঙালী চিন্তাশীল মনীষীদের উপর অনিবার্যভাবে তাঁহার প্রভাব পড়িয়াছে। ধর্মসম্বন্ধে তিনি যে সাম্যবোধের বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তী কালের বাঙলা সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে।

---

১। '...he [Rammohun] was above all and beneath all a religious personality....The root of his life was religion He would never have been able to go so far or to move his countrymen so mightily as he did but for the driving power of an intense theistic passion.' Sophia Dobson Collet : *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy*—ed. by Dilip Kumar Biswas & Prabhat Chandra Ganguly

২। '...he [Rammohun] found that the core of religious truth, comprehending the Unity of God as spirit, his worship in spirit and in truth, the immortality of the soul, and ethical discipline as the basis of spiritual life, formed the central teaching of the canonical scriptures of the historic religions.' Brajendra Nath Seal : *Rammohun Roy* : *The Universal Man* [Calcutta], p. 14. An address delivered at the death anniversary of Rammohun Roy held at Bangalore on the 27th September, 1924.

৩। রামমোহন : 'ব্রহ্মোপাসনা'।

৪। রামমোহন : 'প্রার্থনাপত্র'।

৫। তদেব।

৬। 'The English works of Raja Rammohun Roy' [Allahabad, 1906], pp. 215-216.

৭। রামমোহন : 'ব্রহ্মসঙ্গীত'।

৮। মুসলমান ধর্মশাস্ত্র, বিশেষতঃ সুফী মতবাদের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া

রামমোহন একেশ্বরবাদের প্রতি অনুরক্ত হন। 'তুফাতুলমহাউদ্দীন'-নামক ফারসী ভাষায় রচিত তাঁহার সর্বপ্রথম গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরের একত্ব ও নিরাকারত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থেই তিনি সর্বপ্রথম প্রতীক বা প্রতিমা উপাসনা সম্বন্ধে সকল ধর্মমতের পৌরাণিক অংশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন।

৯। '···The Bible never formally speaks of the personality of Father, Son, and Spirit [the Holy Ghost].···The doctrine or dogma of the Trinity is the church's response to the intellectual demand for the reconciliation of the various statements of Holy Writ concerning the nature of God.' J. Robinson Gregory: *The Theological Student* [London, 1899], p. 52.

১০। ইহা ছাড়া 'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ' নামে একখানি পুস্তিকায় এক পাদরি ও তাঁহার তিন শিষ্যের কথোপকথনছলে রামমোহন 'সুকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ত্রীশ্বরাত্মক খ্রীষ্টীয় মত নিতান্ত অসঙ্গত'।

১১। রামমোহন: 'ব্রাহ্মণ সেবধি' [ ৩য় সংখ্যা ]।

১২। ১৮২১ সালে কলিকাতায় Unitarian Committee গঠিত হয়। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর Rev. William Adam রামমোহনের সাহায্যে কলিকাতায় Unitarian Mission প্রতিষ্ঠা করেন। 'বেঙ্গল হরকরা' অফিসের একটি হলঘরে Unitarian Service চলিতে থাকে। ধর্মতলায় একটি Unitarian Press খোলা হয়। প্রতি রবিবার সকালে রামমোহন তাঁহার পরিবারবর্গ ও অনুগামীদের লইয়া Unitarian Service-এ যোগ দিতেন। এই Unitarian আন্দোলনই কালক্রমে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা যোগাইয়াছিল।

১৩। যীশুখ্রীষ্টের নৈতিক শিক্ষার সারবত্তা প্রদর্শনের জন্য রামমোহন *The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness* নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন: 'I···confine my attention at present to the task of laying before my fellow creatures the words of Christ,···I feel persuaded that by separating from the other matters contained in the New Testament, the moral precepts found in that

book, these will be more likely to produce the desirable effect of improving the hearts and minds of men of different persuasions and degrees of understanding. For, historical and some other passages are liable to the doubts and disputes of free-thinkers and anti-Christians, especially miraculous relations, which are much less wonderful than the fabricated tales handed down to the native of Asia, and consequently would be apt, at best, to carry little weight with them. On the contrary, moral doctrines, tending evidently to the maintenance of the peace and harmony of mankind at large, are beyond the reach of metaphysical perversion, and intelligible alike to the learned and to the unlearned. This simple code of religion and morality is so admirably calculated to elevate men's ideas to high and liberal notions of God, who has equally subjected all living creatures, without distinction of caste, rank or wealth, to change, disappointment, pain and death, and hss equally admitted all to be partakers of the bountiful mercies which he has lavished over nature, and is also so well fitted to regulate the conduct of the human race in the discharge of their various duties to themselves, and to society, that I cannot but hope the best effects from its promulgation in the present form.' *Introduction : The English works of Raja Rammohun Roy* [Allahabad, 1906], pp. 484-485.

১৪। রামমোহন : 'প্রার্থনাপত্র'।

১৫। "An appeal to the Christian Public in defence of 'The Precepts of Jesus' by a Friend to Truth" : *The English works of Raja Rammohun Roy* [Allahabad, 1906], p 564.

১৬। ১৮২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে নেপ্‌লসবাসীরা নেপ্‌লসের স্বেচ্ছাচারী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীরা দাবি করে যে, নেপ্‌লসে নিয়মতান্ত্রিক শাসন চালু করিতে হইবে এবং জনগণকেই তাহাদের ভাগ্য নির্ধারণের

অধিকার দিতে হইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেপ্‌লসের এই গণ-অভ্যুত্থান কঠোরভাবে দমন করা হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট তারিখে রামমোহন নেপ্‌লসবাসীদের শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ পাইলেন। ঐ দিনই জেম্‌স সিল্ক বাকিংহাম [ James Silk Buckingham ] নামে এক ইংরাজ ভদ্রলোকের সঙ্গে রামমোহনের আহার করিবার কথা ছিল; কিন্তু নেপ্‌লসের দুঃসংবাদে রামমোহন এতই কাতর হইয়া পড়িলেন যে, সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার এই সময়কার মানসিক অবস্থা জানাইয়া তিনি সেদিন বাকিংহামকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন: 'I am afraid I must be under the necessity of denying myself the pleasure of your society this evening; more especially as my mind is depressed by the late news from Europe.…

'From the late unhappy news I am obliged to conclude that I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe, and Asiatic nations, especially those that are European colonies, possessed of a greater degree of the same blessing than what they now enjoy.

'Under these circumstance I consider the cause of the Neapolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful.' *The English works of Raja Rammohun Roy* [Allahabad, 1906], p. 923.

১৭। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলি স্পেনের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। স্পেনীয় উপনিবেশসমূহের এই নবজাগরণ ও স্বাধীনতালাভে উল্লসিত হইয়া রামমোহন তাঁহার বহু ইউরোপীয় বন্ধুকে আমন্ত্রণ করিয়া একটি বড় রকমের ভোজে আপ্যায়িত করেন। ভোজসভায় এইরূপ উচ্ছ্বসিত আনন্দপ্রকাশের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া রামমোহন উত্তর দিয়াছিলেন: 'What! ought I to be insensible to the sufferings of my fellow-creatures wherever they are, or howsoever unconnected by interests, religion and language?' *Edinburgh Magazine and Literary Miscellany*, Sept. 1823, pp. 351-52.

১৮। মিড্‌লটন নামে এক 'বিশপ' বা খ্রীষ্টান্‌ ধর্মযাজক রামমোহনকে এই লোভ দেখাইয়াছিলেন যে, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে রামমোহন বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষরূপ লাভবান হইবেন এবং তাঁহার সম্মানও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে। স্বাধীনতা-প্রিয় রামমোহন বিশপের এই প্রস্তাবকে অত্যন্ত ঘৃণাজনক মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করেন এবং জীবনে আর কোনদিন বিশপের মুখদর্শন করেন নাই। S. D. Collet : *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy*

১৯। রামমোহন 'আল্‌বিয়ন' [Albion]-নামক জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাইতেছিলেন। জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপে ভিড়িলে তিনি কিছুক্ষণের জন্য তীরে নামিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি জাহাজের সিঁড়িতে পড়িয়া যান এবং উহার ফলে তাঁহার একখানি পা ভাঙিয়া যায়। সেই ভাঙা পা লইয়াই তিনি পরে ফরাসী জাহাজে উড্ডীন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রতীক ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকাকে অভিবাদন করিতে গিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য : "Two French frigates under the revolutionary flag, the glorious tri-colour, were lying in Table Bay ; and lame as he [Rammohun] was, he would insist on visiting them. The sight of these colours seemed to kindle the flame of his enthusiasm, and to render him insensible to pain.···He was conducted over the vessels and endeavoured to convey by the aid of interpreters how much he was delighted to be under the banner that waved over their decks,—an evidence of the glorious triumph of right over might ; and as he left the vessels he repeated emphatically.'Glory, glory, glory to France' !" Ibid, p. 308.

২০। রামমোহন : 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'।

# পঞ্চম অধ্যায়

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে একটি কথা আছে—'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'[১]—নারীগণ যেখানে সম্মানিত হন, সেখানে দেবতাগণ প্রসন্ন থাকেন। কিন্তু কাজের বেলায় আমরা এই মহৎ শাস্ত্রবচনকে অশ্রদ্ধা করিয়া চিরদিনই নারীকে একটা বিশেষরকম অবহেলার চোখে দেখিয়া আসিয়াছি। জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বসময়ই নারীকে পুরুষের অধীনতায় আবদ্ধ রাখিবার জন্য ফলাও করিয়া প্রচার করিয়াছি,—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'—স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যলাভের যোগ্য নহে। নারীর প্রতি পুরুষের এই-যে অবজ্ঞা—নারী-পুরুষে যে দুস্তর ব্যবধান, তাহার মূলে রহিয়াছে পুরুষের 'পুরুষ' বলিয়া একটা দুর্জয় গর্ববোধ। পুরুষের এই পুরুষ-গর্ব—যাহা নারীকে দাসীর পর্যায়ে নামাইয়া না দিয়া তৃপ্তি পায় না, তাহাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার ফলে অন্য সব জাতির সমাজের মতই আমাদের সমাজেরও সর্বস্তরে নারীকে পুরুষের নির্মম খেয়ালখুশির শিকার হইতে হইয়াছে। সার্ধ একশত বৎসর পূর্বেও এদেশে সদ্যোবিধবা হিন্দুনারীকে শাস্ত্রবচনের দোহাই দিয়া মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পোড়াইয়া মারা হইত। আবার স্বামীর মৃত্যুর পর যে-সকল নারী বৈধব্যব্রত অবলম্বন করিত, তাহাদিগকেও নানা-প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনের চাপে ফেলিয়া অর্ধমৃত করিয়া রাখা হইত। ইহা ছাড়া কিছুকাল পূর্বেও ছিল বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিড়ম্বনা। এই সকল সামাজিক নিগ্রহ ব্যতীত পারিবারিক নির্যাতন এবং লাঞ্ছনাও ছিল এদেশের অধিকাংশ নারীরই ভাগ্যলিপি। এক কথায় বলিতে গেলে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের নারী-জীবন ছিল নিদারুণ বেদনাদায়ক। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ নারীকে মানুষের সামান্যতম অধিকারটুকুও দান করিতে চাহে নাই। সমাজ-শাসনের বেত্রদণ্ড হস্তে লইয়া এদেশের রক্তচক্ষু সমাজপতিগণ এক-একটি ফরমান জারি করিয়াছেন এবং তাহাই পুনঃ পুনঃ পালনের ফলে দেশাচার হইয়া উঠিয়াছে। এই দেশাচারই কালক্রমে সমস্ত ধর্মবোধ, এমনকি শাস্ত্র-বচনকেও অগ্রাহ্য করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ মানুষ কিন্তু অনেক সময়ই ইহাকে অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই জন্যই দেখিতে পাই, রামমোহনের অনেক পূর্ব হইতেই সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে একটা চাপা বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল; মধ্যে মধ্যে এই বিক্ষোভ সক্রিয় হইয়া উঠিয়া

মৃত পতির চিতায় আরূঢ়া বিধবা নারীকে সবলে উদ্ধার করিয়া আনিত।[২] আবার বিদ্যাসাগরেরও পূর্বে বিধবাবিবাহের প্রচেষ্টা চলিয়াছিল,[৩] কেবল অনুকূল পরিবেশ ও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে তাহা সফল হইয়া উঠিতে পারে নাই। সাধারণ লোকের মনে এই-যে মানবিক অনুভূতি—বিপন্না নারীর প্রতি এই-যে সমবেদনা, ইহাই রামমোহন ও বিদ্যাসাগরে চরম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

রামমোহন চাহিয়াছিলেন নারীকে তাহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে। বিদ্যাসাগরও তাহাই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্যে রামমোহন অপেক্ষা বিদ্যাসাগরকে অধিকতর প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। আপন বলিষ্ঠ পৌরুষে বিদ্যাসাগর তাঁহার পথের সমস্ত কাঁটা অপসারিত করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন—অগ্রসর হইয়াছেন শিক্ষায় ও সমাজে নারী-পুরুষের অধিকারগত অসমতা দূর করিতে। বাঙালী নারীসমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে বিদ্যাসাগরেব অতন্দ্র উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া অনেকে তাঁহাকে নারীজাতির পক্ষপাতী বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগর নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে নারীজাতির উপর তাঁহার বিশেষ স্নেহ-ভক্তির কারণস্বরূপ দুইটি কাহিনীর উল্লেখ আছে: একটি, বিদ্যাসাগর-পিতা ঠাকুরদাসের প্রতি এক মুড়িওয়ালীর অযাচিত করুণা প্রদর্শন;[৪] অপরটি, স্বয়ং বিদ্যাসাগরের প্রতি রাইমণি নামে এক মহিলার সন্তানতুল্য স্নেহযত্ন।[৫] কিন্তু নারীজাতির দুঃখমোচনের জন্য বিদ্যাসাগর যে কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা যে কেবল দুই-একটি স্নেহ-মমতার কাহিনী হইতে সমিধ সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা নহে। আসলে বিদ্যাসাগরের হৃদয়টাই ছিল বিশাল, এবং সেই বিশাল হৃদয়ের সমস্তটা জুড়িয়া ছিল একটি অখণ্ড মানবতাবোধ। মানুষমাত্রেরই দুঃখে তিনি বিচলিত হইতেন এবং সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে সর্বস্ব পণ করিয়া বসিতেন। তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত করুণা-মন্দাকিনীর ধারায় দীনদুঃখীর দুঃখজ্বালা নিবারিত হইত। সমাজবিধির শাসনে দুর্গত নারীসমাজও সেই করুণাধারায় অভিষিক্ত হইয়াছিল।

বাঙলার অবহেলিত নারীসমাজ যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়—জীবনের বিচিত্র কর্মকাণ্ডে পুরুষের সহিত নারীও যাহাতে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহার কিছুকাল পূর্বেই—ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রাজা রাধাকান্ত

দেব-প্রমুখ কয়েকজন গণ্যমান্ত ব্যক্তির চেষ্টায় বাঙলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু দেশ তখনও রক্ষণশীল, তাই জনসমর্থনের অভাবে স্ত্রীশিক্ষার এই প্রাথমিক প্রয়াসটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর দীর্ঘ কয়েক বছর কাটিয়া গেল, শিক্ষা ও সংস্কৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়া বাঙলার নারীকুল বাঙলার ঘরে ঘরে অন্তঃপুরবাসিনী হইয়া রহিল। অবশেষে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার পুনরুদ্বোধন করেন ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তিনি কলিকাতায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এই বিদ্যালয়ের নাম ছিল—হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়, পরে নাম হয়—বেথুন নারী-বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের পরিচালনায় বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগরকে সহকর্মীরূপে পাইয়াছিলেন। বেথুনের একান্ত অনুরোধে বিদ্যাসাগর বেথুন নারী-বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকরূপে কাজ শুরু করিলেন [ ডিসেম্বর, ১৮৫০ ]। বাঙলাদেশের স্ত্রীশিক্ষাক্ষেত্রে মণিকাঞ্চনযোগ হইল। বেথুন সাহেব এদেশীয় বালিকাদিগকে শিক্ষাদানের জন্য যথাসর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, এই পণে শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনও তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল।[৬] বিদ্যাসাগরও আপন অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্বের বলে রক্ষণশীল বাঙালী সমাজের জড়ত্ব ঘুচাইয়া এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং নিরলস কর্ম-প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় বালিকাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারে বিদ্যাসাগরকে অনেকটা অসাধ্য সাধন করিতে হইয়াছিল। দেশবাসীর মনোভাব সেকালে এতই রক্ষণশীল ছিল যে, স্ত্রী-শিক্ষার নামে তাহারা রীতিমত ভয় পাইত। অন্তঃপুরবাসিনী বালিকারা—যাহাদের দর্শনকাতর করিয়া গড়িয়া তোলা হইতেছিল, তাহারা গাড়ীর বাহির হইয়া বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিতে যাইবে এবং শিখিয়া পুরুষের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে, ইহা তখন অনেকে কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রয়াস হইল এই আচারবদ্ধ দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তোলা। তিনি জানিতেন, শাস্ত্রের নির্দেশ ছাড়া দেশের লোক এক পা-ও নড়িবে না। তাই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য তিনি মনুসংহিতার একটি শ্লোকাংশ তুলিয়া ধরিলেন—'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াপিযত্নতঃ'—কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় যত্নসহকারে পালন করিতে ও শিক্ষাদান করিতে হইবে। বেথুন-বিদ্যালয়ের যে গাড়ীতে করিয়া মেয়েদের বাড়ী হইতে লইয়া আসা হইত, তাহার গায়ে বিদ্যাসাগর এই শাস্ত্রবচন লিখাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি

অনেকের বাড়ী বাড়ী গিয়াও স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুরোধে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি সেকালের কয়েকজন গণ্যমান্য লোক তাঁহাদের কন্যাদের বেথুন-বিদ্যালয়ে পড়াইতে পাঠাইয়াছিলেন। নারীকে গৃহবন্দী ও অশিক্ষিত করিয়া রাখিবার প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহারা যে সৎসাহস দেখাইয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল।[৭] কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের সংকল্পে অবিচলিত ছিলেন। তাঁহাদের মেয়েরাই বেথুন-বিদ্যালয়ে ছাত্রীর স্থান পূরণ করিয়া চলিল। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে পরে দেশের অন্যান্য লোকেরও স্ত্রী-শিক্ষাবিরোধ মনোভাব অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। একে একে অনেকেই তখন তাঁহাদের কন্যাদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। দীর্ঘকালের কুসংস্কারে একটু একটু করিয়া ভাঙন ধরিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, প্রধানতঃ বিদ্যাসাগরের চেষ্টাযত্নেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর ও বেথুনের মিলিত প্রচেষ্টায় বেথুন নারী-বিদ্যালয়ের কাজ বেশ ভালভাবেই অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু ভালো কাজে যেন কোথা হইতে বিপদ আসিয়া হাজির হয়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পর অল্পকালমধ্যেই বেথুনের অকালমৃত্যু ঘটিল [ ১২ আগস্ট, ১৮৫১ ]। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়টি একটা অনিশ্চয়কর অবস্থার সম্মুখীন হইল। এই অবস্থা হইতে বিদ্যালয়টিকে রক্ষা করিলেন ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী। তিনি বিদ্যালয়-পরিচালনার সমস্ত ব্যয় বহন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদায়-গ্রহণের পর ইহা সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। সিসিল বীডন নামে উচ্চপদস্থ এক রাজকর্মচারী এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বাঙলা সরকারের সম্মতি লইয়া তিনি একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সভাপতি হইলেন তিনি নিজে, আর সম্পাদক হইলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত যত্ন ও অধ্যবসায়ে বেথুন নারী-বিদ্যালয়ের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

কিন্তু স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রচেষ্টা এইখানেই অবসিত হইয়া যায় নাই। অদম্য শক্তি, অফুরন্ত উৎসাহের আধার ছিলেন তিনি। যে-কাজ তিনি একবার ধরিতেন, তাহার সম্পূর্ণ সিদ্ধির জন্য সমস্ত শক্তি উজাড় করিয়া

দিতেন। বাঙলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে তাঁহার ভূমিকা লক্ষ্য করিলে তাঁহার চরিত্রের এই দিকটির পরিচয় মিলিবে।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সেই অনুসারে বাঙলার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব [Sir Frederic Halliday] ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই স্থির করেন, বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু সেকালের রক্ষণশীল বাঙলাদেশে একাজ বড় সহজ ছিল না। ইহার জন্য দেশীয় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন হইল। হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকেই এই কাজের উপযুক্ত লোক বলিয়া স্থির করিলেন। বিদ্যাসাগর তখন একদিকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, অপরদিকে দক্ষিণ-বঙ্গের [ মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী ও নদীয়া জেলার ] বিদ্যালয়-সমূহের স্পেশাল ইন্‌স্পেকটর। তাহা ছাড়া তিনি বেথুন নারী-বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে ইতিমধ্যেই স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। অতএব সেকালের বাঙলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে হাত দিবার মতো তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেহই ছিলেন না। তিনি নিজেও যেন এই কাজের অপেক্ষায় দিন গণিতেছিলেন। স্ত্রীজাতির কল্যাণসাধন ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগটিকে তিনি সেই মহান ব্রতেরই অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কাজেই হ্যালিডে সাহেবের এক কথাতেই তিনি রাজী হইয়া গেলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই নিজের এলাকাভুক্ত জেলাসমূহে অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।[৮]

কিন্তু শীঘ্রই এই কাজে বিদ্যাসাগরকে একটা প্রবল বাধার সম্মুখীন হইতে হইল। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের 'বাচনিক আদেশে' [Verbal Order] বিদ্যাসাগর বালিকা-বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার এইরূপ কার্যে সরকারের পূর্ণ সমর্থন আছে এবং সরকারই বিদ্যালয়গুলির সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন। এই ধারণার বশে তিনি বিদ্যালয়-গুলির জন্য সর্বসমেত ৩,৪৩৯ টাকা ১৩ পয়সা খরচ করিয়া বসিলেন। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের নবনিযুক্ত ডিরেক্টর ইয়ং সাহেব [W. Gordon Young] ইহা ভালো চোখে দেখিলেন না। ফলে তাঁহার সহিত বিদ্যাসাগরের বিরোধ দেখা দিল। ব্যাপারটা ক্রমে ঘোরালো হইয়া উঠিলে ভারতসরকারের নির্দেশ চাওয়া হইল। ভারতসরকার প্রথমে নানাপ্রকার আপত্তির সুর তুলিলেও শেষ পর্যন্ত সমস্ত

টাকাই মঞ্জুর করিয়া দিয়া বিদ্যাসাগরকে দায়মুক্ত করিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়গুলিকে আর স্থায়ী কোনো অর্থসাহায্য দিতে রাজী হইলেন না। সরকারের এইরূপ আচরণে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং ইহার পরই তিনি সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিলেন [ নভেম্বর, ১৮৫৮ ]।

চাকরি ছাড়িয়া দেওয়ায় বিদ্যাসাগরের পাঁচশত টাকা মাসিক আয় হ্রাস পাইল, তিনি এক গুরুতর আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। অন্য কেহ হইলে হয়তো এই অবস্থায় দমিয়া গিয়া যতটা সম্ভব দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিত। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। কোনো প্রতিকূল অবস্থাই তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারিত না। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি যে ব্যাপক আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সরকারের বিরূপ আচরণও তাহাতে তাঁহাকে নিরুদ্দম করিতে পারিল না। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলি পরিচালনের সমস্ত দায়িত্বই তিনি নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন।[৯] এই উদ্দেশ্যে তিনি এক নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুলিয়াছিলেন। ইহাতে সেকালের বহু সম্ভ্রান্ত লোক নিয়মিত চাঁদা দিতেন। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হইলে এমনই করিয়াই অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া উঠে। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাও দেশবাসীর আনুকূল্য লাভ করিয়াছিল।

সরকারী শিক্ষাবিভাগের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করিলেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে সমান উৎসাহী ছিলেন।[১০] চাকরি ছাড়িবার পরেও দীর্ঘকাল [ ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত ] তিনি বেথুন নারী-বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন এবং বৃদ্ধবয়সেও এই বিদ্যালয়ের খোঁজখবর লইতেন। ইহা ছাড়া, যখনই তাঁহাকে স্ত্রীশিক্ষা-সংক্রান্ত কোনো কাজে ডাকা হইত, তখনই তিনি পরম উৎসাহে অগ্রসর হইয়া আসিতেন। ১৮৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে একবার এইরূপ আহ্বান পাইয়া তিনি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর অ্যাটকিন্‌সন্‌, স্কুল-ইন্‌স্পেকটর উড্রো এবং প্রখ্যাতা মানব-হিতৈষিণী মহিলা মিস মেরী কার্পেন্টারের সহিত উত্তরপাড়া বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। ফিরিবার মুখে তাঁহার বগী গাড়ীটা উল্টাইয়া যায়, তিনি গাড়ী হইতে নীচে পড়িয়া গিয়া যকৃতে গুরুতর আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে, এবং ইহাই শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যুর মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বাঙলার নারী-সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ-সাধনকে বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনের

অন্যতম ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, নারীশিক্ষার বেদীমূলে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া তিনি তাঁহার সেই মহান ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গেলেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের অদম্য উৎসাহ থাকিলেও তাহা কখনও তাঁহার বাস্তববুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া যাইত না। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন পুরাপুরি একজন practical man। সময়ের গতি লক্ষ্য করিয়া ও সমাজের নাড়ী বুঝিয়া তিনি চলিতে জানিতেন। কুমারী কার্পেণ্টারের প্রস্তাবিত নর্মাল স্কুল স্থাপনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশে বিদ্যাসাগরের এই বাস্তববুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কুমারী কার্পেণ্টার চাহিয়াছিলেন স্ত্রীশিক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া তুলিতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি বেথুন-বিদ্যালয়ে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করিলে বাঙলার তৎকালীন ছোটলাট গ্রে সাহেব [Sir William Grey] এই বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত চাহিয়া পাঠাইলেন। বিদ্যাসাগর গ্রে সাহেবের নিকট একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় এই ধরনের স্কুল স্থাপন করিলে কোনো ফল পাওয়া যাইবে না। এই অভিমতের সমর্থনে তিনি দেশীয় সমাজের তৎকালীন বাস্তব অবস্থার ইঙ্গিত দিয়া লিখিলেন: 'You can easily conceive whether respectable Hindu will allow their grown-up female relatives to follow the profession of tuition and necessarily break through the present seclusion, when they do not permit the young girls of ten or eleven years to quit zenana after they are married. The only persons, whose services may be available, are unprotected and helpless widows, and apart from the consideration whether morally they will be fit agents for educational purposes, I have no hesitation in saying that the very fact of their dispensing with the zenana seclusion and offering themselves as public teachers will lay them open to suspicion and distrust and thus neutralize the beneficial action aimed at.'[১১]

কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরের এই সময়োচিত উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কুমারী কার্পেণ্টারের কল্পিত নর্মাল স্কুলটি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাত্রীর অভাবে

তিন বৎসর যাইতে-না-যাইতেই উহা তুলিয়া দিতে হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরের কথাই শেষ পর্যন্ত ফলিয়াছিল।

নারীজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনই ছিল বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য। এইজন্য তিনি একদিকে যেমন স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই সমাজের সকলপ্রকার পীড়ন হইতে নারীজাতির রক্ষাকল্পে আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ, বৈধব্য ও বহু-বিবাহ—এই তিনটি প্রথা হিন্দুনারীর অপরিসীম দুঃখের কারণ। বিদ্যাসাগর বহুকাল-প্রচলিত এই প্রথা তিনটির বিরুদ্ধে দৃঢ়হস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

বাল্যবিবাহ শাস্ত্রস্বীকৃত। অঙ্গিরাকৃত 'উদ্বাহতত্ত্বে' আছে :

অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥
তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষজঃ ॥

[ অষ্টবর্ষীয়া কন্যাকে বলে গৌরী, নববর্ষীয়া কন্যাকে বলে রোহিণী, দশবর্ষীয়া কন্যাকে বলে কন্যা, তৎপরবর্তী কন্যাকে বলা হয় রজস্বলা। অতএব কন্যার দশম বৎসর বয়সে জ্ঞানিগণ যত্নশীল হইয়া কন্যা দান করিবেন, তখন আর কালদোষজনিত দোষ থাকে না। ]

কিন্তু শাস্ত্রবচন বাল্যবিবাহ সমর্থন করিলেও মানবিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে এই প্রথার কয়েকটি বিশেষরকম দোষ লক্ষ্য করা যায়। 'বাল্যবিবাহের দোষ'-নামক নিবন্ধে বিদ্যাসাগর সেই সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। নারী-পুরুষের অসাম্য দূর করিবার জন্য বিদ্যাসাগর চাহিয়াছিলেন নারীকে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে উন্নত করিয়া তুলিতে। কাজেই বাল্যবিবাহ যে নারীর যথোচিত শিক্ষালাভের পথে একটি দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়, ইহা তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। এই বিষয়ে একান্ত বাস্তব অবস্থার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—'আমরা অবগত আছি, কোন কোন ভদ্র সন্তানেরা স্ব স্ব কন্যা-সন্তানদিগকেও পুত্রবৎ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই কন্যাদিগের বর্ণপরিচয় হইতে না হইতেই উদ্বাহের দিন উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহার পাঠের প্রস্তাব সেই দিনেই অস্তগত হইয়া যায়। পরে পরগৃহবাসিনী হইয়া তাহাকে পরের অধীনে শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ইচ্ছানুসারে গৃহসম্মার্জন, শয্যাসজ্জন, রন্ধন, পরিবেষণ ও অন্যান্য পরিচর্যার পরিপাটী শিক্ষা করিতে হয়।

পিতৃগৃহে যে কয়েকটি বর্ণের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই স্থালী, কটাহ, দর্বী প্রভৃতির সহিত নিয়ত সদালাপ হওয়াতে একেবারেই লোপ পাইয়া যায়।'[১২] শুধু ইহাই নহে, অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহ দিয়া নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে যে পদদলিত করা হইতেছে, তাহাও বিদ্যাসাগর বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার গভীর খেদপূর্ণ উক্তি স্মরণীয়: 'হায়, কি দুঃখের বিষয়! যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী ও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয়কালে তাদৃশ পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির সুখের আর কি সম্ভাবনা রহিল।'[১৩]

এযুগে স্বাধীন নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিণয়-ব্যবস্থার কিছুটা প্রচলন হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিদ্যাসাগরের কালে ইহা প্রায় কল্পনাতীত ছিল।[১৪] অথচ বাল্য-বিবাহের দোষ নির্ণয় প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর এই বিষয়টির স্বপক্ষে স্পষ্ট মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য: 'মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্য ভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদ্দেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্র-পরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, এক বার অন্যোন্য নয়নসঙ্ঘটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যা-পুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখদুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এই জন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্য-নিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।'[১৫] এই সংস্কারমুক্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই বিদ্যাসাগর সে-যুগের হইয়াও এযুগের আত্মীয়।

বিদ্যাসাগর একদা তাঁহার সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন: 'বিধবা-বিবাহ-প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই।'[১৬] বিদ্যাসাগরের এই সৎকর্মটির অনুষ্ঠানে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন দেখা দিয়াছিল এবং পরিশেষে ইহা আইনের স্বীকৃতিও লাভ করিয়াছিল। কিন্তু

ইহাতে যে প্রচলিত সমাজরীতির বিশেষ কোনো পরিবর্তন হইয়াছে তাহা মনে হয় না। নিম্নবর্ণে বিধবাবিবাহ পূর্বে ছিল, এখনও আছে ; উচ্চবর্ণে পূর্বে ছিল না, পরেও চলন হয় নাই। তত্ত্বহিসাবে বিধবাবিবাহ স্বীকৃত হইলেও কার্যতঃ হিন্দুসমাজের উচ্চস্তরে ইহা পরিগৃহীত হইতে পারে নাই। অতএব ব্যবহারিক দিক দিয়া বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের মূল্যায়ন করিতে বসিলে আমাদিগকে যে অনেকটা নিরাশ হইতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহার অপর একটি দিকও আছে এবং সেই দিকটিই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের ভিতর দিয়া বিদ্যাসাগর শাস্ত্র ও দেশাচারের প্রতি দেশবাসীর অন্ধ শ্রদ্ধার ভিত্তিটি টলাইতে পারিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গেই পারিয়াছিলেন এদেশের পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর অপরিসীম দুর্গতির প্রতি একটা সহানুভূতিশীল চিন্তাপ্রবাহ সৃষ্টি করিতে। এইখানেই বিদ্যাসাগরের সাফল্য। বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের ইহাই সর্বপ্রধান সৎকর্ম।

বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনের জন্য বিদ্যাসাগরকে পর্বতপ্রমাণ গ্রন্থরাশি ঘাঁটিয়া শাস্ত্রবিধি বাহির করিতে হইয়াছিল।[১৭] কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, নিছক যুক্তি ও মানবিক আবেদন অপেক্ষা শাস্ত্রীয় প্রমাণই এস্থলে বেশী কার্যকর হইবে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল : 'যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহারা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও, তদনুসারে চলিতে পারেন।'[১৮] শাস্ত্রে যে বিধবাবিবাহকে 'কর্তব্য কর্ম' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য বিদ্যাসাগর প্রথমে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন—'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' [১ম]। এই পুস্তকে তিনি যুক্তির রথে চড়িয়া ধীরে ধীরে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন এবং উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'পরাশর-সংহিতা'-নামক ধর্মশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত তিনটি শ্লোকের উপর ভিত্তি করিয়া বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। পরাশরের এই শ্লোক তিনটি হইল :

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥ ২৬ ॥

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥২৭॥
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি ॥২৮॥

'স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। যে নারী, স্বামীর মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে স্বর্গলাভ করে। মনুষ্যশরীরে যে সার্ধ ত্রিকোটি লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তৎসম কাল স্বর্গে বাস করে।' [ বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদ ]

এখন কথা উঠিতে পারে, 'পরাশর-সংহিতা' আদৌ ধর্মশাস্ত্র কিনা। এই সন্দেহের নিরসনকল্পে বিদ্যাসাগর গ্রন্থারম্ভেই যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারদের নামের একটি তালিকা উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে পরাশরের নামটিও ঐ তালিকার অন্তর্ভুক্ত। অতএব পরাশর যে একজন ধর্মশাস্ত্রকার এবং তাঁহার প্রণীত সংহিতা যে একখানি ধর্মশাস্ত্র তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, পরাশরের নির্দেশ কি কলিযুগের লোকের পক্ষে পালনীয়? বিদ্যাসাগর এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছেন পরাশর-প্রণীত সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের একটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া:

কৃতে তু মানবো ধর্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ ॥২৩॥

'মনুনিরূপিত ধর্ম সত্যযুগের ধর্ম, গোতমনিরূপিত ধর্ম ত্রেতাযুগের ধর্ম, শঙ্খলিখিতনিরূপিত ধর্ম দ্বাপরযুগের ধর্ম, পরাশরনিরূপিত ধর্ম কলিযুগের ধর্ম।' [ বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদ ]

বৃহন্নারদীয় পুরাণ ও আদিত্যপুরাণে 'কলিযুগে বিধবাবিবাহের নিষেধক' ইঙ্গিত আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। বিদ্যাসাগর অকাট্য যুক্তি উপস্থিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, '...ঐ নিষেধকে কলিযুগে বিধবাবিবাহের নিষেধ বলিয়া বোধ করা কোনও ক্রমে বিচারসিদ্ধ হইতেছে না।' তাহা ছাড়া এই বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য তিনি 'ব্যাসসংহিতা'র প্রথম অধ্যায়ের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন:

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা ॥৪॥

'যে স্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দৃষ্ট হইবেক, তথায় বেদই প্রমাণ ; আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতিই প্রমাণ।' [অনুবাদ : ঐ]।

পরাশরসংহিতা স্মৃতিশাস্ত্র, অতএব পুরাণের তুলনায় অধিক গ্রহণীয়।

এইভাবে যুক্তি-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর পরাশরসংহিতায় উল্লিখিত বিধবাবিবাহ-বিষয়ক শ্লোক তিনটির প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং উহাদের ব্যাখ্যাস্বরূপ বলিয়াছেন : 'পরাশর কলিযুগের বিধবাদিগের পক্ষে তিন বিধি দিতেছেন, বিবাহ, ব্রহ্মচর্য, সহগমন। তন্মধ্যে, রাজকীয় আদেশ-ক্রমে, সহগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিধবাদিগের দুই মাত্র পথ আছে বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য ; ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা হয় ব্রহ্মচর্য করিবেক। কলিযুগে, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া, দেহযাত্রা নির্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই লোকহিতৈষী ভগবান্ পরাশর সর্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন।'

পরাশরসংহিতার মতে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু এই বিষয়ে একটি প্রবল বাধা রহিয়াছে শিষ্টাচার বা দেশাচার। অনেকে এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারেন যে, বিধবাবিবাহ 'শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বলিয়া অবলম্বন করা যাইতে পারে না।' এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য বিদ্যাসাগর 'বসিষ্ঠ-সংহিতা'র একটি বচন তুলিয়া ধরিয়াছেন :

লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে
শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্। [ ১ অধ্যায় ]

'কি লৌকিক, কি পারলৌকিক, উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম অবলম্বনীয় ; শাস্ত্রের বিধান না পাইলে শিষ্টাচার প্রমাণ।' [ অনুবাদ : ঐ ]।

শাস্ত্রীয় বচনের অসি হস্তে লইয়া বিদ্যাসাগর সকলপ্রকার সংশয় ও আপত্তি ছেদন করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ 'সর্বপ্রকারেই কর্তব্য কর্ম'। ইহার পর তিনি সমাজকল্যাণের কথা তুলিয়া বলিয়াছেন : 'দুর্ভাগ্যক্রমে, বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্য-নির্বাহে অসমর্থ হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে ; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যা-

পাপের নিবারণ ও তিন কুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক।'

বিধবাবিবাহ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরে 'এই পুস্তক পাঠ করিয়া হিন্দু-সমাজে একবারে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। প্রাচীন হিন্দুরা বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক খৃষ্টীয়ান বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন; অনেক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং অনেক ধনবান্ লোকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সাহায্যে বিধবাবিবাহ-নিষেধক প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাসাগরলিখিত পুস্তকের অনুকরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। কোন কোন পুস্তকে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ গালি-বর্ষণেরও ত্রুটি ছিল না। প্রায় সকল সংবাদপত্র হইতেই বিদ্যাসাগরের উপর অনবরত প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল।'[১৭] কিন্তু বিদ্যাসাগর ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া প্রতিবাদীদের উত্থাপিত বিভিন্ন আপত্তির যথোচিত উত্তর দানের জন্য লেখনী ধারণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বিধবাবিবাহ-বিষয়ে তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইল: 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় পুস্তক।' এই পুস্তকে তিনি পরাশরবচন যে প্রামাণ্য তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ বিশেষ যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন; যেমন: ১. পরাশরবচন বিবাহিতাবিষয়ক, বাগ্‌দত্তাবিষয়ক নহে। ২. পরাশরবচন কলিযুগবিষয়ক, যুগান্তরবিষয়ক নহে। ৩. পরাশরের বিবাহবিধি মনুবিরুদ্ধ নহে, ৪. পরাশরের বিবাহবিধি বেদবিরুদ্ধ নহে, ৫. বিবাহবিধায়ক বচন পরাশরের, শঙ্খের নহে, ৬. বিবাহবিধায়ক বচন পরাশরের, কৃত্রিম নহে, ৭. পরাশরের বচন বিবাহবিধায়ক, বিবাহনিষেধক নহে ইত্যাদি।

এই যুক্তি-পারম্পর্যের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত গ্রন্থের উপসংহারে বিদ্যাসাগর পাঠকবর্গের নিকট প্রশ্ন তুলিয়াছেন: 'দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহা, বোধ করি, চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব, হে পাঠক মহাশয়বর্গ! আপনারা, অন্ততঃ কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন, এমন স্থলে, দেশাচারের দাস হইয়া, শাস্ত্রের বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না

করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগকে যাবজ্জীবন অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করা, এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত; অথবা দেশাচারের অনুগত না হইয়া, শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা নিরাকরণ এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত নিবারণ করা উচিত।'

দেশাচার যে অপরিবর্তনীয় কিছু নয় তাহাও তিনি এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন: 'ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, সৃষ্টিকাল অবধি আমাদের দেশে আচার পরিবর্ত হয় নাই; এক আচারই পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, আমাদের দেশের আচার পদে পদে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বকালে এদেশে চারি বর্ণের যেরূপ আচার ছিল, এক্ষণকার আচারের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে, ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোকদিগকে এক বিভিন্ন জাতি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। বস্তুতঃ, ক্রমে ক্রমে আচারের এত পরিবর্ত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোক, পূর্বতন লোকদিগের সন্তানপরম্পরা, এরূপ প্রতীতি হওয়া অসম্ভব।'

কিন্তু সকল যুক্তি, সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও আলোচনার পরেও বিদ্যাসাগরের মনে শঙ্কা জাগিয়াছে, দেশের লোক হয়তো কিছুতেই দেশাচারের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিবে না। বিধবাবিবাহ-বিষয়ে প্রথম পুস্তক রচনার সময় তিনি দেশের লোককে কেবল শাস্ত্রানুগত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন, দ্বিতীয় পুস্তকের রচনাকালে তাঁহার সেই ধারণার মূলোচ্ছেদ হইল—ইতিমধ্যেই যে জনমত অভিব্যক্ত হইয়াছিল তাহার মুখামুখি দাঁড়াইয়া বিদ্যাসাগর বুঝিতে পারিলেন যে, লোকচরিত্র বুঝিতে তাঁহার কিছুটা ভুল হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্র নয়, যুক্তি নয়, দেশের প্রচলিত আচার-ব্যবহারই সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করিয়া দেশবাসীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে। দেশাচারের এই অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া বিদ্যাসাগর ঐ গ্রন্থের পৃষ্ঠায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছেন: 'হায়, কি আক্ষেপের বিষয়, দেশাচারই এদেশের অদ্বিতীয় শাসনকর্তা, দেশাচারই এদেশের পরম গুরু; দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন, দেশাচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ।

'ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস!

তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্মের মর্ম ভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে, ধর্মও অধর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয়া মান্য হইতেছে।'

ধর্মাধর্মবোধ বর্জন করিয়া 'ভারতবর্ষীয় মানবগণ' যে কেবল দেশাচারের ঘৃণ্য দাসত্ব করিতেছে, ইহা বিদ্যাসাগরের নিকট অসহ্য বোধ হইয়াছে। তাই বিচারমূঢ় দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁহার ক্রুদ্ধ ক্ষোভ এইভাবে ফাটিয়া পড়িতেছে: '......দুর্ভাগ্যক্রমে, তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছে, দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া লৌকিকরক্ষাব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জন, দেশাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ ও সঙ্কল্পিত লৌকিকরক্ষাব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া, যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত।'

নারীজীবনের কামনা-বাসনা ও সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন থাকিয়া যাঁহারা বালবিধবাকে সর্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনের দিকে ঠেলিয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের হৃদয়-হীনতাকে ধিক্কৃত করিয়া বিদ্যাসাগর উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র বলিতেছেন: 'তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ।'

পরিশেষে এদেশের অবহেলিত নারীজাতির দুঃখবেদনার কথা চিন্তা করিয়া করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের চক্ষু দুইটি অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মাতৃ-হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ভারতীয় নারীর ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের প্রতি এই গ্রন্থে একটি সুগভীর বেদনাবোধ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে: 'হায় কি পরিতাপের বিষয়!

যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।

'হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না!'

পুরাণপ্রসিদ্ধি এই যে, সমুদ্রমন্থনে গরল উঠিয়াছিল—অমৃতও উঠিয়াছিল। বিধবাবিবাহ-আন্দোলনেও বিদ্যাসাগর একদিকে নিন্দা ও অপবাদ কুড়াইয়াছিলেন, অপরদিকে বহুলোকের সানন্দ অভিনন্দন লাভ করিয়াছিলেন।

দেশের রক্ষণশীল সমাজ বিদ্যাসাগরের নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, এমন কি, সেকালের কবি-সাহিত্যিকদেরও কেহ কেহ তাঁহার এই সমাজবিপ্লবকে ভালো চোখে দেখেন নাই। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বিধবাবিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বিধবাবিবাহ ও ইহার উদ্যোক্তাদের প্রতি তিনি শাণিত ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে তাঁহার 'বিধবাবিবাহ-আইন' কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল। বিধবাবিবাহকে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন:

'কোলে, কাঁকে ছেলে ঝোলে, যে সকল রাঁড়ী।
তাহারা সধবা হবে, পরে শাঁকা শাড়ী॥
এবড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর।
কেমন কেমন করে, মনের ভিতর॥'

বিধবাবিবাহের উদ্যোক্তাদের প্রতি ঐ একই কবিতায় তাঁহার সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ:

'বিধবার বিয়ে দিতে, যাহারা উদ্যত।
তার মাঝে বড় বড়, লোক আছে যত॥
যারে ইচ্ছা তারে হয়, ডাকিয়া আনিয়া।
ঘরেতে বিধবা কত, পরিচয় নিয়া॥
গোপনেতে এই কথা, বলিবেন তারে।
জননীর বিয়ে দিতে, পারে কি না পারে?'

বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের প্রবর্তক বিদ্যাসাগরও সেখানে গুপ্ত-কবির হাতে নিস্তার পান নাই:

'সকলেই তুড়ি মারে, বুঝেনাকো কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে, সাগরের ঢেউ॥

সাগর যদ্যপি করে, সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ ঘটন ॥

সমসাময়িক কালের অন্যতম মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন নাই। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন: 'বিধবাবিবাহ প্রবৃত্তিমার্গের অনুকূল এবং হিন্দু যে ভাবে ক্রমশঃ বৈবাহিক ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া আসিতেছেন তাহার বিপরীত বলিয়া এই চেষ্টা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে চাঁদে কলঙ্ক বলিয়াই মনে করি,...।'[২০] তাঁহার মতে, 'বৈধব্য একটী মহৎ ব্রত। ব্রতটী পরার্থে আত্মোৎসর্গ; আত্মোৎসর্গ ব্রতের অনুষ্ঠান কিছু না কিছু সকলকেই করিতে হয়—কেহ জানিয়া শুনিয়া করেন, কেহ না বুঝিয়া করেন, কেহ অল্প মাত্রায় করেন, কেহ অধিক মাত্রায় করেন—কিন্তু সকলেই ইহা করিয়া থাকেন। তবে অন্যের পক্ষে এই ব্রতের শিক্ষা এবং ইহার পালন ধীরে ধীরে নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য ইহার ক্লেশানুভব অল্প হয়—স্থলবিশেষে কোন ক্লেশই হয় না। বিধবার পক্ষে এই ব্রতের ভার একেবারে চাপিয়া পড়ে, এই জন্য সে বিকল হইয়া যায়। এত বিকল হয় যে, সে যে একটী মহৎ ব্রতের ব্রতী হইল তাহা বুঝিতেই পারে না...'[২১]

ভূদেবের চোখে বিধবার জীবন পরার্থে আত্মোৎসর্গের। 'বিধবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভোগসুখ পরিত্যাগ করে, গৃহকার্য্যে অতি নিপুণা হইয়া উঠে, অতিথি অভ্যাগত কুটুম্ব স্বজনদিগকে খাওয়াইতে ভালবাসে, স্বয়ং সবল এবং সুস্থশরীরী হয় এবং ঈর্ষ্যাদি দোষ পরিশূন্যা হইয়া সধবাদিগের প্রতি অনুগ্রহশালিনী এবং তাহাদিগের পুত্রগণের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহশীলা হয়। যে বাড়ীতে এরূপ বিধবার অবস্থান সে বাটিতে জীবিত দেবীমূর্ত্তির অধিষ্ঠান।'[২২]

বিধবার ব্রহ্মচারিণী-জীবন সম্বন্ধে ভূদেবের এইরূপ একটা উচ্চ ধারণা ছিল বলিয়াই তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দোলনকে স্বাগত জানাইতে পারেন নাই। কিন্তু বিধবাকে সমাজকল্যাণে উৎসর্গীকৃতা নারী বলিয়া শ্রদ্ধার আসনে নির্বাসিত করিয়া রাখিলে যে নারীত্বের প্রতি কতটা সুবিচার করা হয় তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

বিধবাবিবাহ-বিষয়ে সেকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম বিধবাবিবাহের ব্যাপক প্রচলন সমর্থন করেন নাই, কিন্তু অবস্থাবিশেষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিধবাবিবাহে তাঁহার আপত্তি ছিল না। তাঁহার মতে, 'বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার

বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না ; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্রস্বভাববিশিষ্টা, স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না।'[২৩] সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে অধিকারগত সাম্য স্থাপিত হউক, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ অভিপ্রেত ছিল। এই অধিকারের প্রশ্ন তুলিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করিয়াছেন : 'যদি পুরুষ পত্নী-বিয়োগের পর পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্ব্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী।··· মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে, যে যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্য্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃ-পরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে'।[২৪]

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দোলনে বিরোধী দলের পাশে পাশেই ছিলেন একদল প্রগতিবাদী সমর্থক। আপন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের মহিমায় বিদ্যাসাগর সেকালের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে স্বপক্ষে আনিতে পারিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসু, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি গণ্যমান্য লোকেরা বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ-বিষয়ক আইন প্রবর্তনের জন্য সরকারের নিকট বিদ্যাসাগর যে আবেদনপত্র পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে এক হাজার লোকের স্বাক্ষর ছিল।[২৫] বিধবাবিবাহের সমর্থনে এই সময়ে ও ইহার কিছুকাল পরে বেশ কয়েকখানি নাটক লেখা হইয়াছিল।[২৬] বিখ্যাত পাঁচালী-গায়ক দাশরথি রায় [দাশু রায়] বিধবাবিবাহ বিষয়ে এক পালা পাঁচালী গান রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, বিধবাবিবাহ লইয়া কয়েকটি ছোট-বড় গানও রচিত হইয়াছিল ; এই গানগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরিত। শান্তিপুরের তাঁতীরা কাপড়ের পাড়ে এইরূপ একটি গান তুলিয়াছিলেন :

'বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥'[২৭] ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের পূর্ব হইতেই বিধবাবিবাহ ছিল সাধারণ লোকের অন্তরের প্রার্থনা ;[২৮] কিন্তু প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহারা সাহস করিয়া মুখ খুলিতে পারিত না। বিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য

উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, তখন দেশবাসী যেন হঠাৎ এক নূতন আলোর দিগন্ত দেখিতে পাইল। বিদ্যাসাগরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া অনেকেই তখন বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে রায় দিতে লাগিল। কিন্তু বিশেষ একটি গৃহপালিত জীবের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার যে সমস্যা গল্পে বর্ণিত, এক্ষেত্রেও সেইরূপ সমস্যা দেখা দিল। বালবিধবার বিবাহ হওয়া যে সংগত—ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীকে সামাজিক নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা করা যে মনুষ্যত্বের একটি প্রধান দাবি, তাহা বুঝিয়াও এবং অনেক সময় মুখে বলিয়াও লোকে কার্যতঃ এপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। ইহার প্রধান কারণই হইল দেশাচার। বহুকাল হইতেই এদেশে বিধবাদের কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল। দেশের লোক ইহাকে ধর্ম ও শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া ধরিয়া লইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহার নির্মমতা ও অশুভ পরিণামের প্রতি কেমন একপ্রকার উদাসীন হইয়া থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। কখনও কখনও দুই-একজন লোক তাহাদের বালিকা কন্যা বা ভগিনীর বৈধব্য দর্শনে কাতর হইয়া এই নিষ্ঠুর প্রথার অবসান-কামনায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিত, কিন্তু কিছুকাল পরেই আবার তাহারা সমাজের চিরাচরিত নিষ্ক্রিয়তায় গা ভাসাইয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্তে দিন যাপন করিত।[২৯] দেশাচার বা সংস্কার মানুষের এমনই বালাই যে সহজে উহাকে ঝাড়িয়া ফেলা যায় না। এই জন্যই বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে বিধবাবিবাহের ন্যায়সংগতি প্রতিষ্ঠিত হইলেও দেশের লোক তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইতে পারে নাই।

অবশ্য এই বিষয়ে আরও দুই-একটি কথা চিন্তনীয়। বিবাহ-ব্যাপারে বাঙালী সমাজের প্রধান সমস্যাই হইল কুমারী কন্যার বিবাহ। আর্থিক ও সামাজিক নানা কারণে কন্যাদায় বাঙালী গৃহস্থের একটি বড় দায়। ইহার চাপে পড়িয়া বিধবাবিবাহের সমস্যা নিতান্তই গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে অবিবাহিতা কন্যার পাত্র জোটানো দুষ্কর, সেখানে বিধবা কন্যার বিবাহ লইয়া চিন্তা করিবার অবসর কোথায়? ইহা ছাড়া, বিধবা হইলেই যে সকল মেয়ের পুনর্বার বিবাহে প্রবৃত্তি আসে তাহাও নহে। যে-সকল বালিকা-বিধবার অবস্থা: 'জানিনে কেমন পতি,/মনে নাই রে সে মূরতি।'[৩০] তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যে-সকল বিধবা স্বামিসোহাগে সোহাগিনী হইয়া প্রথম যৌবনের দিনগুলি অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে স্বামীর স্মৃতি লইয়া স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচারিণীর পবিত্র জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে।

এই সকল বিভিন্ন কারণে বিধবাবিবাহ যুক্তিসম্মত বলিয়া জনমতগ্রাহ্য হইলেও হিন্দুসমাজের উচ্চস্তরে ইহা অপ্রচলিতই রহিয়া গিয়াছে।

বিদ্যাসাগরের মতো বাস্তববুদ্ধির লোক যে সমাজের এইরূপ অবস্থার কথা বুঝিতে পারেন নাই তাহা নহে—তিনি নিজেই দেশাচারের অলঙ্ঘনীয়তার কথা বলিয়াছেন; তথাপি বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য নিজেকে তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা একে একে সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে তিনি একাই শেষ পর্যন্ত অভিযান চালাইয়াছিলেন[৩১]—হিংসার কৃষ্ণহস্ত সম্মুখে উদ্যত দেখিয়াও প্রাণভয়ে পিছাইয়া যান নাই।[৩২]

সকলপ্রকার বিপদ-বাধা অগ্রাহ্য করিয়া বালিকা-বিধবাদের দুঃখমোচনের জন্য এই-যে সমাজবিপ্লব, ইহার মূল প্রেরণা তিনি লাভ করিয়াছিলেন কোথা হইতে? কথিত আছে, বিদ্যাসাগর একদা তাঁহার জননী ভগবতী দেবীর মুখে একটি গ্রাম্যবালিকার অকালবৈধব্যের কাহিনী শুনিয়া বিধবাবিবাহ-প্রচলনের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল একটিমাত্র ঘটনাই যে সাগরবক্ষে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা বলিলে ঠিক হইবে না। বিদ্যাসাগর চক্ষুকর্ণ সজাগ রাখিয়াই চলিতেন এবং সেকালের বালিকা-বিধবাদের অসহনীয় দুঃখকষ্টের কথা নিশ্চয়ই তাঁহার অগোচর ছিল না। তাঁহার বিশাল বক্ষে এই সকল দুর্গতা বালিকাদের প্রতি একটি গভীর বেদনাবোধ জাগ্রত ছিল, এবং কর্মের মধ্য দিয়া প্রকাশলাভের জন্য তাহা উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। একটি বিশেষ ঘটনা এখানে আলম্বন-বিভাবরূপে কাজ করিয়াছিল মাত্র।

সমাজজীবনে নারীরও যে পুরুষের মতো সমান মর্যাদা থাকা উচিত, এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ প্রত্যয় ছিল। এই জন্য নারীনিগ্রহের সকলপ্রকার পন্থার বিরুদ্ধেই তিনি অকুণ্ঠ প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। এদেশে নারীনিগ্রহের একটি জঘন্য পন্থা ছিল বহুবিবাহ। নারীজাতির অশেষ অকল্যাণকর এই বহুবিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধেও বিদ্যাসাগর সবল হস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। 'যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহকাণ্ড যে শাস্ত্রবহির্ভূত ও সাধুবিগর্হিত ব্যবহার', ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি দুইখানি পুস্তক রচনা করেন: ১. বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, ২. বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার [দ্বিতীয় পুস্তক]।

প্রথম পুস্তকটির সূচনাতেই নারীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের হৃদয়ভরা সহানুভূতি প্রকাশিত: 'স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়মদোষে

পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রদেশেই স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশতঃ, স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। অত্রত্য পুরুষজাতি, কতিপয় অতিগর্হিত প্রথার নিতান্ত বশবর্তী হইয়া, হতভাগা স্ত্রীজাতিকে অশেষবিধ যাতনাপ্রদান করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতিজঘন্য অতিনৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই। এই প্রথার প্রবলতাপ্রযুক্ত, তাঁহাদিগকে যে সমস্ত ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, তৎসমুদায় আলোচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।'

বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই এই প্রথার বিরুদ্ধে এদেশের জনমত গড়িয়া উঠিতেছিল। যাহাতে এই বহুনিন্দিত প্রথাটি আইনবলে নিষিদ্ধ হইয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে বহুলোকের স্বাক্ষরিত কয়েকখানি আবেদনপত্রও রাজসরকারের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এবিষয়ে আবার কোনও কোনও পক্ষ হইতে আপত্তিও উঠিয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাঁহার বহুবিবাহ-বিষয়ক প্রথম পুস্তকে বিভিন্ন শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া ও নানা তথ্যের সমাবেশ ঘটাইয়া এই সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। বাঙলাদেশে প্রচলিত কৌলীন্যপ্রথার মসীময় চিত্র অঙ্কিত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই কৌলীন্যপ্রথাই এদেশে বহুবিবাহের অভিশাপ বহন করিয়া আনিয়াছে। রাজা বল্লালসেন কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন করিয়া এবং পরবর্তী কালে দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন রীতির প্রচলন করিয়া এদেশের ব্রাহ্মণ-কন্যাদের অশেষ দুর্গতির মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন। এই দুই অপরিণামদর্শী ব্যক্তির প্রতি বিদ্যাসাগরের ক্রুদ্ধ ক্ষোভ উপরি-উক্ত গ্রন্থে সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে: 'যদি ধর্ম থাকেন, রাজা বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটকবিশারদ নিঃসন্দেহে নরকগামী হইয়াছেন।'

কুলীন ব্রাহ্মণদের সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহপ্রথা যে কি-পরিমাণ নির্লজ্জ

বর্বরতার পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বিদ্যাসাগরের ঐ গ্রন্থে সন্নিবেশিত। এক স্থলে ভঙ্গকুলীনদের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন: 'এ দেশের ভঙ্গকুলীনদের মত পাষণ্ড ও পাতকী ভূমণ্ডলে নাই। তাঁহারা দয়া, ধর্ম, চক্ষুলজ্জা ও লোকলজ্জায় একেবারে বর্জিত। তাঁহাদের চরিত্র অতি বিচিত্র। চরিত্রবিষয়ে তাঁহাদের উপমা দিবার স্থল নাই। তাঁহারাই তাঁহাদের একমাত্র উপমাস্থল। কোনও অতিপ্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয়! আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি। তিনি অম্লান মুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট পাই, সেই খানে যাই। গত দুর্ভিক্ষের সময়, এক জন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। তিনি লোকের নিকট আস্ফালন করিয়াছিলেন, এই দুর্ভিক্ষে কত লোক অন্নাভাবে মারা পড়িয়াছে, কিন্তু আমি কিছু টের পাই নাই; বিবাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি।' অবশ্য বিদ্যাসাগর ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, ভঙ্গকুলীনদের মধ্যেও কিছু কিছু ভালো লোক আছেন। 'তাঁহাবা বিবাহব্যবসায়ীদিগকে অতিশয় হেয় জ্ঞান করেন। নিজে প্রাণান্তেও একাধিক বিবাহ করিতে সম্মত নহেন, এবং যাহাতে এই কুৎসিত প্রথা রহিত হইয়া যায়, তদ্বিষয়েও চেষ্টা করিয়া থাকেন।' এই সকল উদারমনা ভঙ্গকুলীনের কথা বলিয়া বিদ্যাসাগর মন্তব্য করিয়াছেন: 'তাঁহাদের ব্যবহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিবাহব্যবসায় পরিত্যাগ করা ভঙ্গকুলীনের পক্ষে নিতান্ত দুরূহ বা অসাধ্য ব্যাপার নহে।'

বহুবিবাহ-বিষয়ক প্রথম গ্রন্থটির 'চতুর্থ আপত্তি' অধ্যায়ে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের একটি সংখ্যাগত রূপ তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত তালিকাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বিবাহবিষয়ে কুলীনদিগের অত্যাচারের রূপ কতকটা স্পষ্ট হইয়া উঠে।[৩৩] এই সমাজিক অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর জনমতের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন।

এই গ্রন্থের 'পঞ্চম আপত্তি' অধ্যায়ে আছে কায়স্থজাতির কথা। কায়স্থদের সমাজেও ক্ষেত্রবিশেষে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। কায়স্থদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণী—কুলীন ও মৌলিক। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুলীনকন্যা বিবাহ করিয়া পরে কুলমর্যাদায় অপেক্ষাকৃত হীন মৌলিক-গৃহে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিত। কুলীনের দ্বিতীয়বারে এই মৌলিক-কন্যা বিবাহকে বলে 'আন্তরস'। বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে কায়স্থজাতির

এই আন্তরসে ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়াছিলেন। কায়স্থজাতির বিবাহপ্রথা বিশ্লেষণ করিয়া বিদ্যাসাগর দেখাইয়াছেন যে, 'এই আপত্তি অতি দুর্বল ও অকিঞ্চিৎকর। আন্তরস না হইলে, কায়স্থ-দিগের জাতিপাত ও ধর্মলোপ হয় না, এবং বিবাহবিষয়েও কোনও অসুবিধা ঘটে না।'

বহুবিবাহ-বিষয়ে লিখিত দ্বিতীয় গ্রন্থে বিদ্যাসাগর তাঁহার বিপক্ষের সহিত শাস্ত্রীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরে তারানাথ তর্কবাচস্পতি-প্রমুখ পাঁচজন পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া ইহা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন যে, বহুবিবাহ 'সর্বতো-ভাবে শাস্ত্রানুমোদিত কর্তব্য কর্ম'। বিদ্যাসাগর সুকৌশলে যুক্তি-পরম্পরার সাহায্যে প্রতিবাদীদের সমস্ত মত খণ্ডন করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থখানির উপসংহারে বলিয়াছেন: 'যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমত ও অনুমোদিত কার্য, ইহা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইলে, যে কেবল ধর্মশাস্ত্রবিষয়ে স্বীয় অনভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় এরূপ নহে, নিরপরাধ শাস্ত্রকার-দিগকেও নিতান্ত নৃশংস ও নিতান্ত নির্বিবেক বলিয়া বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করা হয়। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড যে যার পর নাই লজ্জাকর, ঘৃণাকর ও অনর্থকর ব্যবহার, তাহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। আমার বোধে, যে সকল মহাত্মারা, জগতের হিতের নিমিত্ত শাস্ত্র-প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা তাদৃশ ধর্মবহির্ভূত লোকবিগর্হিত বিষয়ে অনুমতিপ্রদান বা অনুমোদনপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ইহা মনে করিলে মহাপাতক জন্মে। বস্তুতঃ, মানবজাতির হিতাহিত ও কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করিবার নিমিত্ত যে শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহরূপ পিশাচব্যবহার সেই শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী কার্য, ইহা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে না।'

বহুবিবাহ-বিষয়ক দুইখানি গ্রন্থেই বিদ্যাসাগর নিম্নোদ্ধৃত মনুবচনটিকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রীয় বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন।

'সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥ [৩।১২]

'দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণাবিবাহই বিহিত। কিন্তু, যাহারা যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোমক্রমে বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক।' [ বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদ ]

সর্বাগ্রে সবর্ণে বিবাহ করিয়া পরে হীনবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করার পক্ষে এই যে শাস্ত্রবিধি, ইহা বহুবিবাহের পরিপন্থী বলিয়াই বিদ্যাসাগর মনে করিয়াছিলেন। কারণ, অনুলোম বিবাহের প্রতি দ্বিজাতির বড় একটা আগ্রহ দেখা যায় না, আর সবর্ণেও সর্বপ্রথম একবার মাত্র বিবাহ করার বিধি দেওয়া হইয়াছে। কুলীনকুলে প্রচলিত যে বহুবিবাহ, তাহা সবর্ণের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; মনুবচন অনুসারে এইরূপ বিবাহ একান্তভাবেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

বিদ্যাসাগর শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং রাজবিধির সাহায্যে এই প্রথা বন্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার আলোকে ক্রমপরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেকালের অনেকেই মনে করিয়াছেন যে, বহুবিবাহ নিবারণের জন্য বিদ্যাসাগরের এই বিপুল পরিশ্রম স্বীকারের কোনো অবশ্যকতা ছিল না। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে: '...বহুবিবাহ এ দেশে যতদূর প্রবল বলিয়া বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে।...অনেকেই ভরসা করেন যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত অবস্থায় বহুবিবাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া, অনেকেরই ডন্‌কুইক্সোট্‌কে মনে পড়িবে।'

বস্তুতঃ দেশের মধ্যে যে বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার বিরোধী একটা মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা সেকালের সাহিত্যকর্মের প্রতি লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' ও 'নবনাটক', দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক', বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

উনবিংশ শতাব্দীর নবলব্ধ চেতনায় এদেশের সমাজদেহ হইতে যে সর্ববিধ কুসংস্কারের খোলস খসিয়া পড়িতেছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যুগের তাগিদেই অন্ধবিশ্বাস ও কুপ্রথার স্থান অধিকার করিয়া লইতেছিল সংস্কারমুক্ত জীবনদৃষ্টি ও মানব-মূল্যবোধ। এই অবস্থায় বিদ্যাসাগরের সংস্কার-মূলক আন্দোলনের প্রবলতাকে অনেকটা অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইলেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি সবল হস্তে হাল ধরিয়া কালের তরণীটিকে উজানপথে বহুদূর পর্যন্ত ভাসাইয়া আনিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার আন্দোলনের ফলেই পরবর্তী কালে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিবারণের প্রয়াস

ত্বরান্বিত হইয়াছিল এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হইলেও বিধবার আচরণীয় কৃচ্ছ্রতার অনেকটা লাঘব হইয়া আসিয়াছিল। নারী-পুরুষের অধিকারগত সাম্য প্রতিষ্ঠার যুগদাবিকে বিদ্যাসাগর দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী মনীষীদের কণ্ঠে তাহাই বারবার প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

---

১। 'মনুসংহিতা'য় ধৃত সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ :

'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥' [ ৩।৫৬ ]।

২। '...সেকালে মৃত পতির অনুগমনকালেও অনেক স্থলে মৃত ব্যক্তির কনিষ্ঠ সহোদর কিংবা তদ্রূপ অপর কোনো ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির চিতায় অগ্নি প্রদানের পূর্বে তাহার বিধবার বাম হস্ত ধারণপূর্বক চিতা হইতে নামাইয়া লইত এবং তাহাকে গৃহে আনিয়া বিবাহ করিত।' চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বিদ্যাসাগর'

৩। 'ক. ঢাকার রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহ চালাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থকাম হন। খ. কোটার রাজাও অনুরূপ ভাবে ব্যর্থ হন। গ. বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের ১৯-২০ বৎসর পূর্বে নাগপুরের এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। ঘ. বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশের প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে এক মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ এই বিষয়ে আইন পাস কারাইতে গিয়া অসমর্থ হন।' অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য'

৪। 'এক দিন, মধ্যাহ্নসময়ে, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্যন্ত গিয়া, এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন, যে আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া

আছ কেন? ঠাকুরদাস, তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহ বাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন; ঠাকুরদাস, যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই? তিনি বলিলেন, না, মা আজ আমি, এখন পর্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া, নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর, দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে, তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে দিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।

'পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল।' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: 'বিদ্যাসাগর চরিত'।

৫। '…রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন, আমি, কস্মিন্ কালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্গুণবিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এপর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।' তদেব।

৬। '১৮৫১ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে বেথুন গঙ্গার পরপারে প্রায় ৫।৬ ক্রোশ দূরবর্তী জনাই গ্রামের বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধে সেখানকার বিদ্যালয় পরিদর্শন মানসে গমন করিয়াছিলেন। পথে বহুক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও বহুদূর-ব্যাপী কর্দমময় পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া তিনি জনাই গ্রামে উপস্থিত হন। সহৃদয় বেথুন উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই তাঁহার শেষ কার্য হইল। সহসা তাঁহার দুরারোগ্য জ্বরের সূচনা হইল, এবং তিনি সেই পীড়ায় লোকলীলা সংবরণ করিলেন।' চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বিদ্যাসাগর' ১৬৬-১৬৭।

৭। '…কলিকাতা ও পল্লিগ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত দলপতিরা ঐক্য হইয়া, উহাদের সহিত সামাজিক ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেন, এবং সংবাদপত্রেও তাঁহাদের যথোচিত দুর্নাম ঘোষণা করিয়াছিলেন।' শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন: 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ'

৮। 'নভেম্বর, ১৮৫৭ হইতে মে, ১৮৫৮—এই কয় মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন; তন্মধ্যে হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে ২০টি, বর্দ্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে তিনটি, ও নদীয়ায় একটি। বিদ্যালয়-গুলির জন্য মাসে ৮৪৫ টাকা খরচ হইত; ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০।' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ' [ ১৩৩৮ ], পৃ. ৫১।

৯। অবশ্য বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অনেকগুলি উঠিয়া গিয়া প্রায় কুড়িটি স্থায়ী হইয়াছিল।

১০। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ইয়ং সাহেবের নিকট লিখিত পদত্যাগপত্রে শিক্ষাবিস্তারের মহান ও পবিত্র কর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বিদ্যাসাগর লিখিয়াছিলেন: '…although my direct official connection with the education and enlightment of my countrymen will have ceased, I venture humbly to hope that my remaining years will still be devoted to the advancement of great and sacred cause in which my deep and earnest interest can only close with my life.' চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বিদ্যাসাগর'

১১। তদেব: Appendix B': পৃ. ৪৯৬।

১২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: 'বাল্যবিবাহের দোষ'।

১৩। তদেব।

১৪। সেকালের সনাতনপন্থী হিন্দুসমাজের মুখপাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনায় বিবাহব্যাপারে স্বাধীন নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে : 'ছেলেবেলা হইতে মা বাপ যে দুটিকে মিলাইয়া দেন, তাহারা একত্র থাকিতে থাকিতে ক্রমে ক্রমে দুইটি নবীন লতিকার ন্যায় পরস্পর গায়ে গায়ে জড়াইয়া এক হইয়া উঠে।…বয়স হইয়া বুদ্ধির পরিপাক জন্মিলে পরস্পরের স্বভাব চরিত্র বুঝিয়া যুবক যুবতী বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইতে পারে, এই যে একটি কথা আছে, উটি কথার কথা মাত্র। অন্যের স্বভাব চরিত্র পরীক্ষা করিয়া লওয়া নিতান্ত সহজ কর্ম্ম নয়। ঐ কার্য্যে অতি সুবিজ্ঞ বহুদর্শী ব্যক্তিদিগেরও পদে পদে ভ্রম হইয়া থাকে। ১৯।২০ বৎসরের স্ত্রীলোক এবং ২৪।২৫ বৎসরের পুরুষের ত কথাই নাই। ঐ বয়সে ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রবলা, কল্পনাশক্তি তেজস্বিনী, এবং অনুরাগ একান্ত উন্মুখ। পরস্পরের স্বভাব পরীক্ষায় যে বিবেক এবং ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তাহা ঐ সময়ে অকর্ম্মণ্যপ্রায় থাকে। একটি সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ, একটি মৃদু মধুর হাস্য, একটি অঙ্গভঙ্গীর বৈচিত্র্য, হঠাৎ মনোদুর্গ অধিকার করিয়া লয়; স্বভাব, চরিত্র, রুচি পরীক্ষা করিবার অবকাশ দেয় না। এই জন্য অধিক বয়সে বিবাহ সাধারণতঃ চিরস্থায়ী প্রকৃত প্রণয়ের উৎপাদক হইতে পারে না।' ভূদেব মুখোপাধ্যায় : 'বাল্য-বিবাহ' : 'পারিবারিক প্রবন্ধ' [১২৮৮], পৃ. ২-৩।

১৫। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : 'বাল্যবিবাহের দোষ'।

১৬। 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ'

১৭। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন : 'শুনিয়াছি, এই সময়ে তিনি [ বিদ্যাসাগর ]…কালেজের কার্য শেষ করিয়া অপরাহ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাগারে পুস্তক-রাশির মধ্যে মগ্ন থাকিতেন এবং গ্রন্থকীটের ন্যায় পুঁথির পত্রে পত্রে বিচরণ করিতেন।' চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বিদ্যাসাগর'

১৮। 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' [১ম]।

১৯। রামগতি ন্যায়রত্ন : 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' : গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত [১৩৪২], পৃ. ২১৪।

২০। ভূদেব মুখোপাধ্যায় : 'স্বাধীন চিন্তা' : 'বিবিধ প্রবন্ধ'।

২১। ভূদেব মুখোপাধ্যায় : 'বৈধব্য ব্রত' : 'পারিবারিক প্রবন্ধ'।

২২। তদেব।

২৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'সাম্য'।

২৪। তদেব।

২৫। রাধাকান্ত দেব-প্রমুখ বিধবাবিবাহের বিরোধী-পক্ষীয় লোকেরাও এই সময় সরকারের নিকট বহুলোকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়া যায়।

২৬। এই সকল নাটকের মধ্যে উমেশচন্দ্র মিত্র-রচিত 'বিধবাবিবাহ নাটক' এবং শিমূয়েল পিরবক্স-এর 'বিধবা-বিরহ নাটক' উল্লেখযোগ্য।

২৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বিদ্যাসাগর'

২৮। '…সাধারণ গৃহী লোকেরা বিধবাবিবাহ প্রচলনের বিশিষ্টরূপ আবশ্যকতা সর্বদাই অনুভব করিত। যখনই কোথাও কাহারও বালিকা কন্যা বিধবা হইয়াছে, তখনই সেই স্নেহের পুতুল ক্ষুদ্রকায়া কোমলাঙ্গীর ভাবী দারুণ দাবদাহ স্মরণ করিয়া কোমল-হৃদয় স্ত্রীপুরুষ অশ্রুবারি মোচনা করিয়াছে এবং তাহার বিবাহের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছে।' তদেব। পৃ. ১৯২।

২৯। 'কোন কোন ধনশালী লোকের প্রাণসমা কন্যা বিধবা হইলে প্রচার করিতেন যে, বিধবাবিবাহ যিনি প্রচলিত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ব্যয়-নির্বাহার্থে লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করিব। যৎকালে কন্যার বৈধব্য সংঘটন হয় তৎকালেই দিন-কয়েকের জন্য লোকের মানসিক দুঃখ উপস্থিত হয় যে, একাদশীর দিবস বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড দিনকরের উত্তাপে বালিকা কন্যা শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জলপান না করিয়া কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিবে। কন্যার এরূপ অসহ্য কষ্ট দেখা অপেক্ষা আমাদের মৃত্যু হওয়া শ্রেয়ঃ। কিছু দিন অতীত হইলে, ঐ কন্যার জনক-জননীর আর ঐরূপ দুর্ভাবনা থাকে না। পরে যৌবনাবস্থায় সমুপস্থিতা হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূতা হইয়া কার্য করিলে, পিতা-মাতা দেখিয়াও দেখেন না। ভ্রূণহত্যাদিতেও পরাঙ্মুখ হন না।' শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ'

৩০। আনন্দচন্দ্র মিত্র : 'বাল-বিধবার উক্তি' : 'মিত্রকাব্য' [ ১৩০৪ ], পৃ. ১৪০।

৩১। 'তিনি [ বিদ্যাসাগর ] যখন এই কার্যে [ বিধবাবিবাহ-প্রচলনে ] লিপ্ত থাকিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বস্বান্ত হইলেন, তখন তাঁহার পরম বন্ধু খ্যাতনামা

মধুসূদন স্মৃতিরত্ন একদিন রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আচ্ছা বিদ্যাসাগর, দেশে এত লোক থাকিতে তুমি কেন এ কার্যে একা অগ্রসর হলে?' বিদ্যাসাগর মহাশয় এই রহস্যের যে সরল সদুত্তর দিয়াছিলেন তাহা অতীব আমোদজনক। তিনি বলিয়াছিলেন, 'যখন আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন কি আর একা ছিলাম। অনেক লোকে মিলে মিশে এ কাজে হাত দিয়াছিলাম, কিন্তু, যারা মায়ের ব্যাটা, তারা চুপে চুপে ঘরে গেল, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে গেল, আর আমি বাপের ব্যাটা, কাজে কাজেই ধরা পড়িলাম।' চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বিদ্যাসাগর'

৩২। "...বিধবাবিবাহের আন্দোলনরূপ বৃহৎ বন্যায় যখন সমগ্র দেশ ভাসিয়াছে, সেই সময় একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, সংস্কৃত কলেজ হইতে বাসায় আসিবার সময় ঠনঠনিয়ার কালীতলায় [বিদ্যাসাগর] দেখিলেন, কয়েক-জন লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিবার মানসে অগ্রসর হইতেছে।......সেই ভীমকায় শত্রুদিগের সমাগমে তিনি ভীত কিংবা চিন্তিত হইলেন না, কেবল একটিবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কইরে ছিরে [ শ্রীমন্ত—বিদ্যাসাগরের দেহরক্ষায় নিযুক্ত পরিচারক ], সঙ্গে আছিস্ কি?' শ্রীমন্ত পশ্চাৎ হইতে বলিল, 'তুমি চল না, কে আসে যায়, সে আমি দেখিব, তুমি চলিয়া যাও, চাকর সঙ্গে আছে।' শ্রীমন্ত যে উত্তর করিল, তাহা শুনিয়া আক্রমণকারীরা তৎক্ষণাৎ বুঝিল যে বিদ্যাসাগর সুরক্ষিত হইয়া চলিয়াছেন, আর একটি পাও অগ্রসর হইল না; যে যতদূর আসিয়াছিল, সেইখান হইতে ক্রমে পশ্চাৎপদ হইল।" তদেব: পৃ. ২৩৪।

৩৩। অনেকের মতে বিদ্যাসাগর-প্রদত্ত এই তালিকাটি ভ্রমশূন্য নহে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বহুবিবাহ'-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন: 'আমাদিগের স্মরণ হয়, হুগলি জেলায় যতগুলিন বহুবিবাহপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকে তাঁহাদিগের তালিকা দিয়াছেন। অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে, মৃতব্যক্তির নাম সন্নিবেশ দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে।'

## ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতিবর্ণনির্বিশেষে ব্রহ্মোপাসনার জন্য রামমোহন যে ধর্মীয় মিলনসভার আয়োজন করিয়া যান, তাহাই ব্রাহ্মসমাজ নামে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া বাঙালীকে নবযুগের নবজীবন-সংগীত শুনাইয়াছে। উনিশ শতকে বাঙালীর মনন-সমৃদ্ধ নূতন জীবনাদর্শে ব্রাহ্মসমাজের দান অপরিমেয়। চিরাচরিত প্রথার দাসত্ব বর্জন করিয়া, অন্যায় অসংগতিকে দূরে সরাইয়া দিয়া, কেবল আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিগত বিবেকবুদ্ধির উপর ধর্মবোধ ও জীবনচর্যার প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মসমাজ চাহিয়াছিল ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বাঙালীর সত্যবোধ জাগ্রত করিতে, এবং এই উদ্যমই শেষ পর্যন্ত তাহাকে সমদর্শীর দৃষ্টি দিয়া মানুষকে কেবল মানুষ বলিয়া দেখিতে প্রেরণা যোগাইয়াছিল।

মানুষের প্রতি এই সমদর্শিতা বা সাম্যবোধ ব্রাহ্মসমাজকে কেবল একটি ধর্মসম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া ভেদবৈষম্যবর্জিত মনুষ্যত্বের উদার প্রান্তরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের সাম্যসাধনা প্রথম প্রথম একটি বিশেষ খাতে প্রবাহিত হইলেও পরে তাহা কূলপ্লাবী হইয়া উঠিয়াছিল—ধর্মের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্র অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে, বাঙলায় ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ইতিহাস বাঙালীর সাম্যচিন্তার ক্রমিক পরিণতিরই ইতিহাস।

বাঙলার নবযুগে যে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও মানবতাবোধ বাঙালীর সুপ্তিমগ্ন হৃদয়কে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাই ব্রাহ্মসমাজের সাম্যসাধনার ভিত্তিভূমি রচনা করিয়াছে। ব্রাহ্ম নেতারা যে সকলেই সেই ভূমিতে পদার্পণ করিয়া স্বচ্ছন্দগতিতে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন তাহা নহে—কেহ দিগ্‌ভ্রষ্ট হইয়াছেন, কেহ দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া অর্ধপথে থামিয়া গিয়াছেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের পরিণত নেতৃত্ব এক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বিনির্মুক্ত সাম্যবোধের ক্ষেত্রে পৌছিয়া সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ধারাবাহিক ইতিহাস লক্ষ্য করিলে এই সত্যেরই স্বীকৃতি মিলিবে।

ব্রাহ্মসমাজ প্রথম হইতেই পৌত্তলিকতার বিরোধী। পৌত্তলিকতা ও তাহার অনুষঙ্গী পুরোহিতপ্রথা এদেশে এক ধরনের সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ঘটাইয়া শ্রেণী-বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের পৌত্তলিকতা-বিরোধী আন্দোলন এই

সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আঘাত হানিয়া ধর্মের ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান অধিকার দাবি করিয়াছে।[১]

ব্রাহ্ম-আন্দোলনের শুরুতে রামমোহন যে সর্বজনীন ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে ধর্মজগতে সাম্যবাদের শঙ্খনিনাদ শ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী ব্রাহ্মনেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হাতে এই সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত উদার আদর্শটির মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মেরই উচ্চতর ও বিশুদ্ধতর রূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'হিন্দুধর্ম্ম অতি প্রশস্ত ও উদার ধর্ম্ম—ইহা সকল প্রকার উন্নতি আপনার মধ্যে নিবিষ্ট করিতে পারে। অতএব হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া তাহারদের মধ্যে থাকিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মকেই উন্নত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত করিতে হইবে।'[২] দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত হইল। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের সম্প্রদায়নিরপেক্ষ ধর্মাদর্শ বর্জন করিলেন, বর্জন করিয়া একটি সনাতন ধর্মের সীমিত গণ্ডীর মধ্যেই সর্বসংস্কারমুক্ত ধর্মবোধের উদার অভ্যুদয় ঘটাইতে সচেষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে সাম্যসাধনার এক নূতন দিগন্ত উদ্ভাসিত হইল।

ধর্মের ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গে এক ধরনের স্বাধীনতা রক্ষা করা প্রয়োজন। কেবল উপাসনা-মন্দিরে গিয়া উপাসনায় অংশ গ্রহণ করিবার সমান অধিকার থাকিলেই চলিবে না, প্রত্যেকের অন্তরের ধর্মবোধ যাহাতে অনন্য-প্ররোচিত হইয়া স্বাধীনভাবে স্ফূর্তিলাভ করে তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মহর্ষির সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মসাধনে ইহাই প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল।

রাজা রামমোহনের সময়ে এবং তাহার পরেও কিছুকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম ছিল 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম'।[৩] রাজা বেদ-বেদান্ত মানিতেন, শাস্ত্র-প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন। তিনি যুক্তির আলোকে শাস্ত্রের বাণী ও অনুশাসনকে যাচাই করিয়া তাহার দ্বারাই সকলের ধর্মবোধ নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মসমাজে বেদপাঠ হইত, বেদান্তের ব্যাখ্যান চলিত। তাঁহার বিলাতগমনের পরে তাঁহার একান্ত অনুগামী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশও বহুকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় এই রীতির অনুবর্তন করিয়া চলিতেন। মোট কথা, ধর্মসাধনে রামমোহন শাস্ত্রকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। আর শুধু শাস্ত্রই নহে, ধর্মসাধনে গুরুরও যে একটা বিশেষ স্থান আছে, রামমোহন তাহাও

অস্বীকার করেন নাই। অতএব দেখা যায়, রামমোহনের ধর্মমত প্রাচীন কালের শাস্ত্রকার ও ধর্মগুরুদের অতিক্রম করিয়া যায় নাই।

কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে শাস্ত্র ও গুরুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক সময় জনচিত্তের সাধারণ বিবেকবুদ্ধি ও পুরাগত ধর্মীয় নির্দেশের মধ্যে এক ধরনের বৈষম্যবোধের অবকাশ থাকিয়া যায়। রামমোহনের কালে এই বৈষম্য ততটা অনুভূত না হইলেও পরবর্তী কালে পরিবর্তিত জীবনমূল্যবোধে তাহা প্রকট হইয়া উঠে। ইউরোপের যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ তখন শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ইহার ফলে এদেশের প্রাচীন শাস্ত্র ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির প্রতি শিক্ষিতসমাজে একটা বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল—শাস্ত্র নয়, গুরু নয়, ইউরোপীয় শিক্ষায় পরিমার্জিত ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধিই সত্য-নির্ণয়ের একমাত্র মানদণ্ড হইয়া উঠিল।

দেবেন্দ্রনাথ এই সময়কার ব্যক্তিপুরুষ। যুগচেতনা তাঁহার চিত্তেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—যুক্তির কষ্টিপাথরে সত্যকে যাচাই করিয়া লইবার একটা প্রবল প্রবৃত্তি তাঁহাকেও পাইয়া বসিয়াছিল; কিন্তু আবার অপরদিকে ছিল তাঁহার প্রকৃতি-নিহিত একধরনের রক্ষণশীলতা। এই যুক্তিবোধ ও রক্ষণশীলতার দোটানায় পড়িয়া দেবেন্দ্রনাথ কতকটা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রথমে বেদের অভ্রান্ততা মানিয়া লইলেন, পরে বিশেষ অনুসন্ধানের পর বেদের মধ্যে সত্য-অসত্য মিশ্রিত আছে মনে করিয়া বেদ বর্জন করিলেন—ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদের আশ্রয় লইলেন। ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিভূমি নির্দেশ করিতে গিয়াও তিনি এইরূপ চিত্তসঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার নিজের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য: 'প্রথমে বেদ ধরিলাম, সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলাম না। তাহার পরে প্রামাণ্য একাদশ উপনিষদ্ ধরিলাম; কি দুর্ভাগ্য, সেখানেও ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিতেছি না! …এই উপনিষদ্ তো আমাদের সকল অভাব দূর করিতে পারে না, হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না! তবে এখন আমাদের কি করিতে হইবে? আমাদের উপায় কি? ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তনভূমি হইল না, উপনিষদেও তাহার পত্তনভূমি হইল না, কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে, আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি।'[৪] এইভাবে ব্যক্তি-হৃদয়ের উপর ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিভূমি রচনা করিতে গিয়া

দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্র-গুরু বর্জন করিয়া 'প্রত্যেক মানুষের সহজ বিচারবুদ্ধিকেই একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া' নির্দেশ করিলেন। ধর্মসাধনে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে সম-মর্যাদা দান করা হইল। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজে সাম্যভিত্তিক ব্যক্তিস্বাধীনতার উদ্বোধন ঘটিল। 'যাহা আমার বিচার-বুদ্ধিতে সত্য বলিয়া বোধ হয়, কেবল তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। যাহা নিজের কাছে সত্য বলিয়া বোধ হয় না, তাহাকে কাহারও কথায় সত্য বলিয়া মানিয়া লইব না। শাস্ত্রের কথায় নহে; গুরুর কথাতেও নহে। যাহা নিজের ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে সাধু এবং সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কেবল তাহার অনুসরণ করিয়া চলিব। যে পথ নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির নিকটে আত্মপ্রকাশ না করে, কল্যাণের পথ বলিয়া তাহাকে কখনো আশ্রয় করিব না। গুরুজনের আদেশে নহে, সমাজ শাসনের ভয়েও নহে। সত্যাসত্যের এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের কষ্টিপাথর আমার নিজের ভিতরেই আছে। সত্য এবং ধর্ম্মকে এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইব। কাহারও কথায় না বুঝিয়া সত্য বা ধর্ম্মকে গ্রহণ করিব না। এ সকল বাংলার প্রথম যুগের ব্রাহ্মসমাজের জীবনের এবং সাধনের মূল সূত্র হইয়াছিল।...মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সাধনার প্রথম দীক্ষাগুরু।'[৫]

দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয়—তিনি ঈশ্বরভক্ত সাধক। বাল্যকাল হইতে যে ঈশ্বর-ব্যাকুলতা দেবেন্দ্রনাথের চিত্তকে আন্দোলিত করিতেছিল, তাহাই প্রথম যৌবনে আকস্মিকভাবে তাঁহার হস্তে ঈশোপনিষদের ছিন্নপত্র সংস্থাপন করিয়া[৬] জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহাকে নূতন দৃষ্টি দান করিল।

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

ঈশোপনিষদের এই প্রথম শ্লোকটির আলোকে দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বজগৎকে ঈশ্বরদ্বারা আচ্ছন্ন দেখিতে পাইলেন[৭]—দেখিতে পাইলেন, জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যেই ঈশ্বর সমভাবে প্রকাশমান।[৮] দেবেন্দ্রনাথের মনের এই যে ধর্মীয় সাম্যবোধ, ইহার সহিত মিলিত হইল ইংরাজী শিক্ষায় লব্ধ যুক্তিবাদ-সম্ভূত এক ধরনের সাম্যচেতনা—যাহা 'হিউম্যানিটি'র দোহাই দিয়া সকলপ্রকার ভেদ-বৈষম্যের ঊর্ধ্বভাগে মানুষের স্থান নির্দেশ করিয়া দেয়।

মানবমহিমা সম্বন্ধে এই নবলব্ধ প্রত্যয়ের বলেই দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যেক মানুষের হৃদয়কে ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি বলিয়া নির্দেশিত করিতে পারিয়াছিলেন। আর তাঁহার এই প্রত্যয়ই একদিন ব্রাহ্মসমাজে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদপাঠের বিরুদ্ধে

তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিল।[৯] সত্য বটে, দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে জাতিভেদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই—তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতির বলবতী রক্ষণশীলতা তাঁহাকে অনেকটা দিগ্‌ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু আবার ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ব্রাহ্মসমাজে তিনিই প্রথম মনুষ্যত্বের বেদীমূলে জাতি ও বর্ণের সকলপ্রকার বৈষম্যকে আহুতি দান করিবার পন্থা দেখাইয়াছিলেন।[১০] প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটাইয়া যেদিন তিনি ব্রাহ্মণেতর কেশবচন্দ্রকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে অভিষিক্ত করিলেন,[১১] উপবীতধারী উপাচার্যদের স্থানে যেদিন উপবীতত্যাগী দুই ব্রাহ্মণ-সন্তানকে উপাচার্যপদে নিয়োগ করিলেন,[১২] সেদিন হইতেই ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদের প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। নিজের রক্ষণশীল প্রকৃতির জন্য জাতিবর্ণভেদহীন সাম্যসাধনার পথে দেবেন্দ্রনাথ বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই সত্য, না পারিলেও তিনিই যে এই পথের দিশারী তাহা অনস্বীকার্য।

মনীষী রাজনারায়ণের নিকট লিখিত একখানি পত্রে দেবেন্দ্রনাথের জাতিভেদ-বিরোধী মনোভাব স্পষ্টই অভিব্যক্ত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন: 'ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই; ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান হইতে পারে।…তোমার যদি অভিপ্রায় থাকে যে ভিন্ন জাতিতে তোমার কন্যাকে বিবাহ দিবে, তবে এ প্রস্তাবে সকল ব্রাহ্মই আহ্লাদিত হইবেন এবং এমত পাত্রও আছে যে, সে কন্যাকে গ্রহণ করিতে পারে।'[১৩]

আর একখানি পত্রে বর্ণবৈষম্যসূচক উপনয়ন-প্রথার বিরুদ্ধে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়া তিনি রাজনারায়ণের মতামত চাহিতেছেন: 'ব্রাহ্মণদিগের উপনয়নের বিষয় কি বিবেচনা করেন তাহাদিগের উপনয়ন বিধান পরিবর্ত্তন করিবেন? না, একেবারে পরিত্যাগ করিবেন? আমার মতে ব্রাহ্মদিগের উপনয়ন স্বধর্ম্ম-সম্মত নহে। অতএব অবশ্য তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, যদি ব্রাহ্মদিগের উপনয়নই পরিত্যাগ করিতে হইল, তবে আর ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি জাতিভেদ কোথায় থাকে যে, বিবাহের সময় জাতিভেদ করা যায়।'[১৪]

পরবর্তী কালে দেখা যায়, প্রাচীন ব্রাহ্মদের অনুরোধে দেবেন্দ্রনাথ পুনরায় উপবীতধারী ব্রাহ্মণদেরই কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্যপদে নিয়োগ করিয়াছেন এবং নবীন ব্রাহ্মদের অভিলষিত অসবর্ণ বিবাহে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারেন নাই,[১৫] কিন্তু ইহাতেও তাঁহার পথিকৃতের দাবিটি উড়াইয়া দেওয়া

যায় না। তিনি ঠিক পথেই যাত্রা শুরু করিয়াছিলেন—কেবল চূড়ান্ত সমাজ-বিপ্লব ঘটাইতে চাহেন নাই বলিয়া অর্ধপথে থামিয়া গিয়াছেন।

সমাজবিপ্লবী না হইলেও দেবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় সমাজের বৈষম্য দূর করিয়া একধরনের সাম্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং সেই স্বপ্ন সফল করিতে চাহিয়াছিলেন ধর্মের সাহায্যে। ব্রাহ্মধর্মের উদার পরিমণ্ডলের মধ্যে ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজের পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ধারাগুলি মিলিত হইয়া ভেদবিভেদহীন এক শক্তিশালী আদর্শ জনসমাজ গড়িয়া তুলিবে, এই আশায় একদা তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাষায়, 'যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন-ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্ব্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে—আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল।'[১৬]

দেবেন্দ্রনাথের অনুগামীদের মধ্যে সকলের চেয়ে কাছের লোক ছিলেন রাজনারায়ণ বসু।[১৭] দেবেন্দ্রনাথের মতই রাজনারায়ণও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের উন্নত রূপ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন: 'হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকারমাত্র মনে করি।'[১৮] কিন্তু নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁহার কোনো বিরূপ ভাব ছিল না—সকল ধর্মকেই তিনি সমান মর্যাদা দিতেন। তাঁহার মতে, হিন্দুধর্ম মূলতঃ ধর্মসম্বন্ধে একধরনের সমদর্শিতা শিক্ষা দিতেছে: 'হিন্দুধর্ম্মের ঔদার্য্য সর্ব্ব ধর্ম্মাপেক্ষা অধিক। খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীরা বলে যে আমার এই ধর্ম্মটী না মানিলে তুমি অনন্ত নরকে পড়িবে, হিন্দুধর্ম্মের ভাব তেমন নয়। হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য উপদেশ এই যে, যাহার যে ধর্ম্ম সে ব্যক্তি সেই ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকারে পালন করিলেই উদ্ধার হইবে। সকল হিন্দুরই এই বিশ্বাস।'[১৯]

স্বধর্মের প্রতি অন্ধ অনুরক্তি যে পরধর্মের প্রতি একটা অসহিষ্ণু মনোভাব জাগাইয়া তোলে, এই বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়া রাজনারায়ণ বলিয়াছেন: 'স্বমতের প্রতি অন্ধ অনুরাগ অন্যের ধর্ম্মমতে যাহা সত্য আছে তাহা দেখিতে দেয় না ও বিবেচনারূপ চক্ষুকে নিমীলিত করিয়া রাখে। এই অনুরাগবশতঃ লোকে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর কথা পর্য্যন্তকেও কর্ণে স্থান দেয় না। লোকে এই অনুরাগবশতঃ, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা পরকালে নরকে পতিত হইবে আর আপনারা কেবল

স্বর্গে যাইবে, এরূপ মনে করে। তাহারা এমন বিবেচনা করে না যে মনুষ্য ভ্রান্ত জীব, অন্যের যেমন ভ্রম আছে তেমনি আপনারও ভ্রম থাকিতে পারে।'[২০]

ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ নির্ণয় করিতে গিয়া রাজনারায়ণ প্রথমেই এই ধর্মে সকল মানুষের অধিকার-সাম্যের কথা তুলিয়াছেন '...এ ধর্মে জাতির নিয়ম নাই, সকল-জাতীয় মনুষ্যের এ ধর্মে অধিকার আছে। ঈশ্বরের সূর্য পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে আলোক প্রদান করিতেছে, ঈশ্বরের বায়ু পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে প্রাণ দান করিতেছে, ঈশ্বরের মেঘ পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে জল প্রদান করিতেছে। অতএব কোনও এক বিশেষ জাতি ঈশ্বরের অনুগ্রহপাত্র হইয়া সত্যধর্ম উপভোগ করিবে আর অন্য সকল জাতি তাহাতে বঞ্চিত থাকিবে, ঈশ্বরের এমত অভিপ্রায় কখনই হইতে পারে না। সকল মনুষ্যই যে অমৃত-পুরুষের পুত্র-স্বরূপ। ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি পৃথিবীকে আপনার গৃহ আর সকল মনুষ্যকে আপনার ভ্রাতা-স্বরূপ জ্ঞান করেন।'[২১]

জাতিভেদ সম্বন্ধে রাজনারায়ণের একটি বিশেষ প্রত্যয় ছিল। জন্মগত জাতিভেদের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, কিন্তু কর্মগত জাতিভেদ বা বৃত্তি-ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ তিনি সমর্থন করিতেন। নিজের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন : 'যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। জাতিবিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়।'[২২] এখানে স্পষ্টতঃই জন্মগত জাতিভেদের কথা বলা হইয়াছে। জাতিভেদবর্জনের এই উচ্ছ্বসিত আবেগই উত্তরকালে রাজনারায়ণের জীবনে ঈশ্বরচেতনার স্পর্শে সুগভীর মানবপ্রীতির রূপ ধারণ করিয়াছিল। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষকেই রাজনারায়ণ গভীর প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন বলিয়া একদা দেওঘরের পাণ্ডাদের নিকট তিনি 'দোসরা বৈদ্যনাথ' হইয়া উঠিয়াছিলেন।[২৩] অতএব প্রচলিত জাতিভেদপ্রথার সংকীর্ণতা যে তাঁহার উদার চিত্তকে স্পর্শ করে নাই, তাহা নিঃসংকোচে বলা চলে। কিন্তু জাতিভেদের মূলে যে কর্মানুসারে শ্রেণীবিভাগ, তাহাকে তিনি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করিতেন। হিন্দুধর্মের জাতিভেদকে যে তিনি কেবল কর্মভিত্তিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত উক্তিই তাহার প্রমাণ : 'অনেকে বলেন, হিন্দুধর্ম্ম জাতিভেদের বিশেষ পোষকতা করে। কিন্তু একথা যথার্থ নহে।...

উচ্চনীচ কর্ম্মানুসারে মনুষ্যগণ এক এক শ্রেণীতে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহা হইতেই

জাতির উৎপত্তি হয়। ভারতবর্ষে প্রথমে এক ব্যক্তির চারি পুত্রের মধ্যে বৃত্তি অনুসারে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয়, একজন বৈশ্য ও একজন শূদ্র হইয়াছিলেন, এমন সকল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পুরাকালে কর্ম্ম ও চরিত্রগুণে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইত, শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইত।[২৪]

সকল মানুষেরই প্রতি রাজনারায়ণের সমান প্রীতি ছিল বলিয়া একদিকে যেমন তিনি কাহাকেও হীন পতিত বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন নাই, অপরদিকে আবার তেমনই অতিরিক্ত বিনয়বশতঃ কাহাকেও অযথা শ্রদ্ধা প্রদর্শন পছন্দ করিতেন না। এইজন্যই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যে নরপূজার চলন দেখা দিয়াছিল, তাহাকে তিনি আদৌ সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাঁহার কানপুরে অবস্থিতিকালে ব্রাহ্মসমাজের এক উপাসনাসভায় ব্রাহ্মদের পা-ধরাধরির অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন। ঐ সভায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। রাজনারায়ণ বর্ণনা দিতেছেন: "উপাসনার পরে প্রত্যেক ব্রাহ্ম মজুমদার মহাশয়ের পা ধরিয়া কেহ বলিলেন, 'প্রভু, আমাকে পরিত্রাণ করুন', কেহ বলিলেন, 'আমার হয়ে দুটো কথা ঈশ্বরকে বলিবেন।' তাহার পর অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ব্রাহ্ম আচার্যের পা ধরা হইল, স্থবির ব্রাহ্ম রাজনারায়ণবাবুর পা ধরা হইল না ইহা অনুচিত কার্য হইয়াছে ইহা মনে করিয়া ব্রাহ্মেরা আমার পা ধরিতে আইলেন। আমি 'এমন করিতে নাই, এমন করিতে নাই' বলিয়া বসিয়া বসিয়া পিছু হাঁটিতে লাগিলাম।"[২৫] অন্তরে অকপট মানবপ্রীতি ছিল বলিয়া রাজনারায়ণ কোনো মানুষকে ছোট ভাবিতে পারেন নাই, আবার মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বও সহ্য করিতে চাহেন নাই।

রাজনারায়ণের চরিত্রের এই যে বলিষ্ঠতা, ইহাই তাঁহাকে অন্যদিকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের পথিকৃৎরূপে তাঁহার নাম অবিস্মরণীয়। তাঁহার রচিত 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' [*An old Hindu's Hope*]-নামক প্রবন্ধে ভারতবর্ষের সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী হিন্দুর মিলনে গঠিত যে 'মহাহিন্দু সমিতি'র পরিকল্পনা দেখা যায়, তাহাতে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' স্বাজাত্যবোধের প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল।[২৬] এই সভার কার্যবিবরণ হইতে রচিত 'Prospectus of a Society for the promotion of National feeling among the Educated Natives

of Bengal'.—গ্রন্থটি নবগোপাল মিত্রকে সুবিখ্যাত 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করে, আর এই 'হিন্দুমেলা'ই এদেশে জাতীয় ভাবধারার উদ্বোধন ঘটাইয়া পরবর্তী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের পথ রচনা করে।[২৭] এই দিক দিয়া চিন্তা করিলে রাজনারায়ণকে সত্যই 'Grandfather of Nationalism' বলিতে হয়।

এই স্বদেশপ্রেমিক উদারমনা ব্যক্তিটির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: 'দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।'[২৮]

সহস্র মনকে এক সূত্রে বাঁধিয়া সহস্র জীবনকে এক কার্যে সঁপিয়া দেওয়া তখনই সম্ভব হয়, যখন সহস্র লোককেই সমভাবে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখা যায়। এই প্রীতি-উৎসারিত সাম্যবোধই রাজনারায়ণ-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে রাজনারায়ণের সঙ্গে সঙ্গেই মনস্বী অক্ষয়কুমার দত্তের নাম স্মরণীয়। অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। 'চিন্তা ও মননের বিচিত্র ঐশ্বর্যে' তিনি ছিলেন সেকালের বাঙলায় একজন পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের পূজারীরূপে বাঙালীর অন্তর্লোকে তিনি সুগভীর প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের এই জ্ঞানসাধকের সহিত ভক্তিসাধক দেবেন্দ্রনাথের বহুক্ষেত্রেই মতান্তর ঘটিত।[২৯] এ সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন: 'আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ; —আকাশ পাতাল প্রভেদ!'[৩০]

কিন্তু এত প্রভেদ সত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। বেদ-বেদান্ত বর্জন করিয়া সাধারণ মানুষের আত্মপ্রত্যয়ের উপর ব্রাহ্মধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে পরিকল্পনা দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার অনুপ্রেরণা তিনি লাভ করেন অক্ষয়কুমারের নিকট হইতে।[৩১]

দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার উভয়ই ঈশ্বরবিশ্বাসী—উভয়ই ধর্মকে শাস্ত্রের পাদপীঠে না রাখিয়া সাধারণ মানুষের সহজাত অনুভূতির উপর স্থাপন করিতে

চাহিয়াছেন ; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ভক্তিপথের পথিক, অক্ষয়কুমার যুক্তিবাদের সাধক। দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় বিশ্বাসী ছিলেন, অক্ষয়কুমারের অভিমত : '...জগদীশ্বর নিরূপিত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন—ফলাফল বিধান করিতেছেন—সুখ দুঃখ বিতরণ করিতেছেন। তিনি কদাপি কাহারও স্তব বা প্রার্থনার অনুরোধে কোন নিয়মের অতিক্রম করেন না।'[৩২]

এইরূপ, ধর্মের বহিরঙ্গ সাধনার ক্ষেত্রে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পার্থক্য থাকিলেও মূল ধর্মানুভূতিতে অনেকটা ঐকমত্য দেখা যায়। দেবেন্দ্রনাথের নিকট বিশ্বজগৎ ঈশ্বরসত্তায় আচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি উপদেশ দিয়াছেন : 'পরমেশ্বরের সত্তাতে এই সমুদয় জগৎকে আচ্ছাদন কর। অল্প কি বৃহৎ যাহা কিছু সকলই তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে। জড়েতে তিনি ওতপ্রোত হইয়া আছেন, আত্মার সঙ্গে তিনি সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অভাবে জড়ের সমুদয়ই বিলুপ্ত হয় ; তাঁহার অভাবে মনের চিন্তা দূর হয় ; হৃদয়ের প্রীতি নির্ব্বাণ হইয়া যায় ; আত্মার জীবন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার সত্তাতেই আমাদের সত্তা।'[৩৩] অক্ষয়কুমারও ঈশ্বরসত্তাকে বিশ্বের মূলীভূত কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে, 'এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ নিরীক্ষণ করিয়া বিবেচনা করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে যাবৎ জাতীয় প্রাণী ও যাবৎ জাতীয় জড় বস্তুর এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধও নিরূপিত আছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই সমস্ত পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিয়া অচিন্ত্য, অদ্বিতীয়, অনাদি, পরম কারণ পরমেশ্বরের সত্তা স্পষ্ট উপলব্ধি করেন।'[৩৪]

এই ঈশ্বরসত্তার উপলব্ধি-বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার সাধারণ মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদের অন্তর্নিহিত একধরনের সাম্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ যে ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয়—সকল মানুষেরই যে বিবেকবুদ্ধি আছে এবং সেই বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইলে সকলেই যে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করিয়া স্বাধীনভাবে ধর্মপালন করিতে পারে, এই বিশ্বাসের মূলে রহিয়াছে উচ্চনীচ-নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধাবোধ। এই শ্রদ্ধাবোধ যেমন ভক্তিবাদী দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে ছিল, তেমনই ছিল যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমারের হৃদয়ে। ইংরাজী শিক্ষার গুণে তাঁহারা উভয়ই মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ—উভয়ই ব্যক্তিস্বাধীনতার পূজারী।

এই জন্যই দেখিতে পাই, উনবিংশ শতাব্দীর বিবিধ সামাজিক আন্দোলনে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার উভয়ই অংশগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের অন্তর্নিহিত রক্ষণশীলতা কোনো ক্ষেত্রেই তাঁহাকে উদ্দাম হইয়া উঠিতে দেয় নাই। '…যে-কোন সামাজিক বা অন্যবিধ আন্দোলনে তিনি সর্বদা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আস্তিক্যবাদী অনুশাসনের নির্দেশে চালিত হইতেন।'[৩৫] আর অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদী মন সমস্ত অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া সমাজবিপ্লবের পথে পা বাড়াইতে দ্বিধাবোধ করিত না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি তাঁহার এই বিপ্লবী মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় বাঙলার দরিদ্র ও নির্যাতিত কৃষককুলের দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত করিয়া বহুদিনের সামাজিক বৈষম্যের প্রতি অক্ষয়কুমার সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন: "ভূমিই আমারদের মূলধন, এবং কৃষকেরাই আমারদের প্রতিপালক। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! যাহারা এমন হিতৈষি,—সংসারের এমন সুখ-সঞ্চারক, তাহারদের দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয় ব্যাকুল হয়! তাহারা ভুবন-প্রতিপালক হইয়াও আপনারদের উদরান্ন আহরণে সমর্থ হয় না; এক দিবসও নিরুদ্বেগে সুখে যাপন করিতে পারে না। ইহার কারণ অতি ভয়ানক, এবং তাহার অনুসন্ধান করাও যন্ত্রণা-জনক। মনুষ্যের বিষপূরিত চিত্ত,—তাঁহার দুর্নিবার লোভ রিপুই তাহাদের পরিতাপ প্রাপ্তির একমাত্র কারণ। মনুষ্য যখন লোভ রিপুর বশীভূত হয়েন, তখন পরপীড়া প্রদান বিষয়ে অরণ্যবাসি হিংস্র জন্তুও তাঁহার নিকট পরাভব মানে। 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক' এ প্রবাদ বুঝি বাঙ্গলার ভূস্বামিদিগের ব্যবহার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবেক। ভূস্বামী স্বাধিকারে অধিষ্ঠান করিলে প্রজারা এক দিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; কি জানি কখন কি উৎপাত ঘটে ইহা ভাবিয়াই তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত।"[৩৬]

অন্যত্র প্রজার প্রতি রাজপুরুষদের অত্যাচার সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের মন্তব্য: 'রাজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য সাধন বিষয়ে রাজপুরুষদিগের যত্ন, নৈপুণ্য ও বিক্রম প্রকাশের কিছুমাত্র ত্রুটি দেখা যায় না, কিন্তু প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য সমস্ত বিষয়েই তাহার সম্যক্ বৈপরীত্য প্রতীত হইতেছে। সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া নিরীক্ষণ করিলে সমুদায় বাঙ্গলা দেশ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-সমাকীর্ণ মহারণ্যের ন্যায় বোধ হয়;—যেখানে কোন নিয়ম নাই, কাহারও শাসন নাই;—যেখানে নৃশংস-স্বভাব হিংস্র জীবসকল নিরুপদ্রব নির্ব্বিরোধ প্রাণিদিগের প্রাণ

নাশার্থেই সর্ব্বদা সচেষ্ট আছে। প্রজাদের ধন-সম্পত্তিতে রাজার কিছু স্বভাবসিদ্ধ স্বত্ব নাই, তিনি তাহারদের ধন মান প্রাণাদি রক্ষা করিবেন বলিয়াই কর গ্রহণ করেন। কিন্তু আমাদের রাজপুরুষেরা যদর্থে কর গ্রহণ করেন, তৎসাধন বিষয়ে তাঁহারা কেমন মনোযোগি, পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের বিষম দুরবস্থাই তাহার সাক্ষী রহিয়াছে।'৩৭

বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে সেকালের নীলকর সাহেবেরা যে অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছিল, তাহাও অক্ষয়কুমারের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। নীলকরের অত্যাচারে যে প্রজারা 'কত ক্লেশ, কত আশা-ভঙ্গ, কতদিন অনশন, কত যন্ত্রণা' ভোগ করিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়া অক্ষয়কুমার প্রথমেই লিখিয়াছেন: 'নীলকরদিগের কার্যের বিবরণ করিতে হইলে, কেবল প্রজাপীড়নেরই বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। তাঁহারা দুই প্রকারে নীল প্রাপ্ত হয়েন। প্রজাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া তাহাদের নীল ক্রয় করেন এবং আপনারা ভূমি কর্ষণ করিয়া নীল প্রস্তুত করেন।…এই উভয়ই প্রজানাশের দুই অমোঘ উপায়।'৩৮

সাধারণ মানুষের সহিত এই যে সহমর্মিতা—প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই যে সুতীব্র প্রতিবাদ, ইহাই তো সাম্যবাদের গোড়ার কথা। এযুগের সাম্যবাদী আন্দোলনে যে শ্রেণীবৈষম্য ঘুচাইয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা দেখা যায়, অক্ষয়কুমারের সমাজচিন্তায় তাহারই পূর্বাভাস সূচিত।

অক্ষয়কুমারের কুসংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল চিন্তাধারা এযুগেও আমাদিগকে জাতীয় উন্নতির পথ প্রদর্শন করিতেছে। বর্ণভেদ, কৌলীন্যপ্রথা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে বৈষম্যের অভিশাপ বর্ষণ করিয়া আসিতেছে। এযুগের পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায়ও আমরা ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই। অথচ একশত বৎসরেরও পূর্বে অক্ষয়কুমার ইহার নিরসনকল্পে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। বর্ণবিভেদ দূর করিবার জন্য তিনি অসবর্ণ বিবাহ-প্রথার অনুমোদন করেন এবং ইহাকে আমাদের বংশোন্নতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়া নির্দেশ দেন। তাঁহার ভাষায়, 'ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরস্পর বিবাহের রীতি না থাকাতে, যে বর্ণের যে প্রকৃতি-সিদ্ধ দোষ আছে, তাহা কোন ক্রমেই নিরাকৃত হইতেছে না। কিন্তু এ দেশে ভিন্নজাতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণের প্রথা প্রচলিত না হইলে আমাদিগের বিশিষ্টরূপ বংশোন্নতি হওয়া সম্ভাবিত নহে।'৩৯ ইহা ছাড়া জাতিগত

বৈষম্যবোধ যে আমাদিগকে সর্বনাশের পথে ঠেলিয়া দিতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি এদেশে বৈজাত্য বিবাহ প্রবর্তনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, '…যদি কোন দেশে বিজাতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা নিতান্ত ব্যবহার-বিরুদ্ধ হয়, তবে তত্রত্য লোকের বিশিষ্টরূপ বংশোন্নতি হওয়া সম্ভাবিত নহে, কারণ তাহাদের যে সমুদায় মূলীভূত প্রাকৃত দোষ থাকে, তাহা আর কোনক্রমেই দূরীভূত হয় না। কোন জাতির কোন অংশে বৈলক্ষণ্য থাকিলে, তত্তৎ অংশে সুলক্ষণ-সম্পন্ন অন্য জাতির সহিত উদ্বাহসূত্রে সংযুক্ত না হইলে, তাহা নিরাকৃত হইতে পারে না। এইরূপ বৈজাত্য বিবাহের প্রথা না থাকায় আমাদের যে পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা বলিবার নহে। যত অকল্যাণের বীজ আমাদের মানস-ক্ষেত্রকে দূষিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং অন্যান্য নানা কারণ সহকারে আমাদিগকে ক্রমাগতই নির্বীর্য্য ও নিস্তেজ করিতেছে, তাহা নিঃশেষে নিষ্কাশিত হইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই।'[৪০]

অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদী মন সকলপ্রকার অযৌক্তিক কুসংস্কার হইতে মুক্ত থাকিয়া মানুষকে মানুষের সম্পূর্ণ মর্যাদা দান করিতে চাহিয়াছিল। এইজন্য একদিকে যেমন তিনি পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থায় বিচলিত হইয়াছিলেন এবং সামাজিক বৈষম্য অপনয়নের জন্য অসবর্ণ বিবাহ,আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ, আন্তঃরাজ্য বিবাহ-প্রথার প্রচলন কামনা করিয়াছিলেন, অপরদিকে আবার তেমনই সেকালের নারী-আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছিলেন। 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ-সমিতি'র সম্পাদকরূপে এই বিষয়ে তাঁহার ভূমিকা স্মরণীয়।[৪১]

দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, অক্ষয়কুমার—কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের এই তিন প্রধানের মানসিকতা ও কর্মপন্থা লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে একটি ভেদজ্ঞান-বর্জিত উদারদৃষ্টিসম্পন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। নানা কারণে তাঁহাদের এই প্রাথমিক প্রয়াস সফল হইয়া না উঠিলেও সাম্য ও মানবতার পথে ব্রাহ্মসমাজের নিশ্চিত অগ্রগতিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ব্রাহ্মসমাজে সাম্যসাধনার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে। তরুণ কেশবচন্দ্র যেদিন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন [ ১৮৫৭ ], ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেদিন সুদূর হিমালয়ের কোলে ধ্যানে নিমগ্ন। পরবৎসর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের মতো একজন প্রতিভাবান ও উৎসাহী যুবককে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত দেখিয়া পরম

আনন্দ লাভ করেন। 'একদিকে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ, অপরদিকে দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের নব উদ্দীপনা—এই উভয়ে ব্রাহ্মসমাজমধ্যে এক নব শক্তির সঞ্চার করিল; এবং ইহার পর হইতেই ব্রাহ্মসমাজ নব নব কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র ঐ সকল কার্য্যের উদ্ভাবনকর্ত্তা ও দেবেন্দ্রনাথ পৃষ্ঠপোষক হইতে লাগিলেন।'[৪২] উভয়ের মধ্যে গভীর সৌহার্দ্য দেখা দিল।[৪৩] কিন্তু 'কালস্য কুটিলা গতি'। অল্পকালের মধ্যেই কেশবচন্দ্র ও তাঁহার মতানুগামী নবীন ব্রাহ্মদের সহিত দেবেন্দ্রনাথের একপ্রকার আদর্শগত বিরোধ উপস্থিত হইল।

এই বিরোধের প্রথম কারণ, ধর্মের ক্ষেত্র ব্যতীত জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রে স্বীয় মতাদর্শের প্রতিষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথের প্রবল অনীহা। শাস্ত্রশাসনবর্জ্জিত ব্যক্তিগত প্রত্যয় ও যুক্তিবোধের উপর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন বিচারবুদ্ধির নিকট যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তাহাই একমাত্র আচরণীয়—ইহাই ছিল দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা। এই শিক্ষা বা মতবাদকে তিনি কেবল ধর্মসাধনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম তো জীবন হইতে কোনো বিচ্ছিন্ন বস্তু নহে। অতএব যে আদর্শ ধর্মসাধনে পালিত হইবে, তাহাই জীবনের সকল কর্ম ও সম্বন্ধের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। কেশবচন্দ্র-প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মগণ এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই ব্রাহ্ম মতবাদকে আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে—সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে প্রসারিত করিয়া দিতে চাহিলেন। যে সাম্যভিত্তিক ব্যক্তিস্বাধীনতাকে দেবেন্দ্রনাথ কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই স্বীকৃতি দিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্রের দল তাহাকেই জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ মূলতঃ ছিলেন ধর্মসংস্কারক, সমাজ-সংস্কার বিষয়ে তাঁহার মতবাদ ছিল অনেকটা বিবর্তনপন্থী। ব্রাহ্মগণ পরব্রহ্মের উপাসনায় হৃদয় মার্জিত ও পরিশুদ্ধ করিতে পারিলে ধীরে ধীরে সামাজিক সকল কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করিতে পারিবেন—ইহাই ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, আর এই জন্যই কোনো গুরুতর সমাজবিপ্লব ঘটাইবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুগামিগণ ধর্মকে সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত পালন করিবার উদ্দেশ্যেই সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করিতে উদগ্রীব হইলেন। কেশব-প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্গত সভা' নবীন ব্রাহ্মদের সর্বপ্রকার উন্নতিমূলক আলোচনার প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। 'সঙ্গত সভার সভ্যগণ যে

নবভাবে দীক্ষিত হইলেন তাহা এই যে, হৃদয়ের বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম হয় না।'[৪৪] নবীন ব্রাহ্মদের হৃদয়ের এই যে বিশ্বাস, যাহা কেবল যুক্তিবাদী চিন্তাধারাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা মানুষের মনুষ্যত্বে বিশ্বাস—যুক্তিহীন কুপ্রথা ও কুসংস্কারে নিপীড়িত মানবতার বন্ধনমোচনে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বলেই তাঁহারা হিন্দুসমাজের বর্ণবৈষম্য বা জাতিভেদ-প্রথার মূলে প্রবল আঘাত হানিলেন। জাতিভেদের একটি প্রধান চিহ্ন উপবীত। তরুণ ব্রাহ্মদের দলে যাঁহারা ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাঁহাদের অনেকেই উপবীত পরিত্যাগ করিয়া জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। শুধু ইহাই নহে, নবীন ব্রাহ্মগণ জাতিভেদের উচ্ছেদসাধনে ব্রতী হইয়া আরও অনেক দূর অগ্রসর হইলেন। '১৮৬৪ সাল হইতেই তাঁহারা বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধুয়া ধরিলেন যে, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ বেদীতে বসিলে তাঁহারা উপাসনাতে যোগ দিতে পারেন না।'[৪৫]

কেশবচন্দ্রের অনুবর্তী প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণ সর্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্য দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কাজেই কেবল জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না, অবহেলিত নারীসমাজের উন্নতি সাধনের জন্যও তাঁহারা দৃঢ়-সংকল্প হইলেন। 'সঙ্গতের অবলম্বিত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে নারীজাতির উন্নতিসাধনের চেষ্টা একটি প্রতিজ্ঞারূপে অবলম্বিত হয়। তদনুসারে নবীন ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় ভবনে, স্বীয় স্বীয় পত্নী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির শিক্ষাবিধানে মনোযোগী হন। অনেকে সমস্ত দিন আফিসে গুরুতর শ্রম করিয়া আসিয়া সায়ংকালে স্বীয় স্বীয় পত্নী বা ভগিনীর শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মবন্ধু সভার সংশ্রবে একটি স্ত্রীশিক্ষাবিভাগ স্থাপন করিয়া অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের নানা উপায় অবলম্বন করেন; এবং তাঁহাদের কয়েকজনে মিলিত হইয়া 'বামাবোধিনী পত্রিকা' নামে স্ত্রীপাঠ্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন।···ক্রমে নবীন ব্রাহ্মদলের মধ্যে এক অত্যগ্রসর দল দেখা দিলেন; তাঁহারা নারীজাতির উন্নতির জন্য পূর্ব্বোক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট রহিলেন না; কিন্তু আপনাপন পত্নীকে নববেশে সজ্জিত করিয়া প্রকাশ্যস্থানে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন;···।'[৪৬] ইহা ছাড়া আবার নবীন ব্রাহ্মদের চেষ্টায় স্থানে স্থানে বিধবাবিবাহেরও তোড়জোড় চলিতে লাগিল।[৪৭]

দেবেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম পরম স্নেহভাজন কেশবচন্দ্রের মুখ চাহিয়া নবীন ব্রাহ্মদের সহিত কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে সমাজ-সংস্কারের বিপ্লবী মূর্তি লক্ষ্য করিয়া আর অগ্রসর হইতে চাহিলেন না। এইখানেই নবীন ব্রাহ্মদের সহিত প্রাচীন ব্রাহ্মদের—কেশবচন্দ্রের সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ অনিবার্য হইয়া উঠিল।

বিরোধের দ্বিতীয় কারণ, দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমতের সংকীর্ণতা। ব্রাহ্মধর্মের মূল লক্ষ্য হইল সর্বজনীন ধর্মে আত্মপ্রকাশ। কিন্তু মহর্ষির প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই উন্নত সংস্করণ মাত্র। 'সমগ্র মানবজাতির উদার ধর্মকে' সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্মে রূপ দান করিয়া মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মের মূল নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, প্রাচীন শাস্ত্র-প্রামাণ্য বর্জন করিয়া কেবল ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয়ের উপর ব্রাহ্মধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে সাম্যাদর্শী মতবাদ দেবেন্দ্রনাথ প্রচার করিয়াছিলেন, কার্যতঃ তাহারও মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ব্রাহ্মসাধারণের ধর্মপালনে নির্দেশ দানের নিমিত্ত তিনি 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে একখানি গ্রন্থ সংকলন করিয়া উহাকে 'প্রামাণ্য শাস্ত্রের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন'। কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে বরণ উপলক্ষে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলিয়াছেন : 'যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার একটিমাত্র সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ সাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্যথা হইবে না।'[৪৮]

দেবেন্দ্রনাথ-কথিত এই যে অভ্রান্ত ধর্মগ্রন্থ, ইহা হিন্দুশাস্ত্র ব্যতীত অপর কোনও শাস্ত্র স্পর্শ করে নাই। কাজেই দেখা যায়, শাস্ত্র-প্রামাণ্য বর্জন করিতে চাহিলেও দেবেন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকেই ধরিয়া রহিয়াছেন, এবং ধর্মসাধনে ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয়কে মর্যাদা দানের ইচ্ছা থাকিলেও শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের উপর হিন্দু ধর্মমতই চাপাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথের 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বদা আপনার তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধনকে উচ্চতর ও বিশুদ্ধতর হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন।'[৪৯] নবীন ব্রাহ্মদের এইখানেই ঘোর আপত্তি। তাঁহারা ব্রাহ্মধর্মকে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে মুক্ত করিতে চাহিলেন। প্রাচীন ও নবীনে বিরোধ বাধিয়া গেল।

তৃতীয় অপর একটি কারণে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার নেতৃত্বাধীন নবীন ব্রাহ্মদলের সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ দেখা দেয়। দেবেন্দ্রনাথের আচরণে একটা প্রভুত্বাভিমান ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 'তিনি আপনার বিচারবুদ্ধি বা তথাকথিত

আত্মপ্রত্যয়কে যতটা প্রামাণ্য-মর্য্যাদা প্রদান করিতে লাগিলেন, অপর ব্রাহ্মদিগের বিচারবুদ্ধির প্রতি সেইরূপ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না।'[৫০] ইহা ছাড়া, ব্রাহ্মসমাজের কার্যপরিচালনায়ও দেবেন্দ্রনাথের 'অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী একাধিপত্য' ছিল। ব্রাহ্মসমাজের গৃহ ও অন্যান্য সম্পত্তির ট্রাস্টি ছিলেন তিনি। 'ট্রাস্ট'-পত্রের নির্দেশ অনুসারে সমাজে কর্মচারি-বিনিয়োগ ও অন্যান্য সকল কার্যের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। ব্যক্তিবিশেষে অর্পিত এই সর্বময় কর্তৃত্বই বিরোধের প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ইউরোপীয় সাম্যবাদ ও গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নবীন ব্রাহ্মগণ মহর্ষির এই একতন্ত্র-প্রভুত্ব বেশীদিন সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহারা শীঘ্রই ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জাগাইয়া তুলিলেন—কেশবচন্দ্র ইহাকে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলিয়া আখ্যা দিলেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, দেবেন্দ্রনাথ কোনদিনই ব্রাহ্মসাধারণের উপর অহেতুক প্রভুত্ব ফলাইতে যান নাই। স্বানুভূত ধর্মাদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার বশে তিনি যাহা বলিয়াছেন ও করিয়াছেন, তাহাকে অনেক সময় প্রভুত্ব-প্রদর্শনের মতো মনে হইলেও তাহার পিছনে তাঁহার কোনো আত্মাভিমান ছিল না—ছিল আদর্শ রক্ষার একটা সুদৃঢ় সংকল্প। কেশবচন্দ্রের দল যখন ব্রাহ্মসমাজের ব্যবস্থাপনায় গণতন্ত্রের মৌল নীতি অনুসরণের দাবি তুলিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তখন আপনার সমস্ত অধিকার 'ব্রাহ্মপ্রতিনিধি-সভা'র হাতেই ছাড়িয়া দিলেন। এমন কি ব্রাহ্ম যুবকদের সংস্কার-প্রচেষ্টার অত্যধিক বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হইলেও তিনি তাঁহাদের প্রতি কখনও অসৌজন্য প্রদর্শন করেন নাই। 'যুবকদল আত্মোন্নতির নিমিত্ত কোনও প্রস্তাব করিলেই তিনি তাহাতে যোগ দিতেন ও বিধিমতে সাহায্য করিতেন।'[৫১] কিন্তু যুবকদের সহিত তাঁহার আদর্শগত বিরোধ ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করিল। 'ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুভাবে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রচার করা তাঁহার চিরদিনের আদর্শ। তিনি মনে করিতেন রামমোহন রায় তাঁহাকে সেই ভার দিয়া গিয়াছিলেন।'[৫২] ইহার ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কায় তিনি 'ব্রাহ্মপ্রতিনিধি-সভা'র হাত হইতে সমস্ত অধিকার আবার নিজের হাতেই তুলিয়া লইলেন। নবীন ব্রাহ্মগণ দাবি তুলিলেন, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে থাকিতে পারিবেন না। দেবেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে সায় দিতে পারিলেন না।[৫৩] তিনি উপবীতধারী ব্রাহ্মণদের আচার্যপদে বহাল রাখিলেন।[৫৪] ইহার ফলে কেশবচন্দ্র-প্রমুখ প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণ প্রাচীনপন্থি-প্রভাবিত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া 'ভারতবর্ষীয়

ব্রাহ্মসমাজ' নামে এক নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন [ ১১ই নভেম্বর, ১৮৬৬ ]। এই সময় হইতে দেবেন্দ্রনাথের সমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হইতে লাগিল।

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্মকে বিশ্বজনীন রূপ দান করিল এবং ধর্মমন্দিরের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাঙলার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সাম্য ও মানবতার বহ্ন্যুৎসব ঘটাইতে প্রবৃত্ত হইল। মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায়, "It [Brahmo Samaj of India] was not merely a congregation of worshippers of the 'One God without a Second', but a new community that tried to organise in its domestic and social life and relations the fundamental principles of liberty, equality and fraternity, joined to the ideal of universal humanity"[৫৫]

ব্রাহ্মধর্মের বিশ্বজননী রূপটি পরিস্ফুট করিবার জন্য নবগঠিত এই সমাজ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিল :

'সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥'[৫৬]

অর্থাৎ, সুবিশাল এই বিশ্বই ব্রহ্মের পবিত্র মন্দির, পরিশুদ্ধ হৃদয়ই একমাত্র তীর্থ, সত্যই শাশ্বত শাস্ত্র, বিশ্বাসই ধর্মের মূল, প্রীতিই পরম সাধ্যবস্তু, স্বার্থত্যাগই প্রকৃত বৈরাগ্য—ব্রাহ্মগণ এইরূপই ঘোষণা করিয়া থাকেন।

ইহা ছাড়া, ব্রাহ্মধর্ম যে প্রচলিত সকল ধর্মকেই সম-মর্যাদা দান করে, তাহার প্রমাণস্বরূপ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে 'শ্লোকসংগ্রহ' নামে একটি সর্বশাস্ত্রীয় সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মপুস্তক হইতে অধ্যাত্মশিক্ষামূলক বিভিন্ন বাণী সন্নিবেশিত হইল। দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ ছিল কেবল হিন্দুশাস্ত্রভিত্তিক, 'শ্লোকসংগ্রহ' তাহার বদলে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের উদার পন্থা প্রদর্শন করিল। নূতন ব্রাহ্মসমাজের ধর্মাদর্শে একদেশদর্শিতার পরিবর্তে সমদর্শিতা স্থান করিয়া লইল—ব্রাহ্মধর্মের বিশ্বজনীন রূপ ফুটিয়া উঠিল।

নারী-পুরুষ ও জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষকেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে

সমান অধিকার দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। ১৮৬৮ সালের প্রথম দিকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নূতন উপাসনা-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে প্রথম নগরকীর্তনে বাহির হইয়া কেশবচন্দ্র-প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মগণ ঘোষণা করিলেন :

'নর নারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতবিচার।'[৫৭]

নরনারীর অধিকারসাম্য স্থাপনের চেষ্টা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রথম হইতেই শুরু হইয়া গিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে মহিলাদের যাইবার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। কেশবচন্দ্র তাঁহার ব্রাহ্ম-উপাসনামন্দিরের এক ধারে পরদার আড়ালে মহিলাদের বসিবার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজে পুরুষের সহিত নারীর একত্র উপাসনায় যোগদানের রীতি এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। ইহা ছাড়া, পুরুষের ন্যায় নারীগণও যাহাতে নানা বিষয়ে উচ্চাদর্শ লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' নামে একটি নারী-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।[৫৮] এই সঙ্গে 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা' নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া তিনি অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করেন! তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'বামাবোধিনী পত্রিকা'[৫৯] ও 'পরিচারিকা' বাঙালী নারীর জ্ঞানান্বেষণের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। বস্তুতঃ বাঙলার নারী-জাগরণ-আন্দোলনে যাঁহারা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম; এবং কেশবচন্দ্রের এই নারীজাগরণের আন্দোলন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতি চলিতেছিল। এই সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর প্রগতিশীল ব্রাহ্মদল জাতিভেদের উচ্ছেদকল্পে প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিলেন। উপবীত-পরিত্যাগ, অসবর্ণ বিবাহ, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের একত্রে পানাহার প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যুগপ্রাচীন জাতিভেদ-প্রথাকে চূড়ান্তভাবে আঘাত করা হইতে লাগিল। মানুষকে কেবল মানুষ বলিয়া বিচার করাই এই আন্দোলনের মূল প্রেরণা হইয়া দাঁড়াইল।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এই যে জাতিভেদ-বিরোধী মনোভাব, ইহাতে সাম্যবাদেরই মূল নীতির অনুস্যুতি লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বরসৃষ্ট সকল মানুষই যে সমান মর্যাদা লাভের অধিকারী—মানুষে মানুষে যে কোনো ভেদ নাই, ইহাকে কেবল মুখের কথায় না রাখিয়া নবগঠিত ব্রাহ্মসমাজ ধর্মের পাদপীঠে দাঁড়াইয়া

কার্যতঃ ইহার অনুশীলন করিয়া দেখাইল। 'It [Brahmo Samaj of India] repudiated the law of caste, thereby not only proclaiming the equality of all humans, but seeking to build up a society where this equality will be established upon a religious basis.'[৬০]

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এই জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলনের মূল প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্র মনে করিতেন, প্রাচীনকালে কেবল কতকগুলি বৃত্তি ও কর্ম অনুসারে জাতিভেদ-প্রথা পরিকল্পিত হইয়াছিল; পরে এই প্রথা ধর্মীয় অনুমোদন লাভ করিয়া হিন্দুধর্মের পবিত্র ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।[৬১] তাঁহার বহু বক্তৃতায় তিনি জাতিভেদ-প্রথার অনিষ্ট-কারিতার কথা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—বামুন-শূদ্র, বৃহৎ-ক্ষুদ্রের কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লুটাইয়া দিয়া সকল মানুষকেই ভাই বলিয়া গ্রহণ করিবার উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন। শুধু হিন্দু নয়, শুধু ভারতবর্ষীয় নয়, বিদেশী ও বিধর্মীকেও ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করাকে তিনি ধর্মসাধনেব অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার একটি সুস্পষ্ট উক্তি স্মরণযোগ্য: 'To believe in the Fatherhood of God is to believe in the brotherhood of man; and whoever, therefore in his own heart and in his own house worships the true God daily must learn to recognise all his fellow-countrymen as brethren. Caste would vanish in such a state of society. If I believe that my God is one, and that he has created us all, I must at the same time instinctively, and with all the warmth of natural feelings, look upon all around me—whether Parsees, Hindus, Mohammedans, or Europeans—as my brethern.'[৬২]

সেকালের ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের মধ্যে অনেকেই দেশীয় লোকদের বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। মানবদরদী কেশবচন্দ্র ইহাতে হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিতেন। 'Jesus Christ: Europe and Asia'-বিষয়ক তাঁহার সুবিখ্যাত বক্তৃতায়[৬৩] এই বৈষম্যকে তিনি তীব্র ভাষায় ধিক্কৃত করিয়াছেন। ইউরোপীয়দের ও দেশীয় লোকদের পারস্পরিক মনোভাবের বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন: 'Among the European community

in India there is a class who not only hate the Natives with their whole heart, but seem to take a pleasure in doing so. ···They liken a Native to a fox—wily, fraudulent, and mean —full of sinister motives, deceit and cunning. He is born and bred a fox, and is destined to live and die a fox ! ···Many Natives, on the other hand, liken the European to a wolf—vindictive, wrathful, ferocious, and bloodthirsty. He is born and bred a wolf, and is destined to live and die a wolf.'[৬৪]

ইহার পরে ভাষণশেষে এই বৈষম্যবোধ ও বৈরিভাবের অবসান কামনায় কেশবচন্দ্রের রুদ্ধ আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে : 'Oh ! for the day when race-antagonism shall perish, and strife, discord, and all manner of unbrotherly feeling shall for ever pass away, and harmony shall prevail among us all ! May England and India, Europe and Asia, be indissolubly united in charity and love, and self-denying devotion to truth !'[৬৫] মানবপ্রীতির কী উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি !

ভাবিতে বিস্ময় লাগে, আজ আমরা যাহারা সাম্যবাদের ধ্বজা উড়াইয়া দরিদ্র কৃষক-মজুরদের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া 'ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ' রবে গগন বিদীর্ণ করিতেছি, তাহাদের একশত বৎসর পূর্বে বাঙলার এক মানবপ্রেমিক ধর্মপ্রাণ আচার্যের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল রুদ্ধক্ষোভ 'ছোটলোক'দের প্রতি বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ বাণী। দেশের 'রেওত ও কারিগর'—যাহারা চিরকাল ছোটলোক বলিয়া অবজ্ঞাত, তাহাদের লক্ষ্য করিয়া কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন : 'তোমরা আর নিদ্রা যাইও না। সময় হইয়াছে, উঠ। দেখ তোমাদের হইয়া বলে এমন লোক কেহ নাই। রাজপুরুষেরা তোমাদের কথা শুনিতে পান না, বড় মানুষেরা তোমাদিগকে গ্রাহ্য করে না। এরূপ অপমান কি তোমরা চিরকাল সহ্য করিবে ? তোমরা কি মানুষ নও, পরমেশ্বর কি তোমাদিগকে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া সৃষ্টি করেন নাই ? তবে কেন অজ্ঞান নিদ্রায় পড়িয়া আছ ? তোমরাই এদেশের বড় লোক, তোমরা না থাকিলে দেশ ছারখার হইবে, তাহা কি জান না ? অতএব যত্ন কর, চেষ্টা কর, পরিশ্রম কর, জ্ঞান বিদ্যা লাভ কর। তাহার পর যখন আপনাদের অধিকার আপনারা বুঝিবে, আপনাদের কার্য্য আপনারা করিবে, তখন

রাজপুরুষেরা তোমাদের কথা শুনিতে বাধ্য হইবেন, এবং অত্যাচারী বড় মানুষেরা তোমাদের বিক্রম দেখিয়া ভয় পাইবেন, এবং অবশেষে তোমাদিগকে সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।'[৬৬] কেশবচন্দ্রের এই উক্তি আজিকার দিনেও অপ্রয়োজনীয় বোধ হইবে না।

যুক্তিবোধ, মনস্বিতা, মানবপ্রেম ও সর্বোপরি অসাধারণ বাগ্মি-প্রতিভার জন্য কেশবচন্দ্র সেকালে তরুণ ব্রাহ্মদলের অবিসম্বাদী নেতারূপে গণ্য হইয়াছিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন না, তাঁহাদেরও অনেকে কেশবচন্দ্রের সংস্কারমুক্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো। কেশবচন্দ্রের জীবনে শেষরক্ষা হইল না। তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্তমণ্ডলীর অনেকের নিকট তিনি ক্রমে ক্রমে অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। পরিণত বয়সে অনেকটা ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবন লইয়া তাঁহাকে দিন কাটাইতে হইল। তাঁহার এই ভাগ্য-বিড়ম্বনার কারণ একাধিক।

কেশবচন্দ্রের আধুনিকতার অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় একধরনের প্রকৃতিনিহিত রক্ষণশীলতা ছিল। এইজন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে তিনি যে আধুনিকতার আলাতচক্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যখন বিধি-নিষেধ না মানিয়া ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তখন তিনি ভয়ে পিছাইয়া আসিলেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় পুরুষের সহিত মহিলারাও যাহাতে সমভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি ব্রাহ্মমন্দিরে তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু উপাসনার সময় তাঁহাদিগকে পরদার আড়ালে বসিতে হইত। কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা পরদাবিহীন অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতার দাবি তুলিলেন। দুর্গামোহন দাস-প্রমুখ অতি-প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের পত্নীকন্যাদের লইয়া পুরুষ-উপাসকদের মধ্যে আসিয়া বসিতে লাগিলেন। অনেকেরই তাহা অত্যন্ত বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের প্রবল আপত্তির ফলে সমাজ ভাঙিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। কেশবচন্দ্র সমাজের সংহতি রক্ষার জন্য উপস্থিতমত একটা ব্যবস্থা করিলেন—মন্দিরের একটি কোণে রেলিং-দেওয়া জায়গায় অগ্রসর দলের মহিলাদের বসিবার স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। ইহাতে স্ত্রী-স্বাধীনতা-পক্ষীয়েরা কিছুদিনের জন্য নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু এই ব্যবস্থাও তাঁহাদের মনঃপূত হইল না। নারী-পুরুষের মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্য রাখিতে তাঁহারা নারাজ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার ইংরাজ-

রমণীদের অনুকরণে ব্রাহ্মমহিলাদিগকে অবাধে পুরুষের সহিত মেলামেশা করিতে ও কথাবার্তা বলিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র কিন্তু তখনই অতদূর অগ্রসর হইতে রাজী হইলেন না।[৬৭] নারী-প্রগতির ক্ষেত্রে তাঁহার এই মন্থর গতির জন্য তিনি উৎসাহী ব্রাহ্মগণের নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার যে আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছিল, কেশবচন্দ্রই ছিলেন তাহার প্রধান উদ্যোক্তা। অতএব স্পষ্টতঃই আশা করা গিয়াছিল যে, কেশবচন্দ্রের নবস্থাপিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য-পরিচালনায় প্রথম হইতেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রাহ্ম-গণের 'প্রতিনিধি সভা'র প্রকাশ্য অধিবেশনেও [ তৃতীয় অধিবেশন—রবিবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৭৮৬ শক ] কেশবচন্দ্রের রচিত এইরূপ প্রস্তাবই গৃহীত হয়: 'যেহেতু কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্ট সম্পত্তির ট্রষ্টীগণ তাঁহাদিগের নিজ হস্তে উক্ত সম্পত্তির কার্য্যনির্ব্বাহভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মসাধারণকে তাহার শাসন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব এই সভার মতে ইহা একান্ত অভিলষণীয় যে, সমাজের দাতা ও সভ্যগণ সমবেত হন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ যে দান প্রদত্ত হয় তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে ব্যয় হইবার জন্য নিয়ম এবং সভার সহব্যবস্থান স্থির করেন।'[৬৮]

কিন্তু কার্যতঃ এই প্রস্তাবের মর্যাদা রক্ষিত হইল না। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যেমন একাধিপত্য ছিল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও তেমনই কেশবচন্দ্রের একতন্ত্র প্রভুত্ব চলিতে লাগিল—সাম্যমূলক গণতান্ত্রিক আদর্শ কেবল অতীতের স্বপ্ন হইয়াই রহিল। স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মদের মন ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে আর তাঁহারা তেমন আস্থা রাখিতে পারিলেন না।

কেশবচন্দ্রের এই একতন্ত্রতার পরিপুষ্টি সাধন করিল তাঁহার প্রচারিত 'প্রেরিত মহাপুরুষবাদ'। 'মহাপুরুষ' বা 'Great Men' বিষয়ে বক্তৃতাদান-প্রসঙ্গে [৬৯] তিনি ঘোষণা করিলেন: 'Great men are sent by God into the world to benefit mankind. They are His apostles and missionaries, who bring to us glad tidings from heaven; and in order that they may effectually accomplish their errand, they are endowed by Him with requisite power and talents. They are created with a nature superior to that of others,

which is at once the testimonial of their apostleship and the guarantee of their success. They are not made great by culture or experience : they are born great."[৭০]

বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য—ইঁহারা সকলেই এক একজন 'ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ'। অনেকের ধারণা হইল, কেশবচন্দ্র নিজেকেও এইরূপ 'ঈশ্বরপ্রেরিত' বলিয়া মনে করেন। তাঁহার প্রচারকদল প্রকাশ্যভাবেই তাঁহাকে 'প্রেরিত মহাপুরুষ' বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।[৭১]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী সাম্যাদর্শী ব্রাহ্মগণ দেখিলেন, ব্রাহ্মসমাজে চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করিবার একটি চমৎকার আয়োজন চলিতেছে—কেশবচন্দ্র নিজেকে মহাপুরুষ সাজাইয়া অপর ব্রাহ্মগণকে তাঁহার অধীনে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।[৭২] যে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিস্বরূপ, তাহার অন্যথাচরণ হইতেছে মনে করিয়া অনেকেই কেশবচন্দ্রের উপর বিরক্ত হইয়া রহিলেন।

এই অবস্থায় বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো আসিয়া পড়িল কোচবিহার বিবাহের ঘটনা। কোচবিহারের তরুণ রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের সহিত কেশব-চন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর পরিণয় ঘটে।[৭৩] কোচবিহারের রাজপরিবার পৌত্তলিক-হিন্দুমতাবলম্বী বলিয়া কেশবচন্দ্রের প্রথমে এই বিবাহে ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্র-পরিচালিত জাতীয়তামুখী ব্রাহ্ম-আন্দোলন খর্ব করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজ সরকার ইহাতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন।[৭৪] সরকার পক্ষ হইতে কেশবচন্দ্রের নিকট এই বিষয়ে বার বার অনুরোধ আসিতে থাকে।[৭৫] তাঁহাকে এইরূপ আশ্বাস দেওয়া হয় যে, বিবাহের সময় কোনো পৌত্তলিক অনুষ্ঠান পালিত হইবে না। কিন্তু ধূর্ত ইংরাজ সরকারের এই আশ্বাস যে নিতান্ত অর্থহীন, সরলচিত্ত কেশবচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি শেষ পর্যন্ত বিবাহব্যাপারে সম্মতি দান করিয়া বসিলেন। বিবাহকালে দেখা গেল, প্রকৃতপক্ষে পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া গেল।[৭৬] ইহাতে ব্রাহ্মমতাবলম্বী সকলের মনেই গভীর আঘাত লাগিল। ব্রাহ্মধর্মের মূল নীতিই পৌত্তলিকতা-বিরোধী এবং এই ধর্ম হিন্দুধর্মের প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী নহে। কেশবচন্দ্র আচার্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কতবার এই বিষয়ে কত উপদেশ দিয়াছেন। ইহা ছাড়া, প্রধানতঃ কেশবচন্দ্রেরই প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মবিবাহের জন্য বিশেষ বিধি [ ১৮৭২ সালের তিন আইন ] প্রবর্তিত হয়।[৭৭] অথচ সেই

কেশবচন্দ্রই কিনা তাঁহার পারিবারিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মসমাজের রীতিনীতি ও আদর্শকে লঙ্ঘন করিয়া বসিলেন! কেশবচন্দ্রের আচরণে এই স্ববিরোধ লক্ষ্য করিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রমুখ বহু ব্রাহ্মই প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা অনেক চিন্তা করিয়া, অনেক পরামর্শের পর আদর্শ রক্ষার নিমিত্ত কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে এক নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন [১৫ই মে, ১৮৭৮]। হৃতগৌরব কেশবচন্দ্র ইহার পর 'নববিধান' সমাজ গঠন করিয়া জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির পথে অগ্রসর হইলেন। প্রথম জীবনে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের ভিতর দিয়া সাম্যাদর্শ প্রচার করিবার জন্য তাঁহার যে বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হইয়াছিল, জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া তাহাই ভাগবতী দীনতার পুণ্যস্পর্শে বাষ্পসিক্ত হইয়া উঠিল। কণ্ঠে তখন সাম্যসাধনার এক অভিনব সুর লাগিয়াছে: 'ভক্ত যিনি, তিনি নবাবকে প্রেমালিঙ্গন দেন, সামান্য চণ্ডালকেও প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করেন। প্রেমিক নরপতির কাছে যেমন, দুঃখীর কাছেও তেমনিই। তাঁর কাছে ধনী, ধনী নয়; দরিদ্রও দরিদ্র নয়; মনুষ্য হইলেই তিনি প্রেম দেন।'[৭৮]

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়ই একটা বিরাট প্রতিশ্রুতি লইয়া ব্রাহ্ম-সমাজের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি পালন না করিয়া ভিন্নপথে পরিক্রমা করিলেন। যে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর তাঁহারা তাঁহাদের ধর্মসিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত তাহা ধরিয়া থাকিতে পারেন নাই। ঈশ্বরভক্তির প্রবল স্রোত আসিয়া ক্রমে তাঁহাদিগকে এমন একটি আবর্তের মধ্যে টানিয়া লইল, যাহা সাধারণের পক্ষে নিতান্তই দুরবগাহ। 'মানুষের প্রাকৃত-বিচার-বুদ্ধির' ঊর্ধ্বে যে অমৃতসত্তা, তাহারই সাধনায় নিমগ্ন হইয়া মহর্ষি ক্রমে ক্রমে সাধারণের নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধননিষ্ঠা ও ঈশ্বরপ্রাণতা তাঁহাকে ঘিরিয়া এমন একটি ধর্মীয় আভিজাত্য সৃষ্টি করিয়াছিল যে, তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পূর্বপ্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সাধারণের সহিত বেশীদিন একযোগে পা মিলাইয়া চলা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য। যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর ভিত্তি করিয়া কেশবচন্দ্র সাম্য-সাধনার পথে বেশ কয়েক পা অগ্রসর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি-নিহিত ভক্তির প্রাবল্যে পরিশেষে সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করিয়া কেবল ভক্তি-পথাশ্রয়ী হইয়া পড়িলেন। জীবনের অপরাহ্নবেলায় তাঁহার কণ্ঠে ভক্তিতত্ত্ব

সোচ্চার হইয়া উঠিল : "আহা ! মা ! ভক্তিতে মাতিলাম। খুব মাতাও ; ভারত মাতিবে, পৃথিবী মাতিবে। ভক্তিতে দেশ টল্‌মল্ করিতেছে দেখিয়া মরিব। পৌত্তলিকতা যাইতেছে কি ব্রহ্মজ্ঞানী দল বাড়িতেছে, এ দেখিয়া তত সুখ হয় না। 'ঐ মাকে ডাকছে'—এই কথা শুনিলে বড় সুখ হয়। আশা হয়, মাকে ডাকিয়া নবনৃত্যে সকলে যোগ দিব। ···একটী জননী তুমি মাঝখানে দাঁড়াও। সমস্ত ভারত তোমার চারিদিকে নাচুক। দয়াসিন্ধু, যেন আমরা প্রগল্‌ভা ভক্তিতে নাচিয়া নাচিয়া প্রমত্ত হই ; অনাথনাথ, একবার দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।"[৭৯]

ভক্তিরসের কূলপ্লাবিনী ধারায় অভিষিক্ত হইবার পূর্বে আদি ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথ যাহার আভাস দিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র যাহাকে কতকটা পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই যুক্তিনির্ভর সাম্যবাদের আদর্শটি পরিপূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করিল শিবনাথ শাস্ত্রী-পরিপোষিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে। 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' এই নামটির মধ্যেই সকলের সমানাধিকারের সুরটি ধ্বনিত হইতেছে। এই নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী বলিতেছেন : 'আমরা যখন স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করি, তখন আমাদের মনে দুইটি ভাব প্রবল ছিল। প্রথম, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে একনায়কত্ব দেখিয়াছি, কেশববাবু সর্বেসর্বা, এখানে তাহা হইবে না, এখানে সাধারণতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য হইবে। দ্বিতীয়, কেশববাবু ব্রাহ্মগণের ও ব্রাহ্মসমাজ সকলের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে তাহা হইবে না, এখানে সভ্যগণের ও সমাজ সকলের মত গ্রহণ করিয়া কার্য হইবে। আমাদের মনে এই দুইটি প্রধান ভাব ছিল···।

'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নামটা যে কেমন করিয়া উঠিল, ঠিক মনে নাই। যত দূর স্মরণ হয়, আমাদের প্রধান ভাবের দ্যোতক বলিয়া, আমাদের উৎসাহী বন্ধু পরলোকগত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই নামটার উল্লেখ করিয়াছিলেন।'[৮০] এই নামটি সম্বন্ধে মহর্ষির অভিমত চাওয়া হইলে তিনি ইহার প্রতি তাঁহার সানন্দ সমর্থন জানাইয়াছিলেন। 'এই নামের প্রভাবে, যাঁহারা ইহার সভ্য হইলেন, তাঁহাদের মনে নিরন্তর এই কথা জাগিতে লাগিল যে, ব্যক্তিগত প্রাধান্যে বাধা দেওয়াই এ সমাজের প্রধান কাজ।'[৮১]

বস্তুতঃ ব্যক্তিগত প্রাধান্যে বাধা দেওয়ার কাজ শুরু হইয়া গিয়াছিল আদি

ব্রাহ্মসমাজেই। মহর্ষির প্রাধান্য-বিস্তারে ক্ষুব্ধ হইয়াই কেশবচন্দ্র তাঁহার নবীন ব্রাহ্মদল লইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিয়াছিলেন। আবার এই নূতন সমাজে যখন কালক্রমে কেশবচন্দ্র প্রধান হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারও বিরোধিতা করা হইল। কেশবচন্দ্রের একনায়কত্বের প্রতিরোধকল্পে শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রমুখ প্রাগ্রসর ব্রাহ্মগণ সম্মিলিত হইয়া 'সমদর্শী' [ Or The Liberal] নামে দ্বিভাষী একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন [ নভেম্বর, ১৮৭৪ ]। এই পত্রিকায় সাম্যনির্ভর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথাটি বিশেষভাবে ঘোষিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে কেশবচন্দ্র-প্রচারিত একতন্ত্রাভিমুখী মহাপুরুষবাদ ও আদেশবাদের তীব্র সমালোচনাও পত্রিকাটিতে স্থান লাভ করিয়াছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের ফলেই আসে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা। ধর্মচর্যায়ও চিন্তার স্বাধীনতা প্রয়োজন। ধর্মের ক্ষেত্রে চিন্তাবিহীন গতানুগতিকতা যে প্রকৃত ধর্মভাবের পরিপন্থী, তাহা নির্দেশ করিয়া সমদর্শীর 'সাম্প্রদায়িকতা'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিতেছেন: 'মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অপরাপর প্রবৃত্তির ন্যায় মনুষ্য-হৃদয়ের একটী স্বাভাবিক বৃত্তি মাত্র। অন্যান্য বৃত্তিদিগকে নিয়মিত করিবার জন্য যেমন বিবেক ও চিন্তা প্রভৃতির প্রয়োজন, এ বৃত্তিকেও নিয়মিত করিবার জন্য সেইরূপ বিবেক ও চিন্তা প্রভৃতির প্রয়োজন। চিন্তাবিহীন স্নেহ যেমন পক্ষপাতের আকার ধারণ করে; চিন্তাবিহীন দাম্পত্য প্রণয় যেমন ঈর্ষ্যা ও হিংসারূপে পরিণত হয়; কিম্বা চিন্তাবিহীন দয়া যেমন পাপের প্রশ্রয়ের কারণ হয়; সেইরূপ চিন্তাবিহীন ধর্ম্মভাবও সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতা প্রসব করে। অতএব সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতা নিবারণের কথা মনে হইলেই চিন্তাশীলতার কথা স্মরণ হয়। স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ব্যতিরেকে মনুষ্যের ভ্রম ও সংকীর্ণতা দূর হওয়া দূরে থাকুক কোন প্রকার স্থায়ী উন্নতি হওয়া অসম্ভব।'[৮২]

'ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মণ'-শীর্ষক অপর একটি রচনায় কেশবচন্দ্রের মহাপুরুষবাদ ধিক্কৃত: 'কি অশুভক্ষণে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, মহাপুরুষ বিষয়ক মত ঘোষণা করিলেন। সেই দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজে সাধারণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ হইয়াছে। তিনি প্রচার করিয়াছেন যে সাধারণ মনুষ্য, ঈশ্বরের সাধারণ সন্তান, কিন্তু মহাপুরুষেরা তাঁহার বিশেষ সন্তান, তাঁহারা ঈশ্বরের অবতারস্বরূপ, তাঁহারা ঈশ্বরতুল্য মনুষ্য। এই মত কয়েক বৎসর চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল এবং ইহা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে গৃহবিচ্ছেদ সংঘটিত হইল। অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে এই

ভ্রমাত্মক মত ব্রাহ্মসমাজের অনেক অকল্যাণ সাধন করিবে, সে আশঙ্কা যে অমূলক নহে তাহা এখন দৃষ্ট হইতেছে।' ['সমদর্শী' ( ১২৮১ : মাঘ ) পৃ. ১২১ ]

কেশবচন্দ্র তাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের আদেশ লাভের কথা বলিতেন এবং সেই আদেশ-প্রাপ্ত সত্যকে অনুসরণ করিবার জন্য অপরাপর সাধারণ ব্রাহ্মদের উপদেশ দিতেন। 'সমদর্শী'র পৃষ্ঠায় শিবনাথ ব্যক্তিবিশেষের এইরূপ ঈশ্বরাদেশ লাভের একচেটিয়া দাবিকে উপেক্ষা করিয়াছেন : 'সত্য ন্যায় প্রেম ও পবিত্রতা উপার্জ্জন করা এবং ঈশ্বরের শুভ অভিপ্রায় লাভ করা একই কথা। পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানের ঐশী শক্তি মানুষের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়; এবং বলপূর্ব্বক তাঁহার অভিপ্রেত পথে সেই জীবকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। ইহাকে যদি আদেশ বলিতে হয় বল, বিশেষ বিধান বলিতে হয় বল, ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলিতে হয় বল। আমি নামের জন্য বিবাদ করি না। কিন্তু ঈশ্বর কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ দলকে বাছিয়া বাহির করেন, এবং তাঁহাদের মধ্য দিয়াই তাঁহার শুভাশুভাভিপ্রায় প্রকাশ ও প্রচার করেন এবং সেই পথে না আসিলে ঈশ্বরের শুভ অভিপ্রায় পাওয়া যায় না, এ সকল কথা আমি বুঝিতে পারি না এবং কেবল তাহা নহে এসকল মতকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ ও ভাবী অমঙ্গলের হেতু বলিয়া মনে করি। কেহ যদি এজন্য বিরক্ত হন কি করিব।

'মনুষ্য যে ঈশ্বরানুপ্রাণিত [Inspired] হয় তাহা আমি সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি; কিন্তু কেবল খ্রীষ্ট মহম্মদ চৈতন্য প্রভৃতি ভূতকালের সাধুগণ অথবা লুথার পার্কার কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বর্ত্তমান কালের মহাপুরুষগণ সেই শ্রেণী গণ্য তাহা মনে করি না। সময় বিশেষে আমিও অনুপ্রাণিত হই, তুমিও হও। আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি করিতে পারিলে আমি আরও অনুপ্রাণিত হইব, তুমিও হইবে। এ নিয়ম সকলের পক্ষে। তিনি কোন বিশেষভাবে তাঁহার ইচ্ছা অবগত করান এবং অপর সাধারণকে বঞ্চিত করেন, এরূপ নহে। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের যদি কোনপ্রকার চাবি থাকে সে চাবি কেবল পিটারের নিকট নাই, আমাদের প্রত্যেকেরই হস্তে তাহার এক একটী চাবি আছে।'[৮৩]

ইহা ছাড়া, 'কেশবচন্দ্রের আদেশ ঈশ্বরের আদেশ কিনা' তাহা লইয়া কেশবচন্দ্রের সহিত শিবনাথের প্রায়ই তর্ক উপস্থিত হইত। এই বিষয়ে শিবনাথের নিজের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। শিবনাথ বলিতেছেন : 'আমি কেশববাবুর কোনো কোনো মত লইয়া সর্বদা তর্ক উপস্থিত করিতাম। এই

তর্ক অনেক সময়েই কেশববাবুর সাক্ষাতে হইত। তন্মধ্যে আদশের মত লইয়া বড় তর্ক হইত। কেশববাবু তাঁহার সমুদয় কার্য যেরূপ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া উপস্থিত করিতেন, এবং সকলকে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে বলিয়া উপদেশ দিতেন, তাহাতে আমার মনে ভয় হইত যে, তাঁহার সঙ্গের লোকের চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট হইবে। হয় তাঁহার আদেশ ফর্জ করিতে হইবে, নতুবা নিজের হাত পা বাঁধিয়া তাঁহার হাতে আপনাকে দিতে হইবে। আমি কেশববাবুকে বলিতাম, 'আপনি আদেশ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, সেইভাবে কাজ করিয়া যান। আমরা আদেশ বলিয়া লইতেছি কি না, দেখিবেন না।' তিনি আমার কথার প্রতি কর্ণপাত করিতেন না। ইহা লইয়া তাঁহার সঙ্গে মুখে ও চিঠিপত্রে তর্ক হইত।"[৮৪]

ব্রাহ্মসমাজের ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ভিত্তি করিয়া নিয়মতন্ত্র-প্রণালী গঠনের দাবি বহুকাল পূর্বেই উঠিয়াছিল। কেশবচন্দ্র প্রথম প্রথম এইদিকে একটু ঝুঁকিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কার্যতঃ ইহাকে রূপদান করিতে চেষ্টা করেন নাই। ইহাতে প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণ বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিয়া তাঁহারা সেই ক্ষোভ নিবারণ করিলেন। এই সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রথমেই সাম্যভিত্তিক নিয়মতন্ত্র-প্রণালী রচিত হইল। আনন্দমোহন বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া নবগঠিত সমাজের মধ্যে অধিকারসাম্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া একটি ন্যাসপত্র [ Trust-Deed ] প্রস্তুত করিলেন। ইহার ফলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উচ্চনীচ-নির্বিশেষে প্রত্যেক সভ্যেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হইল, এবং প্রতিটি কার্যই 'সমাজের সমুদয় সদস্যগণের মতানুসারে' চলিতে লাগিল। আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত হইত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সকল বিষয় নির্ধারিত হইত কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত ভাব-চিন্তা অনুসারে, আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনভার ন্যস্ত হইল এই সমাজের অন্তর্গত সকল সভ্যেরই উপর সমভাবে।[৮৫]

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনায় এইরূপ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনের পশ্চাতে আরও একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্যটি মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায় স্মর্তব্য : 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা কালে তাহার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার সময়ে আমরা কেবল ব্রাহ্মসমাজের কথা ভাবি নাই, কিন্তু ভারতের

ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের ছবিটাই আমাদের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল।···সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিধি-প্রণয়নের মধ্যে আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের কনষ্টিটিউসনের একটা ছোটখাট নমুনা দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, এই ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মেরা গণতন্ত্রতা মক্স করিবেন। দেশের লোকেও ব্রাহ্মসমাজের কার্যপ্রণালীর ভিতর এই গণতন্ত্রতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন।'[৮৬]

ব্রাহ্মসমাজের এই উদ্দেশ্যটি প্রত্যক্ষতঃ সফল না হইলেও ইহার একটা প্রেরণাগত মূল্য রহিয়া গিয়াছে। এদেশে আজ যে গণতান্ত্রিক চেতনা লক্ষিত হইতেছে, তাহার প্রেরণামূলে যে-সকল কারণ রহিয়াছে, ব্রাহ্ম-আন্দোলনও তাহাদের একটি।

গণতন্ত্রভিত্তিক এই ব্রাহ্ম-আন্দোলন একদিকে যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতার জয় ঘোষণা করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনই গণতন্ত্রেরই সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত নারী ও পুরুষের বৈষম্য ঘুচাইতে সচেষ্ট হইল। এদেশে মূলতঃ রামমোহনের সময় হইতেই নারীমুক্তি-আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাতে প্রবল গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছিলেন। আর কেশবচন্দ্র তাঁহার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে সেই গতিকে অনুসরণ করিয়াই নরনারীর সমান অধিকার স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি পালনে কেশবচন্দ্র বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনায় পুরুষের সহিত নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হইলেও সে অধিকার চিরচলিত অবরোধপ্রথায় অবরুদ্ধ হইয়া রহিল। স্ত্রীস্বাধীনতাপক্ষীয়দের আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত এই অবরোধ ঘুচিয়া গেলেও ইহা লইয়া তাঁহাদের সহিত কেশবচন্দ্রের মতভেদ রহিয়াই গেল। বস্তুতঃ কেশবচন্দ্র নারীজাগরণের পক্ষপাতী হইলেও অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতায় কোনদিনই সায় দিতে পারেন নাই। আবার স্ত্রী-স্বাধীনতার ন্যায় স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীকে অতিক্রম করিতে চাহেন নাই।[৮৭] কিন্তু প্রগতিবাদী ব্রাহ্মগণ—যাঁহারা পরে কেশবচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সামাজিক কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া নারীকে তাহার স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহারা যেমন সম্পূর্ণ স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, তেমনই শিক্ষাবিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে কোনরূপ ভেদ থাকা বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়া মনে করিতেন।

সমাজসংস্কারকামী এই উৎসাহী ব্রাহ্মদের মধ্যে 'অবলাবান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তৎকালে কুলীনসমাজে প্রচলিত কন্যাহত্যার প্রতিবাদকল্পে দ্বারকানাথ 'অবলাবান্ধব' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন [১৮৬৯],[৮৮] এবং পরে ভারতীয় নারীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে এই পত্রিকায় তাঁহার বিভিন্ন রচনা বাহির হইতে থাকে। দ্বারকানাথ ছিলেন ঢাকার লোক, কিন্তু তাঁহার 'অবলাবান্ধব' তাঁহাকে অচিরেই কলিকাতার প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের দলে শ্রদ্ধার আসন দান করিল। অবশেষে কলিকাতাবাসী ব্রাহ্মবন্ধুদের অনুরোধে ১৮৭০ সালের বর্ষাকালে দ্বারকানাথ তাঁহার 'অবলাবান্ধব' লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। 'ক্রমে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই এক অবলাবান্ধব নারীহিতৈষী দল দেখা দিল। ব্রাহ্মসমাজের অপরাপর আলোচনা ও আন্দোলনের মধ্যে নারীগণের শিক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনা ও আন্দোলন চলিল।'[৮৯] দ্বারকানাথকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মসমাজে 'স্ত্রী-স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হইল'।

দ্বারকানাথের মতই স্ত্রী-স্বাধীনতার অপর একজন উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন বরিশালের দুর্গামোহন দাস। তাঁহারই প্রচেষ্টায় বরিশালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ হইয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের নির্ধারিত 'প্রোগ্রাম' অনুসারে সমাজ-সংস্কারে হাত দিয়া দুর্গামোহন বরিশালে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য প্রবল আন্দালন গড়িয়া তোলেন। হিন্দু-বিধবাদের পুনর্বিবাহ দানে উদ্যোগী হইয়া তিনি প্রথমেই তাঁহার বালবিধবা বিমাতাকে তাঁহার এক বন্ধুর সহিত বিবাহ দেন। ইহার জন্য বহুদিন পর্যন্ত তাঁহাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কর্তব্য সম্পাদনের পরিতুষ্টিতে বিরোধী পক্ষের সকল আঘাতই তিনি অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন। '...তাঁহার দৃষ্টান্ত ও প্ররোচনাতে বরিশালের নব্য যুবকদলের মধ্যে, বিশেষতঃ তাহাদের স্ত্রীগণের মধ্যে, উন্নতি-স্পৃহা ও সংসাহস প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়াছিল।'[৯০] স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য বরিশাল বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে [ ১৮৭০ কি ১৮৭১ সালে ] দুর্গামোহন হাইকোর্টে ওকালতি করিবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন। "তিনি আসিয়া বসিবামাত্র কলিকাতার সমাজসংস্কারার্থী নব্য ব্রাহ্মদলের কেন্দ্রস্বরূপ হইলেন। তাঁহার ভবন ঐ যুবকদলের এক প্রধান আড্ডা হইয়া উঠিল। তখন 'অবলাবান্ধব' সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার কাগজ লইয়া কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছেন ; এবং নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দ্বারকানাথের পশ্চাতে পরবর্তী সময়ের ডেপুটী কণ্ট্রোলার-জেনারেল রজনীনাথ রায় প্রভৃতি একদল যুবক আছেন। ইঁহারা দুর্গামোহন দাসকে পাইয়া, খোঁটার জোরে মেড়ার ন্যায়, বলশালী হইয়া স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন।"[৯১]

এই আন্দোলনই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হইবার পরে ক্রমে ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বাঙলার নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চলিতে লাগিল—বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খুলিয়া নারীগণকে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ দান করা হইল, পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের মাধ্যমে নারীজাগরণের বাণী ঘোষিত হইতে থাকিল, নারী-কল্যাণমূলক সভা-সমিতি গঠন করিয়া নারীগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলিল। ইহা ছাড়া, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ-নিরোধ, বহুবিবাহরোধ প্রভৃতি আন্দোলনের ভিতর দিয়া নারীকে সর্ববিধ সামাজিক কুসংস্কারের অভিশাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্যও সাড়া পড়িয়া গেল। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙলার নারীগণ পুরুষেরই পাশে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন। 'For the first time in the history of Bengal, women, without forsaking their national culture, received franchise equally with men, became graduates of the Calcutta University and medical graduates, doctors and midwives. For the first time, respectable ladies who were 'purdanashin' discarded the 'purdah', mixed with men on equal terms, joined political and other movements, became ministers of religion and preached to men, formed societies among themselves and with men, conducted educational institutions, joined the Congress and became delegates, delivered extempore lectures in public meetings, sang at home and in public, crossed the seas and went to Europe, and lastly but not the least could choose their own husbands and had their voices respected by the parents in the choice of husbands.'[৯২]

এক কথায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বহুমুখী প্রচেষ্টার ফলে বাঙলার নারী-সমাজে জীবনের জোয়ার নামিয়া আসিল।

বাঙালী নারীর এই দুরন্ত জীবনবেগ লক্ষ্য করিয়া প্রাচীনপন্থীরা ইহাতে সামাজিক পবিত্রতা হানির আশঙ্কা করিয়াছিলেন। প্রশ্ন উঠিয়াছিল, গৃহ-কেন্দ্রিক নারীজীবনে বহির্বিশ্বে বিচরণ করিবার শক্তি সঞ্চারিত করিলে গৃহ-শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর উক্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শিবনাথ বলিতেছেন: 'সচরাচর লোকের মুখে শুনিতে পাই, যে তাঁহারা ভয় করেন যে নারীগণকে সামাজিক শক্তি ও স্বাধীনতা দিলে সামাজিক পবিত্রতা থাকিবে না। নারীচরিত্রের এই অবমাননা আমার সহ্য হয় না। ইহার বিপরীত কথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি। নারীগণকে উন্নত কর, জ্ঞান ও সদনুষ্ঠানে অংশী কর, তাঁহাদের অন্তরে আত্ম-মর্যাদাজ্ঞান ফুটিতে দেও, তাঁহাদিগকে অবাধে নিজ ক্ষেত্রে কাজ করিতে দেও, দেখিবে গৃহপরিবারে শান্তি, সমাজে পবিত্রতা, পুরুষচরিত্রে সাধুতা প্রতিষ্ঠিত হইবে···যে যে সমাজে নারীশক্তি আপনাকে জাহির করিবার পথ পাইতেছে, সেই সকল সমাজেই পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।'[৯৩] বস্তুতঃ সমাজের অর্ধাংশকে অবদমিত করিয়া রাখিয়া যে সামাজিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা, তাহা কল্যাণের ব্যভিচারমাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বাঙালীর নিকট এই সত্যই প্রচার করিয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজের অপর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হইল জাতিভেদবিরোধী আন্দোলন। ব্রাহ্ম মতবাদের জন্মলগ্ন হইতেই এই আন্দোলন ক্রমশঃ বলবত্তর হইয়া উঠিয়াছিল। রামমোহন মানুষে মানুষে ভেদসৃষ্টিকারী কৃত্রিম জাতিভেদ-প্রথার প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করিতেন এবং প্রকাশ্যে ইহার কঠোর সমালোচনাও করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এই পরম অকল্যাণকর প্রথাকে তিনি হিন্দুদের রাজনৈতিক অধঃপাতের কারণ বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন।[৯৪] কেবল তৎকালীন ধর্মান্ধ হিন্দু-সমাজের রীতিনীতিকে হঠাৎ আঘাত করিলে গুরুতর বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন নাই; না হইলেও এই সংগ্রামের একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজকে তিনি জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলনভূমিরূপে গড়িয়া তুলিয়া পরবর্তীকালের জাতিভেদবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন। জাতিভেদ-প্রথা সম্বন্ধে পরবর্তী ব্রাহ্ম নেতা দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীও অনেকটা রামমোহনের অনুবর্তী। সমাজসংস্কার বিষয়ে তিনি রামমোহনের মতই ধীর পদে চলিবার

পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্রাহ্মমন্দিরে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ-পাঠের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া, ব্রাহ্মণেতর কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মণসেবিত আচার্যপদে অভিষিক্ত করিয়া এবং রাজনারায়ণ বসুর নিকট লিখিত পত্রে স্বীয় সংস্কারমুক্ত সামাজিক মতামত ব্যক্ত করিয়া জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার বলিষ্ঠ মনোভাবেরই পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুগামী নবীন ব্রাহ্মগণ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই সংগ্রামই আরও ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী জাতিভেদ-প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার 'জাতিভেদ' বক্তৃতায় তিনি জাতিভেদ-প্রথার উদ্ভবের ইতিহাস ও ইহার ফলাফল সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন: 'এই জাতিভেদ হইতে সমূহ অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জাতিভেদপ্রথা ভারতে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত করিয়াছে; ইহাতে ভ্রাতৃবিদ্বেষ ঘটাইয়াছে; কায়িক শ্রমকে নিকৃষ্ট করিয়াছে; শিল্প-বাণিজ্যের দুর্গতি করিয়াছে; দারিদ্র্য-যাতনা বৃদ্ধি করিয়াছে; শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা আনয়ন করিয়াছে; সামাজিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়াছে; হিন্দুগণের মনুষ্যত্ব হরণ করিয়া কাপুরুষতার বৃদ্ধি করিয়াছে; বাল্যবিবাহ, বহু-বিবাহ প্রভৃতি দূষিত রীতিসকল প্রসব করিয়াছে; শারীরিক ও মানসিক উন্নতির পথ রোধ করিয়াছে; শত শত বৎসর ধরিয়া নিম্নজাতীয়দিগকে চাপিয়া রাখিয়াছে এবং সর্বশেষে এ দেশবাসী-দিগকে পরের দাসত্ব-পাশ বহনের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে।…আমি যখন এই সকল অনিষ্ট ফলের বিষয় স্মরণ করি তখন বলি, এই জাতিভেদপ্রথা যদি কোন ঝোপ বা বৃক্ষ হইত তাহা হইলে দুই হস্তে সজোরে ধরিয়া উপাড়িয়া ফেলিতাম।'[৯৫]

ব্যক্তিস্বাধীনতার পূজারী ব্রাহ্মগণ জাতিভেদকে মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও কার্যের অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন। শিবনাথের লেখনীতে তাঁহাদের এই প্রগতিশীল মনোভাব অভিব্যক্ত: 'ভারতবর্ষে জাতিভেদপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে …স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তিকে…খর্ব্ব করিয়াছে। জাতিভেদ প্রথা স্বজাতীয়গণের হস্তে এমন একটি শক্তি, এমন একটি অস্ত্র দিয়াছে, যাহা স্বজাতীয়গণ দলবদ্ধ হইয়া প্রয়োগ করিলেই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তিকে একেবারে দলন করিতে পারেন। সে শক্তির সমক্ষে বিদ্রোহীভাবে দণ্ডায়মান হওয়া অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং সমাজের অঙ্গীভূত প্রত্যেক ব্যক্তিই অপর দশজনের ভয়ে জড়সড়।

সকলেরই স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যের প্রসার সঙ্কুচিত। এইরূপে এদেশে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিলে হয়। তাহার ফলস্বরূপ প্রতিভা, মৌলিকতা, উদ্যোগ, বাণিজ্যাদিতে সাহস ও উদ্ভাবনশীলতা প্রভৃতি গুণ জাতীয় চরিত্র হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। এইটিকে জাতিভেদপ্রথার সুমহৎ সামাজিক অনিষ্টফল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।'[৯৬]

জাতিভেদ-প্রথার প্রতীকস্বরূপ উপবীত ধারণকে প্রগতিবাদী ব্রাহ্মগণ অতি নিন্দনীয় কার্য বলিয়া মনে করিতেন। এই বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজেই প্রতিবাদ জাগিয়াছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ উপবীত-প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ-সাধনে ইচ্ছুক ছিলেন না। প্রাচীন প্রথার সংস্কার সাধন করিয়া ব্রাহ্মমতে উপবীত গ্রহণের একটি নূতন প্রথা তিনি প্রচলিত করিতে চাহিয়াছিলেন।[৯৭] দেবেন্দ্র-নাথের এই প্রচেষ্টা নবীন ব্রাহ্মদের নিরতিশয় ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল। কারণ তাঁহারা জাতিগত সর্বপ্রকার ভেদকে অস্বীকার করিতেন বলিয়া উপবীত-প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপই কামনা করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে নবীন ব্রাহ্মদের এই সংস্কারেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত হইয়াছিল। যে-সকল ব্রাহ্মণ-সন্তান এই সমাজে আসিয়া ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা সকলেই প্রকাশ্যভাবে উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম হইয়া উপবীত ধারণে তাঁহারা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেন। তাঁহাদের এই মানসিক অবস্থাটি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উক্তিতে স্পষ্ট প্রকাশিত: "উপবীত ত্যাগ না করাতে আমার মনে অত্যন্ত অশান্তি হইতে লাগিল। এমন কি প্রতিদিন প্রার্থনার সময় হৃদয় কম্পিত হইত। লোকে বলে 'পইতা কি গায়ে কামড়ায়?' বাস্তবিক ইহা কাল-ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতিদিন দংশন করিতে লাগিল। উপবীত রাখা অসত্য ব্যবহার। অসত্য ব্যবহার করিলে ঈশ্বরদর্শন হবে না। এই ভয়ে আমার প্রাণ অস্থির হইত।"[৯৮] কিন্তু বহুদিনের প্রচলিত প্রথার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁক সহজে দূর হইতে চায় না। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, উপবীত-বর্জন আন্দোলনের পরেও আবার কেহ কেহ ব্রাহ্মদের উপবীত ধারণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতেছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী'র পৃষ্ঠায় ইহার তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে: 'ব্রাহ্মের পক্ষে উপবীত ধারণ কর্ত্তব্য কি না এই প্রশ্ন আবার উত্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে, এই প্রথাটী

যে দুইটী প্রথার চিহ্নস্বরূপ, সে দুইটীর ন্যায় এদেশের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কল্যাণের শত্রু আর নাই। প্রথমতঃ জাতিভেদ, এমন জঘন্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রথা আর নাই, যখন ইহার দোষগুণের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন ইহার ন্যায় এদেশের উন্নতির শত্রু আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ পৌত্তলিকতা, ইহার ন্যায় শত্রুই বা কে আছে? যে পৌত্তলিকতা ভারতবাসী ও ভারত-বাসিনীদিগকে বহুকাল জীবন্ত ঈশ্বরের পবিত্র, পরিত্রাণপ্রদ পূজা হইতে বিরত রাখিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আর নূতন করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এই উভয়ের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিকতার বিনাশ করিয়া নরনারীকে জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা করিতে শিক্ষা দিবেন এবং জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিবেন। অতএব উপবীত যদি উক্ত উভয় প্রথার চিহ্ন এবং পোষক হয়, যদি তাহার রক্ষা উক্ত উভয়ের উচ্ছেদ সাধনের পথে ব্যাঘাত হয়, কিম্বা উহার পরিত্যাগ যদি উক্ত উভয় প্রথার উচ্ছেদ সাধনের পথে সহায় হয়, তবে তাহা যে ব্রাহ্মের পক্ষে কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার পরিত্যাগ যদি ঈশ্বরেচ্ছা সঙ্গত হয় এবং তথাপি ব্রাহ্ম যদি লোকভয়ে ভীত হন, তাহাতে প্রকাশ পায় পরমেশ্বরের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস নাই।'[৯৯]

ব্রাহ্মসমাজের জাতিভেদবিরোধী আন্দোলন যে কেবল একটি বিশেষ ধর্ম-মণ্ডলীর গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, ক্রমে ক্রমে ইহা আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়াছিল। বাঙলাদেশের প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত হিন্দুপরিবারে এই আন্দোলনের ঢেউ লাগিয়াছিল। বাঙলার বাহিরেও এই আন্দোলনের বিস্তৃতি কম হয় নাই। ভারতীয় হিন্দুসমাজকে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি সংস্থা স্থাপন করিয়া ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছিল।[১০০] পরবর্তী কালে গান্ধীজির হরিজন-আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের এই অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব অনস্বীকার্য।[১০১]

হিন্দুসমাজে আজ যে জাতিভেদের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিয়াছে, তাহার বিভিন্ন কারণ দেখানো যাইতে পারে। সেই সকল কারণের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের জাতিভেদবিরোধী আন্দোলন যে একটি প্রধান কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মসমাজের সকলপ্রকার সংস্কার-প্রচেষ্টার মূলে ছিল ইউরোপীয় যুক্তিবাদ-প্রসূত একটি সাম্যচেতনা। ইহা যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে ভিত্তি করিয়া

সর্ববিধ অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিতে চাহে—সমস্ত কুসংস্কার হইতে মুক্তিলাভের প্রয়াসী হইয়া উঠে, তেমনই ইহাই আবার অপরদিকে মানবহিতৈষার প্রতি প্রবল অনুরাগ জাগাইয়া তোলে। যেখানে যুক্তিবাদ সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না, সেখানে অনধীনতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়—উপলব্যথিত নদী-স্রোতের ন্যায় সংস্কার-প্রচেষ্টা স্তিমিত হইয়া আসে—পরমুখিতা অপেক্ষা আত্মমুখিতা প্রবল হইয়া দেখা দেয়। আদি-ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের কর্মপ্রচেষ্টায় এই সত্যই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা যুক্তিবাদের আশ্রয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরে উহা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে, কি ধর্মের ক্ষেত্রে, কি সমাজসংস্কারে কোথাও অনধীনতার আদর্শটিকে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই; আবার আত্মবিলোপ করিয়া যে পরসেবার প্রবৃত্তি, তাহাও তাঁহাদের মধ্যে সম্যক্ স্ফুরিত হয় নাই—স্বোপার্জিত সাধনসম্পদের বলে তাঁহারা গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সেবক না হইয়া সেব্য হইয়া উঠিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী এরূপ বিশেষ সাধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন না। তাঁহার প্রবল ধর্মানুরাগ ছিল সত্য, কিন্তু 'ধর্মের অন্তরঙ্গ সাধনের শক্তি ও সরঞ্জাম' তাঁহার মধ্যে কখনই বেশী ছিল না। তাঁহার যে ধর্মচেতনা ছিল, তাহাকে এক কথায় Rational Religion বা যুক্তিবাদী ধর্ম বলা চলে। নিজের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে যে প্রবল যুক্তিপ্রবণতা ছিল, তাহারই আলোকে শিবনাথ ধর্মের পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজকেও সেই পথে পরিচালিত করিয়াছেন। ইহার ফলে মানুষের সর্বপ্রকার অধীনতাকেই তিনি সর্বদা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন।

'য়ুরোপীয় সাম্যভাবের প্রেরণায়, স্বদেশের ও মানবসমাজের হিতকল্পে ধর্ম্মের ও সমাজের সর্ব্বপ্রকারের শাসন হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া, তাহার মনুষ্যত্ব বস্তুকে অবাধে ফুটিয়া উঠিবার সম্পূর্ণ অবসর দিবার জন্য, শাস্ত্রী মহাশয়ের যে আত্যন্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা গিয়াছে, মহর্ষির কিম্বা কেশবচন্দ্রের মধ্যে তাহা দেখা যায় নাই।'[১০২]

মানুষের মনুষ্যত্বকে ফুটাইয়া তুলিবার এই 'আত্যন্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ' ছিল বলিয়া শিবনাথ কখনও কাহারও উপর তাঁহার নিজের ইচ্ছার চাপ দিতেন না—ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে তিনি সম্পূর্ণ সম্মান দান করিতেন। নিজের জীবনের সমস্ত কর্ম ও চিন্তায় শিবনাথ এই ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া

গিয়াছেন। 'বস্তুত তাঁহার জীবনের কক্ষরেখা তাঁহার নিজ প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বেগেই নিরূপিত হইয়াছিল; সে রেখার নানা অংশ ব্রাহ্মসমাজের পূর্বগামিগণকে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসকেও ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাদের কাহারও সহিত একান্তভাবে লিপ্ত হইয়া গিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলে নাই।'[১০৩] নিজের এই স্বাধীনচিত্ততা তিনি অপরের মধ্যেও অনুরূপভাবে দেখিতে চাহিয়াছেন। 'অপরের সম্বন্ধেও শাস্ত্রী মহাশয় সর্বদা এই ইচ্ছাই করিতেন যে, নিজ জীবন হইতেই সে নিজের আদর্শ ও সাধনা বাছিয়া লউক। বেদী হইতে হয়তো উপদেশ দিলেন, মুমুক্ষু আত্মার লক্ষণ কি কি; নামিয়া আসিয়া তোমাকে এ প্রশ্ন করিবেন না যে উপদেশটি তোমার কেমন লাগিল, অথবা তোমার মুমুক্ষু অবস্থা হইয়াছে কি না।'[১০৪] শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিটি সভ্যের মনেই বিশেষভাবে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল।

শিবনাথ তথা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদী ধর্মের অপর একটি ফল ছিল মানববৎসলতা। শিবনাথের চরিত্রে এই গুণটি বিশেষভাবে লক্ষিত হইত। তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে উক্তি করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য: 'শিবনাথের প্রকৃতির একটি লক্ষণ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে; সেটি তাঁহার প্রবল মানববৎসলতা। মানুষের ভালমন্দ দোষগুণ সব লইয়াই তাহাকে সহজে ভালবাসিবার শক্তি খুব বড় শক্তি। যাঁহারা শুষ্কভাবে সঙ্কীর্ণভাবে কর্তব্যনীতির চর্চা করেন তাঁহারা এই শক্তিকে হারাইয়া ফেলেন। কিন্তু শিবনাথের সহৃদয়তা এবং কল্পনাদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি দুই-ই ছিল; এই জন্য মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়া দেখিতে পারিতেন, তাহাকে সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনো বাজারদরের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিতেন না।'[১০৫]

এই মানববৎসলতা হইতেই মানবহিতৈষা দেখা দেয়। শিবনাথ ছিলেন মনে-প্রাণে মানবহিতৈষী। লোকসেবাই ছিল তাঁহার ধর্মের মূল মন্ত্র। ইহার জন্য জীবনে কোনো ক্ষতিকেই তিনি ক্ষতি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার রচিত একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে তাঁহার এই লোকসেবার মনোভাবটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে:

'আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই,
পরে সুখী করে সুখী হতে চাই।

নিজে তো কাঁদিব,
কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি,—এই ভিক্ষা চাই।'[১০৬]

শিবনাথ শাস্ত্রীর এই আত্মবিলোপকারী সেবার আদর্শ সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। এই সমাজের কতিপয় বন্ধুকে লইয়া শিবনাথ যে 'সাধনাশ্রম' স্থাপন করিয়াছিলেন [ফেব্রুয়ারি, ১৮৯২], তাহার কর্মসূচীর মধ্যে জনসেবাই ছিল সর্বাগ্রগণ্য। ১২৯৯ সনের মাঘোৎসব উপলক্ষে আশ্রমের বিশেষ ভাব লইয়া একটি নগরকীর্তন রচিত হয়। সেই গানের শেষ পঙক্তি কয়টি এইরূপ :

'বিশ্বাস অনল জ্বালি, বৈরাগ্য আহুতি ঢালি,
সেবা যজ্ঞের কর আয়োজন রে।
[জনম সফল কর রে] [আপনা আহুতি দিয়ে]'[১০৭]

সাধনাশ্রমের কর্মিগণ বস্তুতঃই সেবাযজ্ঞে আপনাদের আহুতি দিয়াছিলেন।[১০৮] আর্তত্রাণকর্ম, আতুরাশ্রম ও অনাথাশ্রম স্থাপন, বাঙলাদেশে বধির-মূক-শিক্ষার উদ্বোধন, বাঙলায় ও বাঙলার বাহিরে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কর্মের ভিতর দিয়া শিবনাথের অনুগামী ব্রাহ্ম সেবকদল মানবহিতৈষার স্পষ্ট স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'দাসাশ্রম'-নামক সেবা-প্রতিষ্ঠানটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১০৯] দাসাশ্রমের কর্মীরা প্রকৃত সেবার মনোভাব লইয়াই জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে আর্তমানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। দাসাশ্রমের মুখপত্র 'দাসী' পত্রিকাটি ১৮৯২ সালের আষাঢ় মাস হইতে বহুদিন পর্যন্ত প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী ও সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় মানব-সেবার বাণী প্রচার করিয়াছিল।[১১০] বস্তুতঃ শিবনাথ শাস্ত্রীর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্মীরা জনসেবার যে ব্যাপক আয়োজন করিয়াছিলেন, এদেশের সেবামূলক কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাসে তাহা অবিস্মরণীয়। সর্বপ্রকার বৈষম্যবোধ হইতে মুক্ত থাকিয়া মানুষকে যে কেবল মানুষ হিসাবেই সেবা করা যায়, ব্রাহ্ম সেবকগণ তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

এই যে মানবপ্রীতি, এই যে দুর্দমনীয় অনধীনতা, এই যে মানুষে মানুষে সাম্যবোধ, ইহাই ব্রাহ্মধর্মের মূল আদর্শ। দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজে বা কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কোথাও এই আদর্শটিকে সম্পূর্ণরূপে

ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হয় নাই। সে চেষ্টা করিয়াছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শিবনাথ শাস্ত্রী। ব্রাহ্ম-আন্দোলনের মধ্যে যে সাম্যভিত্তিক মানবধর্ম্মের প্রতিশ্রুতি ছিল, তাহা অনেকটা বিবর্তন-পন্থায় অল্পে অল্পে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'মহর্ষি এই ধর্মের বীজমাত্র বপন করেন। কেশবচন্দ্র এই বীজকে কতকটা ফুটাইয়া তুলিয়া, আবার আপনার হাতেই তাহাকে চাপিয়া নষ্ট করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীই এক সময়ে ইহাকে পরিস্ফুট ও পরিপক্কভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন।'[১১] মহর্ষি ধর্মের ক্ষেত্রে এবং কেশবচন্দ্র সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মধর্মের মূল আদর্শটির উদ্বোধন ঘটাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর দৃষ্টি ছিল আরও প্রসারিত। তিনি কেবল ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নাই, আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের গ্লানি অপনয়নের জন্যও তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

দেশ তখন বিদেশী সরকারের অধীন। মানুষের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী শিবনাথের নিকট দেশবাসীর এই রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা অসহ্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তরুণ বয়সেই তাঁহার মনে ইহার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদের সুর জাগিয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠনের পূর্বে তিনি যখন হেয়ার স্কুলের শিক্ষক, তখন বিপিনচন্দ্র পাল-প্রমুখ কয়েকজন আদর্শনিষ্ঠ যুবককে লইয়া একটা ছোট কর্মিদল গড়িবার চেষ্টা করেন। এই দলের জন্য একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞাপত্রও রচিত হইয়াছিল। বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায় এই প্রতিজ্ঞাপত্রের কথা শোনা যাক ঃ "আমাদের প্রতিজ্ঞা-পত্রের প্রথম কথা ছিল—'স্বায়ত্তশাসনই (তখনও স্বরাজ শব্দের প্রচার হয় নাই আমরা একমাত্র বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি। ...তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের আইন-কানুন মানিয়া চলিব—কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দ্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।'

এই প্রতিজ্ঞা-পত্রের দ্বিতীয় কথা ছিল—'আমরা জাতিভেদ মানিব না; পুরুষের পক্ষে একুশ বৎসরের পূর্ব্বে এবং রমণীর পক্ষে ষোল বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিব না, বিবাহ দিব না এবং বিবাহে সাহায্য করিব না।'

তৃতীয় কথা ছিল -'লোকশিক্ষা প্রচারে প্রাণপণ যত্ন করিব'।

চতুর্থ কথা ছিল—'অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোঁড়া (তখনও অস্ত্র-আইন প্রচলিত হয় নাই) প্রভৃতি নিজেরা অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব।'

পঞ্চম কথা ছিল—'আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জ্জন বা রক্ষা করিব না, যে যাহা অর্জ্জন করিবে তাহাতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে, এবং সেই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের হিতকর কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিব।'"[১১২]

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দেশের পরাধীনতা মোচনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রতিজ্ঞা-পত্রটি রচিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, দেশের যুবকদের মধ্যে যাহাতে একটা সাম্যবাদী চিন্তাধারা দানা বাঁধিয়া উঠে, সেই উদ্দেশ্যেই প্রত্যেকের উপার্জিত অর্থে গঠিত একটি সাধারণ অর্থভাণ্ডারের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। এযুগের বহুল প্রচারিত কমিউনিজমের কষ্টিপাথরে যাচাই করিলেও এই পরিকল্পনাটির মূল্যবত্তা অস্বীকৃত হইবে না। অবশ্য পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই এবং নানা কারণে দলটিও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। 'কিন্তু এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের ইতিহাসের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ এক সময় যে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শের দিকে ছুটিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।'[১১৩]

ব্রাহ্মসমাজের অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহাই তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিল। 'ব্রাহ্মসমাজ যে স্বাধীনতার আদর্শকে ধর্মসাধনে এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাকেই রাষ্ট্রীয় শাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেশের শিক্ষিত লোকেরা লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন।'[১১৪] ইহারই ফলে 'ভারত সভা' ও অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছিল। ইহা ছাড়া বাঙলার সুবিখ্যাত স্বদেশী আন্দোলনে যাঁহারা নেতৃত্ব দিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোক।[১১৫] এমন কি, অগ্নিযুগের প্রথম দিকে বাঙলার যে-সব বিপ্লবী সন্তান দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য জীবনপণ করিয়াছিলেন. তাঁহাদেরও অনেকে ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে প্রভাবিত। স্বাধীনতার পূজারী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মুক্তিকামী ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়া সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শটি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিয়াছিল।

জাতীয় আন্দোলনের একটা বড় গুণ এই যে, ইহা দেশবাসীর মনে একটা ভ্রাতৃবোধ জাগাইয়া তোলে :

'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে ॥'

রবীন্দ্রনাথের এই গানটির মর্মকথা স্বদেশী যুগে বহু বাঙালীর মনেই দোলা দিয়াছিল। দলে দলে বাঙালী সেদিন আত্মপর ভুলিয়া মিলিত হইয়া একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় আন্দোলনের এই ভ্রাতৃ-বোধমূলক সাম্যগাথায় যে ব্রাহ্মসমাজেরই সাম্যসাধনার সুর লাগিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কিন্তু নানা কারণে ব্রাহ্মসমাজ তাহার যুক্তিবাদী সাম্যসাধনাকে শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠার সহিত আঁকড়িয়া থাকিতে পারে নাই। ইহার ফলে সিদ্ধি যখন প্রায় করায়ত্ত, সাধনার জগতে তখনই ছন্দোপতন ঘটিল। আজ ব্রাহ্মসমাজের সেই তেজ ও দুঃসাহস অস্তমিত—আজ ইহা কেবল বাঙালীর বলদৃপ্ত অতীত সাধনার সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে। তথাপি একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, বাঙালীর সাম্যচিন্তায় ব্রাহ্ম-আন্দোলন একটা স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্ম-আন্দোলনের এই অবিসম্বাদী প্রভাবের মূলে যে একটি বিশেষ সত্য রহিয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহার অনুল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। সত্য বটে, ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে ভিত্তি করিয়া এই আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ধর্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সাম্যাদর্শ স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিল; কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, জীবের মধ্যে শিব দর্শনের যে চিরন্তন ভারতীয় ঐতিহ্য—যাহা শুধু মানুষ নহে, সৃষ্টির সমস্ত কিছুর মধ্যেই পরব্রহ্মের প্রকাশ অনুভব করিতে শিক্ষা দেয়, ব্রাহ্ম-আন্দোলন তাহারই সহিত এক সুরে বাঁধা।[১১৭] এইজন্যই ইহা বাঙলা তথা ভারতের অন্য অনেক স্থানেই জনচিত্তকে আলোড়িত করিতে পারিয়াছিল।

একালের দ্বন্দ্ব-দ্বেষ-দীর্ণ পৃথিবীতে হয়তো ভারতীয় এই ঐতিহ্য অর্থহীন বলিয়া মনে হইবে—'শান্তির ললিত বাণী' হয়তো শুধুই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহাই মানবজাতির অন্তিম ভাগ্যলিপি নহে। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত মানুষ আজ থমকিয়া দাঁড়াইয়া শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে চাহিতেছে, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্র হাত মিলাইয়া সন্ধি স্বাক্ষর করিতে উৎসুক, ঐশ্বর্য ও বিলাসের মধ্যে মানুষের মন থাকিয়া থাকিয়া আনমনা হইয়া পড়িতেছে, মানুষের সভ্যতা আজ বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছে। বিশ্ব-মানবের এই মানস প্রগতি ব্যর্থ হইবার নহে। সৃষ্টির জড় হইতে জীবে অভি-ব্যক্তির ন্যায় মানুষের স্বার্থক্লিষ্ট পার্থিব সত্তাও চলিয়াছে ধীর অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে দিব্যজীবনে উত্তরণের পথে। সুদীর্ঘ এই পথ। মহাকালের ইঙ্গিতে

এই পথে চলিতে চলিতেই মানুষ একদিন তাহার 'মর্ত্যসীমা' লঙ্ঘন করিয়া যাইবে। ঊর্ধ্বায়ত মানবজীবন সেদিন সাম্য ও মৈত্রীর বেদীমূলে দাঁড়াইয়া মহামানবতার জয়গানে মুখর হইয়া উঠিবে। সেদিন দূরে কি নিকটে জানি না; কিন্তু তাহার অভ্যাগমন যে অনিবার্য, সৃষ্টির বিবর্তনধারাই তাহা বলিয়া দিতেছে।

---

১। 'Idolatry and iconolatry are a bulwark of feudalism as well as of decadent capitalism. The Idol or the Icon means 1. offerings in kind or money (tributes to the gods), and 2. a priesthood. Gradually, as the money accumulates, big estates grow up round the idols or the icons ( either of gods or of man-gods ), and a priestly class with vested interests grows stronger and stronger. In the mediaeval period, they wielded almost absolute power with their fabulous wealth, vast properties and steady incomes. In India, particularly the South, these religious monarchies, with the hierarchy of 'mohunts', were powers to be reckoned with. In order to keep these feudal religious empires as smoothly running corners, it was the duty and the business of the priests to keep the masses steeped in ignorance, superstitions and blind belief.

'The Brahmo Samaj, in waging war against idolatry, hit at the very root of this ages-old religious feudalism, emancipating the intellect of the people from the tharldom of the priestly classes.' Jogananda Das : 'The Brahmo Samaj': In 'Studies in the Bengal Renaissance'—ed. by Atul Chandra Gupta [ Calcutta, 1958 ], p. 483.

২। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' [ কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৩৬০ ]: পৃ. ৩৬।

৩। "দেবেন্দ্রনাথের সময়েও কিছুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের কাগজপত্রে 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্ম' এই দীর্ঘ নামটিই চলিয়া আসিতেছিল। ১৮৪৭ সালের ২৮শে মে [ ১৭৬৯ শকের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ] তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনে, 'অতঃপর ঐ নামের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম অবলম্বন করা হইবে' এরূপ নির্দ্ধারিত হয়।" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'আত্মজীবনী'

৪। তদেব। পৃ ১২৩-১২৪।

৫। বিপিনচন্দ্র পাল : 'নবযুগের বাংলা'

৬। দেবেন্দ্রনাথ যখন এদেশের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া তৃপ্তি পাইতেছিলেন না, ইউরোপীয় দার্শনিক গ্রন্থ পাঠেও যখন সেই অতৃপ্তি দূর হইল না, তখন একদিন হঠাৎ তাঁহার সম্মুখ দিয়া রামমোহন রায়ের লেখা 'ঈশোপনিষৎ' গ্রন্থের একখানি ছিন্নপত্র উড়িয়া যাইতেছিল। তিনি ঔৎসুক্যবশতঃ হাত বাড়াইয়া তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। তাহাতে ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি মুদ্রিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ নিজে শ্লোকটির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন একুশ বৎসর মাত্র।

৭। "যখন বিদ্যাবাগীশের মুখ হইতে 'ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং' ইহার অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল। আমি মানুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্ম্মের মধ্যে সায় দিল,আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল। আমি ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিতে চাই ; উপনিষদে কি পাইলাম ? পাইলাম যে, 'ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন কর।' ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন করিতে পারিলে আর অপবিত্রতা কোথায় ? তাহা হইলে সকলই পবিত্র হয়, জগৎ মধুময় হয়। আমি যাহা চাই, তাহাই পাইলাম।" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'আত্মজীবনী'

৮। 'সমুদায় জগতে তাঁহার প্রতিরূপ ;...সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে, মানুষের মুখশ্রীতে, ধার্ম্মিকের কল্যাণের অনুষ্ঠানে, তাঁহার ভাবের প্রতিরূপ মাত্র দেখা যায়। ...তাঁহার প্রতিরূপ সকল স্থানে।' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' : প্রথম প্রকরণ : চতুর্থ ব্যাখ্যান [ ১৩৭২ ] : পৃ. ১৫।

৯। 'ব্রাহ্মসমাজ যখন আমি প্রথম দেখিতে যাই [ ১৮৪২ ], তখন দেখিলাম যে, একটি নিভৃত গৃহে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ হইত। যখন ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য এই যে, সকলের নিকটেই ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করা—যখন ট্রাষ্ট-ডীডেতে আছে যে, সকল জাতিই নির্ব্বিশেষে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবে, তখন কার্য্যে ইহার বিপরীত দেখিয়া আমার মনে বড় আঘাত লাগিল।...আমি ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম....।' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'আত্মজীবনী'

১০। '...ব্রাহ্মধর্মের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকস্মিক ভাবে জাতিভেদপ্রথা উচ্ছেদপূর্বক বৃহত্তর হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মসমাজকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে তিনি [ দেবেন্দ্রনাথ ] স্বভাবতঃ ইতস্তত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের মূল লক্ষ্য প্রতীকবর্জিত এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকিলে কালক্রমে জাতিভেদ প্রভৃতি অমঙ্গলকর সামাজিক আচারগুলিও দূর করিতে পারিবেন, এরূপ আশা তিনি পোষণ করিতেন।' দিলীপকুমার বিশ্বাস-সম্পাদিত শিবনাথ শাস্ত্রী-রচিত 'জাতিভেদ'
'সম্পাদকীয়', পৃ. ১০।

১১। "তখন পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীতে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাহারও বসিবার অধিকার ছিল না। কেশবচন্দ্রের প্রতিভা ও গুণে মোহিত হইয়া মহর্ষি তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বরণ করেন। ১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখে নববর্ষের উপাসনা উপলক্ষে মহর্ষি কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের আয়তন ক্রমশঃই বাড়িতেছিল। বাংলাদেশের নানাস্থানে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। বাংলার বাহিরে ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্ম উপাসক-মণ্ডলী গড়িয়া উঠিতেছিল। এ অবস্থায় মহর্ষি দেখিলেন, তাঁহাকে যদি কেবল কলিকাতায় আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহা হইলে সমাজে সম্যকরূপে তত্ত্বাবধান হয় না। তিনি বলিলেন,—'যেখানে যেখানে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে আমার স্বয়ং যাইবার প্রয়োজন। আমি এখন আর কলিকাতায় বদ্ধ থাকিতে পারি না, সুতরাং এখানে একটী আচার্য্যের প্রয়োজন হইতেছে, অতএব এক্ষণে আমি আহ্লাদপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দকে কলিকাতার ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।' বিপিনচন্দ্র পাল : 'নবযুগের বাংলা'

১২। 'বোম্বাই হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে একটি প্রধান সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত করিলেন। তৎপূর্ব্বে উপবীতধারী উপাচার্য্যগণ ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে আসীন হইয়া উপাসনাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। কেশবচন্দ্রের প্ররোচনায় মহর্ষি তাঁহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া দুইজন উপবীত-ত্যাগী উপাচার্য্যকে সেই পদে নিয়োগ করিলেন।' শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [ ১৩৬২ ], পৃ. ২৪২।

১৩। 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী'—প্রিয়নাথ শাস্ত্রী-সংকলিত, পত্র-সংখ্যা : ২৯, পৃ. ৩৮।

১৪। তদেব। পত্রসংখ্যা : ৩৮, পৃ. ৪৯।

১৫। অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থে [ ৩৬৩ পৃষ্ঠায় ] আছে, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ব্রাহ্মসমাজে সর্বপ্রথম অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্র সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পাওয়া যায়, ঐ বছর ২রা আগস্ট তারিখে পার্বতীচরণ গুপ্ত নামে এক ব্রাহ্মযুবকের সহিত ভিন্নজাতীয়া এক বিধবা কন্যার পরিণয় হয়। অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল হইলেও দেবেন্দ্রনাথ এই সকল অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বিষয়ে বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করেন নাই।

১৬। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'আত্মজীবনী'

১৭ 'আমি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত এই সংসার ঘুঁটিয়া দেখিলাম, তোমার [ রাজনারায়ণ বসু ] সমান আর একটি বন্ধু প্রাপ্ত হইলাম না।'—'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী'--প্রিয়নাথ শাস্ত্রী-সংকলিত, পত্রসংখ্যা : ৪৬, পৃ. ৫৭।

১৮। রাজনারায়ণ বসু : 'আত্ম-চরিত'

১৯। রাজনারায়ণ বসু : 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' [ ১৭৯৪ শক ], পৃ ৩০-৩১।

২০। রাজনারায়ণ বসু : 'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা', ১ম ভাগ [ ১৮৬৬ ], পৃ. ৮৩।

২১। রাজনারায়ণ বসু : 'ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ ও ইতিবৃত্ত' [ ১৯৫৭ ], পৃ. ৭।

২২। রাজনারায়ণ বসু : 'আত্ম-চরিত'

২৩। শেষবয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য রাজনারায়ণ দেওঘরে গিয়া বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে একবার শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। দেওঘরে রাজনারায়ণ যে কিরূপ জনশ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া শিবনাথ বলিতেছেন—"তিনি সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের, মানুষের পূজিত হইয়াছিলেন। একবার দেওঘরে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছি, মধুপুরে গাড়ি থামিলে বৈদ্যনাথের পাণ্ডারা উপস্থিত—'মশাই কি বৈদ্যনাথে যাবেন ?' উত্তর—'হাঁ যাব।' প্রশ্ন—'আপনার পাণ্ডা কে ?' উত্তর—'রাজনারায়ণ বসু।' পাণ্ডা হাসিয়া বলিল—'ও ত আমাদের দোসরা বৈদ্যনাথ।' শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [ ১৩৬২ ], পৃ. ২৮৭।

২৪। রাজনারায়ণ বসু : 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' [ ১৭৯৪ শক ], পৃ. ২০।

২৫। রাজনারায়ণ বসু : 'আত্ম-চরিত'

২৬। "জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সভ্যেরা 'গুড নাইট' না বলিয়া

'স্বরজনী' বলিতেন। ১লা জানুয়ারি দিবসে পরস্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখে করিতেন; আর ইংরাজী বাঙ্গলা না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গলাতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন। যে একটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত তাহার এক পয়সা করিয়া জরিমানা হইত।": তদেব। পৃ. ৫২।

২৭। 'মেলার [ হিন্দুমেলার ] অধ্যক্ষগণ স্বদেশীয় উন্নতি, স্বদেশীয় সাহিত্যের বিকাশ, স্বদেশীয় সংগীতাদির চর্চা, স্বদেশীয় কুস্তী প্রভৃতির পুনর্বিকাশ প্রভৃতির উৎসাহ দান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। বর্ষে বর্ষে চৈত্র সংক্রান্তিতে একটি মেলা খোলা স্থির হইল।...জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করাই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল।' শিবনাথ শাস্ত্রী: 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ [ ১৩৬২ ], পৃ. ২৩০-২৩১।

২৮। রবীন্দ্রনাথ: 'জীবনস্মৃতি': রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড [ জন্ম-শতবার্ষিক

২৯। 'দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের মধ্যে তত্ত্বদর্শন, চিন্তাপ্রণালী ও মনঃ-প্রকৃতিগত মৌলিক পার্থক্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ শান্তরসাস্পদ ব্রহ্ম-উপাসক, অক্ষয়-কুমার তত্ত্বজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক ও নিঃস্পৃহ দার্শনিক।' অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য'

৩০। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'আত্মজীবনী'

৩১। 'ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।... তিনি সহজে স্বায় অবলম্বিত কোনও মত বা কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতেন না। শীঘ্র কিছু অবলম্বন করিতেন না. করিলে শীঘ্র ছাড়িতেন না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, ঈশ্বরালোকে, বহু পরীক্ষার পর কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতেন; এবং একবার যাহা নির্ণীত হইত তাহা হইতে সহজে বিচলিত হইতেন-না। সুতরাং তাঁহাকে বেদান্তধর্ম্ম ও বেদের অভ্রান্ততা হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয়বাবুকে বহু প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।' শিবনাথ শাস্ত্রী: 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'

৩২। অক্ষয়কুমার দত্ত: 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', ১ম ভাগ [ ১৭৭৮ শকাব্দ ], পৃ. ১৭।

৩৩। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান': প্রথম প্রকরণ: একবিংশ ব্যাখ্যান:

৩৪। অক্ষয়কুমার দত্ত: 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', ১ম ভাগ [ ১৭৭৮ শকাব্দ ], পৃ. ১।

৩৫। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: 'উন বংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য'

৩৬। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা [বৈশাখ, [ ১৭৭২ শক. ], পৃ. ৫।

৩৭। তদেব। [ শ্রাবণ, ১৭৭২ শক ], পৃ. ৫০ ]।

৩৮। তদেব। ['অগ্রহায়ণ, ১৭৭২ শক ], পৃ. ১১৫-১১৬।

৩৯। অক্ষয়কুমার দত্ত: 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', ১ম ভাগ [ ১৭৭৮ শকাব্দ ], পৃ. ১৬৭।

৪০। তদেব। পৃ. ১৬৬-১৬৭।

৪১। 'কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৫৪ সনের মাঝামাঝি কলিকাতার পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন এবং কাশীপুরে বাস করিতে থাকেন। এই সনের ১৫ই ডিসেম্বর স্বীয় কাশীপুরস্থ ভবনে কলিকাতার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সহযোগে সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমাবধি ইহার সভাপতি পদে বৃত ছিলেন; সম্পাদক ছিলেন—কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রথম দিনের অধিবেশনেই কয়েকটি প্রস্তাবের আকারে সমিতির উদ্দেশ্য নির্ণীত হইল। স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, হিন্দু-বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন এবং বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আন্দোলন করা সুহৃদ সমিতির প্রধান কর্তব্য মধ্যে গণ্য হয়।' যোগেশচন্দ্র বাগল: 'মহর্ষির জীবনের আরও তথ্য' [ সংযোজন ], দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'আত্মজীবনী'
এই তথ্য হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সেকালের নারী-জাগরণ-বিষয়ক বিভিন্ন আন্দোলনে অক্ষয়কুমার অন্যতম অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪২। শিবনাথ শাস্ত্রী: 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [ ১৩৬২ ], পৃ. ২৪০।

৪৩। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের এই সৌহার্দ্য চিরদিনই অম্লান ছিল। আদর্শ বিষয়ে মতানৈক্য উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। নানা বিরোধ-বিপর্যয়ের পর পরিণত বয়সেও কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। ১৮৮২ সালের ৭ই জুলাই এক পত্রে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন: 'আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রহ্মানন্দ, সন্তান ও দাস। আপনি আমাকে অতি উচ্চ নাম দিয়াছিলেন। বহুমূল্য রত্ন 'ব্রহ্মানন্দ' নাম।...ঐ নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাধনে ধনী করিয়াছেন, বিপুল সম্পত্তিশালী করিয়াছেন। আপনার আশীর্বাদে ব্রহ্মের সহবাসে অনেক সুখ এ জীবনে সম্ভোগ করিলাম।': 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী' [ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী-সংকলিত ], পত্রসংখ্যা: ১২৭: পৃ. ১৯২-১৯৩।

৪৪। শিবনাথ শাস্ত্রী: 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [১৩৬২], পৃ. ২২২।

৪৫। তদেব। পৃ. ২২৪।

৪৬। তদেব। পৃ. ২২৩।

৪৭। এই সময়ে স্বয়ং কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে সিন্দূরিয়া পটীর গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে মহাসমারোহে উমেশচন্দ্র মিত্র-প্রণীত 'বিধবাবিবাহ নাটক' অভিনীত হয়। 'কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অভিনয় অত্যন্ত সুন্দর হওয়াতে এই নাটক শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে ও বিধবা বিবাহের সমর্থনে অনুভূতিকে জাগ্রত করে।' প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়: 'বাংলার নারী-জাগরণ' [১৩৫২], পৃ. ৪৩।

৪৮। অজিতকুমার চক্রবর্তী: 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', ২য় খণ্ড [ এলাহাবাদ ১৯১৬ ], পৃ. ৩৪৫।

৪৯। বিপিনচন্দ্র পাল: 'চরিত-চিত্র' [ ১৯৫৮ ], পৃ. ২৩৪।

৫০। তদেব। পৃ. ২৩৫।

৫১। শিবনাথ শাস্ত্রী: 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [ ১৩৬২ ], পৃ. ২৪৩।

৫২। তদেব। পৃ. ২৪৪।

৫৩। 'ব্রাহ্মসমাজের আচার্যমনোনয়ন সম্পর্কে তাঁহার [ দেবেন্দ্রনাথের ] মত ছিল, আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হইলে উপবীতধারী, উপবীতত্যাগী, যে কেহ ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদ লাভ করিতে পারিবেন। এই মানদণ্ডে বিচার

করিয়াই ইতিপূর্বে তিনি, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মণ না হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহাকে আচার্য মনোনীত করিয়াছিলেন।' দিলীপকুমার বিশ্বাস [ -সম্পাদিত ] : শিবনাথ শাস্ত্রী-রচিত 'জাতিভেদ'

৫৪। '১৮৬৫ সালের আষাঢ় মাসে যুবকদলের অগ্রণীগণ কলিকাতা সমাজের অধ্যক্ষদিগের নিকট এই প্রার্থনা জানাইলেন যে, সমাজের বেদীতে উপবীতধারী উপাচার্য্যগণকে বসিতে না দেওয়া হয় ; এবং যদি এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র দিনে সমাজগৃহে উপাসনা করিতে দেওয়া হয়। উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, যাঁহারা বহুকাল সমাজের সহিত যোগ দিয়া অনুরাগের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে এক্ষণে স্বাধিকারচ্যুত করা তিনি পক্ষপাতের কার্য্য বলিয়া মনে করেন। তৎপরে সমাজের একটা সাধারণ উপাসনার দিন থাকিতে, প্রতিবাদকারী কয়েকজনকে আর এক দিন সমাজগৃহ দেওয়া ভাল মনে করিলেন না।' শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু-লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [ ১৩৬২ ], পৃ. ২৪৩।

৫৫। Bipinchandra Pal: *The Brahmo Samaj and the Battle for Swaraj* [ 1945 ], p 30.

৫৬। 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা, ১লা মাঘ, সোমবার, ১৭৯৪ শক।

৫৭। শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [১৩৬২], পৃ. ২৪৬।

৫৮। "১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই, কেশবচন্দ্র মহিলাদের জন্য 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' নামক সভা স্থাপন করিয়া মহিলাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ, তর্ক প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।" প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : 'বাংলার নারী-জাগরণ' [ ১৩৫২ ], পৃ. ৪৯।

৫৯। 'ব্রাহ্মবন্ধু সভার উৎসাহী সদস্য উমেশচন্দ্র দত্ত [ পরে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ, সাধুতার জন্য প্রসিদ্ধ উমেশচন্দ্র ] মহিলাদের জন্য বামাবোধিনী পত্রিকা নামে পত্রিকা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বামাবোধিনী সভার পক্ষ হইতে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। এই পত্রিকাতেই এইদেশের মহিলাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের সাধনা সংঘবদ্ধ ভাবে আরম্ভ হয় ও মহিলারা প্রথম লেখিকা হইবার সুবিধা অর্জ্জন করেন।' তদেব। পৃ. ৪৫-৪৬।

৬০। Bipinchandra Pal: *The Brahmo Samaj and the Battle for Swaraj*: [ 1945 ], p. 28.

৬১। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে ইস্‌লিংটনের 'ইউনিয়ন চ্যাপেল',-এ 'Hindu Theism' সম্বন্ধে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন: 'Caste was originally meant to be a system of social distinctions, a division of society into trades and professions; but in later days this system of social distinctions has been strengthened and fortified by religious sanctions. The man who breaks through the distinctions of caste is held to forfeit all his religious and social privileges as a Hindu. Thus in later times polytheism and caste came in, and almost wholly swept away the purer Hinduism which existed before.' —'Keshub Chunder Sen in England: Diary, Sermons Addresses and Epistles' [ Calcutta, 1938 ], pp. 272-273.

৬২। *Life and works of Brahmananda Keshav*: Comp. by Premsundar Basu [ Calcutta, 1940 ], pp. 146-147.

৬৩। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতা দেন। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ও ধর্মীয় উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পরেই নানাদিকে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়ে।

৬৪। Keshub Chunder Sen: *Lectures in India* [ Calcutta, 1954 ], pp. 17-19.

৬৫। Ibid: p. 36.

৬৬। 'বড় লোক': -'সুলভ সমাচার' [ ১ম খণ্ড, ৪০ সংখ্যা, ৩১শে শ্রাবণ, ১২৭৮ সাল ]: পৃ. ১৫৯।

৬৭। 'খ্রীষ্টের জন্মদিন (২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৬৬ খৃ:) উপলক্ষে মিস্ কার্পেণ্টারের ইচ্ছামত একটী সভা হয়। এই সভায় অনেকগুলি ব্রাহ্মিকা ও ব্রাহ্ম উপস্থিত হন।...ইংরাজ 'ইভিনিং পার্টিতে' গমন করিয়া এবং ইংরাজদিগের নরনারীর পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া, তাহা অনুকরণ করিবার ইচ্ছা সরলচিত্ত ব্রাহ্মদিগের পক্ষে অতি স্বাভাবিক ছিল। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেন যে, ইংরাজ নারীগণ যেমন পুরুষদিগের সহিত স্বাধীনভাবে সম্মিলিত হন, তাঁহাদেরও স্ত্রী ও ভগিনীগণ সেইরূপ পুরুষদিগের সহিত একত্রিত হইবেন। এই মনে করিয়া ব্রাহ্মগণ আপন আপন বন্ধুদিগকে লইয়া নিজ নিজ পত্নী ও ভগিনীদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন এবং কথা কহিতে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এই দলে যে সমস্ত মহিলা উপস্থিত

ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অন্তঃপুরবাসিনী, অন্য পুরুষের সহিত কথা-বার্ত্তা কহা তাঁহাদের তত অভ্যাস ছিল না। সুতরাং স্বামী ও ভ্রাতার নিতান্ত অনুরোধে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কুলবধূর ন্যায় মৃদুস্বরে অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে দুই একটী কথা কহিলেন। ·সভা ভঙ্গ হইলে পর, কয়েক জন যুবা অত্যন্ত আহ্লাদ ও উৎসাহের সহিত কেশবচন্দ্রকে এই সংবাদ দিয়া মনে করিলেন যে, তিনি খুব সুখ্যাতি করিবেন।···

'কেশবচন্দ্র হঠাৎ কাহারও মনে আঘাত বা কষ্ট দিবার লোক ছিলেন না। তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, এরূপ কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি নাই। স্ত্রীলোকদিগকে বলপূর্ব্বক বা অনুরোধ করিয়া স্বাধীন করা, তিনি অত্যন্ত অনিষ্টকর কার্য্য মনে করেন।' গৌরগোবিন্দ রায়: 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র', ১ম খণ্ড [ ১৯৩৮ ], পৃ. ৩৪৫-৩৪৬।

৬৮। 'অধিবেশন' [ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ]: নববিধানাচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন [ ১৯১৭ ], পৃ. ২১।

৬৯। ১৮৬৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতা দেন। ইহার পূর্ববর্ত্তী 'Jesus Christ: Europe and Asia'-বিষয়ক বক্তৃতার পর অনেকেই মনে করিলেন, কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছেন। তাহার প্রতিবাদ-স্বরূপই এই বক্তৃতা।

৭০। Keshub Chunder Sen: *Lectures in India* [ Calcutta, 1954 ], p. 46.

৭১। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে কেশবচন্দ্র ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন: 'পৃথিবীর শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদিগের সঙ্গে, পুণ্যের প্রবর্ত্তক, মুক্তির সহায় ঈশা গৌরাঙ্গের সঙ্গে, এই নরকের কীটকে যাঁহারা একশ্রেণীভুক্ত করিলেন, এই বেদী তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতে কুণ্ঠিত নহেন। আমি তাঁহাদিগের সহিত একশ্রেণীভুক্ত? এ কথা নিতান্ত অসার। যাঁহাদিগের চরণরেণু আমি মস্তকে ধরিবার উপযুক্ত নই, তাঁহাদিগের সহিত একশ্রেণীভুক্ত হইব? যাঁহাদিগের কাছে বসিতে পারি না, সমস্ত পৃথিবী যাঁহাদিগকে ভক্তি করে, যাহাদিগের নিকট হইতে পরিত্রাণের সাহায্য লাভ করিয়াছে, সেই সকল সাধুর নিকট পাপীর ন্যায় পরিত্রাণপ্রার্থী হইয়া যাইব; জীবের সহায় হইয়া একত্র বসিতে চেষ্টা করিব না, এক আসনে বসিব না।':

'জীবনবেদ অর্থাৎ শ্রীমদ্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নিজমুখবিবৃত স্বীয় জীবনতত্ত্ব'—সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত [ ১৯৫৪ ], পৃ. ১৫২।

৭২। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এই অভিযোগ তর্কসাপেক্ষ। কারণ পরবর্তী কালে ভক্তমণ্ডলীর নিকট স্বীয় জীবনতত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন : 'অধীন হওয়াকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। আমাতে যাহা ঘৃণা করি, অন্যেতে তাহা ঘৃণা করি না ? দলের সামান্য কাহাকেও আমি অধীন দেখিতে পারি না। কেহ যে অন্যের অধীন হইবে তাহা দেখিতে পারি না ; আমার অধীন যদি কেহ হয়, তাহাও আমার অত্যন্ত অসহ্য। অন্য একজন মনুষ্য আমার অধীন হইবে ? পিতার নিকট আমি কি উত্তর দিব ? আমার মত আর একজনের ঘাড়ে আমি চাপাইব ? আমার শাসনে অপরকে শাসিত করিব ? মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া দলে আনিবার চেষ্টা করিব ? অপরকে আমি আমার অধীন করিয়া রাখিব ? ইহাতে নরক আমাকে হা করিয়া গিলিবে ; স্বর্গও লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিবে। আমার যদি দল না হয়, একজনও যদি কাছে না থাকে, নিজে যখন দাস নই, তখন অপরকেও দাস করিব না।' তদেব। পৃ. ৪১-৪২।

৭৩। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। 'তখন মহারাজের কিঞ্চিৎ ন্যূন ১৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল, এবং সুনীতি দেবীর চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইতে কয়েক মাস অবশিষ্ট ছিল।' গৌরগোবিন্দ রায় : 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র', ২য় খণ্ড [ ১৯৩৮ ], পৃ. ১১৮৩।

৭৪। "Noting the anti-caste 'levelling' attitude and the 'mass' tendency of the Brahmo Movement, and in order to arrest its growing power, the Government wanted to link it up permanently with a feudal power. They negotiated a marriage between the eldest daughter of Keshub and a feudal prince, the Young Maharaja of Cooch Behar [ 1877 ]." Jogananda Das: 'The Brahmo Samaj' [ In *Studies in the Bengal Renaissance*—ed. by Atulchandra Gupta, 1958], p. 496.

৭৫। 'গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই সম্বন্ধের ঘটকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।…এই সম্বন্ধে আচার্য্য [ কেশবচন্দ্র ] অমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন বিবাহের

ঘটক চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান, এবং ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে ইহা জ্ঞাপন করেন। কিয়দ্দিন পর কুচবিহারের ডিপুটী কমিশনার শ্রীযুক্ত ডেল্‌টন সাহেব কলিকাতায় আসিয়া, আচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, পুনর্ব্বার এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন।' গৌরগোবিন্দ রায়: 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র', ২য় খণ্ড [ ১৯৩৮ ]: পৃ. ১১৮১—১১৮২।

৭৬। এই বিবাহ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার 'আত্মচরিত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন: 'সংবাদ পাওয়া গেল—প্রথম, কেশববাবু কন্যা সম্প্রদান করিতে পাইলেন না। দ্বিতীয়, বিবাহে রাজপুরোহিত ব্রাহ্মণগণ পৌরোহিত্য করিলেন, গৌরগোবিন্দ রায় উপস্থিত ছিলেন মাত্র, কিছু করিতে পান নাই। তৃতীয়, বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা হইতে পারিল না। চতুর্থ, বিবাহে অগ্নি জ্বালিয়া হোম হইল, বর সেখানে থাকিলেন, কন্যাকে উঠাইয়া লওয়া হইল। পঞ্চম, বিবাহস্থলে রাজকুলের প্রথানুসারে হরগৌরী নামক দুইটি পদার্থ স্থাপন করা হইল, প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বন্ধুগণের বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহা অন্তর্হিত করা হইল না, ইত্যাদি।'

৭৭। এই বিবাহ-বিধি অনুসারে বর-কনেকে বিবাহের সময়ে স্বীকৃতি দিতে হয়: 'আমি হিন্দু নহি, মুসলমান নহি, খ্রীষ্টানও নহি' ['I am not a Hindu, not a Mussalman, not a Christian' ]। তাহা ছাড়া বিবাহকালে বর-কনের বয়স যথাক্রমে ১৮ এবং ১৪ বছরের কম হইলে চলিবে না।

৭৮। 'জীবনবেদ অর্থাৎ শ্রীমদ্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নিজমুখ-বিবৃত স্বীয় জীবনতত্ত্ব'—সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত [ ১৯৫৪ ], পৃ. ১৩৬।

৭৯। তদেব। পৃ. ৬৯।

৮০। শিবনাথ শাস্ত্রী: 'আত্মচরিত' [ ১৩৫৯ ], পৃ. ১৫২।

৮১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নামকরণ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, —"নূতন সমাজের নামটা কি হয়, নামটা কি হয়, আমাদের মধ্যে কিছুদিন এই আলোচনা করিয়া, অবশেষে একদিন কতিপয় বন্ধু মিলিয়া আমরা মহর্ষির চরণ দর্শন করিতে গেলাম। তিনি তখন চুঁচুড়া শহরে গঙ্গাতীরস্থ এক ভবনে একাকী বাস করিতেছিলেন। তিনি 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামটা শুনিয়া বলিলেন, 'বেশ হয়েছে। আমাদের সমাজের নাম 'আদি' সমাজ, আমরা কালে আছি। কেশববাবুর সমাজের নাম 'ভারতবর্ষীয়' সমাজ, তাঁরা দেশে আছেন। তোমরা দেশ কালের অতীত হইয়া যাও।' সেখান হইতে আমরা

নূতন সমাজের নাম 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' রাখা স্থির করিয়া আসিলাম।" তদেব। পৃ. ১৫২-১৫৩।

৮২। 'সমদর্শী' [ অগ্রহায়ণ, ১২৮১ ], পৃ. ১৭।

৮৩। তদেব। [ ভাদ্র, ১২৮২ ], পৃ. ৪৬৪-৬৫।

৮৪। শিবনাথ শাস্ত্রী : 'আত্মচরিত' [ ১৩৫৯ ], পৃ. ১১৫।

৮৫। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ যে একত্র মিলিত হইয়া সমাজ-সংক্রান্ত সকল কার্যের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় 'তত্ত্বকৌমুদী' [ ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক। পৃ. ৩ ] পত্রিকার নিম্নোদ্ধৃত বিবরণে : 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যখন জন্ম হয়, তখন অনেকে অনেকপ্রকার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। ...আশঙ্কাকারীদের প্রথম আশঙ্কা এই ছিল যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রভূত শক্তি ও প্রতিভাশালী একজন নেতা নাই, সুতরাং ইহারা একত্রে থাকিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন না। গত দুই বৎসরে আমরা কি দেখিতেছি ? যে এরূপ কোন নেতা না থাকিলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ মিলিত হইয়া সকল-প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা কোন লোকের আকর্ষণে আকৃষ্ট হন নাই, কিন্তু সত্যের বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহারা ক্রমে নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর গুণসকল অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছেন। আর কিছু না হয় এক ব্যক্তির উপর নির্ভর না করিলে চলিবে না এই কুসংস্কারটি যদি ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলেও পরম মঙ্গল।'

৮৬। বিপিনচন্দ্র পাল : 'নবযুগের বাংলা'

৮৭। 'কেশবচন্দ্র নারীদিগকে উচ্চ গণিত, জ্যামিতি, লজিক প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলম্বিত অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেন না। তিনি শিক্ষা বিষয়ে পুরুষে ও নারীতে ভেদ রাখিতে চাহিতেন, নারীগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া উচিত বোধ করিতেন না।' শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [ ১৩৬২ ], পৃ. ৩০০।

৮৮। 'অবলাবান্ধব' পত্রিকার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে এই পত্রিকায় দ্বারকানাথ লিখিতেছেন : 'এদেশীয় কুলকন্যাগণ জীবনে যে বিষম দুঃখ দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা যাঁহাদিগের চক্ষু আছে, তাঁহাদের অগোচর নাই। কিন্তু

যাহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ, তাঁহারা ইহা দেখিতে পান না। যদি একটি হৃদয়-বিদারক ঘটনা আমাদিগের চক্ষু প্রস্ফুটিত না করিত, হয়ত আমরাও আজীবন অন্ধই থাকিতাম। একটি পরমা সুন্দরী যুবতী কুলীন কন্যাকে তাঁহার আত্মীয়েরা বিষ প্রয়োগ করিয়া হত্যা করেন। তখন আমাদিগের বয়স সপ্তদশ বর্ষ। লোকপরম্পরায় এই ঘটনা আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইল। এইরূপে যাহার অপমৃত্যু ঘটিল, আমরা তাহাকে জানিতাম, সুতরাং আমাদিগের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। আমাদিগের জনৈক সমবয়স্ক ব্যক্তির নিকট শুনিতে পাইলাম, এরূপ ঘটনা বিরল নহে, প্রায় প্রতি বর্ষেই ঘটিয়া থাকে। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিলাম, তাঁহার কথা সত্য ; তৎপূর্ব্ব সপ্তদশ বৎসরে একটি গ্রাম হইতে ৩২।৩৩টি স্ত্রীলোকের এইরূপে মৃত্যু হইয়াছে। মানুষের হৃদয় এককালে পাষাণ না হইলে, এ অবস্থায় দ্রব না হইয়া পারে না। আমরা বাল্যকালে চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোক সকল পাঠ করিয়া স্ত্রীজাতির ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলাম। তাহাদিগকে সর্ব্বদা বিদ্রূপ ও উপহাস করিতে আমাদিগের আমোদ বোধ হইত। কিন্তু তখন বুঝিলাম, ইহারা উপহাসের পাত্র নহে, কৃপার সামগ্রী। এই সময় হইতে স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদিগের মমতা জন্মিল। তখন ভাবিলাম, যদি বিন্দু পরিমাণেও ইহাদের এই দুঃখ দুর্গতি দূর করিতে পারি, জীবন সার্থক হইবে। এই অভিপ্রায়েই অবলাবান্ধবের জন্ম হয়।' প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : 'বাংলার নারী-জাগরণ' [ ১৩৫২ ], পৃ. ৫৮–৫৯।

৮৯। শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [ ১৩৬২ ], পৃ. ৩০৪।

৯০। তদেব। পৃ. ২৯৯।

৯১। তদেব।

৯২। Jogananda Das : 'The Brahmo Samaj' : [ In *Studies in the Bengal Renaissance*—ed. by Atulchandra Gupta ] : Calcutta, 1958 : p. 502.

৯৩। শিবনাথ শাস্ত্রী : 'নব যুগের নব প্রশ্ন' : 'প্রবন্ধাবলি', ১ম খণ্ড [ ১৩১১ ], পৃ. ৬৩।

৯৪। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী এক বন্ধুর নিকট লিখিত পত্রে রামমোহন বলিতেছেন : '...I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to

promote their poiltical interest. The distinction of castes· introducing innumerable divisions and sub-divisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling.…" 'The Life and Letters of Raja Rammohun Roy': S. D. Collet

৯৫। শিবনাথ শাস্ত্রী: 'জাতিভেদ'

৯৬। শিবনাথ শাস্ত্রী: 'নব যুগের নব প্রশ্ন': 'প্রবন্ধাবলি', ১ম খণ্ড [ ১৩১১ ], পৃ. ৬০।

৯৭। এই বিষয়ে 'সমদর্শী' পত্রিকার মন্তব্য: 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাতি যাহাতে চিরকাল প্রভেদ থাকে তন্নিমিত্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে উপবীত গ্রহণের এক অভিনব ও আশ্চর্য্য প্রথা সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি যখন প্রথমে প্রস্তুত ও প্রচারিত হয় তৎকালে কেবল জাতকর্ম্ম, নামকরণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এই পঞ্চবিধ গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের নিয়ম করা হইয়াছিল, কিন্তু এখন উপনয়ন নামে আর একটি অনুষ্ঠান প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং উহা কেবল ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মদিগের প্রতিপাল্য।' [ মাঘ, ১২৮১ ], পৃ. ১২০।

৯৮। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী: 'ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয় ও কয়েকটী উপদেশ' [ ১৩৬০ ], পৃ. ৭।

৯৯। 'তত্ত্বকৌমুদী' [ ১লা আশ্বিন, ১৮০২ শক ], পৃ. ৮৬।

১০০। ১৮৮৩ সালে দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালোরে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক আর্কট নারায়ণস্বামী মুদেলিয়ারের অর্থানুকূল্যে 'Native Philanthropic Association for the Regeneration of Pariahs in Southern India' নামে একটি সংস্থা স্থাপন করিয়া অস্পৃশ্য ও অনুন্নত পারিয়া সমাজের উন্নতি সাধনের কার্য আরম্ভ করা হয়। ইহার পরবর্তী কালে মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক বিঠলরাম সিন্ধের উদ্যোগে বোম্বাইয়ে 'Depressed Classes Mission Society of India' এবং পুণায় 'All India Anti-Untouchability League' নামক সংস্থা দুইটির প্রতিষ্ঠা হয় এবং অস্পৃশ্যতা নিবারণে সাফল্যের সহিত আন্দোলন চলিতে থাকে।

১০১। 'হরিজন-আন্দোলনকে স্বীয় প্রতিভা কর্মশক্তি ও চরিত্রগৌরবের দ্বারা অসীম বলশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং উহাকে কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন পরবর্তী কালে মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু তৎপূর্বে তিনি

যে শিবনাথ শাস্ত্রীর শিষ্য বিঠলরাম সিন্ধে কর্তৃক সংগঠিত পশ্চিম ভারতের বিরাট অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন ইহা স্মরণে রাখা প্রয়োজন।' শিবনাথ শাস্ত্রী : 'জাতিভেদ'—দিলীপকুমার বিশ্বাস-সম্পাদিত সংস্করণের

১০২। বিপিনচন্দ্র পাল : 'চরিত চিত্র' [ ১৯৫৮ ], পৃ. ২৬২।

১০৩। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী : 'শিবনাথ শাস্ত্রী'

১০৪। তদেব। পৃ. ৩২-৩৩

১০৫। 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩২৬, পৃ. ৯৮।

১০৬। শিবনাথ শাস্ত্রী : 'আত্মচরিত [ ১৩৫৯ ], পৃ. ২৮৮।

১০৭। 'সাধনাশ্রমের ইতিবৃত্ত': ননীভূষণ দাসগুপ্ত [সাধন আশ্রম, ১৯৫২], পৃ ৩৪।,

১০৮। সাধনাশ্রমে সেবাপরায়ণ কর্মীদের মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, গুরুদাস চক্রবর্তী, অমৃতলাল গুপ্ত, চঞ্চলা ঘোষ, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, বিঠলরাম সিন্ধে, হরিনারায়ণ সেন প্রভৃতি কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১০৯। 'In 1891, some devout Brahmos of Calcutta, Prarnhari Das, Kshirodchandra Das, Indubhushan Roy and others started the remarkable Philanthropic institution, Dasasram [ society of servants ], a combined infirmary hospital, charitable dispensary and orphanage.' Jogananda Das : 'The Brahmo Samaj' [ In *Studies in the Bengal Renaissance*—ed. by Atulchandra Gupta]—Calcutta, 1958: P.504.

১১০। 'কেবলমাত্র সেবাধর্মমূলক জনকল্যাণকে বিষয়বস্তু করিয়া, ঐ বিষয়ে এদেশের ও বিদেশের চিন্তা, কর্ম ও প্রতিষ্ঠানের সহিত দেশবাসীকে মাতৃভাষার মধ্য দিয়া পরিচিত করাইয়া, অন্ধ-বর্ণমালা প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক ও গঠনমূলক প্রবন্ধাদি লিখিয়া, বাঙালী জাতির পুরুষ ও রমণীর মধ্যে সেবার প্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য সম্ভবত বাংলা ভাষায় 'দাসী'ই সর্বপ্রথম মাসিকপত্র।' যোগানন্দ দাস : 'রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন' [ ২য় সং ], পৃ. ২০৫।

১১১। বিপিনচন্দ্র পাল : 'চরিত-চিত্র' [ ১৯৫৮ ], পৃ. ২৬৯।

১১২। ঐ : 'নবযুগের বাংলা'

১১৩। তদেব। পৃ. ১২৮।

১১৪। তদেব। পৃ. ১২৫।

১১৫। এই সকল স্বদেশপ্রাণ দেশনায়কদের মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১১৭। ব্রাহ্ম-আন্দোলনের প্রবর্তক রামমোহন রায়ের বহু-কথিত বাণী: 'লোকহিত করে যেই জন সেই সত্য সেবিছে ঈশ্বর'।

## সপ্তম অধ্যায়

এক-একটা বিশেষ কালে এক-একজন মনস্বী ব্যক্তির মননধারা জনমানসে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই বিশেষ কালটিকে তৎকালীন চিন্তা-নায়কের নামে চিহ্নিত করার রীতি সাহিত্যে প্রচলিত। এই রীতির অনুবর্তন করিয়াই মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিনটি দশককে 'বঙ্কিম-যুগ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, সাহিত্যের ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের যে ভাবধারা অবলম্বন করিয়া যুগ-নির্দেশ করা হয় তাহা কোনো একক ব্যক্তিসত্তায় আকস্মিকভাবে বিকাশলাভ করে না। '...জাতির মগ্নচৈতন্যে যাহা ব্যাপ্ত বা বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, তাহাই কোন যুগ-সন্ধির মাহেন্দ্রক্ষণে, ব্যক্তিবিশেষে সংহত হইয়া—সেই জাতিরই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, প্রতিভার দিব্য শক্তিরূপে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে।'[1] বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন জাতীয় জীবনের প্রতিভূস্বরূপ এমনই একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি। একটা বিশেষ যুগে একটা বিশেষ জাতির বহুদিনের ভাবচিন্তা তাঁহার ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বঙ্কিমের বহু পূর্ব হইতেই বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রে অনেক চিন্তার বীজ ছড়াইয়া ছিল। বঙ্কিমের সময়ে তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়া জাতীয় জীবনে ক্রমে ক্রমে সবুজের নেশা ধরাইয়া দিয়াছে।

রামমোহন হইতে বঙ্কিম পর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমস্তটা জুড়িয়াই চলিয়াছে বাঙালীর মনোরাজ্যে ইংরাজ-প্রীতির প্রবল বন্যা। ইংরাজকে বাঙালী নবজাগরণের দূত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে—ইংরাজকে বিশ্বাস করিয়াছে—ইংরাজের বিচারকে মাথা পাতিয়া লইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী ইংরাজের অন্ধ অনুকৃতিতে গর্ব বোধ করিয়াছে—'বিলাতের কানা ফসেট্ সাহেবে'র মুখের দিকে চাহিয়া ইংরাজী লেখায় হাত পাকাইতে প্রয়াসী হইয়াছে—রেবেকা-হেনরিয়েটাদের রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া ইংরাজ-ললনা বিবাহ করার বিহ্বল স্বপ্ন দেখিয়াছে।

কিন্তু এই ব্যাপক আত্মবিস্মৃতির মধ্যেও বাঙালীর স্বাধীনতাস্পৃহা ও আত্ম-মর্যাদাবোধ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। প্রতিকূল পরিবেশে ক্ষণে ক্ষণে বাঙালীর 'মগ্নচৈতন্য' হইতে ইংরাজ-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিয়াছে। দেরাদুনে সরকারী কর্মরত বাঙালী তরুণ রাধানাথ শিকদারের কণ্ঠ শুদ্ধ করিয়া দিয়াছে প্রভুত্বস্পর্ধী ইংরাজ রাজকর্মচারীর ক্রুদ্ধ আস্ফালনকে, 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' বা

কালা-কানুনের বিরোধী শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের স্পর্ধিত অভিলাষকে কুণ্ঠাহীন ভাষায় ধিক্কার জানাইয়াছেন বাঙলার 'ডেমস্থিনিস' রামগোপাল ঘোষ, জর্জ টমসনের নেতৃত্বে সভাসমিতিতে ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে ইংরাজের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বাঙালীর অবরুদ্ধ বিক্ষোভ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এই যে উত্তেজনা, ইহাই আরও ব্যাপক এবং আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। সরকারী নানাপ্রকার ভেদনীতির প্রতিবাদে, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে, জাতীয় ভাবধারার উচ্ছ্বসিত প্রকাশে এই উত্তেজনার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু 'মরিয়া না মরে রাম!' সহস্র প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মধ্যেও বাঙালীর ইংরাজ-প্রীতি ও ইংরাজের উপর বিশ্বাস একেবারে লোপ পায় নাই। ইংরাজ-রাজত্ব থাকুক—কেবল ইংরাজের নিকট তাহার স্বজাতীয়ের ন্যায় এদেশের লোকও সমান মর্যাদা লাভ করুক, ইহাই ছিল সেকালের সংগ্রামী বাঙালীর একমাত্র কামনা। যত উত্তেজনা কেবল ইহারই জন্য।

ইংরাজের রাজ্য-শাসননীতির উপর দৃঢ় আস্থা রাখিয়া বাঙালী যে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিল, ইংরাজের ভেদ ও বৈষম্য-মূলক আচরণে তাহার সেই সাধের স্বপ্ন ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে, বিচারকার্যে এবং শিল্প ও কৃষি-সংক্রান্ত বিষয়ে ইংরাজ সরকার যে বিভেদমূলক নীতি অবলম্বন করিতেছিলেন, তাহাতে বাঙালীর মনে একটা মর্মদাহী বিক্ষোভ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল।

কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম দিকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় বাঙালী অনায়াসেই কোন-না-কোন চাকরি পাইয়া নিশ্চিন্তমনে জীবন যাপন করিতেছিল। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই সরকারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগ সম্বন্ধে শাসকশ্রেণীর মনোভাব পরিবর্তিত হইল। লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রথমে উচ্চ সরকারী পদ হইতে ভারতীয়দের বঞ্চিত রাখার নীতি অবলম্বন করিলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে ১৮৩৩ সালের সনদ [ Charter Act, 1833 ] অনুসারে এই নীতি পরিত্যক্ত হয় এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীরই যোগ্যতানুযায়ী সরকারী পদ লাভের অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৮৪৩ সাল হইতে এদেশের বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিয়োগ করা হইতে থাকে এবং পরে উচ্চ সরকারী পদের প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের রীতি অবলম্বিত হয়। কিন্তু কর্মচারী-নিয়োগে বৃটিশ বণিকতন্ত্রের এই

নীতিতে আপাতদৃষ্টিতে সমদর্শিতা প্রকাশ পাইলেও ইহার পশ্চাতে এক ধরনের ভেদনীতির খেলা চলিতেছিল। সমপদে নিযুক্ত ইংরাজ ও ভারতীয়ের মধ্যে বেতনের যথেষ্ট তারতম্য বজায় রাখিয়া কোম্পানী বাহাদুর সাদা ও কালোর মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে চাকরিজীবী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মনে একটা চাপা অসন্তোষ থাকিলেও তাহাদের সঙ্গে সরকারের কোনরূপ মৌলিক বিরোধ দেখা দেয় নাই। বিরোধের সূত্রপাত হয় পরবর্তী সময়ে নানা কারণে। '...বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে যত্নবান হইয়াছিলেন, তাহাদের ভাবাদর্শ এই সীমানা অতিক্রম করিয়া বিস্তৃতি লাভ করুক, ইহা কর্তৃপক্ষের কাম্য ছিল না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করিতেছিল এবং শাসক ও শোষিতের মধ্যে শুধুমাত্র সেতুবন্ধনের কাজে সন্তুষ্ট না থাকিয়া তাহারা সেতু নির্মাতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবী জানাইয়াছিল। তাছাড়া, প্রথম যুগে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট এই নূতন শ্রেণীর যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রয়োজনীয়তাও কমিয়া আসিতেছিল। সরকারী চাহিদার অনুপাতে উচ্চ-পদাভিলাষী শিক্ষিত ভারতীয়দের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছিল। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ভারসাম্য কিছুটা বিচলিত হইতে আরম্ভ করে।'[১২]

বেকার সমস্যার সম্মুখীন শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের মধ্যেই এই অস্থিরতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। জীবনযাত্রানির্বাহের নিশ্চিত ব্যবস্থার অভাবে তাহাদের মনে যে নৈরাশ্যবোধ দেখা দিয়াছিল, তাহা তাহাদিগকে একধরনের রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের প্রথম হইতেই বাঙলার শিক্ষিত যুবসমাজে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি একটা গভীর আত্মবোধ লক্ষিত হয়। এই নব্যশিক্ষিতের দল পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পাঠ করিয়া তাহারই আলোকে নিজেদের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। পাশ্চাত্যে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের চেতনা মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছিল, শিক্ষিত বাঙালীর মস্তিষ্কেও তাহার তরঙ্গাঘাত হইল। ইহার ফলে এদেশের মাটিতে স্বায়ত্ত-শাসনের অনুরূপ একটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চালু করার জন্য বাঙলার শিক্ষিত মহলে বেশ একটা সাড়া জাগিয়া উঠিল। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার ইহাতে প্রমাদ গণিলেন। বাঙলার তরুণগণ

এই সময় হইতেই শাসনকর্তৃপক্ষের অনেকটা নেকনজরে পড়িয়া গেল।[৩] কিন্তু ইহাতে দেশের পক্ষে মোটের উপর শাপে বরই হইল। একদা শাসনব্যবস্থায় বিদেশী শাসকদের সহিত দেশীয় লোকদের সমান অধিকার লাভের যে দাবি বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজ হইতে উত্থিত হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে সমগ্র ভারতের মুক্তিসংগ্রামে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে যে-সব ইংরাজ শাসনদণ্ড বা তুলাযন্ত্র হাতে লইয়া আসিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই ভারতবাসীকে 'নেটিভ' বা 'ব্ল্যাক নিগার' বলিয়া অবজ্ঞা করিত। এই সব নেটিভের কাহারও প্রতি কোনো ইংরাজ-প্রভু অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিবিধান প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িত। আইনের আশ্রয় লইলে বহু ক্ষেত্রেই বিচারের নামে ইংরাজ বিচারকগণ কেবল স্বজাতি-প্রীতিরই পরিচয় দিতেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের বিচারদৃশ্যটি এইরূপ বিচার-প্রহসনের দর্পণস্বরূপ।

আসলে এদেশে আগত শ্বেতাঙ্গগণ এতই উন্নাসিক ছিল যে, আইনের চোখেও দেশীয় লোকদের সহিত সমপর্যায়ভুক্ত হইতে তাহারা অপমান বোধ করিত। এই জন্যই ১৮৪৯-৫০ সালে যখন ভারতীয়দের ন্যায় ইউরোপীয়দেরও ফৌজদারী আদালতের বিচারাধীন করার আইন প্রণয়নের চেষ্টা হইল, তখন শ্বেতাঙ্গমহলে একটা তুমুল আলোড়ন উঠিল—তাহারা সকলেই এই আইনকে 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' বা কালা-কানুন বলিয়া বিক্ষোভ দেখাইতে লাগিল।[৪] রাজার জাত বলিয়া প্রভুশক্তির অহংকারে আইনের সমদর্শিতাকেও তাহারা উপেক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইল না।

বিচারকার্যে সমদর্শিতা প্রদর্শনের দাবি রামমোহনের সময় হইতেই উত্থিত হইয়াছিল। রামমোহন প্রকাশ্য-আদালতে সর্বসমক্ষে বিচারকার্য নিষ্পন্ন করার কথা বলিয়াছিলেন।[৫] ইহা ছাড়া, তিনিই প্রথম সরকারকে জুরিপ্রথা প্রবর্তন করার পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে বহু ব্যক্তিই আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের জন্য সরকারের নিকট দাবি জানাইয়াছেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি জনদরদী ব্যক্তির নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু 'ধর্মের কাহিনী' বা সৎপরামর্শ শুনিবার মতো সাধু মনোবৃত্তি তখনও বিদেশী সরকারের হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও বিচার-বৈষম্য বহু ক্ষেত্রেই লক্ষিত হইত। বাঙালীর লেখনী ইহার বিরুদ্ধে তীব্র

প্রতিবাদ জানাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'নীলদর্পণ' নাটকে পক্ষপাতদুষ্ট ইংরাজ বিচারকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া এবং শিশিরকুমার ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠায় ভারতীয় ও ইউরোপীয়ের মধ্যে আইনের সমতা [ Equality of law ][৬] দাবি করিয়া যে আন্দোলন সৃষ্টি করেন, তাহা বাঙলার সমকালীন জনচিত্তকে বিশেষভাবেই আন্দোলিত করিয়াছিল।

ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতেই ভারতের অর্থনৈতিক শোষণ শুরু হয়। বণিকের মানদণ্ড রাতারাতি রাজদণ্ড হইয়া উঠিলেও রাজ্য-শাসনের মধ্যে বণিকসুলভ মনোবৃত্তিই অধিকতর সক্রিয় ছিল। বণিক ইংরাজ শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে এদেশের শিল্পী ও ব্যবসায়ী সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভাঙিয়া দিয়াছিল। ইংরাজ-শাসনের পূর্বে এদেশ শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল, ব্যবসায়-বাণিজ্যেও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সুপ্রাচীন কাল হইতেই বাঙলা তথা ভারতবর্ষের কুটিরশিল্পজাত পণ্যদ্রব্যসমূহ শিল্পসুষমায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের নাগরিকদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছিল। ভারতের তুলা, পশম ও রেশমের বস্ত্র, পিতল-কাঁসার দ্রব্য ও অলংকারপাতি বিশ্বের বাজারে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিল—ঢাকাই মসলিন ও কাশ্মীরী শালের খ্যাতি তো ছিল সুদূরবিস্তৃত। ভারতের বিভিন্ন বন্দর হইতে বাণিজ্য-জাহাজগুলি এই সব পণ্যসম্ভার বহন করিয়া দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি জমাইত. বাঙলার দুইটি বিখ্যাত বন্দর—তাম্রলিপ্তি ও সপ্তগ্রাম সেদিন বাণিজ্য-কোলাহলে মুখর হইয়া থাকিত। কিন্তু ইংরাজ-বিজয়ের কিছুকালমধ্যেই এদেশের শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা বুঝিল—'তেহি নো দিবসা গতাঃ'। ইংলণ্ডের 'শিল্পস্বার্থের যূপকাষ্ঠে' ভারতীয় শিল্পকে বলি দেওয়া হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেই বিপ্লবের ঢেউ আসিয়া ভারতবর্ষের তটেও আঘাত করিল। ইহার অনিবার্য ফলস্বরূপ ভারতবর্ষ তাহার রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সমৃদ্ধিও হারাইয়া ফেলিল। বৈদেশিক মূলধনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছোটবড় নানা ধরনের কলকারখানা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। যন্ত্রদানবের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া দেশীয় হস্তশিল্প চরম অবক্ষয়ের পথ ধরিল। ইহা ছাড়া, বিলাতের কলকারখানায় প্রস্তুত নানাপ্রকার পণ্যসামগ্রী আসিয়া ভারতবর্ষের বাজার ছাইয়া ফেলিল। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব পণ্যদ্রব্যের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করা হইত ভারবর্ষের মাটি হইতেই।'…সে

সময়ে ভারতে নীল, তুলা, চা, কফি ইত্যাদির চাষ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার একমাত্র অর্থ ইহাই যে, ভারতবর্ষ রাতারাতি বৃটিশ কলকারখানার জন্য কাঁচামাল সরবরাহের এক সংরক্ষিত বাগিচায় রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে।'[৭] ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বহির্বাণিজ্যে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ রপ্তানী-কারক দেশ বলিয়া গণ্য হইত। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ভারতে আমদানী-বাণিজ্যই প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল। এইভাবে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশীয় কালা আদমীর কর্মপ্রচেষ্টাকে পর্যুদস্ত করিয়া শ্বেতাঙ্গ ইংরাজগণ অচিরেই কাঞ্চনকৌলীন্যের গর্বে স্ফীত হইয়া উঠিল।

প্রভুত্ববলে সৃষ্ট এই আর্থিক বৈষম্যের প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলার শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এদেশের লোক যাহাতে বৃটিশ সংস্রব ত্যাগ করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যে পুনরায় স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানাপ্রকার প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। ১৮৭৩-৭৪ সালে Mookerjee's Magazine নামক পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প [ The commerce and manufactures of India ] সম্বন্ধে ভোলানাথ চন্দ্র কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। একটি প্রবন্ধে তিনি লিখিতেছেন: The limb of native industry has broken,—it should be set right again for work. The Native English Vernacular Papers should preach for the founding of independent Native Banks, Native Companies and Corporations, Native Mills and Factories, and Native Chambers of Commerce in the Presidencies. They should denounce the insensate practice of preferring foreign goods to home-made manufactures. They should inculcate the discipline of self-denial and the cultivation of patriotic sentiments. [ 12th March, 1873 : p. 110 ]

১৮৭৫ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার একটি সংখ্যায় [ 7th Oct., 1875 : P. 3 ] মনীষী শিশিরকুমার ঘোষ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বিলাতী পণ্য বর্জনের উপরই এদেশের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা নির্ভর করিতেছে। তাঁহার মতে: The lesser India pays to England, the more she will be generously treated.···If India paid less, the English people would not much care to give the people some power ; and

if India paid nothing at all, they would not object to leave the country in our hands.

দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য কেবল লেখনী ধারণ করিয়াই বাঙালী সেদিন ক্ষান্ত থাকে নাই। কেমন করিয়া দেশকে আবার শিল্পসমৃদ্ধ করিয়া গড়িয়া তোলা যায়, তাহার জন্যও বিভিন্ন মহলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে আয়োজিত 'স্বাদেশিকের সভা'র অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় প্রচেষ্টায় কলকারখানা স্থাপন করিয়া দেশকে শিল্পশ্রী-মণ্ডিত করা। অবশ্য এই উদ্দেশ্যে যে-সকল কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল, তাহার ফল পর্বতের মূষিক প্রসবের মতোই অকিঞ্চিৎকর হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে এইরূপ দুইটি শিল্পপ্রচেষ্টার হাস্যকর পরিণতির কথা লিপিবদ্ধ আছে: "দেশলাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। ···অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দেশলাই তৈরি হইল। ভারতসন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে—আমাদের এক বাক্সে যে-খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা-ধরানো চলিত। আরও একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

"খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কি না তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না, কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, 'আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হইয়াছে।' বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য!"

কিন্তু এই ব্যর্থতাই এখানে বড় কথা নহে। বিদেশীর অর্থনৈতিক নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য যে সামান্য চেষ্টাটুকু হইয়াছিল, তাহার মূল্য অপরিসীম। বাঙলার ছেলে সেদিন শিল্পের ক্ষেত্রে ইংরাজ ও ভারতীয়ের বৈষম্য ঘুচাইবার

জন্য যে স্বনির্ভরতার আয়োজন করিয়াছিল, তাহার কোনো ফলই হয়তো হাতে-হাতে পাওয়া যায় নাই; কিন্তু এযুগের ভারতের ব্যাপক শিল্পায়ন-প্রচেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, সেদিনের বাঙালীর সেই ক্ষীণ চেষ্টাটুকুর ধারা একেবারেই মরুপথে হারাইয়া যায় নাই।

শিল্পের ন্যায় কৃষির ক্ষেত্রেও বাঙলা তথা ভারতবর্ষের উপর ইংরাজ তাহার প্রভুশক্তির খেলা খেলিয়াছে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতীয় সভ্যতার প্রায় সমস্তটাই কৃষিনির্ভর। ইংরাজ-বিজয়ের পূর্বে এদেশের কৃষকের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল—অন্ততঃ দুইবেলা সে পেট পূরিয়া খাইতে পাইত। কিন্তু ইংরাজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসে ভারতীয় কৃষককে ক্রমে ক্রমে দারিদ্র্যের নিদারুণ অভিশাপ বরণ করিয়া লইতে হইল। ইংরাজ-প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থায় ইহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে, ইংরাজ প্রভু এবং ভারতবর্ষের কৃষিজীবীরা ইংরাজের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য নিযুক্ত কৃষিমজুর মাত্র। ওয়ারেন হেস্টিংস উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের অনুপাতে কর-নির্ধারণের প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া স্বেচ্ছানুযায়ী উৎপাদন-নিরপেক্ষ কর ধার্য করেন। ইহাতেই রায়তদের উপর আর্থিক চাপ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহার উপর আবার পরবর্তী কালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত করিয়া দরিদ্র রায়তদের হাত-পা বাঁধিয়া অর্থগৃধ্নু জমিদারের হাতে সঁপিয়া দিলেন। রায়তেরা জমির মালিকানা হারাইয়া জমিদারের খেয়ালখুশির রসদ যোগাইতে নিঃস্ব হইয়া গেল, আর ওদিকে জমিদারের নিকট হইতে বৎসরান্তে নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করিয়া ইংরাজ সরকার পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটাইতে লাগিলেন। শুধু ইহাই নহে, সিপাহী-বিদ্রোহের পরে পরাধীন ভারতের জনগণের মুখের গ্রাসেও হাত পড়িল—ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর খাদ্যশস্য বিলাতে রপ্তানী হইতে লাগিল। একটি প্রচলিত সংগীতে এ সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে: 'ছিল ধান গোলা ভরা,/শ্বেত ইন্দুরে করল সারা।' সত্যই ইংরাজ শ্বেত-ইন্দুরের অত্যাচারে কৃষিসম্পদে সম্পন্ন ভারতবর্ষের শেষ পর্যন্ত অনশন ও অর্ধাশন সম্বল হইল।

দেশীয় প্রজাদের দুরবস্থা লইয়া আলোচনার সূত্রপাত হয় নব্যবঙ্গদের সময় হইতেই। নব্যবঙ্গের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি রসিককৃষ্ণ মল্লিক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁহার পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়-কুমার দত্ত পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থার বর্ণনা দিয়া জমিদারের অত্যাচারের

প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্র সেনও 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় জমিদার-কবলিত কৃষক-প্রজাদের দুঃখদুর্দশা সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ইহা ছাড়া, প্যারীচাঁদ মিত্রের *The Zemindar and the Ryot* [ ১৮৪৬ ], কিশোরীচাঁদ মিত্রের *The Ryot and the Zemindar* [ ১৮৫৯ ], সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *Bengal Ryots* [ ১৮৬৪ ], এবং রমেশচন্দ্র দত্তের *The Peasantry of Bengal* [ ১৮৭৪ ] প্রভৃতি প্রবন্ধে ও পুস্তকে বঙ্গদেশের কৃষককুলের শোচনীয় অবস্থার চিত্র তুলিয়া ধরা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি এই ধারাবাহিক আলোচনারই অনুবৃত্তিস্বরূপ। কৃষকগণ যে সমাজের একটা বিশিষ্ট অংশ—তাহাদের অবস্থা ও জমিদারদের অবস্থায় আশমান-জমিন ফারাক থাকায় যে সমাজের সমূহ অমঙ্গল দেখা দিয়াছে, ইহাই কৃষক-সম্বন্ধীয় সকল আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। উনিশ শতকের বাঙালী চিন্তাবিদ্গণ জমিদার ও রায়তে গুরুতর বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়ছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। এযুগে জমিদারী-প্রথা লোপ ও ভূমিসংস্কার-আন্দোলনের ভিতর দিয়া তাহারই মর্যাদা রক্ষিত হইতেছে।

কোম্পানীর আমলে বাঙলাদেশে নীলকর সাহেবদের প্রাদুর্ভাব হয়। বাঙলার কৃষককুল এই অত্যাচারী সাহেবদের কবলে পড়িয়া উৎসন্নে যাইতে থাকে। নীলকর ও কৃষকদের মধ্যে যে সম্বন্ধ দাঁড়ায় তাহা অনেকটা মার্কিন ক্রীতদাস-প্রথারই অনুরূপ। নীলকরগণ কৃষকদের মানুষ বলিয়াই গ্রাহ্য করিত না—কৃষক-গণ অনাহারে অর্ধাহারে ধ্বংসোন্মুখ হইলেও তাহাদের উপর জোর করিয়া নীলের দাদন চাপাইয়া দিত। কেহ কোনরূপ প্রতিবাদ করিলে তাহার আর রক্ষা থাকিত না, তাহাকে নীলকুঠিতে আটক রাখিয়া প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করা হইত। মানুষের প্রতি মানুষের এই অত্যাচার—মানুষে মানুষে এই বৈষম্য ইংরাজজাতির ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। বাঙালীর মনীষা এই অত্যচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে সংকুচিত হয় নাই। মনীষী অক্ষয়-কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠায় নীলকর-কবলিত রায়তদের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা দিয়া তাহাদের প্রতি জনচিত্তের সমবেদনা আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নীলবিদ্রোহের সময় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অকুণ্ঠ প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। সর্বশেষে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে কৃষক ও ভদ্রশ্রেণীর লোকদের প্রতি নীলকর সাহেবদের অমানুষিক উৎপীড়নের কলঙ্কময় চিত্র অঙ্কিত হয়

[১৮৬০]। এই নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া বাঙলার জনসাধারণ নীলকরদের নিষ্ঠুরতার নিন্দায় মুখর হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া, এই নাটকের মধুসূদন দত্ত-কৃত ইংরাজী অনুবাদ প্রচারিত হইলে এদেশের অত্যাচারিত কৃষকদের প্রতি বিলাতেরও উদারপ্রাণ ব্যাক্তিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং তাঁহাদের অনেকেই নীলকরদের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করিতে থাকেন। ইহার ফলে কিছুকালের মধ্যেই মানবিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া এই অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। এদেশে নীলের ব্যবসায় করিতে আসিয়া শ্বেতাঙ্গগণ যে স্পর্ধিত বৈষম্যবোধের পরিচয় দিয়াছিল, বাঙালীর লেখনীবলে তাহা শেষ পর্যন্ত অবদমিত হইয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের সর্বত্রই ইংরাজ শাসকদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই সময়কার প্রধান ঘটনা সিপাহী-বিদ্রোহ [ ১৮৫৭ ]। বাঙালী অবশ্য এই বিদ্রোহের নিন্দাই করিয়াছে এবং ইংরাজের বিজয়লাভে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া, সমকালীন বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহে ইংরাজের বলবিক্রমের পরিচয় পাইয়া বাঙালী ইংরাজ সরকারকে সোল্লাস অভিনন্দন জানাইয়াছে। শিখযুদ্ধজয়ী ইংরাজকে বার বার ধন্যবাদ জানাইয়া গুপ্ত-কবি কবিতা রচনা করিয়াছেন:

'ধন্য লর্ড গবর্ণর, ধন্য চিপ কমেণ্ডর,
ধন্য ধন্য অন্য সেনাপতি।
ধন্য ধন্য সৈন্য সব, ধন্য ধন্য ধন্য রব,
ধন্য ধন্য ব্রিটিশের রতি ॥

শত্রুচয় পেয়ে ভয়, রণে হয় পরাজয়,
সমুদয় হলো ছারখার।
শতদ্রু সলিল অঙ্গে, রুধির তরঙ্গ রঙ্গে,
বিভূষিত শীকশবহার ॥' [ 'যুদ্ধের জয়' ]।

কিন্তু একটা কথা। ইংরাজ-রাজত্বের অবসান কামনা না করিলেও বাঙালী এই সময়ে স্বাজাত্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং দেশের শাসন-ব্যাপারে বিদেশীর সহিত সমান অংশীদার হইয়া পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করিতে চাহিয়াছিল। এই জন্যই দেখিতে পাই, ইংরাজের বলবিক্রমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেও গুপ্ত-কবি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুরকে

স্নেহ করিতে বলিয়াছেন। রঙ্গলাল তাঁহার 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' [১৮৫৮] কাব্যে রাণা ভীমসিংহকে দিয়া স্বাধীনতার 'উৎসাহ-বাক্য' ঘোষণা করাইয়াছেন :

'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায় ?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায় !
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ তায় হে, স্বর্গ-সুখ তায় !'

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরাজপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরবর্তী কালে ইংরাজকে এই বিদ্রোহ হইতে যথোচিত শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছেন : The mutinies have made patent to the English public what must be the effects of politics in which the Native is allowed no voice.'[৮]

বলা বাহুল্য, বাঙালীর এই স্বাজাত্যবোধ ও রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থায় ইংরাজের সহিত সমানাধিকার লাভের দাবিই পরিণামে স্বদেশের শৃঙ্খলমুক্তির সাধনায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দুমেলা' [ ১৮৬৭ ] বাঙালীর অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহার দুন্দুভি-সংকেত। এই মেলার উদ্বোধনকালে মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র নাটক'-এ প্রযুক্ত যে গানটি গাওয়া হয়, তাহাতে পরাধীনতার দুঃসহ মর্মজ্বালা অভিব্যক্ত :

'দিনের্ দিন্ সবে দীন্, হ'য়ে পরাধীন্।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ !...
তাঁতি, কর্ম্মকার করে হাহাকার্,
সূতা, জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার্,—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র, বিকায় নাকো আর্,
হ'লো দেশের কি দুর্দ্দিন্।
আ'জ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
বিদেশী বাস্ বিনা, কিসে রবে লাজ্ ?
ধ'র্ব্বে কি লোক্ তবে দিগম্বরের সাজ্—
বাকল্, টেনা, ডোর্, কপিন্ ?
ছুঁই, সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দীয়াশালাই কাটী, তাও আসে পোতে—
প্রদীপটী জ্বালিতে ; খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক্ নয় স্বাধীন্ !'

এই মেলা-আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশপূজা। ইংরাজকে তাড়াইয়া স্বদেশকে মুক্ত করিতে হইলে বাহুবলের প্রয়োজন ; এইজন্য ব্যায়াম-চর্চা ও অস্ত্র-ব্যবহারশিক্ষার আয়োজন হইল। কিন্তু দেশের লোকের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর করিতে না পারিলে বাহুবলের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে ; অতএব দেশীয় শিল্প এবং কৃষির চরমোৎকর্ষ সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল—'স্বদেশের বিপণি হইতে বিদেশের পণ্যকে বহিষ্কৃত' করার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

বাঙালীর এই যে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা, ইহার মূলে রহিয়াছে মানব-মর্যাদাবোধ। মানুষ—সে শ্বেতাঙ্গ ইংরাজই হউক আর কৃষ্ণকায় ভারতবাসীই হউক— বিশ্বরাজ্যে বিশ্বেশ্বরের নিকট সকলেই সমান, সকলেরই স্বাধীনভাবে বাঁচিয়া থাকার অধিকার আছে। দৈবচক্রে ইংরাজ ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে বলিয়া চিরদিনই সে ভারতবাসীকে মানবাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দাবাইয়া রাখিবে, ইহা অসহনীয়। অধিকারসাম্য স্থাপনের এই আকূতিই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছিল।

বস্তুতঃ উনিশ শতকের সমস্তটা জুড়িয়াই বাঙালীর ধর্মসাধনে, রাষ্ট্রব্যাপারে ও সমাজব্যবস্থায় সাম্য স্থাপনের প্রচেষ্টা চলিয়াছে। সর্বজনীন ধর্মমত প্রচার করিয়া, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার দাবি তুলিয়া, লাঞ্ছিত নারীত্বের পুনরুদ্ধার-বাসনায় সতীদাহপ্রথার বিলোপ সাধনে সহায়তা করিয়া রামমোহন ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিয়াছেন। ইয়ংবেঙ্গলগণ সংস্কারমুক্ত সমাজগঠনের আন্দোলন শুরু করিয়া সাম্যভিত্তিক মানবতাবোধের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের নারীমুক্তি-আন্দোলনে সামাজিক বৈষম্যের একটি অচলায়তন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের চেষ্টায় বাঙালীর ধর্ম ও সমাজ-চিন্তায় সাম্যবোধ সঞ্চারিত হইয়াছে, রাষ্ট্রভাবনায় সাম্যাদর্শী জাতীয়তাবোধ স্থান পাইয়াছে। অবশেষে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সর্বসম বিশ্বাত্মবোধের উদার প্রান্তরে বাঙালী মনীষার সমুজ্জ্বল উত্তরণ ঘটিয়াছে।

বাঙালীর এই মানসযাত্রার পথরেখা অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, পথের পরে বর্ষিত হইয়াছে পাশ্চাত্ত্যের অজস্র আলোকধারা। সেই আলোকে পথ দেখিয়াই উনিশ শতকের বাঙালী অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে সাম্য ও মানবতার অভিমুখে। রুশোর সাম্যাদর্শী মতবাদ বাঙালীকে রাষ্ট্র ও সমাজের নূতন অর্থ খুঁজিতে প্রেরণা যোগাইয়াছে, রুশো-প্রভাবিত ফরাসী-বিপ্লব তাহাকে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, বেন্থাম ও মিলের হিতবাদ

তাহাকে মানবকল্যাণে ব্রতী করিয়াছে, কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ তাহার সম্মুখে মানব-মহিমার দ্বার অপাবৃত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের এই বিপুল আলোকবন্যার মধ্যেও বাঙালী-হৃদয়ের মাটির প্রদীপটি তাহার সমুজ্জ্বল দীপ্তি বিকিরণ করিয়া চলিয়াছে। বাঙালীর ঐতিহ্যগত চিরন্তন সাম্য ও মানবতা-বোধ—কুসংস্কার ও আচারের কৃষ্ণমেঘে যাহা দীর্ঘকাল অবলুপ্ত ছিল—তাহাই সহসা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার স্পর্শে পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া বাঙালীকে মনুষ্যত্বের পথ প্রদর্শন করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সেই পথে বাঙালীর অভি-নিষ্ক্রমণ, দ্বিতীয়ার্ধে বিজয়যাত্রা। বঙ্কিম-মনীষায় এই যাত্রারই শঙ্খনাদ ঘোষিত হইয়াছে।

বঙ্কিম-সাহিত্যের একটি প্রধান উপজীব্য—সাম্যবোধ। প্রবলের শক্তি-দম্ভের প্রতি রূঢ় উপেক্ষা প্রকাশে, সামাজিক নানাপ্রকার বৈষম্যের তীব্র প্রতিবাদে, রাষ্ট্রীয় শোষণ ও কুশাসনের প্রতি নিঃশঙ্ক ধিক্কারে বঙ্কিমের প্রবন্ধ ও উপন্যাসে সাম্যভিত্তিক বলিষ্ঠ মানবতাবোধের স্পষ্ট রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেযুগে পরমুখাপেক্ষিতার দৈন্যাহত জীবনযাত্রায় যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল, বঙ্কিমের রচনায় তাহার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটিয়াছে। পরবশ্যতার নাগপাশে বদ্ধ জাতীয় জীবনে দেশমাতৃকার যে মুক্তিবাণী ধ্বনিত হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীতে তাহাই সোৎসাহে উদ্গীত। এক কথায়, সর্ববিধ ক্লৈব্যের অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য যুগমানসে যে আর্তি দেখা দিয়াছিল, বঙ্কিমের লেখনী তাহাই স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছে এবং যত কিছু অসাম্য ও ভেদবুদ্ধি, তাহার বিরুদ্ধে উদ্যত হইয়া সমত্বসাধনার ইঙ্গিত দিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাঙলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' [ ১৮৬৫ ]। এই উপন্যাসে পাঠনরাজ কতলু খাঁর বলদৃপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বন্দী বীরেন্দ্রসিংহ যে শঙ্কাহীন মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সমকালীন জনমনের অত্যাচারবিরোধী দৃঢ় সংকল্পের সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়াছে। প্রাসঙ্গিক বর্ণনাটি এস্থলে উদ্ধৃতিযোগ্য :

"কয়েকজন শস্ত্রপাণি প্রহরী বীরেন্দ্রসিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দরবারে আনীত করিল। বীরেন্দ্রসিংহের মূর্ত্তি রক্তবর্ণ, কিন্তু তাহাতে ভীতিচিহ্ন কিছু-মাত্র নাই। প্রদীপ্ত চক্ষুঃ হইতে অগ্নিকণা বিস্ফুরিত হইতেছিল; নাসিকারন্ধ্র বর্দ্ধিতায়তন হইয়া কম্পিত হইতেছিল। দন্তে অধর দংশন করিতেছিলেন।

কতলু খাঁর সম্মুখে আনীত হইলে, কতলু খাঁ বীরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বীরেন্দ্রসিংহ! তোমার অপরাধের দণ্ড করিব। তুমি কি জন্য আমার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলে?'

বীরেন্দ্রসিংহ নিজ লোহিত-মূর্ত্তি-প্রকটিত ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন, 'তোমার বিরুদ্ধে কোন্ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা অগ্রে আমাকে বল।'

একজন পারিষদ কহিল, 'বিনীতভাবে কথা কহ।'

কতলু খাঁ কহিলেন, 'কি জন্য আমার আদেশমত আমাকে অর্থ আর সেনা পাঠাইতে অসম্মত হইয়াছিলে?'

বীরেন্দ্রসিংহ অকুতোভয়ে কহিলেন, 'তুমি রাজবিদ্রোহী দস্যু; তোমাকে কেন অর্থ দিব? তোমায় কি জন্য সেনা দিব?'

দ্রষ্টৃবর্গ দেখিলেন, বীরেন্দ্র আপন মুণ্ড আপনি ছেদনে উদ্যত হইয়াছেন।

কতলু খাঁর ক্রোধে কলেবর কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি সহসা ক্রোধ সংবরণ করিবার ক্ষমতা অভ্যাসসিদ্ধ করিয়াছিলেন; এজন্য কতক স্থিরভাবে কহিলেন, 'তুমি, আমার অধিকারে বসতি করিয়া, কেন মোগলের সহিত মিলন করিয়াছিলে?'

বীরেন্দ্র কহিলেন, 'তোমার অধিকার কোথা?'

কতুল খাঁ আরও কুপিত হইয়া কহিলেন, 'শোন্ দুরাত্মা! নিজ কর্ম্মোচিত ফল পাইবি। এখনও তোর জীবনের আশা ছিল, কিন্তু তুই নির্ব্বোধ, নিজ দর্পে আপন বধের উদ্যোগ করিতেছিস।'

বীরেন্দ্রসিংহ সগর্ব্বে হাস্য করিলেন; কহিলেন, 'কতলু খাঁ—আমি তোমার কাছে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি, তখন দয়ার প্রত্যাশা করিয়া আসি নাই। তোমার তুল্য শত্রুর দয়ায় যার জীবন রক্ষা,—তাহার জীবনে প্রয়োজন?'

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্বাধীনতা-অপহরণকারী বিদেশীর দয়ায় জীবনরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বাঙালীর মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, বীরেন্দ্রসিংহের উক্তিতে তাহারই প্রতিধ্বনি।

বঙ্কিমচন্দ্রের, 'আনন্দমঠ' [১৮৮৪] অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের নিত্যকালের প্রতিবাদ। 'যে রাজা রাজ্য পালন করে না, যে শাসনব্যবস্থায় লোক অকাতরে দুর্ভিক্ষের তাড়নায় প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, যে ব্যবস্থায় মানুষ ঘাস লতাপাতা, শিয়াল কুকুর খাইতে বাধ্য হয়, যেখানে জীবনের কোন মূল্য নাই এবং যেখানে জাতি-ধর্ম মান-সম্ভ্রম এমন কি বাঁচিবার অধিকার পর্যন্ত অস্বীকৃত,

বঙ্কিমচন্দ্রের সন্তানগণ সেই রাজা এবং শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সেই অকুণ্ঠ অরাজকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, এবং সেই সংগ্রামে নিশ্চিত জয়লাভ করে। আর শুধুই জয়লাভ নয়, ন্যায়ধর্মের আদর্শ স্থাপন করিতেও তাহারা সমর্থ।[৯] বঙ্কিমের সমসাময়িক জাতীয় জীবনে যে অবিচার ও অত্যাচারের বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া রুদ্ধ ক্ষোভে ফাটিয়া পড়িতে চাহিয়াছিল, তাহাই সন্তানদের বীরধর্মকে আশ্রয় করিয়াছে। প্রভুত্বস্পর্ধী ইংরাজের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে উচ্চারিত সে-যুগের জনমন-মথিত বাণী সন্তানকণ্ঠ-নিঃসৃত 'বন্দে মাতরম্' সংগীতে প্রাণ পাইয়াছে।

মুসলমান-রাজত্বের অবসানে ইংরাজ-শাসনের সূচনা। এই পতন-উত্থানের সন্ধিক্ষণে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। ভূম্যধিকারীর দুর্বিষহ অত্যাচারে প্রজার চোখের জলে প্লাবন নামিয়া আসে। এই পটভূমিকা বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরাণী' [১৮৮৪] উপন্যাসে এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে: '...কাছারির কর্ম্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ী লুট করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পূরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ্, সর্ব্বসমক্ষে তাহা প্রাপ্ত করায়।' এই পটভূমিকায়ই বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস লিখিত। এই উপন্যাসে ভবানী পাঠক দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে ব্রতী। সদলবলে ডাকাতি করিয়া তিনি এই ব্রত পালন করেন। ইহা তাঁহার সর্বভূতে আত্মবোধের বলিষ্ঠ প্রকাশ মাত্র।[১০] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাধারণ বাঙালীর মনে জমিদারের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ জাগিয়াছিল—ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিপুল বৈষম্যের ফলে দেশের মধ্যে যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই যেন ভবানী পাঠকের দস্যুবৃত্তির মধ্যে আদর্শ অনুসন্ধান করিয়াছে। বাঙালীর নবজাগ্রত সাম্যবোধ পাঠক-ঠাকুরের সর্বভূতাত্মক প্রীতিতে রূপ পরিগ্রহ করিয়া শ্রেণী-বৈষম্যের নিরসনকল্পে শক্তিমত্তার আশ্রয় লইতে চাহিয়াছে।

জমিদার-নিপীড়িত বাঙলায় কৃষকগণ চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিল।

জমিদারের অপরিসীম বিত্তদম্ভের নিকট অসহায় কৃষককুল তাহাদের ক্ষীণ অস্তিত্বটুকুও বলি দিতে বাধ্য হইত। উনিশ শতকের বাঙলার এই গুরুতর শ্রেণী-বৈষম্যের বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন: 'জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দ্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।'

জমিদারের এই অমানুষিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লইয়াও কোনো ফল হইত না। জমিদার সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও আদালতের বিচারে শেষ পর্যন্ত অব্যাহতি লাভ করিতেন। এই পক্ষপাতমূলক বিচার-প্রহসনের বিরুদ্ধে ঐ একই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল: 'আইন আছে—সে আইনে অপরাধী জমীদার দণ্ডনীয় হয় না কেন? আদালত আছে —সে আদালতে দোষী জমীদার চিরজয়ী কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না? যে আইনে কেবল দুর্ব্বলই দণ্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাটিল না—সে আইন আইন কিসে?' ঐ প্রবন্ধেই আরও একটু পরে দরিদ্র-দলনকারী এই ইংরাজী আইনের প্রতি বঙ্কিমের তীব্র কটাক্ষ বর্ষিত হইয়াছে: 'আমাদিগের দেশে ভাল আইন ছিল না, বিলাত হইতে এখন ভাল আইন আসিয়াছে।······দেশের শ্রীবৃদ্ধির আর সীমা নাই, সর্ব্বত্র আইনমত বিচার হইতেছে। আর কেহ বেআইনি করিয়া সুবিচার করিতে পারে না। তাহাতে দীন দুঃখী লোকের একটু কষ্ট, তাহারা আইনের গৌরব বুঝে না, সুবিচার চায়। সে কেবল তাহাদিগের মূর্খতাজনিত ভ্রম মাত্র।'

ধনী ও দরিদ্রে—পুঁজিপতি ও নিঃস্বে চিরকালই একটা দুস্তর ব্যবধান। এই ব্যবধান হ্রাস করিবার জন্য ধনবণ্টনের বিভিন্ন রীতি লইয়া বহুকাল হইতেই

পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের চিন্তাপ্রসূত সাম্যাদর্শী মতবাদসমূহ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিত বাঙালীর মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ইহার উপর আবার পাশ্চাত্ত্যের শ্রমিক-আন্দোলনের ঢেউও এই শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙালীর চিন্তাস্রোতে আলোড়ন তুলিয়াছিল। ইহার ফলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি চিন্তাশীল বাঙালীর একটা প্রবল ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিড়াল' প্রবন্ধটিতে ইহা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। কমলাকান্ত ও বিড়ালের কথোপকথনের ভিতর দিয়া বঙ্কিম সে-যুগের সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার মৌলিক পরিচয় দিয়াছেন। কমলাকান্তের প্রতি সর্বহারা নিঃস্বের প্রতিনিধি বিড়ালের উক্তিতে শ্রেণী-বৈষম্যের বিরুদ্ধে শাশ্বত জিজ্ঞাসা: 'তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই?......এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব।...... চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন?...... পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন?... ... সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?'

ভুখা-ভগবানের আহ্বানে ক্ষুধিত মানবের এই বিদ্রোহই এযুগে দেশে দেশে শ্রেণী-সংগ্রামে রূপ পরিগ্রহ করিতেছে।

দরিদ্রের বক্ষোরক্ত শোষণ করিয়া ধনীর ইমারত গড়িয়া উঠে। বহুকথিত এই উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে স্বীকৃতি পাইয়াছে। বাঙলার জনসাধারণের কষ্টার্জিত অর্থ যে একদা মোগলের রাজৈশ্বর্য প্রকাশে ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন: 'যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদসাগরে ভাসি, তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া এই রত্নমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য? তক্তভাউসের কথা পড়িয়া যখন মোগলের প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে? যখন জুমা মসজিদ, সেকন্দরা, ফতেপুরসিকরি বা বৈজয়ন্তভুল্য শাহা জাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মোগলের জন্য দুঃখ হয়, তখন কি মনে হয় যে, বাঙ্গালার কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে?'

কিন্তু ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে শ্রেণীগত বৈষম্য, বঙ্কিমের মতে তাহা অনিবার্য। তিনি দারিদ্র্যকে 'সমাজ সংস্থাপনেরই ফল' বলিয়াছেন। মনীষী রুশোর অভিমত অনুসরণ করিয়া 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন: 'অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহে—বনের ফলমূল, বনের পশু, সকলেরই প্রাপ্য; নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া, সকলেরই ভোগ্য। আহার্য্য, পেয়, আশ্রয়, শরীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক কেহ কামনা করে না, কেহ আবশ্যকীয় বিবেচনা করে না, কেহ সংগ্রহ করে না। অতএব একের অপেক্ষা অন্যে ধনী নহে, একের অপেক্ষা অন্যে কাজে কাজেই দরিদ্র নহে। কাজে কাজেই অসামাজিক অবস্থা দারিদ্র্যশূন্য। দারিদ্র্য তারতম্যঘটিত কথা; সে তারতম্য সামাজিকতার নিত্যফল। দারিদ্র্য সামাজিকতার নিত্য কুফল।' অবশ্য এই নিত্য কুফলের মাত্রা যে কমানো যাইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ইউরোপের তৎকালীন 'সোশিয়ালিষ্ট' ও 'কম্যুনিষ্ট' আন্দোলনের প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাবিদ্। বিংশ শতাব্দীর সাম্যবাদী আন্দোলন তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই। তাহা ছাড়া, মার্ক্স-এঙ্গেল্সের মতবাদসমূহ তৎকালে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়া যথেষ্ট প্রচারিত না হওয়ায়[১১] তাঁহাদের সাম্যবাদী চিন্তাধারার সহিতও তিনি সম্যক্ পরিচিত ছিলেন না। এইজন্যই হয়তো শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের কথা তাঁহার রচনায় স্থান পায় নাই। না পাইলেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তিনি শোষণক্রিয়াকে নিন্দাই করিয়াছেন এবং দারিদ্র্যকে সমাজব্যবস্থার কুফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রেণীগত বৈষম্য ঘুচিয়া গিয়া মানবসমাজে পরিপূর্ণ সাম্য স্থাপিত হউক, এইরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা যে তাঁহার মানবদরদী চিত্তের একাংশে স্থান পাইয়াছিল, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু তৎকালীন প্রতিকূল পরিবেশের জন্যই তিনি এ বিষয়ে মুক্তকণ্ঠ হইতে পারেন নাই।[১২]

উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে পার্থক্য, তাহাকে বঙ্কিমচন্দ্র দেশোন্নতির পরিপন্থী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে এইরূপ শ্রেণীগত পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া তিনি আক্ষেপ করিতেছেন: '...এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান্ এবং কৃতবিদ্য-

দিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে।'[১৩] বঙ্কিমের সুস্পষ্ট অভিমত: '...যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা-সম্পন্ন। যতদিন এই ভাব ঘটে নাই—যতদিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, ততদিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ।'[১৪] পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের নজীর উত্থাপন করিয়া তিনি তাঁহার এই মতের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

হিন্দুসমাজে সর্বাপেক্ষা গুরুতর শ্রেণী-বৈষম্য বর্ণে বর্ণে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে প্রথম হইতেই এই বর্ণবৈষম্য বা জাতিভেদ-প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা চলিয়াছে—ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ভিতর দিয়া এই চেষ্টা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। যুগের চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া বঙ্কিমের রচনায়ও এই বর্ণগত ভেদকে অস্বীকার করা হইয়াছে। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'-এ দেশোদ্ধারব্রতে ব্রতী সন্তানদের নিকট 'সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই।' 'ধর্ম্মতত্ত্ব' [১৮৮৮] গ্রন্থে গুরুর আসনে উপবিষ্ট বঙ্কিম বলিতেছেন: 'যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।' স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, এখানে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্বিশেষে মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার কথা বলা হইতেছে।

বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত মনুষ্যত্বের পূজারী। মানুষ মানুষকে পীড়ন করিবে—শ্রেণীগত কৃত্রিম প্রাধান্যের দোহাই দিয়া এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে পদদলিত করিয়া রাখিবে, সমাজের এই অমানুষী প্রথার প্রতি বঙ্কিমের তীব্র ঘৃণা ছিল। তিনি সে-যুগের অত্যাচারী ইংরাজ ও প্রাচীন ভারতের শূদ্রপীড়ক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কে একই তুলাদণ্ডে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে পীড়নমাত্রই নিন্দনীয়—পীড়নকর্তা স্বজাতীয় হউক বা পরজাতীয় হউক। '...যে পীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন, উভয়ই সমান। স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না।'[১৫] সংকীর্ণ স্বাজাত্যবোধ হইতে মুক্ত হইয়া কেবল

মনুষ্যত্বের নিরিখে মানুষকে দেখিবার এই স্বচ্ছ দৃষ্টি ছিল বলিয়া বঙ্কিম আমাদের নিকট ঋষির মর্যাদা লাভ করিতেছেন।

ইংরাজী শিক্ষা যে এদেশে স্বার্থপর ও উন্নাসিক এক শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। দেশের দুর্দশাগ্রস্ত অগণিত অশিক্ষিত লোকের প্রতি এই শ্রেণীর পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদের কোনো সমবেদনা ছিল না। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রকে নিরতিশয় পীড়া দান করিত। ব্যঙ্গমিশ্রিত আক্ষেপের সুরে এই নবোদ্ভূত শ্রেণী-বৈষম্যের রূপটি তিনি তাঁহার 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন: 'শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক্ রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণা ফসেট সাহেব, এদেশে সার অস্‌লি ইডেন, ইঁহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী— সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি যাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনযাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ—তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি যাট লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।' ঐ একই প্রবন্ধে বঙ্কিম সুশিক্ষিতের প্রতি এই উপদেশ দিতেছেন: 'সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত, অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।'

মুসলমানদের মধ্যে কাহারও কাহারও একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, বঙ্কিমের লেখনী মুসলমান-বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছে। এইরূপ ধারণা বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে অগভীর জ্ঞানেরই পরিচয়। সত্য বটে, বঙ্কিম কোথাও কোথাও মুসলমানদের লইয়া একটু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছেন—'গোহত্যাকারী' ও 'ক্ষৌরিতচিকুর' বলিয়া মুসলমানের চিত্র আঁকিয়াছেন,[১৬] কিন্তু ইহাতেই তাঁহার মুসলমান-বিদ্বেষ প্রমাণিত হয় না। মুসলমান সমালোচক রেজাউল করিমের

উক্তি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য: 'একটু অন্তর্দৃষ্টি লইয়া বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, মুসলমানের পক্ষ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কতকগুলি কাল্পনিক, কতকগুলি বিদ্বেষপ্রসূত, আর কতকগুলি আংশিক সত্য। এই আংশিক সত্যটাকেই গোটা সত্য বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।'[১৭]

বঙ্কিম-সাহিত্যের সামগ্রিক বিচারে দেখা যাইবে যে, বঙ্কিম সম্পূর্ণ সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ভাবে মানুষের সত্য মূল্য নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে বলিষ্ঠচেতা ও উদারস্বভাব ব্যক্তি আছেন, ইহা বঙ্কিমের অবিদিত ছিল না। এইজন্যই দেখা যায়, তিনি যেরূপ গভীর সহৃদয়তা লইয়া হিন্দু বীর ও হিন্দু সন্ন্যাসীর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, মুসলমান বীর ও মুসলমান ফকিরের চিত্র অঙ্কনেও অনুরূপ সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন।

বঙ্কিমের সর্বপ্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তে ওসমান চরিত্রটি বঙ্কিমের নিজস্ব সৃষ্টি। 'ওসমান পাঠানকুলতিলক'। তিনি অসমসাহসী ও যুদ্ধপটু, কিন্তু বিপন্ন শত্রুর প্রতি ক্রোধ সংবরণ করিতে জানেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার বীর হৃদয়ের একাংশ জুড়িয়া ছিল আর্তের প্রতি অপরিসীম করুণাবোধ। যে জগৎসিংহ তাঁহার 'পরম বৈরী'—রণক্ষেত্রে তাঁহার 'দর্পহারী প্রতিযোগী', তিনি যুদ্ধে আহত ও পীড়িত হইয়া পড়িলে ওসমান 'অনুদিন নিজে ব্যস্ত থাকিয়া' তাহার সেবা করাইয়াছেন। পরাজিত শত্রুর প্রতি এই দুর্লভ মমত্ববোধ তাঁহাকে প্রকৃত বীরের মর্যাদা দান করিয়াছে। ওসমান কোমলে-কঠোরে গড়া মনুষ্যত্বের এক আদর্শ মূর্তি। বঙ্কিম হিন্দু হইয়াও মুসলমান বীরের এই মূর্তি অঙ্কন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

বঙ্কিমের 'সীতারাম' [১৮৮৭] উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?'—এই কথাটি যেন উপন্যাসের আগাগোড়া অনুরণিত হইয়া চলিয়াছে। অথচ এই সাম্প্রদায়িক ভাববন্যার মধ্যেও বঙ্কিমের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মনুষ্যত্বের দিকে। সমস্ত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে যে মানবধর্ম, তাহার এক উজ্জ্বল আদর্শ তিনি গড়িয়াছেন চাঁদ শাহ নামে এক মুসলমান ফকিরের চরিত্রে। ফকির 'হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী'—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। হিন্দু রাজা সীতারামের সভায় তিনি যাতায়াত করিতেন, আবার মুসলমান ফৌজদার তোরাব খাঁর সহিতও তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। উভয়ের মধ্যে

বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিলে ফকির স্বজাতিপ্রীতিবশতঃ তোরাব খাঁর পক্ষ অবলম্বন করেন নাই, বরং ন্যায়ের অনুরোধে সীতারামকেই নানাভাবে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু তাই বলিয়া তোরাব খাঁর প্রতিও তিনি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেন নাই। সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে তুচ্ছ করিয়া ন্যায়ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন, এরূপ মহানুভব লোক সংসারে বিরল। ফকিরের চরিত্রে এই মহানুভবতার পরিচয় সুস্পষ্ট। ন্যায়ধর্মের জন্য তিনি সীতারামের রাজ্য রক্ষায় সচেষ্ট হইয়াছেন, আবার সীতারামের অনাচার ও অত্যাচার দেখিয়া সেই একই ন্যায়ধর্মের তাগিদে সীতারামকে পরিত্যাগ করিয়া মোক্কায় যাত্রা করিয়াছেন। যাইবার সময় বড় দুঃখে বলিয়া গেলেন: 'যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।' সমদর্শী ফকিরের এই উক্তি বিজাতি-বিদ্বেষ-প্রসূত নহে—সকল জাতিধর্মকে অতিক্রম করিয়া যে উদার মনুষ্যত্ববোধ, তাহারই আহত অন্তঃস্থল হইতে উৎসারিত। বঙ্কিম-সৃষ্ট এই অনবদ্য চরিত্রের সহিত বঙ্কিম সমধর্মী।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে মুসলমান রাজত্বের কিছু কিছু কলঙ্কময় চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ তাঁহাকে মুসলমান-বিদ্বেষী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়াছেন, সমসাময়িক কালে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে তাঁহাকে অপরাধী করা ঠিক হইবে না। বরং প্রচলিত ইতিহাসের আনুগত্য করিয়া তিনি গভীর সত্যনিষ্ঠারই পরিচয় দিয়াছেন।

'রাজসিংহ' [১৮৮২] উপন্যাসে ঔরংজেবের চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়া বঙ্কিম-চন্দ্র ঔরংজেবকে 'মহাপাপিষ্ঠ' বলিয়াছেন—'ধূর্ত্ত, কপটাচারী, পাপে সঙ্কোচশূন্য, স্বার্থপর, পরপীড়ক, প্রজাপীড়ক' বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন। আবার একথাও স্বীকার করিয়াছেন যে, ঔরংজেব 'বুদ্ধিমান, কর্ম্মদক্ষ, পরিশ্রমী এবং অন্যান্য রাজগুণে গুণবান্ ছিলেন'। টড-প্রমুখ সেকালের ঐতিহাসিকগণ ঔরংজেবের এই চিত্রই অঙ্কন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উহার প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়াই 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঘটনা-সন্নিবেশ করিয়াছেন। এই উপন্যাসে ঔরংজেব-ভগিনী জাঁহানারা ও রৌশন্‌আরাকে তিনি ইন্দ্রিয়পরবশ ও ভোগবিলাসপরায়ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ঔরংজেব-কন্যা জেব-উন্নিসার কলঙ্কিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাতেও তিনি ইতিহাস-বিচ্যুতি ঘটান নাই। প্রচলিত ইতিহাস যাহার নিন্দা করিয়াছে, বঙ্কিম তাহাকেই মসীলিপ্ত করিয়াছেন—ইচ্ছা

করিয়া কোথাও কাহারও প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই।[১৮] 'রাজসিংহ' গ্রন্থের উপসংহারে বঙ্কিমের বিদ্বেষহীন সমদর্শী মনোভাব স্পষ্ট প্রকাশিত: 'হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে।...... অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই নিকৃষ্ট। ঔরংজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্ম্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকের একটা বড় অভিযোগ এই যে, তাঁহার 'আনন্দমঠ' মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। এই গ্রন্থে যে বিদ্রোহের চিত্র দেখা যায়, তাহা মুসলমান-রাজত্বের অবসানকল্পে হিন্দু সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহ—গ্রন্থশেষে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হওয়ায় বিদ্রোহের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। বিদ্রোহীরা, বিশেষতঃ ভবানন্দ ও সত্যানন্দ, ঘোরতর মুসলমান-বিদ্বেষী। তাহা ছাড়া, গ্রন্থের মধ্যে নানাস্থানে আবার মুসলমানের প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণাও পরিস্ফুট—কখনও মুসলমানকে 'নেড়ে' বলা হইয়াছে, কখনও মসজিদ ভাঙিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িবার উৎসাহ প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল কারণে 'আনন্দমঠ'কে আপাতদৃষ্টিতে মুসলমান-বিদ্বেষমূলক একখানি গ্রন্থ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই তথাকথিত মুসলমান-বিদ্বেষটা কেবলই বাহিরের আবরণ—ইহা লক্ষ্যে পৌছিবার একটা উপলক্ষ্য বা ছল মাত্র।

ধ্বংসোন্মুখ মুসলমান-রাজত্বের বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচারের পটভূমিকায় আনন্দমঠের কাহিনী পরিকল্পিত। গ্রন্থটির মূল শিক্ষা—প্রবলের অত্যাচার প্রতিরোধকল্পে শক্তি সাধনা। স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিম স্বদেশকে পরপীড়ন হইতে মুক্ত করিবার ইঙ্গিত দিতে গিয়া ইতিহাসের দ্বারস্থ হইয়াছেন। ইতিহাসের যে সময়টায় বাঙলার বুকের উপর দিয়া অত্যাচারের প্রবল বন্যা বহিয়া গিয়াছে, তাহাই বঙ্কিম তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বাছিয়া বাহির করিয়াছেন। ইতিহাসে মুসলমান রাজকর্মচারিগণ এই অত্যাচারের নায়ক বলিয়া বর্ণিত; আবার

বিভিন্ন সূত্র হইতে ইহাও জানা যায় যে, এই সময়ে বাঙলাদেশে একদল বিদ্রোহী সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন এই দুইটি ঐতিহাসিক তথ্য আশ্রয় করিয়া অত্যাচারিত জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। মুসলমান এখানে অত্যাচারীর প্রতীক মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরাজ শাসকদের ক্রমবর্ধমান অবিচার ও অত্যাচারের ফলে বাঙালীর মনোরাজ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইয়া বাঙালীকে ইংরাজের সর্বপ্রকার উৎপীড়ন প্রতিরোধে আগ্রহী করিয়া তুলিয়াছিল। 'আনন্দমঠ'-এ হিন্দু-মুসলিম বিরোধের চিত্র আঁকিয়া বঙ্কিম তাঁহার সমকালীন ইংরাজ-ভারতীয় বিরোধের ভাবী পরিণতির প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করিয়াছেন। সত্যদর্শী সমালোচক রেজাউল করিমের দৃষ্টিতেও এই সত্যটি ধরা পড়িয়াছে। এই বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য: 'মুসলমানকে আক্রমণ করা তাঁহার [ বঙ্কিমের ] উদ্দেশ্য ছিল না, মুসলিম আমলের অরাজক যুগের চিত্র অঙ্কিত করিয়া বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিক সমস্যার কতকটা সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, এরূপ যে কোন পাঠক বঙ্কিমের মধ্যে এই ভাবেরই প্রাবল্য দেখিতে পাইবেন। তাঁহার নিকট মুসলিম-বিদ্বেষটা ফুটিয়া উঠিবে না। ফুটিয়া উঠিবে বঙ্কিমের স্বদেশ-প্রীতির কথা।'[১৯]

বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' একসময়ে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু তখনকার স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কেহই এই গ্রন্থ হইতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সঞ্চয় করেন নাই—সকলেই ইহার মূল ভাবটি গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নেতা মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল এই সম্বন্ধে বলিতেছেন: 'লেখক এবং পাঠক—উভয় পক্ষই মুসলমান শাসনের বিরোধের স্মৃতি জাগাইয়া বর্ত্তমান কালের স্বাধীনতা সংগ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন। সত্য বলিতে কি, ভিতরে ভিতরে…মুসলমান বলিতে আমরা মুসলমানকে বুঝি নাই, যে স্বাধীনতার পরিপন্থী তাহাকেই বুঝিতাম। মুসলমান…একটা ভাবের প্রতীকমাত্র হইয়াছিলেন।'[২০]

'আনন্দমঠ'-এর 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটিকে অনেকে পৌত্তলিকতাদোষে দুষ্ট বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে ইহা কেবল হিন্দুদের জন্যই রচিত। কিন্তু এই সংগীতটিতে যে মাতৃমূর্তির বন্দনা করা হইয়াছে, তিনি আমাদের দেশমাতৃকা—সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের জননী জন্মভূমি। তিনি যেমন প্রাকৃতিক

শোভায় শোভিতা, তেমনি বিপুল শক্তির অধিকারিণী—কারণ তাঁহার সপ্তকোটি সন্তানের সহিত তিনি এক ও অভিন্না। হিন্দু-মুসলমান লইয়া যে সপ্তকোটি বাঙালীর দেশ বঙ্গভূমি, তাহারই ভাবময়ী মাতৃপ্রতিমা তিনি। কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্মের দেবী তিনি নহেন। তাঁহাকে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী বলিয়া বর্ণনা করিয়া সমগ্র দেশবাসীর শক্তি, শ্রী ও জ্ঞানের প্রতীকস্বরূপা এক দেবী-মূর্তির কল্পনা করা হইয়াছে। এই দেবী দেশের হিন্দু-মুসলমান সকলেরই নমস্যা, কারণ তিনি দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী – তিনি দেশজননী। বঙ্কিমচন্দ্র এই দেশ-জননীরই বন্দনা গাহিয়াছেন।

বঙ্কিমের কমলাকান্তও দুর্গোৎসবের সময় মৃন্ময়ী দুর্গা-প্রতিমার ভিতর দিয়া দেশ-জননীকে প্রণাম জানাইয়াছে। 'শারদীয়া প্রতিমা' হইয়া উঠিয়াছেন 'কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি'। জাতি-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে ছয়কোটি বঙ্গবাসী সকলেই তাঁহার সন্তান—সকলেরই নিকট তিনি পূজ্যা, কারণ তিনি যে দেশ-জননী। কমলাকান্তের কল্পনায় দেবী দুর্গার এক অভিনব মূর্তি উদ্ভাসিত। 'এই মূর্ত্তিতে দেবী শুধু হিন্দুর দেবী নহেন, তিনি সকল বাঙ্গালীর মাতা, তিনি নববলধারিণী, নবদর্পে দর্পিণী, নবস্বপ্নদর্শিনী—এ মাতা শুধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অর্চ্চনীয় নহেন, দেশবিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম দিবে, ইহাকে পাইতে হইলে ইন্দ্রিয়াসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, দ্বেষকে হত্যা করিতে হইবে, ইহার দাবী ভ্রাতৃবাৎসল্য ও পরের মঙ্গল সাধন। ইনি শুধু হিন্দুর দেবী নহেন—ইনি স্বর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।'[২১]

বঙ্কিমচন্দ্রের বহু রচনায় হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতির প্রতি তাঁহার একটা বিশেষ প্রীতির স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' [১৮৮৮] ও 'কৃষ্ণচরিত্র' [১৮৮৬] গ্রন্থে হিন্দুধর্মের নানা বিষয় লইয়া বিস্তৃত আলোচনা আছে, 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' উপন্যাস রচনার মূল উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মের শিক্ষা প্রচার ; ইহা ছাড়া, বঙ্কিমের অনেক উপন্যাসেই একজন করিয়া হিন্দু সাধুপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। হিন্দুজাতির বলবীর্য লইয়াও বঙ্কিম বহুস্থলে প্রশংসমান আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে স্বতঃই তাঁহার 'হিন্দুত্ব-প্রীতি'র পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার সেই 'হিন্দুত্ব-প্রীতি'কে একটা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে চলিবে না। 'তাঁহার সেই হিন্দুত্ব-প্রীতি হিন্দু-প্রীতিই নয়।'[২২] বিশ্বজনের প্রতি প্রসারিত যে উদার প্রীতিবোধ, তাহাই বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের ন্যায় একটি বিশিষ্ট জাতিকে আশ্রয় করিয়া উৎসারিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি

লইয়া বঙ্কিম যে-সকল আলোচনা করিয়াছেন, তাহার 'ভাষাই হিন্দু', কিন্তু তাহার মূল লক্ষ্য হইল মানুষ। আসল কথা, মানুষকে বঙ্কিমচন্দ্র অতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং এইরূপ দেখিতেন বলিয়া সকল জাতির মধ্যেই তিনি মনুষ্যত্ব-মহিমার সন্ধান করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন ধর্মপরায়ণ হিন্দুরাজার যশোপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, তেমনই প্রজাবৎসল মুসলমান ভূপতিরও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। বঙ্গে পাঠান-শাসনের বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে বলিতেছেন: 'পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আবির্ভূত; এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ন্যায়-শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্ত্তা রঘুনাথ শিরোমণি; এই সময়ে স্মার্ত্ততিলক রঘুনন্দন; এই সময়েই চৈতন্যদেব; এই সময়েই বৈষ্ণবগোস্বামীদিগের অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী; —চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব্ব বৈষ্ণবসাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খ্রীষ্টশতাব্দীর মধ্যেই ইঁহাদিগের সকলেরই আবির্ভাব। এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্ব্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।'

বঙ্কিম হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষ বয়সে হিন্দুধর্মে তাঁহার বিশেষ মতিগতি হইয়াছিল, কিন্তু তখনও ধর্মবিষয়ে তাঁহার কোনো গোঁড়ামি ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন: 'স্বর্গ জেলখানা নহে—তাহার যে একটি বৈ ফটক নাই, একথা আমি মনে করি না। ধর্ম্ম এক বস্তু বটে, কিন্তু তাহার নিকটে পৌঁছিবার অনেক পথ আছে...।'[২২৩] বস্তুতঃ সকল ধর্মেই বঙ্কিমের শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু সকল ধর্মের চেয়ে যাহা বড় ধর্ম—সেই মানবধর্মই ছিল তাঁহার মূল আদর্শ। বঙ্কিমের সাহিত্য-প্রতিরূপ কমলাকান্ত 'মনুষ্যত্ব মিলিল কৈ?' বলিয়া রোদন করিয়াছে।

মনুষ্যত্বের যিনি পূজারী—মানুষের প্রতি যাঁহার নিঃসীম ভালবাসা, তিনি কখনও একটা বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হইতে পারেন না। বঙ্কিমের স্বজাতিপ্রীতি তাই খণ্ড ক্ষুদ্র হইয়া আপনার চারিদিকে পরিখা কাটিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহে নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিকে ['জাতি' অর্থে এখানে 'সম্প্রদায়'] তিনি এক অখণ্ড জাতীয় সত্তায় রূপায়িত দেখিতে চাহিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছেন: 'এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে,

ধর্মের প্রভেদে, নানা জাতি। বাঙ্গালি, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে?' এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জাতীয় ঐক্য স্থাপনের কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন: '...সমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?'

কিন্তু বঙ্কিমের এই জাতীয়তাবোধে যে মানব-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কেবল তাঁহার স্বদেশ ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমিত ছিল না। স্বদেশপ্রীতির মুকুরে বিশ্বপ্রীতিকে প্রতিফলিত দেখিয়া বঙ্কিম মহামানবতার জয়গান করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমের এই সর্বজনীন প্রীতিবোধ ও মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা আর এক দিকে সমাজের একটা গুরুতর অসাম্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছিল। সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া একটা ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া রহিয়াছে। অথচ নারী ও পুরুষ উভয়েই মানুষ, উভয়েরেই সমাজে নিজ নিজ বিশিষ্ট স্থান আছে। পুরুষ যে মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে সক্ষম, নারীর পক্ষেও তাহার আপন ক্ষেত্রে সেইরূপ মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া সম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল মননধারার উত্তরসাধক বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশ্বাস অটুট ছিল। সমাজ-জীবনে নারীর স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া বঙ্কিম তাঁহার 'প্রাচীনা এবং নবীনা' প্রবন্ধে বলিতেছেন: 'স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য বা অধিক; তাঁহারা সমাজের অর্দ্ধাংশ। তাঁহারা পুরুষগণের শুভাশুভবিধায়িনী হউন বা না হউন, তাঁহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; কেন না, স্ত্রীজাতি সমাজের অর্দ্ধেক ভাগ। স্ত্রী পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি।' কিন্তু, 'সকল সমাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই ইহার কারণ; পুরুষ বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই কার্য্যকর্ত্তা; স্ত্রীজাতিকে কাজে কাজেই তাঁহাদিগের বাহুবলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যতদূর আত্মসুখের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী; তাহার অতিরেকে তিলার্দ্ধ নহে।'

আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে স্ত্রীপুরুষে বৈষম্য চলিয়া আসিয়াছে, বঙ্কিমের রচনায় তাহারও উল্লেখ দেখা যায়। উল্লিখিত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন: 'প্রাচীন কালের কথা বলিতে চাহি না; তৎকালীন স্ত্রীজাতির চিরাধীনতার বিধি; কেবল অবস্থাবিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকারে নিষেধ; স্ত্রী ধনাধি-

কারিণী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্রয়ে ক্ষমতার অভাব; সহমরণ বিধি; বহুকাল-প্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ; বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়মসকল, স্ত্রীপুরুষে গুরুতর বৈষম্যের প্রমাণ। তৎপরে মধ্যকালেও স্ত্রীজাতির অবনতি আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী; স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভাগিনী দাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা দুহিতা স্বসার তাহাও ছিল না।'

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষার গুণে স্ত্রীজাতির এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু বঙ্কিমের মতে তাহাতেও 'বঙ্গীয় যুবতীগণের' প্রকৃত উন্নতি সূচিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র চাহিয়াছিলেন নারীকে মনুষ্যত্বগুণে ভূষিত দেখিতে। বঙ্গীয় নারীগণ কর্মে ও ধর্মে উন্নত হইয়া কল্যাণময়ী মূর্তিতে সমাজে বিরাজ করিবেন, ইহাই ছিল বঙ্কিমের একান্ত কামনা। তাঁহার সমকালীন বাঙালা নারীসমাজে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়া তিনি সবিশেষ আক্ষেপ করিয়াছেন।

নারীর সহজাত গুণের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের একটা বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ ছিল। রূপ অপেক্ষা গুণের বিচারেই তিনি নারীর প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করিতে চাহিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ 'স্ত্রীলোকের রূপ' প্রবন্ধে কমলাকান্তের জবানীতে নারীর অচিরস্থায়ী রূপ সম্বন্ধে বঙ্কিমের ব্যঙ্গাত্মক উক্তিটি লক্ষণীয়: 'স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যরূপ বুক্‌ড়ি চালের ভাত, প্রণয়-কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়—আর কাহার সাধ্য খায়? শেষে বেশভূষারূপ তেঁতুল মাখিয়া, একটু আদর-লবণের ছিটা দিয়া, কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়।' নারীর এই যে অপসৃয়মান রূপলাবণ্য, ইহা অপেক্ষা মনুষ্যোচিত কয়েকটি গুণেই তাহার প্রকৃত পরিচয়। লেখক তাই নারীর রূপের কথা আর শুনিতে চাহেন না। নারীজাতির বিবিধ গুণের কথা স্মরণ করিয়া তিনি বলেন: 'আমি শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে, কোটী গুণে মহত্ত্বের গুণ আছে। আমি শুনিতে চাই যে, তাহারা মূর্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি। যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত কষ্ট সহ্য করিয়া জননী সন্তানের লালন পালন করেন, যাহারা দেখিয়াছেন যে, কত যত্নে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেবা শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা কামিনীকুলের সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। যাঁহারা কখন কোন সুন্দরীকে পতি পুত্রের জন্য জীবন বিসর্জ্জন, ধর্ম্মের জন্য বাহ্যসুখ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিয়দ্দূর বুঝিয়াছেন যে, কিরূপ প্রীতি ও ভক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বসতি করে।'

বঙ্কিমের বিভিন্ন উপন্যাসেও নারীর রূপ অপেক্ষা গুণেরই অধিক মূল্য দেওয়া হইয়াছে। 'বিষবৃক্ষ' [১৮৭৩] ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' [১৮৭৮]—এই দুইটি উপন্যাসে সূর্যমুখী ও ভ্রমর তাহাদের নারীসুলভ গুণেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রূপতৃষাতুর নগেন্দ্রনাথ প্রথমযৌবনা কুন্দের দেহকান্তি দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল. সাধ্বী স্ত্রী সূর্যমুখীর অমর্যাদা করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু সূর্যমুখীর প্রেম, সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগ নগেন্দ্রনাথকে আবার সূর্যমুখীর নিকট ফিরাইয়া আনিয়াছে। রোহিণীর রূপে মুগ্ধ গোবিন্দলাল বিনা অপরাধে সরলা বালিকাবধূ ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল : 'এ ( ভ্রমর ) কালো ! রোহিণী কত সুন্দরী ! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এত কাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব।' কিন্তু 'রূপের সেবা' গোবিন্দলালকে বেশীদিন তৃপ্ত রাখিতে পারে নাই। রূপমোহ কাটিয়া গেলে তাহাকে আবার ভ্রমরের নিকট ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। গোবিন্দলালের বিদায়কালে অভিমানিনী ভ্রমর তাহার স্বাধিকার বিস্তার করিয়া বলিয়াছিল : 'বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর।—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও—একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে।······এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে, আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে।' মৃত্যুপথযাত্রিনী ভ্রমরের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া গোবিন্দলালকে তাহার আত্মকৃত অপরাধের জন্য সত্যই কাঁদিতে হইয়াছিল। রূপ অপেক্ষা গুণই চিরভাস্বর হইয়া রহিল।

নারীর প্রেম, প্রীতি ও ব্যক্তিত্বমহিমা যুগে যুগে বহু বিপথগামী পুরুষকে কল্যাণের পথে ফিরাইয়া আনিয়াছে। পুরুষ যখন পথভ্রষ্ট হইয়াছে, নারী তখন পথের পাশে দাঁড়াইয়া শুধাইয়াছে : 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?' নারীর প্রদর্শিত পথে পুরুষের যাত্রা সফল হইয়াছে—নারীর সাহায্য ও সহানুভূতি পুরুষকে চলার পথে প্রেরণা যোগাইয়াছে। পুরুষের জীবনযাত্রায় নারীর এই আনুকূল্যের কথা বঙ্কিম-সাহিত্যে সহজ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। '···স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতীত সংসারের কোন গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয় না। গহনা গড়ান ও গোরু কেনা হইতে ফরাসিস্ রাজ্যবিপ্লব এবং লুথরের ধর্ম্মবিপ্লব পর্য্যন্ত সকলেই স্ত্রীসাহায্যসাপেক্ষ।'[২৪]

নারী অবলা—সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা নারীর শক্তি ও সাহস অনেক কম,

ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু জীবনের চরম প্রয়োজনে এই অবলা নারীও অনেক সময় অমিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র নারীর সেই বীর্যময়ী মূর্তিও তুলিয়া ধরিয়াছেন। বঙ্কিমের 'বিমলা' স্বামিহত্যার প্রতিশোধ-কল্পে অতুলনীয় সাহসের পরিচয় দিয়াছে। নৃত্যগীতমুখর সভাকক্ষে পাঠান সুলতান কতলু খাঁকে ছুরিকাহত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে, বাঙালী নারীর কুসুমকোমল দেহেও ফণিনীর বিক্রম লুকাইয়া আছে। বঙ্কিমের 'শান্তি' নবীনানন্দ সাজিয়া পুরুষের মতোই বলবিক্রম দেখাইয়াছে; সত্যানন্দের দেওয়া শক্তি-পরীক্ষার ধনুকে গুণ যোজনা করিয়া সে পুরুষ-দুর্লভ শক্তির পরিচয় দিয়াছে। তাহার সাহস ও চাতুর্যের নিকট কাপ্তেন টমাসের মতো জাঁদরেল ইংরাজ-সেনাপতিও হতপ্রভ।

পুরুষ হইলেই সে নারী অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে না। মনুষ্যত্বই মানুষকে প্রকৃত শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়া দেয়। যাহার মনুষ্যত্ব আছে, সে নারী হইলেও 'অবলা' নয়; যাহার তাহা নাই, সে পুরুষ হইলেও 'নারী'। বঙ্কিম-সৃষ্ট আফিমখোর কমলাকান্ত এই নারী-পুরুষ-বিচারের বিভ্রমে পড়িয়া প্রশ্ন করিতেছে:

'যে ওয়াজিদালিশাহা লক্ষ্ণৌ নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চতুর্দোলারোহণে মুচিখোলায় আগমন করিয়া, হংস হংসী কপোত কপোতী লইয়া ক্রীড়া করেন, গোলাপ সহিত বারি-হ্রদে নিত্য স্নান করিয়া, স্বীয়ানুরূপী পিঞ্জরস্থ বুলবুলিকে সঘৃত পলান্ন প্রদান করেন, তিনি হি না শী? এবং যে মহিষী দেশ-বাৎসল্যে ঐহিক সুখ সম্পত্তি বিসর্জ্জন করিয়া—রাজপুরুষগণের শরণাপন্ন হওয়াপেক্ষা ভিক্ষান্ন শ্রেয়ঃ বোধে, নেপালের পর্ব্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি শী না হি?' ['চন্দ্রালোকে']

ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণ-আন্দোলন বঙ্কিম ও মধুসূদনের হাতে সাহিত্যিক সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বঙ্কিম তথা মধুসূদন বাঙলাসাহিত্যে কোমলে-কঠোরে গড়া মহীয়সী নারীমূর্তি অঙ্কন করিয়া নারী-পুরুষের চিরপ্রচলিত বৈষম্যকে রূঢ় আঘাত হানিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে বঙ্কিমের মনোভাব ছিল আরও একটু অগ্রসর। কথাচ্ছলে একবার শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের নিকট তিনি বলিয়াছিলেন: "এদেশে স্ত্রীরাই মানুষ, সে কথা আমি একবার বুঝাইবার চেষ্টা পেয়েছি। ইউরোপের যত মনস্বিনী স্ত্রীর কথাই বল, ঝান্সীর রাণীর চেয়ে কেহ উচ্চ নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে অমন নায়িকা আর নাই। ইংরেজ সেনাপতি রাণীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া

বলিয়াছিল, 'প্রাচ্যদিগের মধ্যে এই একমাত্র স্ত্রীলোক-পুরুষ।' আমার ইচ্ছা হয়, একবার সে চরিত্র চিত্র করি, কিন্তু এক 'আনন্দমঠেই সাহেবেরা চটিয়াছে, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না।"[২৫]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নারীজাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তিসাধনের কথা বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বঙ্কিম-সাহিত্যে সেই চিন্তারই পরিণত ফসল। বঙ্কিমের লেখনী বাঙালী নারীর জীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে স্পর্শ করিয়াছে।

প্রাচীন ও মধ্য-যুগের বাঙলায় নারীকে উপযুক্ত শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া হইত না। তাহাকে অবরোধবাসিনী করিয়া কেবল পুরুষের সেবাকার্যেই নিযুক্ত রাখা হইত। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য-সংস্রবের ফলে এদেশে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে থাকে। ইহার ফলে পুরুষের ন্যায় নারীকেও যথোপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিয়া তোলার ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসমাজীরা এই বিষয়ে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইলে নারীও যে আদর্শ মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারে, বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী' তাহাই প্রচার করিতেছে। সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ে প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের অধ্যাপনায় পাঁচ বৎসরে ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য, অভিধান এবং রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ আয়ত্ত করিল—সাংখ্য এবং বেদান্তেরও কিছু কিছু শিখিল—যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিল, এবং সর্বশেষে 'সর্বগ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'য় জ্ঞান লাভ করিল। এই পাঁচ বৎসরেই আবার সে ইন্দ্রিয়সংযম শিখিল—মল্লযুদ্ধে পারদর্শিনী হইয়া উঠিল। অবশেষে বহুজনমান্যা 'দেবী চৌধুরাণী' হইয়া সর্ববিধ জ্ঞানচর্চার চরম সিদ্ধি লাভ করিল। প্রফুল্লের এই শিক্ষাপর্বের অবতারণা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, জ্ঞানার্জনের যোগ্যতা পুরুষের ন্যায় নারীরও আছে—নাই কেবল সেই যোগ্যতা প্রকাশের অধিকারটুকু; এই বিষয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে অধিকার-সাম্য স্থাপিত হইলে পুরুষ অপেক্ষা নারী কোনমতেই হেয় প্রতিপন্ন হইবে না।

বহুনিন্দিত কৌলীন্যপ্রথা এক সময়ে বাঙালী নারীর জীবনে চরম অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কুলীনত্বের অধিকারে এক-একজন পুরুষ বহু নারীর পাণিগ্রহণ করিতেন এবং তাহাদের প্রায় সকলেরই নিকট তিনি নামেমাত্র স্বামী

হইয়া বিরাজ করিতেন, আর বিবাহিত জীবনের সর্বসুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া এই-সব কুলীনপত্নী কেবল দুঃখ ও লাঞ্ছনাই ভোগ করিত। নারীত্বের এই অপমান ঘুচাইবার জন্য উনিশ শতকে বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মনীষীরা বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও সাহিত্যের মাধ্যমে নারীজীবনের এই সমস্যাটি তুলিয়া ধরিয়া ইহার সমাধান কামনা করিয়াছেন। বঙ্কিমের 'প্রফুল্ল' চাঁদমুখী হইয়াও কুলীনপত্নী বলিয়া 'পোড়ারমুখী'—বিনা অপরাধে সে স্বামিগৃহ হইতে বিতাড়িতা। বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' [১৮৬৬] উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরী এক চির-বিরহিনী কুলীনপত্নী। ভ্রাতৃগৃহে নবপরিণীতা ভ্রাতৃজায়ার সহিত আমরা শ্যামা-সুন্দরীকে রহস্যালাপ করিতে দেখি। কিন্তু 'শ্যামাসুন্দরীর মুখের হাসির অন্তরালে রহিয়াছে বুভুক্ষু অন্তরের অতৃপ্ত ক্ষুধা।...তিনি স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিতা কুলীনপত্নী। ভ্রাতৃবধূর সহিত রহস্যালাপের ভিতর দিয়াই বঙ্কিম সুকৌশলে তাঁহার জীবনের ইতিহাসের এই বিষাদপূর্ণ অধ্যায়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন...।'[২৬] 'কখনও ফুল হইয়া ফুটি নাই' বলিয়া শ্যামাসুন্দরী যে বিলাপোক্তি করিয়াছেন, তাহাতে নারীঘাতী কৌলীন্যপ্রথার প্রতি একটা গভীর অনুযোগের সুর প্রকাশ পাইয়াছে।

বিবাহব্যাপারে স্বেচ্ছানির্বাচনের কথা বাঙালী মেয়ে কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। যাহার হাতে পিতামাতা মেয়েকে সঁপিয়া দিতেন, মেয়ের তাহাকেই 'পরম দেবতা' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার ফল দাম্পত্যজীবনকে বিষাদময় করিয়া তুলিত। কখনও কখনও বয়সের অস্বাভাবিক তারতম্যবশতঃ গৃহিনী 'সচিব-সখী' না হইয়া কেবল ধর্মপত্নীর ভূমিকায় গুরুভার-পীড়িত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইত, কখনও বা স্বামীর অযোগ্যতার লাঞ্ছনায় স্ত্রীকে জীবনভর বিষণ্ণ হইয়া থাকিতে হইত। বাঙালী নারীর এই দুঃসহ দুর্বিপাকের দিকেও বঙ্কিম অঙ্গুলিসংকেত করিয়াছেন। বঙ্কিমের সন্ধানী দৃষ্টি ইহা স্পষ্টই লক্ষ্য করিয়াছিল যে, দাম্পত্যপ্রণয়ে বয়স এবং রুচির একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর অপরিতৃপ্ত দাম্পত্যজীবনের চিত্র আঁকিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই সত্যটি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন [ 'চন্দ্রশেখর'—১৮৭৫ ]। বত্রিশ-অতিক্রান্ত পণ্ডিত চন্দ্রশেখর শর্মা; আট বছরের বালিকা শৈবলিনীকে তিনি বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেন। তাহা ছাড়া, তিনি শুষ্ক জ্ঞানতাপস—গভীর রাত্রেও বিদ্যালোচনায় ব্যস্ত থাকেন, শৈবলিনীর হৃদয়দ্বারে একটুখানি থামিয়া দাঁড়াইবার তাঁহার সময় নাই। ইহার

ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। বিবাহের আট বৎসর পরেও দাম্পত্যজীবনে স্থিরতা আসিল না। সদ্য-উদ্ভিন্নযৌবনা শৈবলিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রৌঢ় চন্দ্রশেখর অশ্রুমোচন করিতেন। ভাবিতেন: 'হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল।······এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?'

সত্যই চন্দ্রশেখর শৈবলিনী-কুসুমকে বৃন্তচ্যুত করিয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন। 'চন্দ্রশেখরের বিষয়-বিমুখ, পাঠনিরত চিত্তবৃত্তিতে শৈবলিনী তাহার প্রণয়তৃষ্ণা-নিবারণের বিশেষ সুযোগ পায় নাই।'[২৭] শৈবলিনীর স্বামিসুখবঞ্চিত নারীহৃদয় বাল্যপ্রণয়ী প্রতাপকে ঘিরিয়া স্বপ্নের জাল রচনা করিত। অবশেষে প্রতাপকে লাভ করিবার জন্য সে 'গৃহত্যাগিনী' হইল। ননদিনী 'সুন্দরী' তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতে গেলেও সে আসিল না। কারণ 'কি সুখে, কোন সুখের আশায়' সে ঘরে ফিরিয়া যাইবে? বেদগ্রামে স্বামিগৃহে থাকিয়াও সে ভাবিত: 'যদি পিতৃমাতৃকুলে কাহারও অনুসন্ধান পাই, তবে তাহার গৃহে গিয়া থাকি।—নচেৎ কাশী গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব – নচেৎ জলে ডুবিয়া মরিব।' প্রণয়সুখ-বিরহিতা শৈবলিনীর এই মর্মবেদনাই তাহাকে ঘর ছাড়াইয়া পথে বাহির করিয়া দিয়াছিল। পথে পথে সে বুভুক্ষু হৃদয় লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে—প্রতাপকে অবলম্বন করিয়া নারীজীবনের একটা কিছু অর্থ খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন শেষ পর্যন্ত তাহাও মিলিল না, তখন তাহার বিদ্রোহী নারীহৃদয় স্বামীকে প্রশ্ন করিয়াছে: 'এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক্ করিয়াছিলেন কেন?'

নীতিবিদ্ বঙ্কিম কুলত্যাগিনী পাপিষ্ঠা শৈবলিনীকে কঠোর শাস্তি দিয়াছেন—শৈবলিনীর চরিত্র বর্ণনা করিয়া লেখনী কলুষিত হইল মনে করিয়াছেন, কিন্তু শিল্পী বঙ্কিমের চক্ষু দুইটি এই বঞ্চিতার বেদনায় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া

উঠিয়াছে। 'আজি হইতে শৈবলিনী মরিল'—ইহা কেবল সর্বসুখ-বঞ্চিতা শৈবলিনীর মর্মন্তুদ বিলাপ নহে, মানবদরদী বঙ্কিমের একটি করুণ দীর্ঘশ্বাসও ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে।

বঙ্কিমের এই সমবেদনার স্পর্শ লাগিয়াছে রূপসী লবঙ্গলতার [ 'রজনী' —১৮৭৭ ] জীবনেও। লবঙ্গলতার সুস্থির জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়াও বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যে, জীবনব্যাপী সতীত্বধর্ম পালনের অটল দৃঢ়তার আড়ালে লবঙ্গলতার অবচেতন মনে একটা বেদনাময় অস্থিরতা লুকাইয়া ছিল। দুর্বল মুহূর্তে তাহাই লবঙ্গলতাকে পীড়া দিয়াছে—তাহাকে অশ্রুসিক্ত করিয়াছে।

লবঙ্গলতা বৃদ্ধ রামসদয়বাবুর তরুণী ভার্যা। রামসদয়বাবুর বয়স তেষট্টি বছর, লবঙ্গ উনিশ বছরের যুবতী। কিন্তু ইহার জন্য লবঙ্গলতার দৃশ্যতঃ কোনো ক্ষোভ ছিল না। '......তিনি বাস্তবিক পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসেন কি না সন্দেহ। ভালবাসিতেন বলিয়া, তাঁহাকে নবীন সাজাইতেন—আপন হস্তে নিত্য শুভ্র কেশে কলপ মাখাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন। যদি রামসদয় লজ্জার অনুরোধে কোন দিন মলমলের ধুতি পরিত, স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিলপেড়ে, ফিতেপেড়ে, কল্কাপেড়ে পরাইয়া দিতেন···। রামসদয় প্রাচীন বয়সে, আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত—লবঙ্গলতা, তাহার নিদ্রিতাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া দিতেন।···রামসদয় নাক ডাকিলে, লবঙ্গ ছয়গাছা মল বাহির করিয়া, পরিয়া ঘরময় ঝম্‌ঝম্ করিয়া, রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত।'

এই যে বৃদ্ধ স্বামীকে নবীন বেশে সাজাইয়া নবীন করিয়া তোলার চেষ্টা, ইহার পিছনে যেমন গভীর ভালবাসা রহিয়াছে, তেমনই রহিয়াছে মনের মতো জিনিসটি না পাওয়ার একটা ক্ষীণ বেদনাবোধ। বয়সের বিপুল তারতম্যকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়া পাতিব্রত্যধর্মকে এখানে বার বার হুঁচোট খাওয়ার দায় হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। এই জন্যই লবঙ্গলতার এই সযত্নরক্ষিত স্বামিপ্রেম বাল্যপ্রণয়ী অমরনাথের সান্নিধ্যে মুহূর্তের জন্য একটু বিস্রস্ত হইয়া পড়িতে চাহিয়াছে। যৌবনের দ্বারদেশে আসিয়া অমরনাথের যে গভীর ভালবাসা সে পাইয়াছিল—অমরনাথের সহিত তাহার বিবাহের কথা উঠিলে যে ভীরু প্রেম সেদিন সলজ্জ শালীনতার আশ্রয় লইয়াছিল, তাহা 'ভবানীনগরের রামসদয় মিত্র' আসিয়া একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে পারে নাই।

ক্ষণিকের দুর্বলতায় তাহা অমরনাথের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নিভৃত অবসরে অমরনাথের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া লবঙ্গলতা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া ফেলিয়াছে : 'তুমি আমার কে ? তা ত জানিনা। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—', লবঙ্গলতা আর বলিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার না-বলা এই কথাটিতে যে অমরনাথকে একদিন-না-একদিন নিবিড় করিয়া পাওয়ার বাসনা উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝিয়া লইতে কাহারও দেরি হয় না। নারীর একনিষ্ঠতা রক্ষার তাগিদে ইহলোকে যে অপ্রাপনীয়, লবঙ্গলতার প্রেমিক হৃদয় তাহার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই—লোকান্তরের অনুকূল পরিবেশে তাহাকে লাভ করিবার একটা গোপন সাধ পোষণ করিয়াছে। বঙ্কিমের সংবেদনশীল কবিচিত্ত লবঙ্গের এই স্বপ্নসাধকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙলাদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন বিশেষভাবে দানা বাঁধিয়া উঠে। সমাজের সর্বস্তরে স্ত্রীপুরুষে অধিকারসাম্য স্থাপনের প্রতি এই সময়ে বাঙলার শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট প্রবণতা লক্ষিত হয়। তাহারই একটি বিশেষ ফল—পরিণয়-বন্ধনে পুরুষের ন্যায় নারীরও মতপ্রকাশে স্বাধীনতা। বঙ্কিম-সাহিত্য এই যুগ-দাবিকে নানাভাবে উপস্থাপিত করিয়াছে। কখনও শৈবলিনী ও লবঙ্গের বঞ্চিত হৃদয়ের আলেখ্য চিত্রিত করিয়া, কখনও বা রাধারাণী ও রজনীকে পতিনির্বাচনে স্বীয় মত প্রকাশের সুযোগ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নরনারীর সর্বাপেক্ষা বড় সম্পর্কটি স্থাপনে অধিকারসাম্য কামনা করিয়াছেন। বঙ্কিমের সাম্যচিন্তার ইহা অন্যতম ফল।

বঙ্কিম-পূর্ব যুগ হইতেই নারী-পুরুষের জীবন-প্রতিবেশ রচনায় সমরূপ সামাজিক বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে থাকে। ইহার ফলে বালবিধবাদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি অনেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। মৃতদার পুরুষের পুনরায় পত্নীগ্রহণের প্রচলিত সামাজিক রীতির সহিত সমতা রাখিয়া বিধবাদেরও পুনর্বিবাহ দেওয়ার আন্দোলন চলিতে থাকে। বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন নেতারা এই আন্দোলনকে প্রবল হইতে প্রবলতর করিয়া তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়ও এই আন্দোলনের ছাপ স্পষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাদের উপর অনুষ্ঠিত সামাজিক পীড়নের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। যুগপ্রচলিত নিষ্ঠুর বৈধব্য-প্রথার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন : 'আট বৎসরের কুমারী কন্যা বিধবা হইয়াছে, যে ব্রহ্মচর্য্যের সে কিছু জানে না,

যাহা যাট বৎসরের বুড়ারও দুরাচরণীয়, সেই ব্রহ্মচর্য্যের পীড়নে পীড়িত করিয়া তাহাকে কাঁদাইতে হইবে, আপনি কাঁদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কাঁদাইতে হইবে, নহিলে ধর্ম্ম থাকে না।'[২৮] বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিমের অভিমত : '...সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।...যদি পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্ব্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী।'[২৯]

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—বঙ্কিমের এই দুইখানি উপন্যাসে বাল-বিধবার কাহিনী স্থান পাইয়াছে। প্রথমটিতে বঙ্কিম প্রেমবিহ্বলা বিধবা কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিয়াছেন, দ্বিতীয়টিতে বৈধব্যভারপীড়িতা রোহিণীর অসংযত প্রেমাভিলাষের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি দেখাইয়াছেন যে, বিধবার রক্তমাংসের শরীরে অপরাপর পাঁচজনের মতোই প্রেমতৃষ্ণা সহজাত। সমাজবিধি ইহাকে অবদমিত করিয়া রাখিতে চাহিলেও বাস্তবিক পক্ষে ইহা অস্বীকার করা যায় না।

কুন্দ বালবিধবা। তারাচরণের সহিত কুন্দর বিবাহ একটা আকস্মিক ব্যাপার। ইহাতে না তারাচরণ, না কুন্দ, কাহারও মনে একটু দাগ কাটিতে পারে নাই।[৩০] অতএব বিবাহের তিন বৎসর পরে যখন কুন্দ বিধবা হইল, তখন পূর্বপতির স্মৃতিতে সে এমন কিছুই পাইল না, যাহা লইয়া সমগ্রটা জীবন অতিবাহিত করিতে পারে। তাহার নারীহৃদয়ে যে প্রেমের ফুল ফুটিয়াছিল, তাহা কুঁড়ি হইতেই নগেন্দ্রমুখী। কলিকাতায় 'বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষু' মেলিয়া সে অবাক বিস্ময়ে নগেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত ; তারাচরণের সহিত শুভদৃষ্টিতে সে চক্ষু অন্যথাচরণ করে নাই। বিধবা হইলেও কুন্দর এই সরল ও স্বাভাবিক প্রেমের প্রতি বঙ্কিম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। নগেন্দ্রের সহিত কুন্দর পরিণয় ঘটাইয়া এই প্রেমকে তিনি স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের মতো 'চিত্তসংযমে অপ্রবৃত্ত' ব্যক্তির অসংযত প্রণয় যে সংসারে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করে এবং তাহার ফল যে কখনও মঙ্গলজনক হয় না, ইহা দেখাইবার জন্য বঙ্কিম শেষ পর্যন্ত কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু ঘটাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তখনও এই বালবিধবার স্বার্থহীন অনাবিল প্রেমের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির অভাব দেখা যায় নাই।[৩১] কুন্দর মৃত্যুতে 'অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল' বলিয়া তিনি যে আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনের গভীরতম প্রদেশে সঞ্চিত মানবিক

অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সকল নীতিবোধকে অতিক্রম করিয়া ইহা আমাদিগকে বালবিধবার করুণ পরিণতি সম্বন্ধে ভাবাইয়া তোলে।

রোহিণীর চরিত্রটিও আমাদের নিকট বালবিধবার অভিশপ্ত জীবনের চিত্র তুলিয়া ধরে। রোহিণী 'অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল'। সে রূপসী—তাহার রূপ উছলিয়া পড়ে। কিন্তু এই রূপের ডালি লইয়া ভরা যৌবনে সে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছে। তাহার এই নিঃসঙ্গতা মাঝে মাঝে তাহাকে বিদ্রোহী করিয়া তোলে। মনে তাহার প্রশ্ন জাগে: '…কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না। কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল?' হিন্দুসমাজ এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারে নাই—পারিয়াছে কেবল কঠোর অনুশাসন প্রচার করিয়া প্রশ্নকারিণীর কণ্ঠ রুদ্ধ করিতে। কিন্তু সামাজিক অনুশাসন মানুষের বাক্‌শক্তি কাড়িয়া লইলেও হৃদয় তাহা শুনিবে কেন? রোহিণীর বিদ্রোহী হৃদয়ও তাহা শুনিতে চাহে নাই। 'যাহা অপরে দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিত তাহাকে সে অবিচার বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে চাহিয়াছে এবং এই অবিচারকে ব্যঙ্গ করিয়া সে গায়ের জ্বালা জুড়াইতে চাহিয়াছে।'[৩২]

রোহিণীর সকল অপরাধের মূল এইখানেই। সে পাপিষ্ঠা—সে পিশাচী—আত্মসুখের জন্য সে পরের ঘর ভাঙিয়াছে, সমস্তই সত্য। কিন্তু যে সমাজবিধি তাহাকে সর্বসুখে বঞ্চিত করিয়া প্রাণহীন এক মহাশূন্যের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে, তাহাও কি ইহার জন্য কম দায়ী? বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও রোহিণীকে তাহার পাপের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করেন নাই। '…মানুষের বাঁধা-ধরা সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ-জীবনের সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দেখিতে পারিয়াছিলেন,—হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন—এই সংসারের আইন-কানুনের নীচে কত অসহায় নিরীহ প্রাণ নিয়ত পিষিয়া মরিতেছে। আমরা যাহাকে তাহার পাপ বলিয়া তাহাকে অভিশপ্ত করিয়া রাখিয়াছি—সে নিজে তাহার কতটুকুর জন্য সত্যকার দায়ী?'[৩৩]

রোহিণী 'আজন্ম-প্রণয়-বঞ্চিতা', কিন্তু অন্য অনেক নারীর মতো তাহারও ভোগতৃষা আছে—অকালবৈধব্যরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা তাহা প্রশমিত করিতে

পারে নাই। পূর্বপতির অনুরাগ যদি তাহার স্মৃতিপথে উজ্জ্বল হইয়া থাকিত, তাহা হইলে হয়তো সে এই তৃষ্ণা অবদমিত করিয়া রাখিতে পারিত, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে তাহার কোনো আভাস পাওয়া যায় না। কাজেই যৌবনের অনুকূল বাতাসে তাহার তৃষিত হৃদয় যে বারিবিন্দুর জন্য পক্ষবিস্তার করিয়া ফিরিবে, তাহা আর যাহাই হউক অস্বাভাবিক নহে। অবশ্য প্রবল ধর্মভয় থাকিলে এই স্বাভাবিক গতিরও রাশ টানা যায়; কিন্তু রোহিণীর সেরূপ ধর্মভয় ছিল না। '...পাপকে বর্জ্জন করিয়া পুণ্যকে আশ্রয় করিতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন রোহিণী সে শিক্ষা লাভ করে নাই।'[৩৪] ইহার জন্যও দায়ী তাহার অকালবৈধব্য। অল্পবয়সে বিধবা হইয়া সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সে ব্রহ্মানন্দের সংসারে আশ্রয় লইয়াছে এবং ঘরকন্নার কাজ করিয়া বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি কোনমতে কাটাইয়া দিয়াছে। জীবনভর সে যেমন শিক্ষাগ্রহণের অবসর পায় নাই, তেমনই স্নেহশীল কোনো অভিভাবক না থাকায় কাহারও নিকট কিছু শিখিবার সুযোগও তাহার হয় নাই। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহার জীবনে সুস্থিরতা আসে নাই—আত্মসুখলাভের এক অনিয়ন্ত্রিত লালসা তাহাকে অহরহ পাপের পথে অঙ্গুলি-সংকেত করিয়াছে। সেই পথে সে উন্মত্তের মতো ছুটিয়াছে; পথের নেশা যেমন তাহাকে টানিয়াছে, পথচলার দুঃখও তেমনই তাহার পায়ে পায়ে জড়াইয়া রহিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত তাহাকে আশাহত জীবনের চরম পরিণতি বরণ করিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছে।

হরলালকে লইয়া সুখের নীড় বাঁধিবার আশায় সে উইল চুরি করিয়াছে; কিন্তু পরিশেষে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া কাঁদিতে বসিয়াছে। গোবিন্দলালের প্রতি প্রথম আকর্ষণেই সে বুঝিয়াছে, ইহা 'মরিবার কথা'; কিন্তু হৃদয়কে সে বশে রাখিতে পারে নাই। তাহার প্রণয়ভিক্ষু হৃদয় গোবিন্দলালের সম্পত্তি রক্ষার জন্য অসাধ্যসাধন করিয়া এক ধরনের আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে চাহিয়াছে। গোবিন্দলাল জানুক আর না জানুক, সে যে গোবিন্দলালের একটা কিছু উপকার করিতে চলিয়াছে, এই চিন্তাই তাহাকে আপাত-তৃপ্তি দিয়াছে। কিন্তু প্রণয়ের অনল একবার প্রজ্বলিত হইলে সহজে নিবিতে চাহে না। চৌর্যাপরাধে ধৃত হইবার পর গোবিন্দলালের অপ্রত্যাশিত দয়ায় রোহিণীর প্রণয়াসক্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। গোবিন্দলালকে 'প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ' জানাইয়া রোহিণী 'বড় সুখী হইল'। তথাপি প্রচলিত সংস্কারের মর্যাদা রক্ষা করিতে চাহিয়া জগদীশ্বরের নিকট সে আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছে: 'হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে

দুঃখিজনের একমাত্র সহায়! আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না।...আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু? রাখিব কি প্রভু?—হে দেবতা! হে দুর্গা—হে কালি—হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও। আমার প্রাণ স্থির কর—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।' কিন্তু 'পারি না' বলিয়া এড়াইতে চাহিলেই সব কিছু এড়ানো যায় না। মানুষের হৃদয় শাস্ত্র বুঝিয়া চলে না, বৈধব্যের কঠিন নিগড় যে যৌবনের স্বাভাবিক প্রণয়াসক্তিকে সর্বক্ষণই বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে, ইহা প্রত্যাশিত নহে। অশিক্ষিত রোহিণীর বেলায় তাহা একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিল। '...সেই স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়—থামিল না। কখনও ভাবিল, গরল খাই; কখনও ভাবিল, গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া, অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলি; কখনও ভাবিল, পলাইয়া যাই; কখনও ভাবিল, বারুণীতে ডুবে মরি; কখনও ভাবিল, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই।'

প্রণয় ও সংস্কারবোধের এই দ্বন্দ্বে রোহিণী শেষ পর্যন্ত প্রণয়কেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। ইহার ফল যে বিষময় হইবে তাহা সে স্পষ্টই বুঝিয়াছিল, বুঝিয়াও নিজেকে ফিরাইতে পারে নাই। তাহার আবাল্য-বঞ্চিত নারীহৃদয়ে যে অতৃপ্ত প্রণয়-লালসা লুকাইয়া ছিল, গোবিন্দলালের অনুরাগের স্পর্শ লাগিয়া তাহা সহসা সর্পশিশুর মতো ফণা উদ্যত করিয়া উঠিল। তাহার বিষজ্বালায় সে ভ্রমর ও গোবিন্দলালকে পোড়াইয়া মারিয়াছে, নিজেও পুড়িয়াছে। তাহার 'বারুণী-নিমজ্জন' এই অসহনীয় প্রণয়-জ্বালারই 'একটি অভ্রান্ত প্রমাণ।' এই জ্বালায় জ্বলিয়াই সে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিল এবং পরিশেষে ইহাকে প্রশমিত করিবার আশায় গোবিন্দলালকে লইয়া পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। প্রসাদপুরে গোবিন্দলালকে পাইয়া তাহার ভোগতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্তরের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া যে প্রণয় ক্রমবিকশিত হইয়া নরনারীকে শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, তাহা সে লাভ করিতে পারে নাই। গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু গোবিন্দলালের অন্তরে রোহিণীর স্থান হয় নাই—সেখানে ভ্রমরই ছিল একমাত্র অধীশ্বরী। 'যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা

অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা,—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে।' এই জন্য গোবিন্দলালকে কাছে পাইয়াও রোহিণী তাহাকে নিবিড় করিয়া লাভ করিতে পারে নাই। 'ইহাই তাহার চরম পরাজয়। গ্রন্থমধ্যে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। কিন্তু গোবিন্দলাল যে তাহার সঙ্গে থাকিয়া পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায় নাই ইহা সে বুঝিয়া থাকিবে।'[৩৫]

জীবনভর রোহিণী কেবল পরাজয়ের গ্লানিই বহন করিয়া আসিয়াছে। বাল্যে কঠোর নিয়তির নিকট সে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, যৌবনে সর্বপ্রথম হরলালকে জয় করিতে গিয়া পরাজিত হইয়াছে, তাহার পর গোবিন্দলালের সম্পত্তি রক্ষার জন্য দ্বিতীয়বার উইল চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে—তাহাও তাহার পরাজয়। গোবিন্দলালকে প্রলুব্ধ করিয়াও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই—সেখানে ভ্রমরই চিরজয়ী হইয়া রহিয়াছে। পরাজয়ের পর পরাজয় আসিয়া তাহাকে যেন পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার ফলে তাহার প্রকৃতিতে এমন এক বিকৃতি আসিয়াছিল যাহাতে তাহার মনে হইত: '...নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে?' নিশাকর-সম্ভাষণ তাহার এই অসুস্থ চিন্তারই পরিণতি।

বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে 'রাক্ষসী' ও 'পিশাচী' বলিয়া চিত্রিত করিয়া পরিণামে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অলিখিত ভাষায় ইহাও বলিতে চাহিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজ বালবিধবার ললাটে চিরদুঃখের অভিশাপ আঁকিয়া দিয়া কত-যে অভিশপ্ত রোহিণীর জন্ম-পত্রিকা রচনা করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সাম্যবাদী বঙ্কিমের উদার মন সমাজের বন্ধনপীড়ন হইতে নারীকে মুক্ত করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছে।

'বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বদাই সাম্যের গান গাহিয়া গিয়াছেন...।'[৩৬] 'সাম্য' প্রবন্ধে তিনি তাঁহার প্রচারিত সাম্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের 'বিজ্ঞাপন'-অংশে তিনি বলিতেছেন: 'সাম্যনীতি নূতন তত্ত্ব নহে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা যেভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা করি নাই। আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াছি—সেইরূপ লিখিয়াছি।' ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় জীবনে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও নাগরিক অধিকার-বিষয়ে সাম্য স্থাপনের কথা আলোচনা করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক সাম্যের উপরই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ

করিয়াছেন। তাঁহার মতে সামাজিক বৈষম্যই অন্য সকল বৈষম্যের মূল ; এই বৈষম্য দূর হইলে মানুষের অধিকাংশ দুঃখেরই অবসান ঘটিবে।

মানব-সংসারের দিকে তাকাইয়া বঙ্কিম বুঝিয়াছেন, 'সংসার বৈষম্যপূর্ণ'। এই বৈষম্য দুই প্রকার—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। শক্তি, সৌন্দর্য ও বুদ্ধিবৃত্তিতে মানুষে মানুষে যে বৈষম্য, তাহা প্রাকৃত বৈষম্য—প্রকৃতিই আপন হস্তে এইরূপ বৈষম্যের বিধান করিয়াছেন; ইহা অমোঘ ও অলঙ্ঘ্নীয়। আর একপ্রকার বৈষম্য আছে যাহা প্রকৃতিনির্দিষ্ট নহে। এই অপ্রাকৃত বৈষম্যের উদাহরণ—ব্রাহ্মণ-শূদ্রে বৈষম্য, ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য প্রভৃতি। মানুষের সমাজব্যবস্থার ফলেই এইরূপ বৈষম্যের উদ্ভব বলিয়া ইহাকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা চলে—সামাজিক বৈষম্য।[৩৭]

এই অপ্রাকৃত বৈষম্য বা সামাজিক বৈষম্যের ফলে মানবসভ্যতায় নানা সংকট দেখা দিয়াছে ; ভারতবর্ষের দুর্দশার কারণও সামাজিক বৈষম্য। যুগে যুগে এই বৈষম্য নিরসনের জন্য দুইটি পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে—এক, সশস্ত্র বিপ্লব ; দুই, পারস্পরিক আপস-আলোচনা ও 'উপদেষ্টার উপদেশ'। 'অধিকাংশ দেশেই উপদেষ্টার উপদেশেই সাম্য আদৃত এবং সংস্থাপিত হইয়াছে।' এই সকল মহান উপদেষ্টার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তিন দেশের তিনজনকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন—বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও রুশো। বুদ্ধদেব ভারতবর্ষের বর্ণবৈষম্য উচ্ছেদের নিমিত্ত মানব-মৈত্রীর মহাবাণী প্রচার করেন। খ্রীষ্ট-প্রচারিত মানবপ্রীতির 'মহাবাক্যে' প্রভু এবং দাস—উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতের বৈষম্য ঘুচিয়া যাইতে থাকে। আর রুশোর শিক্ষাগুণে উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর অন্তর্বর্তী ব্যবধানের প্রাচীরে ভাঙন ধরে। অবশ্য রুশোকে বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের 'সমকক্ষ ব্যক্তি' বলিয়া মনে করেন নাই। রুশো জগতে 'অবিমিশ্র বিমল সত্য' আনেন নাই। তিনি ছিলেন 'বাক্‌শক্তিতে যথার্থ ঐন্দ্রজালিক'। বচনের গুণে তিনি সত্য-মিথ্যায় মিলাইয়া আপন মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তথাপি রুশোরও মূল কথা —সাম্য। তাঁহার মতে 'বসুন্ধরা কাহারও নহেন ; তৎপ্রসূত শস্য সকলেরই'।

রুশোর এই সাম্যাদর্শী মতবাদের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতি আধুনিক সাম্যবাদী চিন্তাধারার জনকত্ব আরোপ করিয়াছেন। রুশো-প্রভাবিত ফরাসী-বিপ্লবের আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমের উক্তি এস্থলে স্মরণীয়: "...'ভূমি সাধারণের' এই কথা বলিয়া রুসো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। 'কম্যুনিজম্' সেই বৃক্ষের ফল। 'ইণ্টারন্যাশনল' সেই বৃক্ষের ফল।"

ওয়েন, লুই ব্লাং এবং কাবে—রুশো-পরবর্তী এই সকল পণ্ডিতের সাম্যমূলক মতের উল্লেখ করিয়া বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যে, ইহারা সকলেই রুশোর চিন্তাধারায় প্রভাবিত। এই প্রসঙ্গে তিনি মনীষী জন স্টুয়ার্ট মিলের মতাদর্শেরও উল্লেখ করিয়াছেন। মিলের মতে উপার্জিত ধনে উপার্জনকর্তার সম্পূর্ণ অধিকার, এবং তিনি সে-ধন তাঁহার পুত্রকে বা অপরকে অবশ্যই দিয়া যাইতে পারেন; কিন্তু যদি তিনি কাহাকেও না দিয়া যান, তবে তাহার সম্পত্তিতে কেবল তাঁহার পুত্রেরই নহে—সমাজের সকলেরই সমান অধিকার। বঙ্কিমচন্দ্র মিলের এই মতকেও সাম্যাত্মক মত বলিয়াছেন।

মিল-প্রমুখ মনীষীদের প্রচারিত অধিকারসাম্যের কথা আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যমূলক বিধি-বিধানের প্রতি তাঁহার দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাবীকালের সমাজব্যবস্থায় যে এইরূপ বিধি-বিধানের জয় ঘোষিত হইবে, সে সম্বন্ধে তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত: 'এক্ষণে এসকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য, এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলিবে।' মানুষে মানুষে অধিকারগত বৈষম্যের নীচতা লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম আমাদের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন: 'তুমি যে উচ্চ কুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণে নহে; অন্য যে নীচ কুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই—তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা। জন্ম, দোষগুণের অধীন নহে। তাহার অন্য কোন দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী।'

পরাণ মণ্ডলকে উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্গদেশের দরিদ্র কৃষক-কুলের প্রতি বঙ্কিমের সহানুভূতি অজস্র ধারায় বর্ষিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকগণ যে কী শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বঙ্কিম মানুষের শুভবুদ্ধি ও সহৃদয়তার নিকট আবেদন জানাইয়াছেন: 'যে বসুন্ধরা কাহারও নহে, তাহা ভূম্যধিকারিবর্গ বণ্টন করিয়া লওয়াতে' সমাজে যে গুরুতর বৈষম্য দেখা দিয়াছে, তাহার করুণ চিত্রটি বঙ্কিমের 'সাম্য'-শীর্ষক রচনায়

উদ্ঘাটিত : 'যতক্ষণ জমীদারবাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঙ্গিল সার্সী-প্রেরিত স্নিগ্ধালোকে স্ত্রীকন্যার গৌরকান্তির উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণ পরাণ মণ্ডল, পুত্রসহিত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট বলদে ভোঁতা হালে তাঁহার ভোগের জন্য চাষকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে।'

কিন্তু কৃষকের দুঃখভোগের এখানেই শেষ নহে। জীবনভর তাহাকে দুঃখ-দারিদ্র্যের সাহিত সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয়। জমিদারের খাজনা, মাথট ও সেলামী দিয়া, গোমস্তার অসংগত পাওনা মিটাইয়া, দেড়ী সুদে মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিয়া কৃষক নিঃস্ব হইয়া যায়। তখন তাহার সম্বল হয় অনশন ও অর্ধাশন। ইহার উপর আবার কারণে-অকারণে তাহাকে মাঝে মাঝে জমিদারের কাছারিতে হাজির হইয়া কুৎসিত গালিগালাজ ও উত্তম-মধ্যম হজম করিয়া আসিতে হয়। কখনও বা গোমস্তার খেয়ালখুশিতে তাহার ক্ষেতের ধান ক্রোক হইয়া যায়, আদালতে নালিশ করিয়াও কিছু ফল হয় না—'জমিদারের পক্ষ হইতে পালটা নালিশ' করিয়া তাহাকে জব্দ করা হয়। অবশেষে ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়া বেচারা কৃষককে জমি বেচিয়া দিতে হয়, নচেৎ জেলে যাইতে হয়, নতুবা দেশত্যাগী হইতে হয়।

কৃষকের এই দুরবস্থা দূর করার জন্য প্রয়োজন ভূমিব্যবস্থার আমূল সংস্কার-সাধন। কিন্তু তৎকালীন স্বার্থান্বেষী ইংরাজ সরকারের নিকট এই বিষয়ে আবেদন-নিবেদন করিয়া ফল পাওয়ার কোনো আশা ছিল না। অগত্যা বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জমিদারদের কাছেই নালিশ জানাইয়াছেন। ভরসা এই যে, সদাশয় জমিদারগণের চেষ্টায় 'দুর্বৃত্ত জমিদার' তাহার দুর্বৃত্তি পরিত্যাগ করিবে। মানবদরদী বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের অত্যাচার হইতে মানুষকে বাঁচাইবার জন্য মানুষেরই হৃদয়-দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন।

মানবসমাজের সকলপ্রকার বৈষম্যকেই বঙ্কিম ঘৃণার চোখে দেখিয়াছেন। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে চিরচলিত বৈষম্য, তাহাও তাঁহাকে পীড়া দিয়াছে। 'সাম্য' প্রবন্ধের শেষ অংশে এই বিষয়ে তিনি সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য ইহার পূর্বেও দুই একটি প্রবন্ধে তিনি নারী-পুরুষে অসাম্যের কথা তুলিয়াছেন এবং সমাজজীবনে নারীকে তাহার স্বকীয় মর্যাদা দান করিবার কথা বলিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহার প্রায় সব উপন্যাসেই নারীমহিমার জয়গান ঘোষিত।

নারীর প্রতি বঙ্কিমের এই সম্ভ্রমবোধের পুষ্টি সাধন করিয়াছিল মিলের

*Subjection of Women*-নামক গ্রন্থটি। আমাদের দেশের নারীসমাজের স্বাতন্ত্র্য-হীনতার আলোচনা-প্রসঙ্গে মিলের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন : 'এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী ; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে। আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে। পতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতাস্বরূপ ; দেবতাস্বরূপ কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে।'

বঙ্কিমের সমসাময়িক বাঙলাদেশে নারীপুরুষের বৈষম্য ঘুচাইবার জন্য নানারূপ আন্দোলন চলিতেছিল। বঙ্কিমের চিন্তাধারায় এই আন্দোলনের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই আন্দোলনকে স্বাগত জানাইয়া তিনি লিখিতেছেন : 'অস্মদ্দেশে স্ত্রীপুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাদিগের দেশীয়গণের কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটি বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জন্য সমাজমধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে।'

এই বৈষম্যসূচক বিষয় কয়টিকে বঙ্কিম নিম্নলিখিতরূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন :

'১ম। পুরুষকে বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য করিতে হয় ; কিন্তু স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা থাকে।

২য়। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, সে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে অধিকারী। কিন্তু স্ত্রীগণ বিধবা হইলে, আর বিবাহ করিতে অধিকারিণী নহে ; বরং সর্ব্বভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে বাধ্য।

৩য়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকে গৃহ-প্রাচীর অতিক্রম করিতে পারে না।

৪র্থ। স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামিগ্রহণে অধিকারী নহে, কিন্তু পুরুষগণ স্ত্রী বর্ত্তমানেই, যথেচ্ছ বহুবিবাহ করিত পারেন।'

ইহার পর বঙ্কিম প্রত্যেকটি বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করিয়া সমাজে পুরুষের ন্যায় নারীরও যে সমান অধিকার থাকা উচিত তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বঙ্কিমের ক্ষুরধার লেখনী ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও তিরস্কারের মাধ্যমে তৎকালীন প্রগতিভীত বাঙালী সমাজের কর্মবৃত্তিকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিয়াছে।

বঙ্কিম নির্দ্বিধায় বলিয়াছেন—বিধানের কর্তা পুরুষ বলিয়াই সমাজে স্ত্রী-পুরুষে বৈষম্যের বিধান প্রচলিত ; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে : 'স্ত্রীগণও মনুষ্য-জাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী।' বঙ্কিমের মতে স্ত্রী-পুরুষে প্রকৃত সাম্য স্থাপন করিতে হইলে যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে উভয়ের সমান অধিকার, বিধবার পুনর্বার পতিগ্রহণে অধিকার, অবরোধ-প্রথার বিলোপ ও

বহুবিবাহ-রোধের প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন পুরুষের ন্যায় নারীরও ধন-সম্পত্তিতে অবাধ অধিকার। বিভিন্ন যুক্তি-পরম্পরা উপস্থিত করিয়া বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যে উত্তরাধিকারসূত্রে লভ্য সম্পত্তিতে নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার থাকা উচিত; আর কেবল তাহাই নহে, নারীকে সুশিক্ষিতা করিয়া পুরুষের ন্যায় অর্থোপার্জনেও যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। বঙ্কিম বলিতে চাহিয়াছেন যে, নারীসমাজের এইরূপ সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের চেষ্টাই নারী-পুরুষে সাম্য স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। সমকালীন বাঙালী সমাজে এই চেষ্টার স্বল্পতা লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্কিমের 'সাম্য' প্রবন্ধে যে 'বিপ্লবাত্মক সংকেত' ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আজও পর্যন্ত আমরা বিস্ময় বোধ করি। সে-যুগের বাঙলায় সাম্যচিন্তার এরূপ দুঃসাহসিক প্রকাশ আর কাহারও রচনায় দেখা যায় নাই। 'যুক্তিবাদের নির্মোহ আঘাতে বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশী শাসন ও স্বদেশী শোষকের স্বরূপ, তথাকথিত জনকল্যাণবাগীশদের আচরণের ফাঁকিটুকু এবং চিন্তাধারার জড়তা উদ্ঘাটিত করিতেছিলেন এবং এই বিস্ফোরণে প্রচলিত সমাজ-সম্পর্ক শিহরিয়া উঠিয়াছিল'।[৩৮]

কিন্তু এই যে মহাবিপ্লবী, এই যে সাম্যবাদের একনিষ্ঠ পূজারী—যিনি 'মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট' বলিয়া উদাত্ত কণ্ঠে সাম্যনীতি প্রচার করিয়াছেন, শেষজীবনে তিনিই আবার সুর পরিবর্তন করিয়া তাঁহার সাহিত্য-কৃতি হইতে 'সাম্য' প্রবন্ধটিকে মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত কথাবার্তার বিবরণদান-প্রসঙ্গে তাঁহার সমসাময়িক লেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন: "বঙ্কিম বাবু বলিলেন, 'এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে।' নিজের লিখিত প্রবন্ধের কথা উঠিলে বলিলেন, 'সাম্য'টা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।"[৩৯] বঙ্কিমের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে স্বতঃই মনে হইতে পারে যে, তাঁহার চিন্তা-ধারায় একটা স্ববিরোধ দেখা দিয়াছিল। বঙ্কিম-সমালোচক এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন: 'ধর্মতত্ত্ব রচনার সময় স্বভাবতই তিনি [ বঙ্কিম ] সাম্যতত্ত্বে আস্থা রাখতে পারেন নি। ব্যক্তির বৃত্তির অনুশীলন ও সাফল্যের মতবাদের সঙ্গে সাম্যের মতবাদ খাপ খায় না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস গভীর বলে অনুশীলনের দ্বারা ব্যক্তির যোগ্যতা অর্জনের অধিকারকে স্বীকার না করে তিনি পারেন না; বাইরের থেকে আরোপিত সাম্য সেখানে অস্বাভাবিক ও অসংগত।'[৪০]

বস্তুতঃ চিন্তার পরিণতিতে এই 'বাইরের থেকে আরোপিত সাম্য'কেই বঙ্কিমচন্দ্র অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। কারণ, যে সুগভীর মানবপ্রেম হৃদয়ের উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া বিশ্বমানবের দিকে প্রসারিত হইতে চায় —যাহার জাদুস্পর্শে উচ্চনীচবোধ লুপ্ত হইয়া জগতের সকলকেই সর্বভূতেশ্বর ভগবানের প্রকাশ বলিয়া মনে হয়, তাহারই প্রেরণায় বৃদ্ধ বঙ্কিম এক বৃহত্তর সাম্যবোধের আভাস পাইয়াছিলেন। এই সাম্যবোধ কেবল সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিয়া তৃপ্তি লাভ করে না, পরন্তু তাহাকে শুধুই বাহ্য ব্যাপার বলিয়া মনে করে। নিখিল বিশ্বের সকলের সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়া—সকলকেই বক্ষোবদ্ধ করিয়া এক মহান উল্লাস ইহার আদর্শ। গুরুর ভূমিকায় ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই সার্বিক প্রীতিমূলক উদার সাম্যবোধের কথাই বঙ্কিম বলিয়াছেন।

ব্যক্তির বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনের দ্বারা যে মনুষ্যত্বপ্রাপ্তির কথা তিনি বলিয়াছেন, মনুষ্যপ্রীতি তাহার প্রধান উপাদানরূপে নির্দেশিত। যে ঈশ্বরভক্তিকে তিনি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়াছেন,[৪১] তাহাও মনুষ্যপ্রীতি ব্যতীত সার্থকতা লাভ করে না। তাই 'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন: 'মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই'। —ইহা বঙ্কিমের হৃদয়-নিহিত সত্যবাণী। সর্বমানবে, তথা সর্বভূতে ঈশ্বরানুভূতি ভারতবর্ষের চিরন্তন ঐতিহ্য। ইহাই শেষজীবনে বঙ্কিমের চিন্তাধারায় বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছিল, এবং ইহার ফলে যে অধ্যাত্মদৃষ্টি তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহা একদিকে যেমন ঈশ্বর ও মানবকে অভিন্ন করিয়া তুলিয়াছে—অপরদিকে তেমনই ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া মানুষে মানুষে ভেদকেও অস্বীকার করিয়াছে। পরিণত বয়সের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে 'কোন মনুষ্য তাঁহা (ঈশ্বর) ছাড়া নহে, সকলেই তিনি বিদ্যমান।...সকল মনুষ্যকে না ভালবাসিলে, তাঁহাকে ভালবাসা হইল না, আপনাকে ভালবাসা হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রীতির অন্তর্গত না হইলে প্রীতির অস্তিত্বই রহিল না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগৎই আমি, যতক্ষণ না বুঝিব যে সর্ব্বলোকে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই।'[৪২]

বস্তুতঃ মনুষ্যপ্রীতি ও ঈশ্বরভক্তি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। মনুষ্যপ্রীতি ব্যতীত যেমন ঈশ্বরভক্তি সম্ভব হয় না, তেমনই ঈশ্বরভক্তির অভাবে মনুষ্যপ্রীতিও সম্যক্ স্ফূর্তিলাভ করে না; '...কারণ সেইরূপ ভক্তিযুক্ত না হইলে মানুষের

প্রতি প্রীতির কোন অর্থই হয় না—তাহা একটা অন্ধ হৃদয়াবেগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেরূপ প্রীতির দ্বারা মানুষের সত্যকার কল্যাণ হইতে পারে না—হিতসাধন সম্পূর্ণ হয় না, কেবল একটা আত্মতৃপ্তিই ঘটে, এজন্য তাহার গূঢ় লক্ষ্য—পরার্থ নয়, স্বার্থ। অতএব নিষ্কাম প্রীতি ব্যতিরেকে সত্যকার পরহিতসাধন অসম্ভব। এই নিষ্কাম প্রীতির জন্যই ঈশ্বরে ভক্তি একান্ত আবশ্যক।'[৪৩]

ঈশ্বরভক্তিমূলক এই যে 'নিষ্কাম প্রীতি', ইহাকেই বঙ্কিম মনুষ্যত্বের আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় পরিপুষ্ট হইলেও এখানে তাঁহার ভারতীয় মন কথা বলিয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় সাধনার ভাবাদর্শ অনুসরণ করিয়া ঈশ্বর ও মানব, জীব ও ব্রহ্ম—উভয়কে তিনি অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। এইজন্যই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিয়াছেন: ' তাঁহাকে ( ঈশ্বরকে ) ভালবাসিলে সকল মনুষ্যকেই ভালবাসিলাম। সকল মনুষ্যকে না ভালবাসিলে, তাঁহাকে ভালবাসা হইল না… ।'[৪৪]

মানুষকে ভালবাসার কথা পৃথিবীর সকল মনীষীই বলিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মনীষী কোঁত তাঁহার Positivism তত্ত্ব প্রচার করিয়া এই মনুষ্যপ্রীতির কথাই বিশেষভাবে বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই—আছে শুধু এই পরিদৃশ্যমান মাটির পৃথিবীতে প্রত্যক্ষদৃষ্ট মানুষ ও তাহার সুখদুঃখময় জীবন। তাই মানুষের সেবাকেই তিনি মানুষের একমাত্র ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম—Religion of humanity বা মানবধর্ম। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তরুণ বাঙালী-মন কোঁত-প্রচারিত মানবধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং মানব-সেবার মহোৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন যে, ইহাতে একটা বড় রকমের ফাঁক থাকিয়া যায়, মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা না করিলে সেই সেবায় পূর্ণতা আসে না—দ্বিধা, সংকোচ, স্বার্থপরতা আসিয়া তাহাকে পলে পলে খণ্ডিত করিয়া ফেলে। এইজন্য তিনি কোঁতের মানবধর্মের সহিত গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মের সমন্বয় সাধন করিয়া মানবসেবার মহাবাণী প্রচার করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যেই মানবসেবার কথা বলা হইয়াছে। কমলা-কান্তবেশী বঙ্কিম 'একা' প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 'মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।' বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে মানবসেবার কথাই বিশেষভাবে কীর্তিত। 'সাম্য' প্রবন্ধেও কৃষকসম্প্রদায় ও নারীজাতির উন্নতি বিধানের কথা বলিয়া সেই একই মানব-

সেবার আদর্শ প্রচার করা হইয়াছে। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে প্রচারিত অনুশীলনধর্মে সেই আদর্শই ঈশ্বরভক্তির স্পর্শে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সর্বত্রই ভেদ-বিভেদ অতিক্রম করিয়া যে শাশ্বত মানুষ, তাহাকেই বরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। মানুষের পূজারী বঙ্কিম মানুষকে কোথাও খণ্ড ক্ষুদ্র করিয়া দেখেন নাই—উচ্চনীচ-নির্বিশেষে সকল মানুষেরই প্রতি তাঁহার প্রীতির দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যে পূর্বাপর লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তাঁহার সাম্যচিন্তায় কোথাও বিন্দুমাত্র ছেদ পড়ে নাই। শেষজীবনে সমাজবাদী বঙ্কিমকে পিছনে রাখিয়া ঋষি বঙ্কিম আসিয়া আমাদের সামনে দাঁড়াইয়াছেন। তখনও তাঁহার কণ্ঠে সেই একই সাম্যের গান—তফাৎ এই যে, সেই গানের স্বর অবরোহ হইতে আরোহে উঠিয়া গিয়াছে।

---

১। মোহিতলাল মজুমদার : 'বঙ্কিম-বরণ'

২। অরবিন্দ পোদ্দার—'বঙ্কিম-মানস'

৩। ১৮৭৪ সালে *Mookerjee's Magazine*-নামক পত্রিকায় শম্ভুচন্দ্র মুখার্জির একটি রচনা প্রকাশিত হয়। রচনাটির নাম : 'Where shall the Baboo go ?' ইহার অংশবিশেষ এইরূপ : 'The British officers in the Punjab, Oudh, the North-Western Provinces, the Central Provinces, Rajputana and Central India would not, within the last ten years, unless sorely pressed for hands, receive a Bengali's application for any situation.···In August 1869 an advertisement appears in ··*Moniteur official* of the North-Western Provinces inviting Candidates for the post of Translator and Head Clerk to a District Judge's Court, on a pay of Rs. 120/-*per mensem*, which ends thus : 'BENGALI BABOOS AND YOUTHS FRESH FROM COLLEGE NEED NOT APPLY.' pp. 82-83.

৪। "কলিকাতার বাইরে মফঃস্বলের বিচারালয় হইতে শ্বেত-কৃষ্ণ বিচার বৈষম্য বিদূরণের জন্য গভর্ণমেণ্ট কয়েকটি আইনের প্রস্তাব করেন। কলিকাতার ইউরোপীয় সমাজ ও সংবাদপত্র সংঘবদ্ধভাবে এই প্রস্তাবিত আইনের প্রবল বিরোধিতা করিতে থাকেন, এবং ইহার নামকরণ করেন, 'ব্ল্যাক এ্যাক্ট'। খসড়া অবস্থাতেই এই আইন প্রত্যাহৃত হয়।" অরবিন্দ পোদ্দার : 'বঙ্কিম-মানস'

৫। 'His [Rammohan's] idea was that the people were to watch the judicial proceedings and to see that the judges followed the principles of law and equity. Every person who chose should have a right to be present during the trial

of causes in any court, and to make notes of cases decided, and publish them in any manner he might think proper for general information.' : B. B. Majumder : *History of Political Thought*, Vol. I [C. U. : 1934], pp. 49-50.

৬। February 2, 1882 : p.3. ; September 6, 1883 : p.3 ; September 20, 1883 : p. 3.

৭। অরবিন্দ পোদ্দার : 'বঙ্কিম-মানস'

৮। *The Hindoo Patriot* [January 14, 1858]. p. 13.

৯। অরবিন্দ পোদ্দার : 'বঙ্কিম-মানস'

১০। রাণীত্বলাভের প্রাক্‌কালে প্রফুল্লকে ভবানী পাঠক শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার মহাবাণী শুনাইতেছেন :

'আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥' [ ৬ অধ্যায় ]

১১। কার্ল মার্কস-রচিত *Das Kapital*-এর ইংরাজী অনুবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে ; অনুবাদ করেন Samuel Moore এবং Edward Aveling. 'কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো'র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালে, অনুবাদ করেন Samuel Moore.

১২। 'He [Bankimchandra] was all along conscious of the restrictions imposed on his freedom of opinion by the conditions of service under the Government' B. B. Majumdar : '*History of Political Thought*', Vol. I [C. U., 1934], p. 452

১৩। 'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা'।

১৪। তদেব।

১৫। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা'।

১৬। দুইটি বিশেষণই 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীনের প্রতি প্রযুক্ত।

১৭। রেজাউল করিম : 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' [ ১ম সং ], পৃ. ৪৭-৪৮।

১৮। 'তিনি [ বঙ্কিম ] কোথাও ইসলাম ধর্ম্মকে আক্রমণ করেন নাই, ইসলামের আদর্শ, ইসলামের পয়গম্বর, ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কোরান, হদীস—এ সবের উপর কোথাও বিদ্রূপপূর্ণ আঁচড় কাটেন নাই। জায়েদ, রশীদ, সাদেকের মত কতগুলি লোক, আর আর দু'পাঁচ জন বাদশা, বেগম ও শাহজাদা ও শাহজাদীকে কেন্দ্র করিয়া যে সব উপন্যাস তিনি লিখিয়াছেন, তাহার সহিত

ইসলামের অথবা মুসলমানের নিগূঢ় সম্বন্ধ কি থাকিতে পারে যে তাঁহাদিগকে অযুক্তভাবে চিত্রিত করিলে বর্ত্তমান যুগের মুসলমানের রক্ত গরম হইয়া যাইবে? তা'ছাড়া, সে সব বাদশা-বেগমের চরিত্র সম্বন্ধে, অন্য পরে কা কথা, মুসলমান লেখকগণও একমত নহেন। কেহ নিন্দা করেন, কেহ প্রশংসা করেন, সে ক্ষেত্রে অনুকূল মত গ্রহণ না করিয়া প্রতিকূল মত গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কি এমন অপরাধ করিয়াছেন··· ?' : তদেব। পৃ. ৪৭।

১৯। তদেব। পৃ. ৫২।

২০। 'নবযুগের বাংলা'

২১। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : 'বঙ্কিমচন্দ্র'

২২। মোহিতলাল মজুমদার : 'বঙ্কিম-বরণ'

২৩। বঙ্কিমচন্দ্র : 'কৃষ্ণচরিত্র'।

২৪। বঙ্কিমচন্দ্র : 'প্রাচীনা এবং নবীনা'।

২৫। 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সঙ্কলিত [১৯২১], পৃ ১৯৭।

২৬। প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত : 'উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম'

২৭। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা'

২৮। 'ধর্ম এবং সাহিত্য'।

২৯। 'সাম্য' প্রবন্ধ।

৩০। কুন্দর প্রতি তারাচরণের ভালবাসার বর্ণনা দিতে গিয়া বঙ্কিম পরিহাসচ্ছলে বলিতেছেন : '···প্রণয়ের বিষয়টা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তাহার কতদূর ছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু একটা পোষা বানরীর সঙ্গে একটু একটু ছিল।'

৩১। 'বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রেমকে হৃদয়হীন শাসকের নিষ্ঠুর পীড়নে পদদলিত করিতে পারেন নাই,—ধরণীর একটি কানন-প্রান্তে আপনা-আপনি ফুটিয়া-ওঠা একটি কুন্দ-কুসুমের বুকে মধুসৌরভের মতই কুন্দর প্রেম বঙ্কিমচন্দ্রকে বিহ্বল করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু হায়, অসহায় মানুষ!—এ ফুল ঝরিয়া পড়ে অনাদরে —উপেক্ষায়—শত লাঞ্ছনায়—অপমানে। বঙ্কিমচন্দ্রও কুন্দকে অকালে ঝরাইয়াছেন—কিন্তু চোখের জল মুছিতে মুছিতে,—বেদনা-ব্যথিত হৃদয়ের অস্ফুট দীর্ঘ নিঃশ্বাসে!' শশিভূষণ দাশগুপ্ত : 'বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ'

৩২। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত :

৩৩। শশিভূষণ দাশগুপ্ত : 'বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ'

৩৪। প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত : 'উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম' পৃ. ২৯৫।

৩৫। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : 'বঙ্কিমচন্দ্র'

৩৬। শশিভূষণ দাশগুপ্ত : 'বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ'

৩৭। ব্যাপক অর্থে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় প্রকার বৈষম্যই সামাজিক বৈষম্য। 'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন : 'নৈসর্গিক তারতম্যে সামাজিক তারতম্য অবশ্য ঘটিবে,...কিন্তু সাম্যতত্ত্বের তাৎপর্য্য এই, যে সামাজিক বৈষম্য নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত-বৈষম্য ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং মনুষ্য-জাতির অনিষ্টকর'। বঙ্কিম-কথিত এই 'অতিরিক্ত বৈষম্য'ই সমাজবিহিত ; অতএব প্রকৃতপক্ষে ইহাকেই সামাজিক বৈষম্য বলিতে হয়।

৩৮। অরবিন্দ পোদ্দার : 'বঙ্কিম-মানস'

৩৯। 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সঙ্কলিত [ ১৯২১ ], পৃ ১৯৮

৪০। ভবতোষ দত্ত : 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র'

৪১। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে গুরুর ভূমিকায় বঙ্কিম তাঁহার জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের বিবরণ দিয়াছেন : "অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব ?' 'লইয়া কি করিতে হয় ?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।' দ্রষ্টব্য : 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধ।

৪২। তদেব।

৪৩। মোহিতলাল মজুমদার : 'বাংলার নবযুগ'

৪৪। বঙ্কিমচন্দ্র : 'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধ।

*

## অষ্টম অধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর অপরাহ্ণবেলায় মানবধর্মের উদার ভূমিতে দাঁড়াইয়া বাঙলার এক তরুণ সন্ন্যাসী সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! —ওঠো, জাগো! আপন আত্মার অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান হও, জড়ত্বের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া মনুষ্যত্বলাভের পথে যাত্রা করো। মনে রাখিও, জগতে আজ সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন—'মানুষ'।

স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশিত এই বীর্যদীপ্ত মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান—সাম্যবোধ। স্বার্থসুখ-পরিশূন্য হৃদয়ে মানুষ মানুষের প্রতি আত্মবৎ সমদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণে ব্রতী হইবে—ইহাই মানবজীবনের সাধ্যবস্তু—ইহাই মনুষ্যত্ব। মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ এই সাম্যভিত্তিক মনুষ্যত্ব সাধনার কথাই বিশেষভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আহ্বান আমাদিগকে হিংসাদ্বেষ-পরিকীর্ণ পরিচিত পৃথিবী হইতে এমন একটি জগতের সন্ধান দেয়, যেখানে মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নাই—যেখানকার একমাত্র পাথেয় হইল মানবপ্রেম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রভাতসময় হইতেই বাঙালী মনীষা নানাভাবে সাম্য ও মানবতার বাণী উচ্চারণ করিয়া আসিয়াছে। সর্বজনীন ধর্মের বেদীমূলে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে আহ্বান করিয়া, বহুদিনের একটি বিভেদমূলক সমাজ-রীতির উৎসাদনে সহায়তা করিয়া, এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে জনগণের মৌল অধিকার লাভের দাবি তুলিয়া রামমোহন উনিশ শতকের বাঙলাদেশে সাম্য-সাধনায় প্রথম ঋত্বিকের আসন গ্রহণ করেন। প্রায় সমসাময়িক কাল হইতে ইয়ংবেঙ্গলগণ মানবমর্যাদার প্রতিষ্ঠাকল্পে সামাজিক কুসংস্কারের গ্রন্থি ছেদনে উচ্ছৃঙ্খল প্রয়াস শুরু করিয়া দেন। কিছুকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের করুণা-মন্দাকিনীর প্রবল স্রোতে বাঙালী নারীর চারিদিকে রচিত দুর্লঙ্ঘ্য সমাজ-প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। অক্ষয়কুমারের বুদ্ধিদীপ্ত মতবাদ বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে এক অভিনব মুক্তির বার্তা বহন করিয়া আনে। ব্রাহ্মসমাজীরা ক্রমে ক্রমে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবি তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে সকলের জন্য সমান অধিকার আদায়ের পরোয়ানা জারি করিয়া পরে অধ্যাত্মচেতনার উচ্চ মঞ্চে দাঁড়াইয়া সর্বজনীন মনুষ্যপ্রীতির বাণী ঘোষণা করেন।

ইহা ছাড়া আরও অনেক ছোট-বড় তরঙ্গ উত্থিত হইয়া উনিশ শতকের মানবমুখী প্রবাহকে স্ফীত হইতে স্ফীততর করিয়া তুলিতে থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রথম জীবনে উনবিংশ শতাব্দীর এই প্রবাহে অবগাহন করিয়াছিলেন। রামমোহন-প্রমুখ মনীষীদের মানবপ্রেমমূলক রচনা তিনি সাগ্রহে পাঠ করিতেন; বঙ্কিম-প্রচারিত সাম্যনীতি তাঁহার তরুণ মনকে নিঃসন্দেহে আকৃষ্ট করিত; ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়া 'নরনারী সাধারণের সমান অধিকার' প্রতিষ্ঠার আয়োজনও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহার উপর আবার সেকালে পাশ্চাত্যদেশে মানবকল্যাণমূলক চিন্তার ক্ষেত্রে যে-সকল বিচিত্র ফসল ফলিয়াছিল, তাহাও তাঁহার জ্ঞানভিক্ষু চিত্তকে বিশেষভাবে পরিপোষণ করিয়াছিল। 'Man is born free, and everywhere he is in chains' বলিয়া মনীষী রুশো যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত ফরাসী বিপ্লবীদের কণ্ঠে যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, দেশকালের গণ্ডী ছাড়াইয়া নবযুগের শিক্ষিত বাঙালীর কণ্ঠে তাহা প্রবলভাবে অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিবেকানন্দ এই যুগেই পাশ্চাত্যবিদ্যার পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং যুগসমুত্থ এই অভিনব সুরের মায়াজাল যে তাঁহার চিত্তেও কতকটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার উপর ছিল মিল ও বেন্থামের হিতবাদ। 'The greatest good of the greatest number' বলিয়া তাঁহারা মানবকল্যাণের যে নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা পাশ্চাত্য দর্শনের উৎসাহী ছাত্র বিবেকানন্দের দৃষ্টি এড়াইয়া যাওয়ার কথা নয়। সর্বোপরি বলিতে হয় অগস্ট কোঁতের Positivism বা প্রত্যক্ষবাদের কথা। এই মতবাদে যে ঈশ্বর-নিরপেক্ষ মানব-ধর্মের [Religion of Humanity] আদর্শ প্রচার করা হইয়াছে, তাহা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলার শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। তৎকালীন বাঙালী মানসে এই আদর্শের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে যে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে মানবসেবার প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছিল, তরুণ বিবেকানন্দের পক্ষেও তাহাকে স্বাগত জানানো স্বাভাবিক। এক কথায়, সমকালীন সাম্য-ও-মানবতাবাদী চিন্তাধারার সহিত যে বিবেকানন্দের মানসযোগ ঘটিয়াছিল তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়, এবং ইহার ফলে তাঁহার চিত্তে মানবপ্রেমের অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছিল। অবশ্য এই প্রেমের বীজ তাঁহার বাঙালী চরিত্রের মধ্যে পূর্ব হইতেই নিহিত ছিল। ইহার সহিত সর্ববন্ধন-অসহিষ্ণু এক

অনমনীয় তেজ মিলিত হইয়া সমাজের সকলপ্রকার বিভেদমূলক রীতিনীতির বিরুদ্ধে তাঁহার চিত্তকে বিদ্রোহী করিয়া তোলে। বাল্যকালেই মুসলমান-হস্তে খাদ্যগ্রহণ প্রভৃতি তথাকথিত 'জাতনাশা কদাচার' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার এই বিদ্রোহী মনের পরিচয় প্রকাশ পায়,[১] পরবর্তী কালে নিখিল মানবের প্রতি তাঁহার যে সর্বসংকোচহীন উদার প্রেম লক্ষিত হয়, বাল্যেই তাহার উদ্বোধন ঘটে।

এই সর্বজনীন প্রেমই তাঁহাকে দিয়াছিল স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করিবার অবাধ অধিকার। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে তিনি সমগ্র বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মননধারার একমাত্র প্রতিনিধি। ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ-শাসন তখন এদেশের সমস্তটা জুড়িয়া প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। পরানুকরণের স্রোতে দেশের জাতীয় জীবন হাবুডুবু খাইতেছে, চাকরিলাভই 'শিক্ষার একমাত্র তপঃফল' বলিয়া গণ্য হইতেছে, ইংরাজের উপর বিশ্বাস রাখিয়া দেশ তখন চতুর্বর্গসিদ্ধি লাভের সুখস্বপ্ন দেখিতেছে। 'কিন্তু আসলে এই স্বপ্ন-বিলাস ও সুখের আশ্বাস—নিরুপায়ের আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র; তলে তলে একটা ক্লান্তি আসিয়াছে, সংশয়ও দেখা দিয়াছে—পশ্চিম এ জাতির মস্তিষ্কে হানা দিয়াছে—তাহার জীবনকে দুর্ব্বল করিয়াছে। একদিন যাহার নূতনত্বে সে অধীর হইয়াছিল—সেই নূতনকে লইয়া লোফালুফি করিয়া, তাহাকে বাজাইয়া এবং চতুর্দ্দিকে ছুঁড়িয়া ছড়াইয়া সে সকলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, এক্ষণে সেই নূতনের উন্মাদনাশেষে তাহার দেহে-মনে একটা বেদনা জাগিতে লাগিল।'[২] এই বেদনাবোধের ফলেই বাঙালী তখন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল—তাহার সমস্ত সত্তা জুড়িয়া একটা স্বাতন্ত্র্য-অভিমান জাগিয়া উঠিতেছিল—রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অসাম্যজনিত অপমানবোধ ক্রমেই তীব্র রূপ ধারণ করিতেছিল; আর সেই সঙ্গে জড়বাদী শিক্ষা ও সভ্যতার নাগপাশে হাঁপাইয়া-ওঠা বাঙালীর মন চাহিতেছিল অধ্যাত্ম-চেতনার আশ্রয় লইয়া এমন একটি অবস্থায় গিয়া পৌঁছিতে, যেখানে অন্ততঃ মানসিক দিক দিয়া একপ্রকার স্বস্তি লাভ করা যায়। নবযুগের শিক্ষা যেমন বিবেকানন্দের মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, নবযুগের এই বেদনা এবং বাসনাও তেমনই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া একদিন স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল একদিকে মানবমুখী শিক্ষা ও সংস্কার, অপরদিকে চারিপাশের জীবনধারার চরম অবক্ষয় এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের একটা অন্তর্লীন কামনা—এই উভয়ে মিলিয়া বিবেকানন্দের চিত্তক্ষেত্রে মানবপ্রেমের যে ফল্গুধারা সৃষ্টি

করিয়াছিল, তাহাই শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র সান্নিধ্যে আসিয়া কূলপ্লাবী হইয়া উঠিয়াছিল।

সাধকশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ। সর্বত্যাগী গৃহী-সন্ন্যাসী তিনি। বিভিন্ন ধর্মের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ভাগবতী সত্তায় উপনীত। কিন্তু সুখদুঃখের অতীত এক অপার্থিব মহাজীবনের অধিকারী হইয়াও মাটির পৃথিবীর দুঃখবেদনায় তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। তাঁহার করুণাঘন হৃদয়ের অজস্র পরিচয়ের মধ্যে একটি পরিচয় পাই স্বামী সারদানন্দের রচনায়: "মথুরের সহিত কাশী, বৃন্দাবনাদি তীর্থদর্শনে যাইবার কালে" বৈদ্যনাথের নিকটবর্তী কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় গ্রামবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিয়া 'বাবা'র [ শ্রীরামকৃষ্ণের ] হৃদয় একেবারে করুণায় পূর্ণ হইল। মথুরকে বলিলেন, 'তুমি তো মা-র দেওয়ান। এদের এক মাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও, আর পেট্‌টা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।' মথুর প্রথম একটু পেছ্‌পাও হইলেন। বলিলেন, 'বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখ্‌ছি অনেকগুলি লোক—এদের খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার অনটন হয়ে পড়তে পারে। এ অবস্থায় কি বলেন?' সে কথা শুনে কে? বাবার তখন গ্রামবাসীদের দুঃখ দেখিয়া চক্ষে অনবরত জল পড়িতেছে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব করুণার আবেশ হইয়াছে। বলিলেন, 'দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।' এই বলিয়া বালকের ন্যায় গোঁ ধরিয়া দরিদ্রদের মধ্যে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার ঐরূপ করুণা দেখিয়া মথুর তখন কলিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়া 'বাবা'র কথামত সকল কার্য করিলেন।"[৩]

মানুষের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের এই যে অফুরন্ত প্রেম, ইহা তাঁহার অধ্যাত্ম-চেতনারই অঙ্গীভূত। তাঁহার ধর্মজ্ঞান ও ঈশ্বরবোধ বিগলিত হইয়া মানবপ্রেমের রূপ ধারণ করিয়াছিল। ভারতীয় অদ্বৈত-সাধনার ধারা বাহিয়া এই মহাসাধক জীবের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর ও জীবে এইরূপ অভেদবোধ ছিল বলিয়াই তিনি 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দয়াধর্মের এই যে আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন, ইহা একটি ঘটনায় বড় সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে: '…ঠাকুর কোন একদিন অপরাহ্ণে দিব্যভাবে আপন মনে কহিতেছেন, [ কাছে নরেন্দ্রনাথ ও আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না ] জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব-পূজন। দুঃশালা জীবে দয়া,

এত অহঙ্কার? স্বষ্ট জীব তুই, তোরে কে দয়া করে তার ঠিক নাই, তুই আবার জীবে দয়া করবি? নিস্তব্ধ, পরে—না না জীবের সেবা, ক্ষণ পরে আবার বললেন—'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা! তবে ত হবে'?"[৪]

অদ্বৈতজ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ এই মানুষটির মন হইতে আত্মপরভেদবোধ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছিল, এবং তাঁহারই নিকট বিবেকানন্দের প্রেম-দীক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। নবযুগের **Humanism** বা মানবিকতা—যাহা বিবেকানন্দের মানসক্ষেত্রে পূর্বেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা এই গুরুর নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করিয়া নবরূপে বিকশিত হইয়া উঠিল। মানবমুখী চিন্তাধারা ঈশ্বর ও মানবকে এক ও অভিন্ন করিয়া লইয়া নূতন খাতে বহিতে লাগিল। উনিশ শতকের নব্য ভাবধারায় পরিপুষ্ট নরেন্দ্রনাথ এই সময় হইতেই বিবেকানন্দ হইবার সাধনায় মগ্ন হইলেন। তাঁহার এই সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল—অদ্বৈতজ্ঞান।

অদ্বৈতজ্ঞান ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বেদান্তের মূল শিক্ষা—প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মচিন্তার চরম পরিণতি। বহুর মধ্যে একের অনুভূতিই ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। দ্বৈত বা দুই বলিয়া কিছুই নাই। সর্বত্রই একের লীলা। এক ব্রহ্মই বহু-রূপে প্রকাশিত। জগতের সকল জীবই স্বরূপে এক—কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। '...একটি অ্যামিবা এবং উচ্চতম স্তরে উন্নীত একজন শ্রেষ্ঠ মানবের ভিতরে স্বরূপে কোনও ভেদ নাই, যাহা কিছু ভেদ সবই রহিয়াছে বাহিরের রূপে।'[৫] এক ব্রহ্ম বা আত্মাই অখণ্ডরূপে সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন, রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতই মায়াশক্তির প্রভাবে বস্তুর ভিন্নত্ব প্রতীয়মান হয় মাত্র। সর্বভূতে এইরূপ একটি অখণ্ড সত্তার অনুভূতিই অদ্বৈতজ্ঞান। এই জ্ঞানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সাধক একদিকে যেমন ঈশ্বর ও নিজের মধ্যে অভিন্নত্ব উপলব্ধি করে—'সোঽহমস্মি' বলিয়া একটি আনন্দঘন অবস্থায় উন্নীত হয়, অপরদিকে তেমনই সর্বজীবে আত্মস্বরূপ অনুভব করিয়া সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া উঠে। তখন আর 'আমি' ও 'তুমি'র ব্যবধান থাকে না—সব 'তুমি'গুলি জুড়িয়া একটি অখণ্ড 'আমিত্ব' জাগিয়া উঠে। পরের সুখদুঃখকে তখন নিজেরই সুখদুঃখ বলিয়া মনে হয়। আর্ত ও দরিদ্রের দুঃখ দেখিলে এই প্রত্যয়ই জন্মে যে, সে-দুঃখ আমারই দুঃখ—আমারই 'আমি'গুলি দুঃখ ভোগ করিতেছে। তখন দুঃখীর দুঃখ দূর করার যে চেষ্টা, তাহা মূলতঃ আত্মদুঃখমোচনেরই চেষ্টা হইয়া দাঁড়ায়। আত্মপ্রেম ও মানবপ্রেম এই অবস্থায় সমার্থক হইয়া উঠে।

বিবেকানন্দের মানবপ্রেম ও সাম্যচিন্তা বেদান্তের এই অদ্বৈতবাদের উপরই

প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে যখন শ্রেণী-সংগ্রাম ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ভিতর দিয়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ধুয়া উঠিয়াছে—বাঙলাদেশে যখন সাম্যনীতির মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত সমাজ-সংস্কারের আয়োজন চলিতেছে, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তখন প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মভাণ্ডার হইতে অদ্বৈতবাদের মহাশক্তি লইয়া অভিনব সাম্যবাদ প্রচার করিতে অগ্রসর হইলেন। জোর করিয়া যাঁহারা মানুষের উপর সাম্যনীতি চাপাইয়া দিতে চাহেন, তিনি তাঁহাদের সগোত্র ছিলেন না। তাঁহার সাম্যবাদ বিশ্বজনীন প্রেম ও প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মতে মানুষে মানুষে এই প্রেম ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা যায় একমাত্র অদ্বৈত-ভূমিতে দাঁড়াইয়া। আর এই অদ্বৈতবাদ কিছু নূতন কথাও নয়। প্রত্যেক মানুষেরই গভীরতম অনুভূতি অদ্বৈতমুখী: "There are moments, when every man feels that he is one with the universe, and he rushes forth to express it, whether he knows it or not. This expression of oneness is what we call love and sympathy, and it is the basis of all our ethics and morality. This is summed up in the Vedanta philosophy by the celebrated aphorism, Tat tvam asi, 'Thou art That'."[৬]

মানবমনের এই অদ্বৈতপ্রবণতাকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে পারিলেই সকল হিংসাদ্বেষ চলিয়া যায়—সকলপ্রকার বিভেদের অবসান ঘটে। মানুষ যদি নিজেকে বিশ্বের সকলের সহিত একাত্ম বলিয়া অনুভব করে, তবে আর সে কাহাকেও আঘাত করিতে বা ঘৃণা করিতে পারে না। কারণ অপরকে আঘাত করিলে তো তাহার নিজেকেই আঘাত করা হয়—অপরের প্রতি যে ঘৃণা তাহা তাহার নিজেরই প্রতি ঘৃণা হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যেক মানুষই তাহার নিজেকে ভালবাসে, অদ্বৈতচেতনায় অপরকে ভালবাসাও নিজেকে ভালবাসা। এই আত্মপরভেদহীন উদার ভালবাসাই মানুষকে সমদৃষ্টি দান করে—সাম্যবাদের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তোলে।

মানবসমাজে যেখানে যতপ্রকার অন্যায় বা অপরাধ দেখা যায়, সবগুলেরই মূলে রহিয়াছে বিভেদবোধ।[৭] এই বিভেদবোধ হইতেই সংসারে নানাপ্রকার বিশেষ অধিকার [privilege] লাভের চেষ্টা দেখা দেয়: '...there is first the brutal idea of privilege, that of the strong over the weak. There is the privilege of wealth. If a man has more money

than another, he wants a little privilege over those who have less. There is the still subtler and more powerful privilege of intellect; because one man knows more than others he claims more privilege. And the last of all, and the worst, because the most tyranical, is the privilege of spirituality. If some persons think they know more of spirituality, of God, they claim a superior privilege over everyone else'.[৮] বেদান্তের অদ্বৈতচিন্তায় এই সকল privilege বা বিশেষাধিকারবোধের স্থান নাই। কারণ, 'The same power is in every man, the one manifesting more, the other less; the same potentiality is in everyone. Where is the claim to privilege? All knowledge is in every soul, even in the most ignorant; he has not manifested it, but, perhaps, he has not had the opportunity, the environments were not, perhaps, suitable to him.'[৯]

আধুনিক সমাজবাদীদের মতো বিবেকানন্দও শোষণমুক্ত সমাজ কামনা করিয়াছেন, কিন্তু সে-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার মত ও পথ সম্পূর্ণ আলাদা। সে-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে অদ্বৈতবোধের উপরে; তাহাতে সকলেই শুধু সমান নয়—সকলেই এক—একেরই বিভিন্ন প্রকাশ [manifestation] মাত্র। সে-সমাজে দীন-দরিদ্র-বঞ্চিতকে শিখাইতে হইবে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দেবত্ব [Divinity] আছে—যাহা সর্বশক্তির আধার—যাহাকে উদ্বোধিত করিয়া কাজে লাগাইলে অসাধ্যও সাধন করা যায়। সমাজের প্রতিটি নরনারী যদি নিজের সেই অন্তর্নিহিত শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠে, তবে কে কাহাকে শোষণ করে?—কে কাহাকে বঞ্চনা করে? সমাজ তখনই শোষণমুক্ত হইবে—প্রকৃত সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হইবে তখনই।

বিবেকানন্দের সমস্ত সাম্যবাদী চিন্তা, বাণী ও কর্মপ্রচেষ্টা এই আধ্যাত্মিক সাম্যবাদকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত। 'মানবজীবনের অপরিহার্য আধ্যাত্মিক প্রবণতা'র দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি সমাজগঠনের পরামর্শ দিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষেরই প্রকৃতি অল্পবিস্তর ধর্মপ্রবণ। কিন্তু ধর্মটি যে কী তাহা আগে বুঝিতে হইবে। বিবেকানন্দের মতে ধর্ম হইল মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ—

'Religion is the manifestation of divinity already in man'. প্রবল ও দুর্বল, বিদ্বান ও মূর্খ, ধনী ও দরিদ্র—সকলেরই ধর্ম হইল আপন অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধন। এই দেবত্ব যেমন একদিকে সকলকে আপন করিয়া লইয়া অগ্রসর হইবার নির্দেশ দেয়, অপরদিকে তেমনই 'অভীঃ' হইয়া পূর্ণতালাভের প্রেরণা যোগায়। এই উভয়ের সমন্বয়েই সমাজে সাম্য স্থাপিত হয়—সমাজ সুন্দর হইয়া উঠে। নতুবা কেবল বাহির হইতে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা করিলে কোনো স্থায়ী ফল হইবার সম্ভাবনা নাই।

সমাজের কল্যাণ সাধন সম্বন্ধে বিবেকানন্দের একটি বিশিষ্ট ধারণা ছিল। জোড়াতালি দিয়া একটা সমাজব্যবস্থা চালু করা তিনি পছন্দ করেন নাই। তিনি চাহিয়াছেন সমাজের সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধন; অনেক জায়গায়ই তিনি বলিয়াছেন: 'I want root and branch reform—'আমি চাই আমূল রূপান্তর সাধন'। রামমোহন-প্রমুখ পূর্বতন সংস্কারবাদীদের সঙ্গে এইখানেই বিবেকানন্দের একটা মস্ত বড় প্রভেদ রহিয়াছে। পূর্ববর্তী সমাজ-সংস্কারকদের সংস্কারচেষ্টা কেবল সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমিত ছিল, কিন্তু বিবেকানন্দের অভিযান [campaign] সমাজের সকলকে লইয়া। আপামর জনসাধারণের মনে তিনি আত্মবোধের অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে চাহিয়াছেন এবং সেই অগ্নির উজ্জ্বল আলোকেই সকলে পথ চিনিয়া লইতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মাদ্রাজে প্রদত্ত তাঁহার একটি বিখ্যাত বক্তৃতার অংশবিশেষ স্মরণীয়: 'Most of the reforms that have been agitated for during the past century have been ornamental. Every one of these reforms only touches the first two castes, and no other. The question of widow marriage would not touch seventy per cent of the Indian women, and all such questions only reach the higher castes of Indian people who are educated, mark you, at the expense of the masses Every effort has been spent in cleaning their own houses. But that is no reformation. You must go down to the basis of the thing, to the very root of the matter. That is what I call radical reform. Put the fire there and let it burn upwards and make an Indian nation.'[১০]

বিবেকানন্দ সমাজবিপ্লব হইতে আধ্যাত্মিক বিপ্লবেরই প্রতি অধিক গুরুত্ব

আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষের মনে যদি প্রকৃত ধর্মবোধ জাগ্রত থাকে—প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন যদি 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' হয়, তাহা হইলে সমাজের সকল কদাচারই একদিন দূর হইয়া যাইবে এবং সমাজ সুশ্রীতা লাভ করিবে। সামাজিক পাপ দূর করিবার জন্য পৃথক্‌ভাবে কোনো সমাজবিপ্লবের আবশ্যকতা নাই বলিয়া তিনি মনে করিতেন। অথচ এই তিনিই আবার তাঁহার এক অনুরাগী ভক্তকে লিখিয়াছিলেন—'I am a socialist' —আমি সমাজতন্ত্রবাদী। তাঁহার এই উক্তিটি আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর বলিয়া ইহা একটি যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

'সোস্যালিজম্' বস্তুটি বিদেশী চিন্তার ফসল. আমাদের দেশে ইহার শিকড় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু যে মানবমুক্তি 'সোস্যালিজম্'-এর মূল লক্ষ্য, ভারতীয় দর্শনে তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বেদান্তের জীব-ব্রহ্ম-তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া এই মানবমুক্তিরই বাণী প্রচার করিয়াছেন। 'বনের বেদান্ত'কে তিনি ঘরে আনিতে চাহিয়াছেন—বেদান্তের শিক্ষাকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিয়া সোস্যালিস্টদের অভিপ্রেত শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছেন।[১১] তাহা ছাড়া, সোস্যালিস্টরা সাম্যের সন্ধানী—বিবেকানন্দও তাহাই ছিলেন; মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে উদ্বোধিত করিয়া তিনি সাম্য স্থাপনের পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। সোস্যালিস্ট মতবাদে মানবসেবার আদর্শ পরিগৃহীত, বিবেকানন্দও ঈশ্বরজ্ঞানে 'জীবে প্রেম' প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। দীন-দরিদ্র তাঁহার চোখে দয়ার পাত্র নয়—নারায়ণরূপে পূজ্য। তাঁহার উপদেশ—'দরিদ্রদেবো ভব', 'মূর্খদেবো ভব'। প্রাচীন ভারতের নির্জন গিরিকন্দরে ধ্যানমগ্ন বৈদান্তিক ঋষির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আধুনিক যুগের ভাষায় তিনি কথা কহিয়াছেন। 'সোস্যালিজম্' ও বেদান্তবাদের মধ্যে উদ্দেশ্যের সমতা লক্ষ্য করিয়াই বিবেকানন্দ নিজেকে 'সোস্যালিস্ট' বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।[১২]

বিবেকানন্দের এই অদ্বৈতবোধজনিত বলিষ্ঠ মানবপ্রেম ও সাম্যচিন্তার উৎসমূল সন্ধান করিলে আমরা গুরুদত্ত শিক্ষার সাক্ষাৎ লাভ করি সত্য, কিন্তু উৎসে অবস্থিত জ্ঞানের তুষার বিগলিত হইয়া প্রেমের উচ্ছল ধারায় বহিয়া যাইতে প্রয়োজন ছিল একটি নিম্নভূমির। বিবেকানন্দের স্বদেশ ভারতবর্ষ সেই গঙ্গাবতরণের ভূমি। আসমুদ্রহিমাচল এই বিশাল দেশের প্রায় সমস্তটাই তিনি পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ পরিক্রমায় একদিকে তিনি যেমন দরিদ্রের

পর্ণকুটিরে শয্যা পাতিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই ধনীর প্রাসাদশীর্ষেও আসন পাইয়াছিলেন। দরিদ্র ও বিত্তবান, মূর্খ ও বিদ্বান, ছোটজাত ও বড়জাত—সকলেরই সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন, সকলেরই সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনাকে তাঁহার বিশাল বক্ষে স্থান দিয়াছিলেন। ভারতের অগণিত নরনারীর হৃদ্‌স্পন্দন তিনি কান পাতিয়া শুনিয়াছিলেন এবং তাহারই সুর ও তালে নিজের হৃদয়বীণাটি বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইল—জ্ঞানের খরতপ্ত কঠিন ভূমি হইতে তিনি প্রেমের ছায়াশীতল তরুতলে নামিয়া আসিলেন। চোখ বুজিয়া গভীর ধ্যানের মধ্যে তিনি একের অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, চোখ মেলিয়া সেই 'এক'-কেই ভারতের বিশাল প্রান্তরে 'বহু'-রূপে দেখিতে পাইলেন—দেখিয়া দুই হাতে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

বিবেকানন্দের এই যে স্বদেশপ্রেম, ইহাই পরিণামে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া বিশ্বপ্রেমে রূপ লাভ করিয়াছিল। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—Charity begins at home. বিবেকানন্দের মানবপ্রেমও তেমনই তাঁহার স্বদেশের মানুষকে অবলম্বন করিয়া প্রথমে বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং পরে বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রসারিত হইয়াছিল।[১৩] কিন্তু তাঁহার এই স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম একপক্ষে আত্মপ্রেমেরই নামান্তর। অদ্বৈতবাদী এই সন্ন্যাসী স্বদেশের তথা সমগ্র পৃথিবীর সকলের মধ্যেই নিজ স্বরূপকে উপলব্ধি করিতেন। তাই সকলকে ভালবাসিয়া তিনি তাঁহার নিজেকেই ভালবাসিয়া গিয়াছেন। গভীর ধ্যানে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভে চরিতার্থ বিবেকানন্দের 'প্রণয় বা গভীর সমাধি' কবিতায় পরম অনুভূতির সুরে ধ্বনিত হইল :

"নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ ॥
সে ধারাও বন্ধ হ'ল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌', বোঝে—প্রাণ বোঝে যার ॥"

কিন্তু এই অনুভূতি কেবল নিজের মধ্যে সীমিত থাকিলে তৃপ্তি নাই, ইহাকে পূর্ণরূপে উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিবার জন্য প্রয়োজন—সর্বজীবে

ঈশ্বরানুভূতি তথা সর্বজীবে আত্মস্বরূপ-দর্শন। তাই আত্মমুক্তির স্তর হইতে বিশ্বমুক্তির স্তরে নামিয়া আসিয়া সাধক 'সখার প্রতি' কবিতায় ঘোষণা করিলেন :

'ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

হিন্দুদর্শন আব্রহ্মস্তম্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া যে আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ প্রচার করিতেছে, স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে তাহাই সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। উচ্ছ্বসিত আবেগে তিনি ধর্মীয় সকল ক্রিয়াকাণ্ডকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরাত্মক সর্বভূতে প্রেম প্রদর্শনই ধর্মসাধনার পন্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন :

"শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম ; 'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।" [ঐ]

এই যে প্রেম, ইহা নির্বিশেষ হইতে বিশেষে নামিয়া আসিয়াছে, আবার বিশেষ হইতে নির্বিশেষে উঠিয়াছে—ভাব ও রূপে, অসীম ও সীমায়, ঈশ্বর ও মানবে একাকার করিয়া ফেলিয়াছে। এই প্রেমের দৃষ্টিতে বিভেদ নাই, বৈষম্য নাই, বিশ্বের সকল কিছুই একটি অখণ্ড একের মধ্যে বিধৃত। এই একের অনুভূতি লইয়াই বিবেকানন্দ অকুতোভয়ে স্বদেশের ও বিদেশের নানা সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। স্বদেশবাসীকে তিনি অভয়মন্ত্র দিয়াছেন, আর 'শৃন্বন্তু বিশ্বে' বলিয়া বিশ্বমানবের নিকট অমৃতবাণী প্রচার করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ মানবসভ্যতার যে-সকল সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ধর্মবিষয়ক সমস্যাটি সর্বপ্রধান। যুগে যুগে এই সমস্যার পীড়নে পৃথিবী রক্তস্নান করিয়াছে—সভ্যতার বনিয়াদ ভাঙিয়া পড়িয়াছে—মানুষের মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত হইয়াছে। আবার যুগে যুগেই কত মহাপুরুষ জন্মিয়া ধর্মান্ধতা ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন—মানুষের অন্তর হইতে 'বিদ্বেষ-বিষ' নাশ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আজও পর্যন্ত এই প্রাচীন সমস্যাটির মূলোৎপাটন সম্ভব হয় নাই। বিবেকানন্দ বেদান্ত-প্রচারিত একের তত্ত্ব সম্মুখে রাখিয়া ইহার একটা সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন।

ধর্ম-বিষয়ে তিনি তাঁহার গুরুর উত্তরাধিকার বহন করিতেন। গুরুর 'যত মত তত পথ' উক্তির মধ্যে যে ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী ঘোষিত, শিষ্য তাঁহার বৈদান্তিক জ্ঞানের আলোকে তাহাই উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রত্যেক ধর্মকেই সত্যের এক-একটি প্রকাশ বলিয়া তিনি মনে করিতেন [১৪] এবং এইজন্য সকল ধর্মেরই প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হিন্দু-সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি মুসলমানদের কোরান ও খ্রীষ্টানদের বাইবেল খুব ভালভাবেই পড়িয়াছিলেন, এবং শ্রদ্ধানতচিত্তে মহম্মদ ও খ্রীষ্টের বাণী স্মরণ করিতেন। বুদ্ধ-প্রচারিত অহংলোপের বাণীও তাঁহার শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই মহাপুরুষগণ যে একেরই বিভিন্ন উজ্জ্বলতম প্রকাশ, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন।[১৫]

বিবেকানন্দের একখানি প্রিয় গ্রন্থ—*The Imitation of Christ.*[১৬] তিনি এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন 'ঈশা-অনুসরণ' নাম দিয়া। অনুবাদগ্রন্থটিতে পূর্বকথারূপে রচিত 'সূচনা' অংশে সকল ধর্মের সিদ্ধপুরুষদের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়। গ্রন্থটির মহতী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন : " 'সব সেয়ানকী এক মত' - সকল যথার্থ জ্ঞানীরই একপ্রকার মত। পাঠক এই পুস্তক পড়িতে পড়িতে গীতায় ভগবদুক্ত 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' উপদেশের শত শত প্রতিধ্বনি দেখিতে পাইবেন। দীনতা, আর্তি এবং দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মুদ্রিত এবং পাঠ করিতে করিতে জলন্ত বৈরাগ্য, অত্যদ্ভুত আত্মসমর্পণ এবং নির্ভরের ভাবে হৃদয় উদ্বেলিত হইবে। যাঁহারা অন্ধ গোঁড়ামির বশবর্তী হইয়া খ্রীষ্টিয়ানের লেখা বলিয়া এ পুস্তককে অশ্রদ্ধা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ন্যায়দর্শনের একটি সূত্র বলিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব : 'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ'—সিদ্ধপুরুষদিগের উপদেশ প্রামাণ্য এবং তাহারই নাম শব্দপ্রমাণ। এস্থলে ভাষ্যকার ঋষি বাৎস্যায়ন বলিতেছেন যে, এই আপ্ত পুরুষ আর্য এবং ম্লেচ্ছ উভয়ত্রই সম্ভব।"[১৭] বস্তুতঃ স্বামীজী প্রত্যেক ধর্মকে উহার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুলির দিক দিয়া বিচার করিতেন এবং প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যকার বিশেষ গুণগুলিই বড় করিয়া দেখিতেন।

*Imitation of Christ* পড়িয়া খ্রীষ্টধর্মের উদার শিক্ষার প্রতি তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থের একটি বাণী তাঁহাকে পরম সত্যের জন্য দুঃখবরণের শক্তি যোগাইয়াছে : '...**we have taken up the cross, thou hast laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death. Amen.**'[১৮] গ্রন্থটি সম্বন্ধে সন্ন্যাসজীবনের প্রারম্ভে বরাহনগর

হইতে প্রমদাদাস মিত্রকে তিনি লিখিতেছেন: 'মহাশয়কে একখানি—কোন খ্রীষ্টিয়ান সন্ন্যাসীর লিখিত—*Imitation of Christ* নামক পুস্তক পাঠাইলাম। পুস্তকখানি অতি আশ্চর্য। খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যেও এ প্রকার ত্যাগ বৈরাগ্য ও দাস্যভক্তি ছিল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।'[১৯] এই ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ভক্তির উদ্গাতা 'ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট' স্বামীজীর গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

ভগবান বুদ্ধকেও স্বামীজী অনুরূপ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন।[২০] সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তিনি বুদ্ধদেবের অপূর্ব জীবনকথা আলোচনা করিতে করিতে আকুল হইয়া পড়িতেন।[২১] একবার বুদ্ধগয়ায় গিয়া তিনি বোধিদ্রুমমূলে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন।[২২] বহুস্থানে বহুবার তিনি বুদ্ধ-প্রচারিত করুণাবার্তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের নিকট ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদও পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি [world-figure] বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার মতে মুসলমান সম্প্রদায়কে সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমগ্র জগৎকে মহম্মদ একটি বড় শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের বুকে মুসলমানগণ যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আধিপত্য করিয়াছেন, তাহা স্বামীজীর চক্ষে ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া গণ্য। মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের বিপুল প্রভাব লক্ষ্য করিয়া স্বামীজীর ধারণা হইয়াছিল: '…এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নাই যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোরান বা হদিসের বহু বাক্যের দ্বারা অনুমোদিত এবং উৎসাহিত নয়।'[২৩] স্বামীজী মনে করিতেন, একমাত্র মুসলমানধর্মই বিজিত দেশে জনসাধারণের সর্ববিধ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেয়। এবিষয়ে খ্রীষ্টানধর্ম ও মুসলমানধর্মের তুলনামূলক আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার একটি উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য: '…ইসলাম যেথায় গিয়েছে, সেথায়ই আদিম নিবাসীদের রক্ষা করেছে। সে-সব জাত সেথায় বর্তমান। তাদের ভাষা, জাতীয়ত্ব আজও বর্তমান।'[২৪] তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইসলাম ও হিন্দুধর্ম—এই দুই মহান্ ধর্মমতের সমন্বয়েই ভারতের প্রকৃত কল্যাণ আসিতে পারে। মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে লিখিত এক পত্রে স্বামীজীর এই মনোভাবটি স্পষ্ট অভিব্যক্ত। বেদান্ত-প্রচারিত সাম্যবাদের প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি মন্তব্য করিতেছেন যে, হিন্দুগণ বুদ্ধিদ্বারা বেদান্তের মর্মসত্যটি বুঝিতে পারিলেও 'কর্মপরিণত বেদান্ত (practical Advaitism)' তাহাদের মধ্যে 'সর্বজনীনভাবে এখনও পুষ্টিলাভ করে নাই'—'…কখনও যদি কোন ধর্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এই সাম্যের কাছাকাছি আসিয়া থাকে, তবে একমাত্র

ইসলামধর্মাবলম্বিগণই আসিয়াছে ;…।'[২৫] এই সূত্রেই তিনি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মমতের সমন্বয় কামনা করিয়া বলিতেছেন :

'আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।'

পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লইয়া পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। দেশকাল অনুসারে ধর্মের এই সব বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন ঘটে। ইহার ফলে কোনো একটি বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের ধর্ম সমগ্র মানবজাতির ধর্ম হইতে পারে না। সর্বজনীন ধর্মের মর্যাদা পাইতে হইলে জাতীয়ত্বের বিশেষ ছাপটি মুছিয়া ফেলিতে হইবে। চিকাগো-ধর্মমহাসভায় [ ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ ] প্রদত্ত ভাষণে এই বিষয়ে স্বামীজীর সুস্পষ্ট অভিমত : '…if there is to be ever a universal religion, it must be one which would hold no location in place or time, which would be infinite like the God it would preach, whose sun shines upon the followers of Krishna or Christ ; saints or sinners alike ; which would not be the Brahman or Buddhist, Christian or Mohammedan, but the sum total of all these, and still have infinite space for development ; which in its catholicity would embrace in its infinite arms and formulate a place for every human being, from the lowest groveling man who is scarcely removed in intellectuality from the brute, to the highest mind, towering almost above humanity, and who makes society stand in awe and doubt his human nature.

'It would be a religion which would have no place for persecution or intolerance in its polity, and would recognize a divinity in every man or woman, and whose whole scope, whose whole force would be centered in aiding humanity to realize its divine nature'.

স্বামীজী-পরিকল্পিত এই যে সর্ববন্ধনমুক্ত ধর্ম—যাহাকে কেবল মানবধর্ম বলিয়া বিশেষিত করা চলে—তাহা সকল ধর্মমতের উন্নত ভাবগুলির সমন্বিত রূপ বলিয়াই সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিতে পারে। ভারতবর্ষের ধর্মবিদ্বেষ দূর করিবার উপায়স্বরূপ স্বামীজী এইরূপ একটি সমন্বয়ী ধর্মেরই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

ধর্মবিদ্বেষের ন্যায় পৃথিবীতে জাতিতে জাতিতেও ঘোর বিদ্বেষ দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর পরাধীন ভারতে ইংরাজ রাজপুরুষ ও সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে যে পারস্পরিক বিদ্বেষের ভাব দেখা যাইত, তাহার একটি সুনিপুণ চিত্র স্বামীজীর রচনায়ঃ "ত্রিংশকোটি মানবপ্রায় জীব—বহুশতাব্দী যাবৎ স্বজাতি বিজাতি স্বধর্মী বিধর্মীর পদভরে নিষ্পীড়িত-প্রাণ, দাসসুলভ-পরিশ্রম-সহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীত-হীন, ভবিষ্যদ্-বিহীন, 'যেন তেন প্রকারেণ' বর্তমান প্রাণধারণমাত্র-প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচ-চাতুরী-প্রতারণা-সহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্বলের যমস্বরূপ, বলহীন, আশাহীনের সমুচিত কদর্য বিভীষণ-কুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক-মেরুদণ্ডহীন, পূতিগন্ধপূর্ণ-মাংসখণ্ডব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারতশরীরে পরিব্যাপ্ত—ইংরেজ রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের ছবি।"

"নববলমধুপানমত্ত হিতাহিতবোধহীন হিংস্রপশুপ্রায় ভয়ানক, স্ত্রীজিত, কামোন্মত্ত, আপাদমস্তক সুরাসিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড়সহায়, ছলে-বলে-কৌশলে পরদেশ-পরধনাপহরণপরায়ণ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাত্মবাদী, দেহপোষণৈকজীবন—ভারতবাসীর চক্ষে পাশ্চাত্ত্য অসুর।"[২৬]

মোট কথা—বিদেশীরা ভারতবাসীকে 'কালো দাস' বলিয়া ঘৃণা করিত, ভারতবাসীরা বিদেশীকে 'ম্লেচ্ছ' বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিত।

স্বামীজীর মতে দুই দিকেই বুঝিবার ভুল—'দুই দৃষ্টিই বহির্দৃষ্টি', ভিতরের সত্যটি কেহই বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। বাহ্য আচার-আচরণে এক জাতি অপর জাতির নিকট যতই ঘৃণ্য বলিয়া গণ্য হউক না কেন, প্রত্যেক জাতির জাতীয় চরিত্রে একটা বিশেষ শক্তি আছে—যাহা 'সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক'। ভারতবর্ষে এই শক্তি আধ্যাত্মিক, পাশ্চাত্ত্যে এই শক্তি লৌকিক বা আধিভৌতিক। 'ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ', ; একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্য-সুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।'[২৭]

জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে যে এই দুই শক্তিরই সমান প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, একটু অন্তর্দৃষ্টি লইয়া এই মূল সত্যটি বুঝিয়া লইলে আমাদের জাতিবৈর নিতান্তই ভ্রমজনিত বলিয়া মনে হইবে। তাহা ছাড়া আরও একটি কথা আছে। বিশ্বব্যবস্থার পিছনে যে এক মহাশক্তি ক্রিয়াশীল —বেদান্তমতে যাহাকে সর্বব্যাপী অদ্বয় আত্মার অনির্বাণ শক্তিরূপে নির্দেশ করা হয়—তাহাই বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন জাতীয় ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশলাভ করিয়াছে। স্বামীজীর ভাষায়ঃ 'অগ্নি তো এক, প্রকাশ বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য স্থবিচার-বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে।'[২৮]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় চিন্তাধারায় অদ্বৈতবোধের বিকাশের কথা বলিতেছেনঃ "...আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাত্ত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে। ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা ভাবটা ভুল; ও-সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে; মাটি, পাথর, গাছপালা, জন্তু, মানুষ, দেবতা, এমন কি ঈশ্বর স্বয়ং—এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে। অদ্বৈতবাদী এর চরম সীমায় পৌছুলেন, বললেন যে সমস্তই সেই একের বিকাশ। বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগৎ এক, তার নাম 'ব্রহ্ম' আর ঐ যে আলাদা আলাদা বোধ হচ্ছে, ওটা ভুল, ওর নাম দিলেন 'মায়া', 'অবিদ্যা' অর্থাৎ অজ্ঞান। এই হ'ল জ্ঞানের চরম সীমা।"[২৯]

অভেদমূলক এই জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে লক্ষ্য করিলে পারস্পরিক ভেদবুদ্ধির বদলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে একটি মিলনসূত্র আবিষ্কার করা যায়। এই মিলন বিজিত ও বিজেতায় নয়—দুর্বল ও সবলে নয়; এই মিলন হইবে সাম্যবোধের ভিত্তিতে—সবলে সবলে—আধ্যাত্মিক বলে ও আধিভৌতিক বলে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা কেবল তাহার আধিভৌতিক বল লইয়া সম্পূর্ণ নহে—ভারতের আধ্যাত্মিক বল ব্যতীত তাহার পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। আবার অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় সভ্যতারও পূর্ণতালাভের জন্য প্রয়োজন পাশ্চাত্ত্যের অধিভূত শক্তির। এই দুই শক্তির সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যকে হাত-ধরাধরি করিয়া মনুষ্যত্ব-সাধনার যজ্ঞভূমিতে আহ্বান করিয়াছেন।

ভারতব্যাপী সুদীর্ঘ পরিক্রমায় স্বামীজী সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে একটি কথা তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভারতের প্রাণকেন্দ্রে রহিয়াছে একটা সুগভীর অধ্যাত্মবোধ। ইহারই প্রেরণায় ভারতবাসী ঐহিক সুখের চেয়ে পারলৌকিক সুখশান্তির জন্যই অধিক লালায়িত। 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' বলিয়া জৈব অস্তিত্বটাকে অস্বীকার করিয়া আকাশবৃত্তি অবলম্বন করার দিকেই তাহার ঝোঁক বেশী। ফলে ভোগের চেয়ে ত্যাগই তাহার নিকট বড় হইয়া উঠিয়াছে। ভারত যে কেবল নৃপতিকে মুকুটদণ্ড ত্যাগ করিতে শিখাইয়াছে তাহা নহে, 'দীন নারী'কে 'অরণ্য-আড়ালে' লজ্জা ঢাকিয়া 'একমাত্র বাস' ভিক্ষা দিতেও প্রেরণা যোগাইয়াছে। ভারতবর্ষের এই ত্যাগ—এই আত্মবিলোপ মনুষ্যত্ব সাধনার একটি বিশেষ দিক সত্য, কিন্তু এই সঙ্গে ঐহিক সিদ্ধিরও প্রয়োজন। ত্যাগ ও ভোগ—এই উভয়ের সমন্বয়েই মানুষ 'মানুষ' হইয়া উঠে—জাতি পূর্ণতা লাভ করে। 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' বলিয়া কেবল সন্ন্যাসের আদর্শকেই বড় করিয়া দেখিলে চলিবে না। ভারতবর্ষের আশ্রমধর্মও আগে গৃহী হইয়া পরে সন্ন্যাসী হইতে শিক্ষা দিতেছে। স্বামীজীও তাই বলিয়াছেন : '...ভোগ না হ'লে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে।... বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাটা-লাথি খেয়ে চুপটি ক'রে ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই।'[৩০]

ভারত-পরিক্রমায় স্বামীজী লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, একদিকে যেমন ইহবিমুখতা ভারতবাসীকে ঐহিক সুখে নিস্পৃহ করিয়া একটা অপ্রতিরোধ্য নিষ্ক্রিয়তা ও আলস্যের কোলে ঠেলিয়া দিতেছে, অপরদিকে তেমনই ধর্মের নামে রাশি রাশি কুসংস্কার তাহার স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনুষ্যত্বের পরিপন্থী এই সব কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্বসভায় উন্নতশিরে দাঁড়াইবার জন্য স্বামীজী দেশবাসীকে আহ্বান জানাইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা একটি বড় ব্যাধি [ স্বামীজীর ভাষায় : 'a form of mental disease' ]। এক সময়ে এই ব্যাধিটি এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের স্পর্শটুকুও অপবিত্র বলিয়া মনে করিত। আবার মজা এই, নিরন্তর নিজেকে অস্পৃশ্য বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া

গিয়াছিল যে, তাহার স্পর্শ সত্য-সত্যই কলুষিত।[৩১] বিভেদমূলক এই অস্পৃশ্যতা-প্রথার উচ্ছেদ কামনায় স্বামীজীর লেখনী ছিল স্বতই সমুদ্যত। ধর্মের নামে ধর্মের এই ব্যভিচারকে তীব্র কশাঘাত করিয়া শিষ্য হরিপদ মিত্রকে তিনি লিখিতেছেন: "আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু-ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি করছেন? খালি বলছেন, 'ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না।' এমন সনাতন ধর্মকে কি ক'রে ফেলেছে! এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।"[৩২]

অভেদবাদী এই সন্ন্যাসীর প্রশস্ত বক্ষে কেবল যে হিন্দু-সম্প্রদায়ের সকলে সমান স্থান পাইত তাহাই নহে, অন্য সম্প্রদায়ের লোকের প্রতিও তাঁহার সমান মমত্ববোধ ছিল। স্বামী অখণ্ডানন্দ দুর্ভিক্ষের সময় মুর্শিদাবাদে অনাথাশ্রম [orphanage] স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রমে মুসলমান বালককে লওয়া যাইবে কিনা এই বিষয়ে সম্ভবতঃ তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তরে স্বামীজী লিখিলেন: 'মুসলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না। তাহাদের খাওয়-দাওয়া আলগ্ করিয়া দিলেই হইল এবং যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এইপ্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম—জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখো।...হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান ইত্যাদি সকল জাতের ছেলে লও, তবে প্রথমটা আস্তে আস্তে, অর্থাৎ তাদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগ্ হয়; আর ধর্মের যে সর্বজনীন সাধারণ ভাব, তাই শিখাইবে।'[৩৩] সে-যুগের ছোঁয়াছুঁয়ি-বিচারের পটভূমিকায় স্বামীজীর এই উদারতা অতুলনীয়।

ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষের প্রতি স্বামীজীর এইরূপ মমত্ববোধ ছিল বলিয়াই সকলপ্রকার সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়া গিয়াছেন। কেবল যে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধেই তাঁহার বজ্রকণ্ঠ সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, মানুষ যেখানে মানুষকে প্রতারিত করিয়া স্বার্থসিদ্ধির ফিকির খুঁজিতেছে—মানুষে মানুষে যেখানে অসাম্য ও অবহেলা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে, সেইখানেই এই সমদর্শী পুরুষসিংহের তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত তাহাদের আচরণে নগ্ন স্বার্থপরতার পরিচয় দিতেছে। জনশত্রু এইসব ধর্মধ্বজী—যাহারা

ভ্রান্ত ধর্মবোধ ও সমাজবিধির বেড়া দিয়া নিজেদের উচ্চমঞ্চে তুলিয়া রাখে—তাহারা দেশকে দুর্গতির অতল তলে নামাইয়া দিয়াছে। স্বামীজীর কণ্ঠে তাই গভীর আক্ষেপের সুর: 'যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য!'[৩৫]

সমাজের নিম্নস্তরের অত্যাচারিত মানুষের প্রতি স্বামীজীর কী অপূর্ব সহানুভূতি!

কিন্তু কেবল অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনই নয়, অত্যাচারীর প্রতিও স্বামীজীর সাবধানবাণী উচ্চারিত:

'অত্যাচারিগণ! তোমরা জান না যে, অত্যাচার ও দাসত্ব এক জিনিসেরই এপিঠ ওপিঠ। দুই-ই এক কথা।'[৩৫]

মানবপ্রেমিক এই সন্ন্যাসীর নিকট সামাজিক সকলপ্রকার বিভেদ অতিক্রম করিয়া মানুষের শাশ্বত সত্তাটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই হিন্দুসমাজে প্রচলিত বংশগত জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথাকে তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। এই প্রথার বিভেদমূলক রীতিনীতিকে তিনি 'জাতের বিটলেমি' বলিয়া ঘৃণা করিতেন। জাতি বা বর্ণ[৩৬] সম্বন্ধে তাঁহার একটি বিশেষ প্রত্যয় ছিল। বর্ণ বলিতে তিনি বুঝিতেন গুণ বা কর্ম অনুসারে বিভক্ত মানবশ্রেণী। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ যে কেবল ভারতবর্ষেই দেখা যায় তাহা নহে, প্রত্যেক দেশেরই সমাজজীবনে মোটামুটি চারিটি কর্মভিত্তিক শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়—জ্ঞানী, সৈনিক, ব্যবসায়ী ও দাস। এই চারিটি শ্রেণীকেই স্বামীজী যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া তাঁহার ধারণা হইয়য়াছে যে, এই চারিটি শ্রেণী বা বর্ণ প্রত্যেক দেশেই পর্যায়ক্রমে আধিপত্য করিবে। অবশ্য এই পর্যায়িক আবর্তনে সর্বত্রই যে ব্রাহ্মণ আদিতে থাকিবে তাহা নহে, অন্যান্য বর্ণের প্রাধান্য দিয়াও পর্যায় আরম্ভ হইতে পারে।[৩৭]

আমাদের দেশে সভ্যতার আদিতে ব্রাহ্মণগণ প্রাধান্য লাভ করেন। সমাজে তাঁহারা পুরোহিতের সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত। অধ্যাত্মবলে বলীয়ান এই পুরোহিতগণই সর্বদেশে মানবসভ্যতার কর্ণধার। স্বামীজীর ভাষায়: "পুরোহিত-প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের

প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার-বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ। পুরোহিত জড়-চৈতন্যের প্রথম বিভাজক, ইহ-পরলোকের সংযোগ-সহায়, দেব-মনুষ্যের বার্তাবহ, রাজা-প্রজার মধ্যবর্তী সেতু। বহুকল্যাণের প্রথমাঙ্কুর তাঁহারই তপোবলে, তাঁহারই বিদ্যানিষ্ঠায়, তাঁহারই ত্যাগমন্ত্রে, তাঁহারই প্রাণসিঞ্চনে সমুদ্ভূত ;...'[৩৮] কিন্তু আবার কালক্রমে নানা কারণে এই পুরোহিত-সমাজের অবনতি ঘটিতে থাকে। 'উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, যে সংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক্ প্রযুক্ত ছিল, অবনতির পূর্বকালে তাহাই আবার কেবলমাত্র ভোগ্যসংগ্রহে বা আধিপত্য-বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যয়িত।'[৩৯] এই পর্যায়ের অবনতিমুখী স্বার্থলোলুপ পুরোহিত-শ্রেণীকে স্বামীজী জনগণের শোষণযন্ত্ররূপে গণ্য করিয়া তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। পুরোহিত-শ্রেণীর এই শোষণের ফলেই পুরোহিতশক্তির প্রাধান্যের পর এদেশে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়শক্তি ও বৈশ্যশক্তির প্রাধান্য দেখা দেয়। কালচক্রের আবর্তনে সর্বশেষে শূদ্রশক্তির আবির্ভাবের কথা।

কিন্তু স্বামীজীর মতে শূদ্র-প্রাধান্যই সমাজ-বিবর্তনের শেষ কথা নয়। কারণ শূদ্রত্বসহিত শূদ্রজাগরণ অর্থাৎ তামসিকতার আশ্রয় লইয়া আধিপত্য প্রকাশ মানবসভ্যতার অন্তিম পরিণতি হইতে পারে না। মানুষের মন স্বভাবতঃই অধ্যাত্মমুখী। কাজেই মানুষ অন্তরে অন্তরে চায় এমন একটি সমাজব্যবস্থায় স্বস্তি লাভ করিতে, যাহাতে একটা অধ্যাত্মনির্ভর শান্তির আবহাওয়া বজায় থাকিবে। সত্ত্বগুণাশ্রিত ব্রাহ্মণের আধিপত্যেই এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভব। এইজন্য স্বামীজীর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, শূদ্র-প্রাধান্যের শেষে আবার ব্রাহ্মণ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বলিতে জন্মগত কোনো বিশেষ শ্রেণী নয়। যাহারা সকলপ্রকার নীচতার আশ্রয় লইয়া জীবনযাপন করে, তাহারাই শূদ্র ; আর যাহারা পার্থিব বুদ্ধিকে অবদমিত রাখিয়া মহান আদর্শে জীবন গড়িয়া তোলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য।[৪০] শূদ্রযুগের অন্তে শূদ্রগণ শূদ্রত্ব বর্জন করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে—'শূদ্রসংস্কৃতির ব্রাহ্মণায়ন' ঘটিবে, ইহাই 'prophet' বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী—মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের ইহাই অভিপ্রেত।

অদ্বৈতবাদী এই সন্ন্যাসীর নিকট বর্ণবিভাগেও অদ্বৈততত্ত্ব প্রকাশিত। এক বর্ণই বহুরূপে বিভিন্ন বর্ণে প্রকাশ লাভ করিয়াছে, আবার সেই 'এক' ও 'বহু'র মধ্যে বিরাজ করিতেছে একই অদ্বয় অখণ্ড আত্মা। এই উপলব্ধির ফলেই

স্বামী বিবেকানন্দ একদিকে যেমন বর্ণভেদকে অস্বীকার করেন নাই, অপরদিকে তেমনই বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য আছে বলিয়াও মানিতে চাহেন নাই—বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষকেই তিনি সমান মর্যাদা দিয়াছেন—সকলেরই প্রতি তাঁহার প্রেম সমভাবে প্রসারিত। তিনি জানিতেন: '…জাতি ইত্যাদি উন্মত্ততা—যাজকদের লিখিত গ্রন্থেই পাওয়া যায়, ঈশ্বর-প্রণীত গ্রন্থে নাই।'[৪১]

এই বৈদান্তিক দৃষ্টিকোণ হইতেই যুগপুরুষ বিবেকানন্দ তাঁহার সমকালীন নারী-জাগরণ-আন্দোলনে স্বকীয় মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পূর্বতন সংস্কারবাদীদের ন্যায় তিনিও নারীসমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কোনো সমাজবিধির সংস্কার সাধন করিয়া যে এইরূপ উন্নতি সম্ভব তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না।[৪২] উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে নারীর অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন ঘটাইতে পারিলে সে নিজেই তাহার সকল সমস্যার সমাধান করিয়া লইতে পারিবে—ইহাই ছিল বিবেকানন্দের সুদৃঢ় অভিমত। আসল কথা, বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদী মন নারী ও পুরুষের মধ্যে একই শক্তিমান আত্মার অবস্থিতি অনুভব করিত, এবং এইরূপ অনুভূতির ফলেই বিশ্বাস করিত যে, নারী তাহার অশিক্ষার আবরণ ভাঙিতে পারিলে পুরুষের মতোই শক্তি প্রকাশ করিতে পারে। তাঁহার নিজের উক্তিতেই তাঁহার এই মনটি ধরা পড়িয়াছে: 'আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা।'[৪৩]

নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে এই যে আত্মার অখণ্ড অস্তিত্বে বিশ্বাস—একই আত্মার সর্বাবস্থিতি ও সর্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে যে বিশেষ প্রত্যয়, ইহাই আবার স্বামী বিবেকানন্দকে উদ্দীপিত করিয়াছে তাঁহার স্বদেশবাসীর সকলপ্রকার দুর্বলতা ও নীচতাকে কঠোরভাবে শাসন করিতে। তিনি তাঁহার স্বদেশপ্রেমে সমুজ্জ্বল দুইটি আয়ত চক্ষু মেলিয়া দেখিয়াছেন, দেশের লোক নির্বীর্য হইয়া কুসংস্কার, আলস্য ও হীন স্বার্থপরতার মোহে গা ঢালিয়া দিয়াছে। দেখিয়া উদাত্তকণ্ঠে সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছেন: 'এস, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা-হলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও।'[৪৪] যখনই কাহারও হীনতা-দীনতা দেখিয়াছেন, তখনই তাহাকে সাবধান করিয়া

দিয়াছেন : 'ছুঁচোগিরি করবি তো চিরকাল পড়ে থাকতে হবে।'[৭৫] 'দীনহীনা' ভাব ত্যাগ করিয়া দেশবাসীকে শক্তিসাধনায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে তিনি আহ্বান করিয়াছেন—বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—দুর্বল ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।

স্বদেশবাসীর উদ্দেশে উচ্চারিত এই উদ্বোধনমন্ত্রের প্রেরণামূলে রহিয়াছে বৈদান্তিক সাম্যবোধ-প্রসূত এক গভীর সহমর্মিতা। ভারতবর্ষ-নামক একটি দেশে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অদ্বৈতবোধ লাভ করিয়া যখন তিনি দ্বিজ হইলেন, তখন তাঁহার নিকট আত্মপর-ভেদ মুছিয়া গিয়াছে—স্বদেশ ও বিদেশের সীমারেখা বিলীয়মান। তাঁহার বিশ্ব-প্রসারিত অহং-চেতনায় স্বদেশবাসী যেমন তাঁহার ভাই, বিদেশবাসীও তেমনই তাঁহার 'Sisters and Brothers'. সাগরমেখলা ধরণীর যে যেখানে থাকুক সকলেরই প্রতি তাঁহার একমাত্র বাণী—'শুভমস্তু।' মানবশুভকামী সন্ন্যাসী যখন দেখিয়াছেন যে, পৃথিবীর একটি দেশের ভাইবোনেরা—সে-দেশ তাঁহার স্বদেশই হউক আর বিদেশই হউক—প্রাচীন গৌরব হারাইয়া পঙ্কশায়ী হইয়াছে, তখন তাহাদের দুঃখ ও অপমানে নিজেরই বিশ্বব্যাপী সত্তায় আঘাত অনুভব করিয়াছেন। এইজন্যই ভারত-নামক সেই দেশটিকে তিনি বীর্যদীপ্ত মনুষ্যত্বের পথে আহ্বান করিয়াছেন—যেমন করিয়াছেন ইংলণ্ড ও আমেরিকার জড়বাদী ভাইবোনদের অধ্যাত্ম-বোধের পথে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে মিলিয়া তাঁহার যে বিরাট সংসার, সেই সংসারের সকলেই তাঁহার নিকট সমান স্নেহভাজন। তাই সকলেরই অভাব পূরণের জন্য তাঁহার সমান উৎকণ্ঠা। প্রাচ্যের অধ্যাত্মসম্পদ লইয়া পাশ্চাত্ত্যে বিলাইয়াছেন, আর পাশ্চাত্ত্যের আধিভৌতিক সিদ্ধির চিত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়া প্রাচ্যের হতাশমলিন ভাইবোনদের উদ্বোধিত করিতে চাহিয়াছেন। দান নয়—দয়া নয়, কেবল সমানে সমানে সার্থক বিনিময়ের ভিত্তিতে তাঁহার বিরাট সংসারের সকলকেই ঋদ্ধিযুক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[৭৬]

তাঁহার এই বিশ্ব-প্রসারিত প্রেমই তাঁহাকে সর্বযুগের সাম্যবাদী চিন্তানায়ক-দের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছে। তাঁহার প্রেমিক হৃদয়ে সেইখানেই ব্যথা বাজিয়াছে, যেখানে মানুষ চাহিতেছে তাহার সহযাত্রী মানুষকে পিছনে ফেলিয়া সমাজে একটা সুবিধামত জায়গা দখল করিয়া লইতে। এই সুবিধা দখলের চেষ্টাতেই সমাজে যত শ্রেণীভেদ দেখা দিয়াছে—ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান্-মূর্খ, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ। আর এই শ্রেণীভেদের মূলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রহিয়াছে

অর্থনৈতিক অসম-বন্টন। সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস আশ্রয় করিয়া স্বামীজী এই অসম-বণ্টনের মূল সূত্রটি বিবৃত করিয়াছেন: "একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে, সে পেলে ঘোড়ার ডিম; যে পাহারা দিলে, সে জুলুম ক'রে কতকটা আগ ভাগ নিলে। অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে ম'লো!! পাহারাওয়ালার নাম হ'ল রাজা, মুটের নাম হ'ল সওদাগর। এ দু-দল কাজ করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগলো। যে জিনিস তৈরি করতে লাগলো, সে পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান' ডাকতে লাগলো।"[৪৭]

এই ভগবান-ডাকা মানুষগুলি শুধু যে দুঃখবেদনার হলাহল পান করিয়া নীলকণ্ঠ তাহাই নহে, অভিজাত-সম্প্রদায়ের দেবসভা হইতেও বহিষ্কৃত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই লক্ষ লক্ষ বেদনাপীড়িত মানবক শুধু ধনী ও মানী ব্যক্তিদের অবহেলা কুড়াইয়া পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে এবং নিজেদের দুরবস্থাকে কেবল ভাগ্যবিড়ম্বনা মনে করিয়া সর্বদা শঙ্কিত হৃদয়ে দিন কাটাইতেছে।

সমাজে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের অনেকেই সমাজ-কল্যাণের দোহাই দিয়া তথাকথিত এই সব ছোটলোকদের দাবাইয়া রাখিতে চাহেন। কিন্তু 'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে'। নিম্নশ্রেণীর লোকদের দীর্ঘকাল ধরিয়া অপমানিত করিয়া দূরে সরাইয়া রাখায় সমাজ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও দুর্গতির সম্মুখীন। সময় থাকিতে যদি তাহারা তাহাদের আধিপত্যের উচ্চ মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি সহানুভূতি না দেখায়, তবে আর তাহাদের রক্ষা পাইবার উপায় নাই। অতীত গৌরবের দিকে হাত বাড়াইয়া তাহারা যতই আস্ফালন করুক না কেন, বর্তমান কালে তাহারা মূল্যহীন—ভবিষ্যৎ ভারত তাহাদের কোনই স্বীকৃতি দিবে না। তাহাদের প্রতি বিবেকানন্দের সময়োচিত সাবধানবাণী: 'তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' ব'লে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্চ তোমরা। তোমাদের বাড়ী-ঘর-দুয়ার মিউজিয়ম, তোমাদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন দেখলে বোধ হয়, যেন

ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূত কাল—লুঙ্ লঙ্ লিট্ সব এক সঙ্গে। বর্তমান কালে তোমাদের দেখছি ব'লে যে বোধ হচ্চে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ—লোপ লুপ্। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরি করছ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন-কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্চ না?···তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক।'[৪৮]

এই 'নূতন ভারতে'—ভাবীকালের ভারতবর্ষে যাহাদের বিজয়বার্তা ঘোষিত হইবে, সেই চির-অবহেলিত জনগণকে স্বাগত জানাইয়া স্বামীজীর বাণী মেঘমন্দ্রস্বরে ধ্বনিত: 'বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ ক'রে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!!'[৪৯]

শ্রমজীবিসভ্যতার এরূপ প্রশস্তি-রচনা এযুগের অতিবড় সমাজবাদীদের পক্ষেও শ্লাঘার বিষয়। শুধু তাহাই নহে, এযুগের সাম্যবাদী স্লোগানে 'খেটে-খাওয়া' মানুষের প্রতি যে সহানুভূতি অভিব্যক্ত, স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে তাহারই পূর্বধ্বনি। ভারতবর্ষের সরলস্বভাব কৃচ্ছ্রসাধক শ্রমজীবীদের উদ্দেশে বাঙলাসাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম প্রণাম জানাইয়াছেন:

'হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি?—কে ভাবে এ কথা।···লোকজয়ী

ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা; আমাদের গরীবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য ক'রে যাচ্চে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবি!—তোমাদের প্রণাম করি।'[৫০]

বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর সমদর্শী মন সমাজের মন্থরগতি ন্যুব্জদেহ লোকদেরও ছোট বলিয়া ভাবিতে পারে না। তাহারাও যে মানুষ, তাহারাও যে আত্মার অনন্ত শক্তির অধিকারী—এই বিশ্বাস বেদান্তদৃষ্টি-সম্ভূত। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের সেই সমুন্নত দৃষ্টি লইয়াই ভারতের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর কথা চিন্তা করিয়াছেন।

ভারতের নিম্নশ্রেণীর লোকের সর্বপ্রকার দুরবস্থা ঘুচাইবার একমাত্র উপায়—শিক্ষা। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিলে তাহার দুর্বল হস্ত সবল হইবে এবং তাহার ভিতরকার মানুষটি জাগিয়া উঠিয়া সমাজে তাহার প্রাপ্য আসনখানি দখল করিয়া লইবে। স্বামী বিবেকানন্দের লেখনীমুখে এই সত্যেরই দ্বিধাহীন প্রকাশ: 'আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা।… পুরোহিতশক্তি ও পরাধীনতা তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া নিষ্পেষিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ। তাহাদিগকে ভাল ভাল ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জানিতে পারে—জগতে কোথায় কি হইতেছে। তাহা হইলে তাহারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই সাধন করিবে।'[৫১]

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণশ্রেণীর লোকেরা দীর্ঘকাল ধরিয়া অধীত বিদ্যাকে কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এযুগের ভারতেও ভদ্রনামধারী একশ্রেণীর লোকের মধ্যে বিদ্যাচর্চা সীমিত। স্বামী বিবেকানন্দ সমাজের এই শম্বুকবৃত্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। জ্ঞানকে তিনি গোষ্ঠীতন্ত্র মুক্ত করিয়া সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে বলিয়াছেন। ভারতের অগণিত অজ্ঞ ও দরিদ্র

লোকের যথার্থ উন্নতি সাধনের একমাত্র উপায় যে তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার ঘটানো, একথা তাঁহার পরিব্রাজক-জীবনের উপলব্ধ সত্য।

মূর্খ ভারতবাসীকে, দরিদ্র ভারতবাসীকে বিবেকানন্দ অভয়মন্ত্র দিয়াছেন—গণশিক্ষার মাধ্যমে গণচেতনার উদ্বোধন ঘটাইতে চাহিয়াছেন—বিত্তবানের শোষণকে 'demonical and brutal' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। এ পর্যন্ত আধুনিক সাম্যবাদী চিন্তার সহিত তাঁহার চিন্তাধারার মিল লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র মত পোষণ করিতেন। তাঁহার বেদান্ত-নির্ভর সমদৃষ্টি ভালো-মন্দ উভয়ের মধ্যেই সমান দেবত্ব লক্ষ্য করিত। জগৎ-সংসারে ছোট-বড় সকলেই যে নিরন্তর পূর্ণতালাভের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, এই পরম সত্যটি তাঁহার প্রজ্ঞালোকিত চিত্তে ধরা পড়িয়াছিল। 'সকলেই আমাদের সহযাত্রী—সবাই আমাদের এক পথের পথিক—প্রাণবন্ত সকল অস্তিত্ব—সকল উদ্ভিদ—জন্তুসমূহ। সেখানে আমাদের সাথী শুধু আমাদের মানুষ ভাইগণ নয়, আমার পশু ভাই—আমার উদ্ভিদ ভাই; শুধু আমার 'ভালো' ভাই নয়—আমার 'মন্দ' ভাই, আমার আধ্যাত্মিক ভাই নয়—আমার দুর্জন ভাই। তাহাদের সবাই এক লক্ষ্যের দিকেই যাত্রা করিয়াছে। সকলেই এক স্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রত্যেকেই সেই অসীম মুক্তির দিকে ত্বরান্বিত।'[৫২] —সর্বতোমুখী এই প্রেমদৃষ্টিই বিবেকানন্দের সাম্যবাদের গোড়ার কথা। এইজন্য, তিনি demon ও brute-কে বশে আনিবার জন্য আধুনিক কায়দায় শ্রেণীসংগ্রাম চাহেন নাই—চাহিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অদ্বৈতবোধ জাগ্রত করিয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটাইতে।

আসল কথা, স্বামী বিবেকানন্দের মূল লক্ষ্য ছিল মানবসেবা। একদিকে যেমন তিনি 'অমানুষ'কে মনুষ্যত্বলাভের প্রেরণা দিয়া সেবা করিতে চাহিয়াছেন, অপরদিকে তেমনই আর্তজনের আর্তি অপনোদনের সেবামন্ত্রও প্রচার করিয়াছেন—বলিয়াছেন: 'দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।'[৫৩] এই সর্বমানবাত্মক সেবার মধ্য দিয়াই তাঁহার সাম্যবাদ অর্থবহ হইয়া উঠিয়াছে। আর এই সেবা তো কেবল মানবসেবা নয়—ইহা একদিকে ঈশ্বরসেবাও। ঈশ্বর ও মানব, এক ও বহু স্বামীজীর দৃষ্টিতে একটি অখণ্ড সাম্যবোধের মধ্যে বিধৃত। তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী চলিয়াছে এই এক ও বহুর লীলা। সংসার ছাড়িয়াছিলেন একের টানে, সেই একেকে 'বহুরূপে সম্মুখে' দেখিয়া বহুর পূজায় একেরই পূজা করিয়া

গিয়াছেন। বহু ও এক ছিল তাঁহার নিকট একই সত্যের এপিঠ আর ওপিঠ। বহুর দ্বারে দাঁড়াইয়া তিনি যে সেবামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা একেরই চরণে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

মহাকালের রথশীর্ষে দাঁড়াইয়া বহ্নি-বলয়িত এই তেজস্বী পুরুষ 'এক' ও 'বহু'র মিলন-মহোৎসবে উর্ধ্বায়ত মহান সাম্যবাদের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিতেছেন। উনিশ শতকের বাঙলাসাহিত্য স্বামীজীর এই আদর্শ সাম্যবাদ প্রচার করিয়া সাম্যচিন্তার শেষ পর্যায়ে উপনীত। বিশ শতকেও ইহার প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নহে। 'বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ, নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়' বলিয়া, প্রবীণ ভক্তকে গৃহহীন দরিদ্রবেশী দেবতার বাণী শুনাইয়া, 'সবারে বাস্ রে ভালো' সংগীতের উদার সুরমূর্ছনা তুলিয়া এযুগের বাঙলাসাহিত্য স্বামীজী-প্রচারিত সাম্যবাদের উত্তরাধিকার ঘোষণা করিতেছে।

---

১। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার : 'বিবেকানন্দ চরিত' [ ১৩৪৭ ], পৃ. ১৩-১৪।

২। মোহিতলাল মজুমদার : 'বাংলার নবযুগ'

৩। স্বামী সারদানন্দ : 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' [ ১ম ভাগ : ১৩৬০ ], পৃ. ২৪৪-২৪৫।

৪। বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত [ ২য় সং ], পৃ. ১৩৩।

৫। শশিভূষণ দাশগুপ্ত : 'স্বামী বিবেকানন্দের সাম্যবাদ' : 'বিশ্ববিবেক'— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য-সম্পাদিত

৬। Swami Viyekananda : *The Spirit and Influence of Vedanta* : *Thoughts on Vedanta* [ Calcutta, 1954 ], p. 20

৭। 'Wherever there is evil and wherever there is ignorance and want of knowledge, I have found out by experience that all evil comes, as our scriptures say, relying upon differences, and that all good comes from faith in equality, in the underlying sameness and oneness of things. This is the great Vedantic ideal.' : *The Mission of the Vedanta* : works, Vol. III [ Almora, 1948 ], p. 194.

৮। *Vedanta and Privilege* : works, Vol. I [ Calcutta, 1955 ], p. 422.

৯। Ibid : p. 422.

১০। *My plan of Canpaign* : Works, Vol. III [ Almora, 1948 ], p. 216.

১১। 'যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, মানবিক সৌভ্রাত্রে অনুপ্রাণিত, শোষণহীন যে সমাজের কল্পনা সোস্যালিষ্ট চিন্তানায়কেরা করেছিলেন, মানব-মুক্তিই ছিল তার প্রধান কথা। বিবেকানন্দও মানবমুক্তির প্রশ্নেই সোস্যালিষ্ট হয়েছিলেন।' সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : 'বিবেকানন্দ ও সোস্যালিজম্' : 'বিশ্ব-বিবেক'

১২। '...তাঁর (বিবেকানন্দের) কর্ম ও বিশ্বাসের মধ্যে, ধর্ম ও সমাজ-তন্ত্রবাদের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি নেই। ধর্মই তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের উৎস। তাঁর সমাজতন্ত্রবাদ একান্তরূপে ধর্মভিত্তিক—এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব।' সান্ত্বনা দাশগুপ্ত : 'বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন'

১৩। 'সূর্যরশ্মি যেমন শূন্যে তাপ বিকিরণ করে না, উষ্ণতা উৎপাদনের জন্য তাহার একটি অবয়বী পদার্থের আশ্রয় চাই, তেমনই প্রেমকে ক্রিয়াশীল হইতে হইলে তাহার একটা আধার চাই, সেই আধারকে ধরিয়াই সে আপনাকে নিরাধার করিতে পারে; প্রেম যদি সত্যকার প্রেম হয়, তবে সেই আধারে বদ্ধ হইয়াই সে উচ্ছ্বসিত আবেগে সকল সীমা লঙ্ঘন করে।' মোহিতলাল মজুমদার : 'বাংলার নবযুগ'

১৪। 'Every religion is an expression, a language to express the same truth, and we must speak to each in his own language.' : পত্রাবলী—পত্রসংখ্যা ২৪১ : 'বাণী ও রচনা'।

১৫। ভগিনী নিবেদিতার রচনায় ধর্মসম্বন্ধে বিবেকানন্দের উদার মনো-ভাবের উল্লেখ লক্ষণীয় : 'This was indeed the master-thought which he continually approached from different points of view, the equal truth of all religions, and the impossibility for us, of criticising any of the Divine Incarnations, since all were equally forth-shinings of the one.' : *The Master as I saw him* [ Calcutta, 1948 ], 6th ed. p. 8

১৬। গ্রন্থখানি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের অন্যতম। লেখক ইহাতে নিজের নাম উল্লেখ করেন নাই। টমাস-আ-কেম্পিস [Thomas A Kempis] নামে এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এই গ্রন্থের লেখক বলিয়া অনুমান করা হয়। মূল গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় লিখিত। বিবেকানন্দের রচনায় যে-গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা মূল হইতে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত।

১৭। 'ঈশা অনুসরণ' : 'বাণী ও রচনা'।

১৮। বঙ্গানুবাদ : যে ক্রুশকাষ্ঠের ভার তুমি আমাদের উপর দিয়াছ, আমরা তাহা গ্রহণ করিয়াছি। বল দাও, যাহাতে ইহা আমরা আমরণ বহন করিতে পারি। তথাস্তু। 'The Imitation of Christ' মূল গ্রন্থে পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। যথা : 'I have received the Cross, I have received it from thy hand : and I will bear it until death, as thou hast laid it upon me.' : Tr. by Richard Challoner [Calcutta, 1945], p. 247.

এই পাঠও আবার উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন অনুবাদে কিছু কিছু পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত। স্বামীজীর উদ্ধৃত অংশের সহিত এই সকল অনুবাদের কোনটিরই পাঠের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায় না। ল্যাটিন হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের দ্বারা ইংরাজীতে অনূদিত হওয়ার ফলেই এইরূপ পাঠান্তর ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ স্বামীজীর সময়ে যে অনুবাদ প্রচলিত ছিল, তাহাতে স্বামীজী-লিখিত পাঠই ছিল ; অথবা মূল ভাবটি বজায় রাখিয়া স্বামীজী নিজের ভাষায় উহা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন।

১৯। পত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ১২।

২০। স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিতেছেন : 'বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই—তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি।' তদেব : পত্রসংখ্যা ৩৪।

২১। 'ভগবান্ বুদ্ধদেবের অপূর্ব্ব ত্যাগ, অলৌকিক সাধনা ও অসীম করুণা,—নিশিদিন নরেন্দ্রের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। জন্ম, জরা, দুঃখ, ব্যাধির নির্ম্মম পেষণে প্রবৃত্তি-তাড়িত জীবকুলের কাতর হাহাকারে, করুণা-বিগলিত রাজপুত্রের বিশাল হৃদয়ের অপূর্ব্ব বেদনা বর্ণনা করিতে করিতে নরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিত।' সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার : 'বিবেকানন্দ-চরিত' [ ১৩৪৭ ], পৃ ১১৯।

২২। 'বুদ্ধগয়ায় উপনীত হইয়া নরেন্দ্র বোধিসত্ত্বের মন্দির দর্শন করিলেন। ...বোধিদ্রুম মূলে পবিত্র প্রস্তরাসনে নরেন্দ্রনাথ ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহার গুরুভ্রাতাদ্বয় ধ্যানভঙ্গে চাহিয়া দেখেন, নরেন্দ্র পাষাণবৎ নিশ্চল—দেহ স্পন্দনহীন। বহুক্ষণ অতীত হইলে তিনি একবার অর্দ্ধবাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন ; পরক্ষণেই আবার ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন।' তদেব। পৃ ১২০।

২৩। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'।

২৪। তদেব।

২৫। পত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ৩৯৫।

২৬। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'।

২৭। 'বর্তমান সমস্যা' : 'বাণী ও রচনা'।

২৮। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'।

২৯। তদেব।

৩০। তদেব।

৩১। এই প্রসঙ্গে শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রতি স্বামীজীর একটি উক্তি উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে : "ব্রাহ্মণেরাই ত ধর্মশাস্ত্রগুলিকে একচেটে করে বিধি-নিষেধ তাদেরই হাতে রেখেছিল ; আর ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতগুলিকে নীচ বলে বলে তাদের মনে ধারণা করিয়ে দিয়েছিল যে, তারা সত্যসত্যই হীন। তুই যদি একটা লোককে খেতে শুতে বসতে সর্ব্বক্ষণ বলিস—'তুই নীচ', 'তুই নীচ', তবে সময়ে তার ধারণা হবেই হবে যে 'আমি সত্যসত্যই নীচ'।" : 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' [ উত্তর কাণ্ড ] : উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬২ : ষষ্ঠ বল্লী, পৃ. ৩৮-৩৯।

৩২। পত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ৭৬।

৩৩। তদেব : পত্রসংখ্যা ৩৬৮।

৩৪। তদেব : পত্রসংখ্যা ৮৪।

৩৫। তদেব : পত্রসংখ্যা ৬৮।

৩৬। 'বর্ণ' ও 'জাতি' সমার্থক নয়, তথাপি সাধারণভাবে বর্ণ অর্থে জাতি শব্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে।

৩৭। 'চীন, সুমের, বাবিল, মিসরি, খল্‌দে, আর্য, ইরানি, য়াহুদী, আরাব—এই সমস্ত জাতির মধ্যেই সমাজ-নেতৃত্ব প্রথম যুগে ব্রাহ্মণ-বা পুরোহিত-হস্তে। দ্বিতীয় যুগে ক্ষত্রিয়কুল অর্থাৎ রাজসমাজ বা একাধিকারী রাজার অভ্যুদয়।

'বৈশ্য বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী সম্প্রদায়ের সমাজ-নেতৃত্ব কেবল ইংলণ্ড-প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জাতিদিগের মধ্যেই প্রথম ঘটিয়াছে'। 'বর্তমান ভারত'।

৩৮। তদেব।

৩৯। তদেব।

৪০। স্বামীজীর ভাষায় : By the Brahmin ideal what do I mean ? I mean the ideal Brahmin-ness in which worldliness is altogether absent and true wisdom is abundantly present. : *The Mission of the Vedanta* : Works, Vol. III [ Almora, 1948 ], p. 197.

৪১। 'পত্রাবলী' : পত্রসংখ্যা ৩২৯।

৪২। এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সুচিন্তিত অভিমত : '…যদি সামাজিক কোনও আচারের পরিবর্তন ঘটাইতে হয়, তাহা হইলে ঐ আচারের মূলে কি আবশ্যকতা আছে, সেইটি প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেইটি পরিবর্তন করিয়া দিলেই উক্ত আচারটি আপনা হইতে নষ্ট হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন নিন্দা বা স্তুতির দ্বারা কাজ হইবে না', : 'পত্রাবলী' : পত্রসংখ্যা ৩৮৪।

৪৩। 'পত্রাবলী' : পত্রসংখ্যা ১১৬।

৪৪। 'পত্রাবলী' : পত্রসংখ্যা ৬৭।

৪৫। 'পত্রাবলী' : পত্রসংখ্যা ১১৬।

৪৬। ভারতবাসীদের পক্ষে এই বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্বামীজী বলিতেছেন : Give and take is the law, and if India wants to raise herself once more, it is absolutely necessary that she brings out her treasures and throw them broadcast among the nations of the earth, and in return be ready to receive what others have to give her. Expansion is life, contraction is death.' : *Reply to the Calcutta Address* · Works, Vol. IV. pp. 310-311.

৪৭। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'।

৪৮। 'পরিব্রাজক'।

৪৯। তদেব।

৫০। তদেব।

৫১। 'পত্রাবলী' : পত্রসংখ্যা ৯৮।

৫২। *Vedanta and Privilege* : Works, Vol. 1. p. 421.

৫৩। 'পত্রাবলী' : পত্রসংখ্যা ১৪২।

## নবম অধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাসাহিত্যের সাজি পাঁচফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। শাস্ত্র-বিচার ও বাদানুবাদের কিংশুক ফুল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সাহিত্যগন্ধী কত বিচিত্র ফুলের সমারোহ দেখা দিয়াছে—আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য, খণ্ডকবিতা, গীতিকবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক। এই সকল সাহিত্যকর্মের মধ্যে ইতস্ততঃ নানাভাবে সাম্যচিন্তার ফসল ছড়াইয়া আছে। উহার সমস্তটা সংগ্রহ করিয়া তুলিয়া ধরা দুঃসাধ্য। যাঁহারা এই ফসলের প্রধান ব্যাপারী, তাঁহাদের মতবাদ ও আদর্শ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে যথাসাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে। তথাপি এমন কয়েকজন সাহিত্যরথীর এমন কয়েকটি রচনা বা রচনাংশ আছে, যেগুলি আমাদিগকে ভেদ-বৈষম্য-বর্জিত উদার মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। বর্তমান অধ্যায়ে এই ধরনেরই কিছু কিছু রচনার পরিচয় সন্নিবেশিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাসাহিত্যে যে সাম্যচিন্তার প্রসার লক্ষ্য করা যায়, তাহাতে এইসব রচনারও দান বড় কম নয়।

### কাব্য-কবিতা

**মাইকেল মধুসূদন দত্ত :**

বাঙলাসাহিত্যে মধুসূদনের দান অবিস্মরণীয়। বাঙলা কাব্যের দেহে ও আত্মায় তিনি অভিনবত্ব আনিয়েছেন। তাঁহার এই সাহিত্যিক সিদ্ধির বিষয় পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার কবিকর্মে নানাপ্রকার মৌলিকতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যুগচিন্তারও সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়াছে। মধুস্বদনের যুগ মানবমহিমা ঘোষণার যুগ। এই যুগে পাশ্চাত্যের প্রচুর আলোকসম্পাতে বাঙলাসাহিত্যের মধ্যযুগীয় দেববাদ ফিকা হইয়া আসিয়াছে—মানবমুখিতা বা human interest সাহিত্যের নূতন বনিয়াদ রচনা করিতেছে। যে-মানুষ জাতি, বর্ণ ও প্রচলিত অন্ধবিশ্বাসের গলিপথ ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের উদার প্রান্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকেই নবযুগের বাঙালী সাহিত্যরথীরা দুচোখ ভরিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই নবদৃষ্টির মূলে যে কেবল পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষাই সক্রিয় ছিল তাহা নহে, বাঙালীর হৃদয়নিহিত চিরন্তন মানবপ্রেম ও সাম্যচেতনা অলক্ষ্যে থাকিয়া

এই দৃষ্টিতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। চর্যাপদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মঙ্গলকাব্য, অনুবাদসাহিত্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর মধ্য দিয়া বাঙলাসাহিত্যে মানবিকতাবাদ বা humanism-এর যে চেতনা লক্ষ্য করা যায়, তাহাই উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় পরিপুষ্ট হইয়া বাঙালীর পুরাতন মানবমুখী দৃষ্টিশক্তিকে প্রবল ও প্রখর করিয়া তুলিয়াছিল।[১] প্রাচীন ও মধ্য যুগে বাঙালী যে দৃষ্টি দিয়া মানুষকে দেখিত, উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীর চোখেও সেই একই প্রেমের দৃষ্টি—কেবল তাহাকে পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানাঞ্জন মাখাইয়া যুগোচিত একটা নূতন রূপ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। যুগসমুখ এই নবদৃষ্টির আলোকেই মধুসূদনের সাহিত্য-সাধনার অগ্রগতি। তাঁহার সাহিত্যকর্মে আমরা মাইকেল এম্. এস্. ডাটকে দেখিতে পাই বটে, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি করিয়া দেখিতে পাই বাঙালী কবি শ্রীমধুসূদনকে। বাঙালীর অন্তর্লোকের প্রেম ও সাম্যবোধ—যাহা বাঙালী বলিয়া মধুসূদনের মধ্যে আপনা হইতেই স্বাঙ্গীকৃত হইয়াছিল—তাহাকে তিনি পাশ্চাত্ত্য কাব্যরীতির পোশাক পরাইয়া সাহিত্যে হাজির করিয়াছেন। এইজন্যই দেখিতে পাই—কুল বা বংশের নিরিখে মানুষে মানুষে যে বৈষম্য, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া তিনি মানুষের সত্যমূল্যটি নির্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

মূল সংস্কৃত রামায়ণে দেখি, আর্যকুলের 'সূর্যপ্রভববংশ' সন্তানগণ যে মনুষ্যত্বের ছাপ লইয়া প্রতিষ্ঠিত, অনার্যকুলের লঙ্কাদ্বীপবাসীদের ললাট হইতে সেই ছাপ মুছিয়া ফেলা হইয়াছে—মহাকবি বাল্মীকি তাহাদিগকে কেবল পাপাচারী রাক্ষস বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রেমধারা-পরিপ্লুতা শ্যামলা বঙ্গভূমির কবিচিত্ত প্রথম হইতেই অনার্য রাক্ষসকে সস্নেহে মানুষের সমাজে টানিয়া লইয়া বাঙালীর চিরন্তন সাম্যবোধের পরিচয় দিয়াছে। বাঙলা রামায়ণের আদি কবি কৃত্তিবাসের দৃষ্টিতে লঙ্কাবাসীরা রাক্ষস বলিয়া অবজ্ঞাত হয় নাই।'···কৃত্তিবাসের রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, বিভীষণ, তরণীসেন ইঁহারা কেহই রাক্ষস নহেন, ইঁহারা ভক্ত। ভক্তি মানুষেরই গুণ, রাক্ষসের নহে।'[২] অতএব কৃত্তিবাসের কবিকল্পনায় লঙ্কারাজ্য মানুষেরই রাজ্য—লঙ্কার রণকোলাহল-মুখর ইতিহাসে মানবসভ্যতারই একটি দ্বন্দ্বসংঘাতময় চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর কবি মধুসূদন কৃত্তিবাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই কাব্যলোকে যাত্রা করিয়াছেন। 'কৃত্তিবাস যাহাকে মধ্যযুগের রূপ দিয়াছিলেন, মধুসূদন তাহাকেই উনবিংশ শতাব্দীর রূপ দিয়াছেন মাত্র।'[৩] মধুসূদনের যুগানুসারী স্বচ্ছদৃষ্টি রাক্ষসকুলের মধ্যেও মনুষ্যত্ব-

মহিমা আবিষ্কার করিয়াছে—রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহার নিকট 'grand fellow', রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎকে তিনি 'my favourite Indrajit' বলিয়া প্রীতি জানাইয়াছেন। তাহা ছাড়া সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার ভিতর দিয়া যে মানবজীবন আবর্তিত, তাহার লীলাছন্দ তিনি আর্যকুলের ন্যায় অনার্যকুলেও লক্ষ্য করিয়াছেন।

বাল্মীকি-কাব্যে উপেক্ষিত হইলেও লঙ্কাদ্বীপবাসী অনার্যগণও যে মানুষ—উত্তর-ভারতের সভ্যতাগর্বী আর্যদের সঙ্গে তাহারাও যে একাসনে বসিবার যোগ্য, ইহা বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্য মধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য'-খানির অনেক স্থলে রাক্ষসকুলের আচার-আচরণে আর্য রীতিনীতির আরোপ করিয়াছেন।

ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতিপদে বরণ করার যে অনুষ্ঠান, তাহা গাঙ্গেয় ভূমির আর্যরাজকুলেরই আচরিত অনুষ্ঠান। আর্যরীতি অনুসারেই লঙ্কেশ্বর রাবণ

'যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।' [১ম সর্গ]।

আবার নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অতর্কিতে লক্ষ্মণকর্তৃক আক্রান্ত ইন্দ্রজিতের মুখেও আর্য-বীরধর্মের কথা :

'নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।' [৬ষ্ঠ সর্গ]।

কিন্তু কেবল রাবণ বা ইন্দ্রজিৎই নহে, লঙ্কার পুরবাসিনীদের আচরণেও আর্যরীতি। অশোকবনে সীতা-সন্নিধানে রক্ষোবধূ সরমার আচরণ আর্য-কুলবধূকেই স্মরণ করাইয়া দেয় :

'কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে; সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারা-রত্ন যথা!
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।' [৪র্থ সর্গ]।

রক্ষোবধূ সরমা কৌটা খুলিয়া সীতাদেবীর সীমন্তে সিন্দূরচিহ্ন আঁকিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার রাক্ষসী-পরিচয় মুছিয়া ফেলিয়া আর্যকুলের হিন্দু নারীর দলে মিশিয়া গিয়াছেন।

সম্মোনিহত রাক্ষসবীর মেঘনাদের পত্নী প্রমীলার সহমরণেও আর্যরীতির অবিকল অনুসরণ। সিন্ধুতীরে মেঘনাদের চিতা সজ্জিত হইলে

'চিতায় আরোহি সতী ( ফুলাসনে যেন ! )
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে ;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী ; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি ;
সে রবের সং মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব !' [ ৯ম সর্গ ]।

এই চিত্র উচ্চবর্ণের হিন্দুকুলের মধ্যে প্রচলিত সহমরণ-প্রথারই নিখুঁত অনুবৃত্তি।

মধুসূদনের বর্ণনায় আর্য-অনার্যের ভেদ অবলুপ্ত।

জাতিগত ভেদের ন্যায় এদেশে চিরকাল ধরিয়া নারী-পুরুষের মধ্যেও প্রবল বৈষম্য চলিয়া আসিতেছে ; কেবল নবযুগে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোকে এই বৈষম্য অনেকটা হ্রাস পাইতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাঙালী নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-হীন অসহায় অবস্থা বাঙালী মনীষার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মধুসূদনের বহু পূর্বে রামমোহন রায় বাঙালী নারীকে সামাজিক নিগ্রহ হইতে মুক্ত করিবার আন্দোলন আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগর-প্রমুখ সংস্কারকদের চেষ্টায় এই আন্দোলন ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠে, এবং সমাজে নারীরও যে একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে—কেবল পুরুষের দাসত্ব করিবার জন্যই যে নারী-জীবন সুনির্দিষ্ট হয় নাই, ইহা প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন চলিতে থাকে। মধুসূদনের সাহিত্যিক মননকর্ম এই যুগধারাকে অনুসরণ করিয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যে চিত্রাঙ্গদা ও প্রমীলার চরিত্র সৃষ্টি করিয়া মধুসূদন নারীর ব্যক্তিমহিমা পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন।

পুরুষের অন্যায় ও অসংগত আচরণও নীরবে সহ্য করার যে উপায়হীন ভীরুতা, তাহার দায় হইতে চিত্রাঙ্গদা নারীজাতিকে মুক্তিলাভের ইঙ্গিত দিয়াছেন। বীরবাহু দেশবৈরীর সহিত যুদ্ধ করিয়া বীরোচিত মৃত্যু বরণ করিয়াছে—স্বামী রাবণের এই অন্তঃসারশূন্য উক্তিকে শোকাতুরা বীরবাহুজননী চিত্রাঙ্গদা কিছুতেই মানিয়া লইতে পারেন নাই। ইহার প্রতিবাদে স্বামীর প্রতি তাঁহার অভিমানক্ষুব্ধ ধিক্কার উচ্চারিত :

'দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি

হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এদেশে
রাঘব ?……
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !' [ ১ম মর্গ ]

চিত্রাঙ্গদার এই উক্তি অন্তঃপুরবাসিনী ভীরুস্বভাবা নারীর হৃদয়ে সত্যভাষণের সাহস যোগাইবে।

মধুসূদনের অপর একটি অনবদ্য নারীচরিত্র—প্রমীলা। নারী যে অবলা নহে—প্রয়োজনবোধে নারীর পক্ষেও যে পুরুষের ন্যায় শক্তিসাহস প্রদর্শন করা সম্ভব, প্রমীলার আচরণে তাহাই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। স্বামী ইন্দ্রজিতের সহিত মিলনের আশায় প্রমীলা প্রমোদ-উদ্যান হইতে সহচরী-পরিবৃতা হইয়া লঙ্কার রাজপুরীতে যাইবেন। পথে রামচন্দ্রের সৈন্যগণ তাঁহাকে বাধা দিতে পারে। কিন্তু সেজন্য তাহার শঙ্কা নাই। তাঁহার মুখে স্পর্ধিত উক্তি :

'দানবনন্দিনী আমি ; রক্ষঃকুল-বধূ :
রাবণ শ্বশুর মম. মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে ,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?' [ ৩য় মর্গ ]।

নারী হইলেও এক্ষেত্রে প্রমীলার ভুজবলের প্রয়োজন অনিবার্য। অতএব তিনি ও তাঁহার সঙ্গিনীরা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইলেন। প্রমীলাকে যোদ্ধবেশ-পরিহিতা তেজস্বিনী বীরাঙ্গনারূপে উপস্থাপিত করিয়া মধুসূদন এদেশের সর্বদা-শঙ্কিত নারীকুলের নিকট অপরাজেয় নারীত্বের এক মহান আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন।

শক্তি ও সাহসের ক্ষেত্রে নারী যে অনেক সময় পুরুষকেও স্তম্ভিত করিয়া দেয়, ইহা দেখাইবার জন্যই যেন মধুসূদন পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকেও প্রমীলার বীর্যবত্তার নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য করাইয়াছেন। প্রমীলার বীরপণায় রামচন্দ্র বিনা রণে তাঁহার নিকট পরিহার মাগিয়াছেন। এমন কি, প্রমীলার

'ভীমারূপী' দূতীকে দেখিয়া ভীতত্রস্ত রাম অকপটে মিত্র বিভীষণের নিকট স্বীকার করিতেছেন :

'দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে.
রক্ষোবর ; যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি !
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে !' [ ঐ ]।

অতিভাষণদোষে দুষ্ট হইলেও মধুসূদনের এই বর্ণনার মূলে রহিয়াছে নারী-পুরুষের চিরাগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদের মনোভাব।

এইরূপ প্রতিবাদেরই ফল—নবযুগের বাঙলায় নারীমুক্তি-আন্দোলন। কেবল যে মেঘনাদবধ কাব্যেই এই আন্দোলনের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যেও ইহার সোচ্চারপ্রকাশ। পুরুষের ন্যায় নারীরও যে সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত, এই কাব্যের বিভিন্ন নারী-চরিত্র-চিত্রণে তাহাই বিশেষভাবে প্রচার করা হইয়াছে। বিশেষতঃ 'সোমের প্রতি তারা', 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী'. 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা', 'দশরথের প্রতি কেকয়ী', 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'—এই পাঁচখানি পত্রিকায় উল্লিখিত পৌরাণিক নারীগণ সকলেই স্বকীয় ব্যক্তিত্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। নবযুগের নবপ্রবুদ্ধ চেতনার আলোকেই মধুসূদন তাহাদের রূপ দান করিয়াছেন। বাঙলার নারী-প্রগতি-আন্দোলনের সহিত তাহাদের যোগসূত্রটিকে খুঁজিয়া পাইতে অসুবিধা হয় না। নারীর ব্যক্তিত্বমহিমার কাব্যরূপ দান করিয়া মধুসূদন নারী-পুরুষে সাম্যবোধের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।

### হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় :

বাঙলাসাহিত্যে কবি হেমচন্দ্র মধুসূদনের অনুজ হইবার সাধনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে-সাধনায় তিনি অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের অনুসরণে তিনি 'বৃত্রসংহার' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের বিষয়-নির্বাচন ও গ্রন্থনায় বৈশিষ্ট্য থাকিলেও কবিত্বের বিচারে ইহা অনেক পরিমাণেই ব্যর্থতার সম্মুখীন। তথাপি হেমচন্দ্রের এই কাব্যেও যে নবযুগের চিন্তাধারার কিছুটা প্রতিফলন ঘটিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর ইংরাজ-মোহ অনেকটা কাটিয়া অসিয়াছিল। ইংরাজের হাতে নানাদিক দিয়া ঘা খাইয়া বাঙালী বুঝিতে

শিখিতেছিল যে, ইংরাজ এদেশের লোককে কিছুতেই নেটিভত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে দিবে না। ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে নিরন্তর একটা প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক বজায় থাকিয়া ইহাই স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল যে ইংরাজী কেতাবে যতই কেন-না সাম্য ও মানবতার কথা লেখা থাকুক, ইংরাজ ইংরাজই এবং ভারতবাসীও ভারতবাসীই। এই অসাম্যবোধের বেদনা আবেদন-নিবেদনের ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধের তীরে আসিয়া নোঙর ফেলিয়াছিল। বাঙালী তথা ভারতবাসীর মনে 'বিদেশের ঠাকুর' ফেলিয়া 'স্বদেশের কুকুর'কেও আপন করিয়া লইবার যুক্তি দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল। শিক্ষিত বাঙালীর মন সেদিন স্বদেশ ও স্বজাতির পাশে দাঁড়াইয়া 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' বলিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছিল। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের কাব্য এই যুগেরই কাব্য। তাই উভয় কাব্যেই এযুগের জগৎ ও জীবনের সংকেত—উভয় কাব্যেই জাতির মুক্তিকামনার স্পর্শ। "উনবিংশ শতাব্দীর দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের মহিমাতেই 'মেঘনাদবধ' মহিমান্বিত। রাম-লক্ষ্মণ কোন্ দেশ হইতে আসিয়া সাগর বন্ধন করিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিয়াছিল, —প্রত্যেক স্বদেশভক্ত রাক্ষসের উচিত জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া পরপীডন হইতে দেশকে রক্ষা করা; মেঘনাদ তাহাই করিয়াছিল, তাই সে বীর; আর বিভীষণ তাহা করে নাই, তাই সে ভীরু, বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহী। এই দেশপ্রেম এই স্বাধীনতার সুরের যোগান দিয়া মধুসূদনকে 'মেঘনাদবধে'র উপাখ্যানকে দাঁড় করাইতে হইয়াছে। এই সুর-মিশ্রণ হেমচন্দ্রকেও করিতে হইয়াছিল,···। 'বৃত্রসংহারে'র ভিতরে দেবগণ কর্তৃক স্বর্গের পুনরুদ্ধারের ভিতরে স্বদেশ-উদ্ধার ও স্বাধীনতা লাভের মহিমা······।"[৪]

'বৃত্রসংহার' কাব্যে দেব-দৈত্যের কাহিনী বর্ণনাচ্ছলে কবি দেশবাসীর প্রাণে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতালাভের দুরন্ত গতিবেগ সঞ্চার করিতে চাহিয়াছেন। ইহাতে যুগধর্মের প্রতি তাঁহার অকপট আনুগত্যই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে আবার যুগনিরপেক্ষ একটি চিরন্তন সমস্যার দিকেও কবি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছেন। মৃত্তিকাচারী হীনবল নর-দেবতাদের উপর প্রভুত্বকামী নর-দানবদের অত্যাচারের ফলে মানবসভ্যতায় যুগে যুগে যে সমস্যা দেখা দেয়, বৃত্র-সংহারের কাহিনীতে তাহারই রূপকসত্য প্রকাশিত। অসুররাজ বৃত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেবতাদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধচেষ্টার চিত্র অঙ্কিত করিয়া কবি প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের মিলিত অভিযানের উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রবল ও দুর্বলের—

উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতের মধ্যে যে সংঘাতশীল বৈষম্য, তাহারই উচ্ছেদমন্ত্র 'বৃত্রসংহারে'র মর্মমূলে নিহিত।

এই কাব্যের বিরাট জয়-পরাজয় ও রণকোলাহলের মধ্যে শান্ত তপোবনের নিভৃত আকাশ হইতে স্থিরশুভ্র একটি নক্ষত্র সমস্ত কাব্যটির উপর প্রেম ও করুণার মৃদু আলোক বর্ষণ করিতেছে। কাব্যের এই অংশটিতে ঋষিশ্রেষ্ঠ দধীচির অপূর্ব আত্মদানের কাহিনী। দধীচি দেবতাদের কল্যাণের নিমিত্ত তনুত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। পরার্থে আত্মোৎসর্গের এই সুযোগ তাঁহার নিকট এক পরম প্রাপ্তি। সেই প্রাপ্তির আনন্দে কণ্ঠ তাঁহার আবেগ-মুখর :

'এ ভবমণ্ডল
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কয় জন ?
হিতব্রত-সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা ?
হায় রে অবোধ প্রাণী, এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিব ?
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে ?
অনুক্ষণ জীবনের স্রোতধারা-ক্ষয়,
হায়, সে কতই রূপে ! কেন ভবে হেন
ঘটে যদি কার ভাগ্যে সে দুর্লভ যোগ,
কাতর নরের চিত্ত সে ব্রত-সাধনে ?...
জগৎ-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্মপালনে ;
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।' [ ১৩শ সর্গ ]

এই যে 'নরের কল্যাণ' সাধনের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিবার মহতী ভাবনা, ইহার মূলে রহিয়াছে বিশ্বৈকাত্মবোধের অম্লান দীপ্তি। স্বদেশ-প্রেমের সহিত আত্মপরভেদহীন এই বিশ্বপ্রেম মিলিত হইয়া 'বৃত্রসংহার' কাব্যের কাহিনীভাগকে একটি দুর্লভ মহিমা দান করিয়াছে।

'বৃত্রসংহার' ও অপর কয়েকখানি ছোটবড় কাব্য ব্যতীত কবি হেমচন্দ্র কিছু কিছু খণ্ডকবিতাও রচনা করিয়াছিলেন, এই কবিতাগুলি বিবিধ বিষয় লইয়া রচিত। ইহাদের মধ্যে কোন-কোনটিতে সমকালীন যুগমানসের আশা-আকাজ্ক্ষা ও সমস্যার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। কবিচিত্তে যুগানুসারী যে-সকল ভাব ও ভাবনা দেখা দিয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল প্রকাশ এই সকল কবিতায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই নারী-পুরুষে অধিকারসাম্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশে আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছিল। হিন্দুসমাজের বৈষম্য-মূলক নির্মম বিধি-বিধানের ফলে হিন্দুনারীর যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, তাহার নিরসনকল্পে বিদ্যাসাগর-প্রমুখ সমাজসংস্কারকগণ বিশেষভাবে আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কবি হেমচন্দ্রের চিত্তেও তৎকালীন এই নারীমুক্তি-আন্দোলনের তরঙ্গাভিঘাত ঘটিয়াছিল। তাঁহার 'ভারত-কামিনী', 'কুলীন-মহিলা বিলাপ', 'বিধবা রমণী' প্রভৃতি কবিতায় তাহারই সার্থক অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। নারী ও পুরুষের মধ্যে যুগপ্রাচীন সমাজবিহিত বৈষম্যের প্রতিবাদে হেমচন্দ্রের কবিকণ্ঠ সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে।

সে-যুগের পরাধীন ভারতে শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ ও কৃষ্ণকায় ভারতবাসীর মধ্যে ছিল গুরুতর বৈষম্য। অধিকাংশ ইংরাজ রাজপুরুষের নিকট ভারতবাসী তখন 'ব্ল্যাক নিগার' বা 'নেটিভ' বলিয়া অবজ্ঞাত হইত। বর্ণগত বৈষম্যজনিত এই অবজ্ঞা সেদিন শিক্ষিত বাঙালীর মনকে বিশেষভাবে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। হেমচন্দ্রের কবি-হৃদয়ও যুগমানসের এই বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স অফ ওয়েলসের কলিকাতা আগমন উপলক্ষে রচিত 'ভারতভিক্ষা' কবিতাটিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

বিচারক্ষেত্রে সাদা-কালোর বৈষম্য লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে রচিত 'ইলবার্ট বিল' এদেশে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল।[৫] এই বিলের বিরোধী ইংরাজদের ব্যঙ্গ করিয়া হেমচন্দ্র কবিতা লেখেন—'নেভার—নেভার'। এই কবিতায় ইংরাজের তাৎকালিক গর্বিত আচরণের প্রতি কবির বিদ্রূপ উপভোগ্য :

'গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিসম্যান,
ডাক ছাড়ে ব্রান্‌সন্ কেশুয়িক-মিলার—
"নেটিবের কাছে খাড়া নেভার্—নেভার্!"
"নেভার"সে অপমান— হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান, আমাদের "জান না"?
বিবিজান! দেহে প্রাণ কথনও তা হবে না॥'

এই বিদ্রূপই আরও সুর চড়াইয়া মদোদ্ধত ইংরাজ-চরিত্রকে চরম আঘাত হানিয়াছে :

'সাবাস ইংরেজ জাতি সাবাস বুকের ছাতি,
লাঙ্গুল বেঁধেছে ভাল সভ্যতা নেজুড়।'

এই সকল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মূল সুর স্বদেশপ্রেম। হেমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনার মধ্যে বিভিন্নভাবে ইহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'বৃত্র-সংহার' কাব্যে ইহা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, 'বীরবাহু কাব্যে' বীরবাহুর উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতায় ইহার প্রাথমিক রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু খণ্ডকবিতালীর বিভিন্ন অংশে ইহার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়।

কবির সুবিখ্যাত 'ভারত-সঙ্গীত' কবিতায় মহারাষ্ট্রের ঐতিহাসিক বীর-গাথার[৬] ছলে ইংরাজাধীন ভারতবর্ষকে মুক্তিসংগ্রামের জন্য আহ্বান জানানো হইয়াছে। এই কবিতায় মোহাচ্ছন্ন পরাধীন ভারতবাসীর আত্মসম্বিৎ ফিরাইয়া আনিবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সেদিনের পর-পদদলিত দেশে কবির বজ্রগম্ভীর শিঙ্গা-ধ্বনিতে স্বাধীনতার উদ্বোধন-বাণী প্রচারিত :

'বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?'

'ভারতবিলাপ' কবিতাটি কবির অপর একটি দেশপ্রেমের কবিতা। গর্বিত ইংরাজ রাজপুরুষ ও পদদলিত হতমান স্বদেশবাসীর মধ্যে যে নিদারুণ বৈষম্য, তাহার বেদনা কবিকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। কবিতাটির শেষে কবির নিরুপায় অক্ষেপ। পরাধীনতার দুঃসহ ব্যথায় অনেক কথাই কবির মনে জাগিতেছে, কিন্তু রাজরোষের ভয়ে কবি সংযতবাক্ :

'ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার,
বাজিত গরজে— উথলি আবার
উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ।'

স্বদেশের পরাধীনতায় কবি-হৃদয়ে যে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কখনও প্রবলভাবে—কখনও দীপশিখার ম্লান মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কবি যেমন শিঙ্গা বাজাইয়া স্বাধীনতার অমোঘ আহ্বান ধ্বনিত করিয়াছেন, তেমনই আবার পরাধীন ভারতের বুকফাটা হাহাকারকে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। 'পদ্মের মৃণাল' কবিতায় দুর্গত দেশ-বাসীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া কবি বিলাপ করিতেছেন :

'আজি এ ভারতে হায়, কেন হাহাধ্বনি।

কলঙ্ক লিখিতে কার কাঁদিছে লেখনী ?

তরঙ্গে তরঙ্গে নত পদ্মমৃণালের মত,

পড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী।

আজি এ ভারতে কেন হাহাকারধ্বনি !'

কবির এই দেশপ্রেমই 'হায় কি হলো' কবিতায় তির্যক্ ভঙ্গীতে প্রকাশিত :

'পরের অধীন দাসের জাতি "নেসেন" আবার তারা !

তাদের আবার "এজিটেসন্"—নরুন উঁচু করা !'

কিন্তু এই নৈরাশ্য কবিচিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ জাগরণ সম্বন্ধে তিনি দৃঢ় আশা পোষণ করিতেন। 'মন্ত্রসাধন' কবিতায় তিনি বলিতেছেন—ইংলণ্ডের ইতিহাসে প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান লক্ষ্য করিয়া ভারতের জনগণও একদিন স্বধিকার-প্রতিষ্ঠায় শিক্ষা লাভ করিবে :

'শিখিবে ভারত—শিখিবে এ কথা

চিরদিন তরে, না হবে অন্যথা—

এক দিকে কোটি প্রাণী কাতরতা,

শ্বেতাঙ্গ কজন বিপক্ষ তায়।'

'রিপণ-উৎসব—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ' কবিতায় ভাবী ভারত সম্বন্ধে কবির আশা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কবি মানসনেত্রে ভারতের নব-উত্থান প্রত্যক্ষ করিয়া দেশজননীর জাগরণ-গান রচনা করিয়াছেন :

'উঠ উঠ মাতঃ ডাকিছে তোমায়

তোমার সন্তান যে যথা আজ,

কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবাদল

কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ।

একা বঙ্গ নয় হিমালয় হ'তে

কুমারীর প্রান্ত যেখানে শেষ,

আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান

জাগাতে তোমারে জেগেছে দেশ।'

দেশবাসীর এই যে 'একপ্রাণ' হইয়া জাগরণ, ইহার মর্মমূলে থাকে পারস্পরিক প্রীতি ও সাম্যবোধ। হেমচন্দ্রের কবিমানস এই প্রীতি ও সাম্যবোধের সুরেই কাব্যবীণায় ঝঙ্কার তুলিয়াছে।

**নবীনচন্দ্র সেন ঃ**

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাসাহিত্য মানবতার জয়গানে মুখর। কবি নবীনচন্দ্রের কাব্যে এই গান একটু উচ্চগ্রামেই বাঁধা হইয়াছিল। নবীনচন্দ্র ছিলেন মূলতঃ মানুষেরই কবি। একদিকে তিনি যেমন কোনো মানুষকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই,[৭] অন্যদিকে তেমনই জাতিধর্মের বিভেদ ভুলিয়া সকল মানুষকেই কেবল মানুষ বলিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন এবং সেই মানুষের একটা মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ রূপের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তাঁহার ত্রয়ী কাব্য—রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস তাঁহার এই মানবমুখী ভাব ও ভাবনার বাণীবহ।

কবি তাঁহার এই কাব্যত্রয়ে আধুনিক যুগের পাশ্চাত্ত্য-প্রচারিত সাম্য ও মানবতার আলোকে মহাভারতীয় কাহিনীর নবমূল্যায়ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।[৮] কবির মতে, মহাভারতের যুগে বৈষম্য ও বিরোধে প্রপীড়িত ভারতবর্ষে একজন মহামানব আবির্ভূত হইয়া সাম্য ও ঐক্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং জনচিত্তে প্রেম ও সহমর্মিতার উদ্বোধন ঘটাইয়াছিলেন। কবির এই আদর্শ মানুষটি হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—বহুঘোষিত এই উক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া কবি কৃষ্ণের মানবসত্তার প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টা যে সর্বাংশে সফল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ 'রৈবতকে' কৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ং—আমি ভগবান্' ; 'কুরুক্ষেত্রে' তিনি 'দ্বাপরের অবতার' ; 'প্রভাসে' তিনি 'পতিতপাবন, নরনারায়ণ'। তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কন করিয়া কবি আমাদের নিকট একজন মহান্ মানবের চিত্র তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে '…কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত প্রেমের দেবতায় রূপান্তরিত হইলেও কবি তাঁহার চরিত্রে আধুনিক পাশ্চাত্য আদর্শের মহৎ গুণগুলি সঞ্চারিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কাভুর, মাৎজিনি, বিসমার্ক প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ-নায়কগণ খণ্ড ছিন্ন স্বদেশকে সামগ্রিক ঐক্যবন্ধনের যে মহৎ প্রয়াস করিয়াছিলেন, সেই স্বাদেশিক আদর্শ ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীর নিকট উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই কবি কৃষ্ণকে খানিকটা স্বাদেশিক আদর্শে গড়িতে চাহিয়াছিলেন।[৯]

কৃষ্ণচরিত্রকে এইপ্রকার নবরূপ দান করিবার জন্য মহাভারত-কাহিনীর সহিত কল্পনার রঙ মিশাইয়া কবিকে একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে

হইয়াছে। কবি দেখাইয়াছেন, সে-যুগের ভারতে সর্বক্ষেত্রেই ছিল বিভেদ আর বিরোধ—জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, ধর্মে ধর্মে।

এই যে জাতি, বর্ণ, রাষ্ট্র ও ধর্ম লইয়া ভারতব্যাপী বৈষম্য ও বিরোধ, ইহারই পটভূমিকায় দাঁড়াইয়া যুগমানব শ্রীকৃষ্ণ চাহিয়াছিলেন সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড 'মহাভারত' গড়িয়া তুলিতে, এবং বিবদমান রাজন্যবর্গকে একটি রাষ্ট্রীয় শক্তির ছত্রচ্ছায়ায় আনয়ন, বেদবাদী ও কাম্যকর্মসঙ্কুল ভারতভূমিতে প্রেমধর্মের প্রচার প্রভৃতি কর্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া সেই সাধনাকে তিনি সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। ত্রয়ী কাব্যে নবীনচন্দ্রের মূল বক্তব্য বিষয় ইহাই।

কবির কাব্যত্রয়ে বর্ণিত কাহিনী পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা ধীরে ধীরে একটা স্থির লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সে লক্ষ্য হইল মানবপ্রেম ও সাম্যবাদ।

'রৈবতকে' দেখি, ভারতব্যাপী উৎকট বর্ণভেদ এবং ধর্মের নামে ধর্মের ব্যভিচার লক্ষ্য করিয়া বালকবয়সেই শ্রীকৃষ্ণ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। পার্থের নিকট নিজ জীবনের 'পূর্বস্মৃতি' বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন :

'একাকী নির্জ্জনে এক তরুর ছায়ায়,
একটি উপলখণ্ডে করিয়া শয়ন,
চাহি অনন্তের শান্ত দীপ্ত নীলিমায়,
ভাবিতেছি,—জীবনের ভাবনা প্রথম,—
একই মানব সব ; একই শরীর ;
একই শোণিত মাংস, ইন্দ্রিয় সকল ;
জন্ম মৃত্যু একরূপ ; তবে কি কারণ
নীচ গোপজাতি, আর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ ?
চারি বর্ণ, চারি বেদ ; দেবতা তেত্রিশ ;
নিরমম জীবঘাতী যজ্ঞ বহুতর।'

ব্যাসের সহিত কথোপকথন-প্রসঙ্গেও জাতিভেদের বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের তীব্র ক্ষোভ সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে :

'আছিল কি চারি জাতি ? লইল যখন
কেহ শস্ত্র, কেহ শাস্ত্র, বাণিজ্য কেহ বা,
সমাজের হিতব্রতে হইল যখন

কেহ হস্ত. কেহ পদ, কেহ বা মস্তক ;
আছিল কি জাতিভেদ ?'

জাতিভেদের বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের এই বিদ্রোহবাণী শেষ পর্যন্ত আর্যে-অনার্যে প্রেম ও মিলনের মধ্যে স্নিগ্ধ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। 'প্রভাসে' দেখিতে পাই, আর্যকুলগৌরব শ্রীকৃষ্ণ আপনার জাতিবর্ণ-নিরপেক্ষ প্রেম ও উদারতায় অনার্য-জাতির পরম প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। আর্যদ্বেষী অনার্যরাজ বাসুকিও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃষ্ণার্জুনের বিরুদ্ধে যাইতে অসম্মত। ইহা ছাড়া অনার্যবালা শৈলজার আর্যবীর অর্জুনের প্রতি নিষ্কাম প্রেম ও কৃষ্ণ-ভগিনী সুভদ্রাকে ভগিনীজ্ঞানে শ্রদ্ধাপ্রীতি নিবেদন আর্য-অনার্যের মিলন-মহোৎসবে একটি যূথিকা-কুসুমের সৌরভ বিতরণ করিতেছে। আবার আর্যকন্যা আর্যবধূ সুভদ্রাও আর্যদ্বেষিনী অনার্যা জরৎকারুকে আপন স্নেহনীড়ে টানিয়া লইয়া জাতিভেদ-পরিচ্ছিন্ন উদার মানবপ্রেমের পরিচয় দিয়াছে। 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে অভিমানাহতা জরৎকারুর প্রতি সুভদ্রার সান্ত্বনাবাণীতে সর্বভেদহীন বিশুদ্ধ মানবপ্রেমেরই মহিমা প্রকাশ পাইতেছে :

"...'অনার্য আর্য'—কহিতে লাগিল ভদ্রা—
'একই পিতার পুত্র-কন্যা সমুদয়।
এক রক্ত, এক মাংস, এক প্রাণ, সকলের
এক আত্মা, এক জল, ভিন্ন জলাশয়'।"

একদিকে সুগভীর সহমর্মিতা লইয়া জাতিতে জাতিতে ঐক্যস্থাপন, অপরদিকে বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে একটি বৃহৎ রাষ্ট্রীয় শাসনের অধীনে আনিয়া সাম্য ও ঐক্যের ভিত্তিতে ভারতমাতার 'রাজরাজেশ্বরী' মূর্তির প্রতিষ্ঠা—নবীনচন্দ্রের মতে এই উভয় কার্যেই শ্রীকৃষ্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। দুইটি পরস্পরবিরোধী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি মহাজাতি গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছিল খণ্ড-বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে সম্মিলিত করিয়া একটি বিশাল 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। সে-যুগের ভারতবর্ষে দিকে দিকে চলিতেছিল স্বার্থোদ্ধত রাজন্যদের স্পর্ধিত তাণ্ডব। জরাসন্ধ, শিশুপাল, ভগদত্ত, নাগেন্দ্র বাসুকি—ইহাদের উগ্র লোভ ও স্বার্থবুদ্ধির ফলে ভারতভূমি তখন বিপন্ন। ইহারা সন্ধিবদ্ধ হইয়া একযোগে কৃষ্ণরাজধানী দ্বারকা আক্রমণ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। অন্যদিকে আবার হস্তিনায় হিংসামত্ত কৌরবগণ ইন্দ্রপ্রস্থের পাণ্ডবদিগকে আঘাত হানিবার জন্য সজ্জিত হইতেছিল। এই ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লবে 'সাধুর দুর্দশা' ও 'অসাধুর আধিপত্য'

ঘুচাইবার জন্য পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এক মহানায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের কব্যত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেই বিরাট কর্মযজ্ঞেরই প্রস্তুতি, অগ্রগতি ও পবিণতির চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। 'রৈবতকে' সুভদ্রা ও অর্জুনের বিবাহের ফলে যাদব ও পাণ্ডবদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হওয়ায় বিরোধী শক্তিগুলিকে পর্যুদস্ত করিয়া একরাষ্ট্র স্থাপনের শক্তি সঞ্চিত হইল, 'কুরুক্ষেত্রে' শিশু অভিমন্যুর আত্মদানে সেই শক্তিব অভিযান আরও তীব্র হইয়া উঠিল, 'প্রভাসে' মহাযুদ্ধের পর মহাশান্তি—সর্বত্রই প্রেম—সকলেই হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া একটি ধর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ ; সেই প্রেমের ক্ষেত্রে যদুবংশের আত্মকলহের ফলে আকস্মিকভাবে যে বিষবাষ্প উঠিয়াছিল, তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

হিংসাদ্বেষ-বিহীন যে মানবতা—সর্বপ্রকার সাম্যকে অবলম্বন করিয়া পরিস্ফুট যে মনুষ্যত্ব, তাহারই কল্যাণপূত শান্তিবারিধারায় ভারতের ঝঞ্চাদীর্ণ বিশাল প্রান্তরভূমির সমস্ত ধূলিমালিন্য একদা মহামানব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কল্যাণহস্তে ধৌত করিয়া দিয়াছিলেন। 'এক ধর্ম, এক জাতি, এক রাজ্য, এক নীতি' প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিরোধ-সংঘাতপূর্ণ ভারতবর্ষে তিনি তাঁহার ধ্যানলব্ধ মহাভারতের মূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সাম্যভিত্তিক কর্মপ্রচেষ্টায় এইখানেই ছেদ পড়ে নাই। "সাম্যবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই যে একজাতি একরাষ্ট্র এবং একধর্মের বন্ধনে মহামানবের মিলনের আদর্শ, নবীন সেনের মতে শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার ভিতরেই আবদ্ধ রাখিতে চান নাই ; ভারতবর্ষকে অবলম্বন করিয়া এই মহামানবের মিলনাদর্শ সমগ্র জগতে একদিন প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন। এই জন্য 'প্রভাসে'র শেষদিকে দেখিতে পাই, পঞ্চপাণ্ডবের যে রাজ্য ছাড়িয়া মহাপ্রস্থানে যাত্রা, তাহা নবীনচন্দ্রের মতে মহাভারত প্রতিষ্ঠার পরে দেশবিদেশে এই আদর্শ প্রচারের জন্য যাত্রা ; বলরাম যে সমুদ্রে গিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং নাগরূপে যে তাঁহার প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিল তাহার ব্যাখ্যায় কবি বলিয়াছেন যে, আর্যবীর বলরাম অনার্য নাগজাতির সহিত একত্রিত হইয়া সমুদ্র পাড়ি দিয়া দূর দূর দেশে নব আদর্শ 'কর্ষণ' ও বপন করিতে গিয়াছেন।"[১০]

আসল কথা, কবি-কল্পনায় শ্রীকৃষ্ণ একটি মহৎ ভাব বা 'আইডিয়া'র প্রতীক হইয়া উঠিয়াছেন। অগাস্ট কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ, মিল-বেন্থামের মানবহিতবাদ ও সেণ্ট সাইমনের সাম্যবাদ—এই ত্রিধারার প্রয়াগতীর্থে অবগাহন করিয়া

নবযুগের নবশিক্ষায় শিক্ষিত নবীনচন্দ্রের কবিমানস ভাবী পৃথিবীতে বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধুর স্বপ্ন দেখিয়াছিল—ঠিক আধুনিক বিশ্বরাষ্ট্রবাদীদের মতোই। আবার 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'ই যে এই স্বপ্ন সফল করিবার 'মিশন' গড়িয়া উঠিবে, সে-বিষয়েও কবিচিত্তে একটা দৃঢ় প্রতীতি ছিল। কবির অবচেতন মনের এই স্বপ্নসাধ এবং প্রত্যয়ই শ্রীকৃষ্ণলীলার নবরূপায়ণে আভাসিত।

এই প্রসঙ্গে অপর একটি কথাও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। সত্য বটে, নবীনচন্দ্র তাঁহার ত্রয়ীকাব্যে বিশেষভাবে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টায় একদা এই ভারতবর্ষে বিরোধ, বিচ্ছিন্নতা ও অসাম্য তিরোহিত হইয়া সাম্যভিত্তিক একটি মহান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে হয়তো ইহাও চাহিয়াছেন যে উনিশ শতকের পর পদদলিত ও নানাপ্রকার বৈষম্যে পীড়িত ভারতবাসী এই মহাভারতীয় কাহিনী হইতে সাম্য, সংহতি ও ও ঐক্যের শিক্ষা লাভ করুক। প্রাচীনের নজীর দেখাইয়া জাতীয় জীবনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার রেনেসাঁসধর্মী সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ। নবীনচন্দ্র রেনেসাঁস-যুগেরই কবি। তাই তাঁহার কাব্যের অব্যক্ত সংকেতটি উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

উনিশ শতকীয় সাম্যবাদ যে নবীনচন্দ্রের কবিচিত্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা তাঁহার বিভিন্ন রচনা লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। কেবল ত্রয়ীকাব্য নয়, তাঁহার আরও কয়েকখানি কাব্যের মধ্যেও তাঁহার সাম্যাদর্শী মনোভাব পরিস্ফুট। ত্রয়ীকাব্য ছাড়া মহাপুরুষ-জীবনী লইয়া তিনি অপর তিনখানি কাব্য রচনা করেন—'খৃষ্ট', 'অমিতাভ' ও 'অমৃতাভ' [তাঁহার জীবদ্দশায় অসম্পূর্ণ]। এই সকল কাব্যের মূল প্রেরণা ছিল ধর্মবিষয়ে সাম্যবোধ। বস্তুতঃ বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবনী-কাব্য রচনা করিয়া নবীনচন্দ্র ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, ধর্মে ধর্মে কোনো ভেদ নাই। একমাত্র 'মানবধর্ম'কেই তিনি প্রকৃত ধর্ম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার মতে: 'সত্যই ইহার প্রাণ, মনুষ্যত্ব ইহার লক্ষ্য। মনস্বী মানব মাত্রই ইহার শিক্ষক, সর্ব অবস্থার মানবই ইহার অধিকারী!'[১১] মানবধর্ম-নির্ভর এই উদার সাম্যচিন্তাই নবীন-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের কবি হিসাবেই নবীনচন্দ্র সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই কাব্যের মূল সুর স্বদেশপ্রেম। কিন্তু একটু অন্তর্দৃষ্টি

দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই স্বদেশপ্রেমের মূলে রহিয়াছে মানবাধিকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাম্যবোধজনিত একটা মর্মদাহী জ্বালা। প্রভুত্বগর্বী ইংরাজের নিকট পদে পদে অপদস্থ হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী বুঝিতে শিখিয়াছিল যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে মানুষ হিসাবে ইংরাজের পাশে দাঁড়াইবার কোনো অধিকারই সে লাভ করিতে পারিবে না। এই অধিকারসাম্যের কামনাই সে-যুগে বাঙালীকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল—স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সে-যুগের বাঙলাসাহিত্য এই নব-উদ্বোধনের অভ্রান্ত সাক্ষ্য দিতেছে। ঈশ্বর গুপ্তের 'কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া', রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়', হেমচন্দ্রের 'ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?' দীনবন্ধুর 'নীলকরনিকবকরে' লাঞ্ছিত চাষীদেব করুণ আর্তনাদ বাঙলা-সাহিত্য-গগনের ঈশাণকোণে পুঞ্জমেঘের সঞ্চার করিয়াছিল। নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' সেই ঝটিকাগর্ভ মেঘেরই একটি বিদ্যুৎ-ঝলক।

'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে বর্ণিত কাহিনীটি ঐতিহাসিক। ইতিহাসের একটি অতি নিকটবর্তী ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া নবীনচন্দ্র দেশবাসীকে মুক্তিসাধনার ইঙ্গিত দিয়াছেন। অবশ্য সে-যুগে দেশবাসীর দাসত্ব-পীড়িত হৃদয় হইতেই সে ইঙ্গিতে আসিয়াছিল। যুগপ্রতিভূ-রূপে নবীনচন্দ্র যুগমানসের অধীর আকাঙ্ক্ষাকেই বাণীরূপ দিয়াছেন।

পলাশি-যুদ্ধের শেষে মোহনলালের যে সুদীর্ঘ বিলাপোক্তি, তাহাতে বন্ধন-পীড়িত জাতির করুণ আর্তনাদকে কবি ভাষা দিয়াছেন। কবি যেন সমগ্র জাতির বেদনা বহন করিয়া মোহনলালের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতেছেন :

'কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ !
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি !
তুমি অস্তাচলে, দেব ! করিলে গমন,
আসিবে যবনভাগ্যে বিষাদ-রজনী !…
কি ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন !
কি ক্ষণে প্রভাত হ'ল বিগত শর্ব্বরী !
আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন,
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি।…
নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,

ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক-সিন্ধু-জলে ?
যাও তবে, যাও দেব ! কি বলিব আর ?
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে ।
কি কাজ বল না, আহা ! ফিরিয়া আবার ?
ভারতে আলোক কিছু নাহি প্রয়োজন ।
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ !'

অন্ধ-কারাগারের আগল ভাঙিয়া আলোকে বাহির হইয়া আসিতে না পারার এই যে অভিমান-মিশ্রিত মর্মব্যথা, ইহাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী-মানসকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। নবীনচন্দ্রের কাব্যের বহুস্থানেই মুক্তিপ্রয়াসী জাতির সেদিনের সেই ব্যথা-বেদনার উচ্ছল প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির উপরই যে জাতির ঐক্য ও সংহতি নির্ভর করিতেছে, নবীনচন্দ্রের কাব্যে তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সত্য বটে, মুসলমান-শক্তি একদিন বিজয়ীর বেশে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দুদের সহিত একই সুখ-দুঃখের আবর্তে আবর্তিত হইয়া মুসমলানগণ তাহাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

হিন্দু ও মুসলমান—উভয়ই এখন ভারতজননীর সমান স্নেহভাজন—উভয়ই পরস্পর ভ্রাতৃতুল্য। রাণী ভবানীর উক্তিতে এই সত্যই প্রকাশ পাইতেছে :

'এই দীর্ঘকাল
একত্রে বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব, আর্য্যসুতসনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত ;
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্ম্মের কারণে।'

রাণী ভবানীকে আশ্রয় করিয়া নবীনচন্দ্র জাতিকে ধর্মীয় বৈষম্যের উর্ধ্বে উঠিয়া স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন।

শিল্পসৃষ্টি ও রসসৃষ্টির দিক হইতে নবীনচন্দ্র হয়তো সর্বাংশে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার কবিকৃতির সমস্ত স্খলন-পতন-ত্রুটি সত্বেও একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, বাঙলাকাব্যের ক্ষেত্রে তিনি সমকালীন যুগচিন্তার সুরটি তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং তাহাতেই তাঁহার কাব্য একটা বিশেষ

মহিমা লাভ করিয়াছে। মানুষের সর্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে—সে বন্ধন সমাজেরই হউক, আর রাষ্ট্রেরই হউক—নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যে একটা প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছেন এবং মানুষে মানুষে সাম্য স্থাপনের ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই যে মনুষ্যত্ববোধ ও সাম্যবোধ, ইহাই নবীনচন্দ্রের কবিসত্তাকে আমাদের নিকট বরণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

**রবীন্দ্রনাথ :**

রবীন্দ্র-সাহিত্য দুরবগাহ। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অপ্রতিহত প্রভাব। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার প্রথম ও প্রধান পরিচয়—তিনি কবি। তাঁহার অশীতিবর্ষ-বিস্তৃত জীবনে তিনি নিরন্তর-প্রবাহে কাব্যবীণায় সুর তুলিয়াছেন। বহুবিচিত্র সেই সুরের সামগ্রিক পরিচয় গ্রহণ করা বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য নহে। রবীন্দ্রনাথের কবিকর্মে যেখানে যেখানে সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণার স্পর্শ লাগিয়াছে, কেবল তাহাই এখানে আলোচ্য। এই আলোচনাও আবার কালসীমার দ্বারা খণ্ডিত। উনবিংশ শতাব্দীতে কবির যে-কয়খানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সকলের মধ্যেই অভীষ্ট বস্তুর সন্ধান করিতে হইবে। তাহা ছাড়া আবার স্বল্পপরিসরে বস্তুপুঞ্জের ভার সৃষ্টি করার অবকাশ নাই বলিয়া বস্তুর প্রতীকধর্মিতার আশ্রয় লইতে হইবে। এই সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অভীপ্সিত প্রচেষ্টাকে এখানে একান্তভাবে সীমিত করা হইল।

মানুষ যখন গভীর অনুভূতির ভিতর দিয়া তাহার ক্ষুদ্রজীবনকে বিশ্বজীবনের সহিত মিলিত করিয়া দেয়—নিজেকে সে যখন বিশ্বজগতে সম্প্রসারিত করে, তখন তাহার নিকট খণ্ড ক্ষুদ্র বলিয়া কিছুই থাকে না—আত্মপরভেদের তুচ্ছতাও লুপ্ত হইয়া যায়—সমস্ত মানুষ, সমস্ত প্রাণী, সমস্ত বৃক্ষলতা, এমন কি জল-স্থল-আকাশে পরিব্যাপ্ত বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা পড়ে—সকলেরই সহিত সে গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক অনুভব করে। বিশ্বের সহিত মহামিলনের এই-যে পরম অনুভূতি, ইহা একদিকে যেমন হৃদয়কে অনির্বচনীয় আনন্দরসে অভিষিক্ত করে—অপরদিকে তেমনই বিশ্বের ভিতর দিয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট যাইবার রাজপথ খুলিয়া দেয়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সীমা ও অসীম, অপূর্ণ ও পূর্ণ তখন একটি মহান্ ঐক্যের মধ্যে বিধৃত হয়, এবং শুধু মানবসমাজে নহে—বিশ্বের যেখানে যত কিছু বিভেদ, বৈষম্য ও ক্ষুদ্রতা আছে, সমস্তকেই উপেক্ষা

করিবার শক্তি জাগে। মরুচারী 'দুর্দম স্বাধীন' আরবসন্তানের সহিত সভ্য মানুষের যে প্রকৃতিগত ভেদ, তাহা নিতান্তই বাহিরের ব্যাপার; বিশ্বপ্রসারিত প্রেমদৃষ্টি দিয়া দেখিলে আরবের সেই হিংস্র মানুষগুলিও একান্ত আপন হইয়া উঠে—তাহাদের জীবনযাত্রাকে বরণ করিয়া লইয়া শক্তির উল্লাস লাভ করিতে ইচ্ছা হয়। 'হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর' মানুষের শত্রু বটে—মানুষের সহিত তাহার নিত্য বিরোধ, কিন্তু বিশ্বৈকাত্মবোধজাত প্রেম তাহাকে দূরে সরাইতে পারে না—তাহাব 'হিংসাতীব্র সে আনন্দ'কেও অভিনন্দন জানায়। বিপুল কিরণে ভুবন-আলো-করা তপন আর ঘাসের উপর নিয়ত পতনশীল ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুতে কত তফাৎ! কিন্তু প্রেমের নিকট এ পার্থক্য নিতান্তই তুচ্ছ। আকাশবিহারী বিরাট তপন মৃত্তিকাচারী শিশিরের ক্ষুদ্র বুকে আসিয়া ধরা দেয়—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র একাত্ম হইয়া যায়। চরাচরব্যাপী এই-যে প্রেম ও একাত্মতার অনুভূতি, ইহাকে অধ্যাত্মবোধজাত একপ্রকার সাম্যচেতনার নামান্তরমাত্র বলা যায়। ববীন্দ্র-মানসে ক্ষণে ক্ষণে এই চেতনার স্ফুরণ লক্ষিত হয়। অবশ্য কবির প্রথম বয়সেই যে ইহার সম্যক বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু সেই বয়সেও তাঁহার চিত্তের বিশ্বমুখিতার পরিচয় অস্ফুট থাকে নাই। কিশোর-কবি যখন বলেন:

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

[ 'প্রভাত-উৎসব' : 'প্রভাতসংগীত' ]

তখন এই কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, কবিচিত্তে বিশ্বপ্রাণের দোলা লাগিয়াছে। বিশ্বব্যাপী যে বিরাট প্রাণস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, কবি তাহার সমগ্র স্পর্শটুকু লাভ করিতে চাহিতেছেন।

বস্তুতঃ ক্ষুদ্র-'আমি'-পরিচ্ছিন্ন হইয়া কবি বিশ্বের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইতেই আনন্দ পান:

'তপন ভাসে, তারা ভাসে, আমিও যাই ভেসে—
তাদের গানে আমার গান, যেতেছি এক দেশে।
প্রভাত সাথে গাহি গান, সাঁঝের সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি—তারার সাথে যাই।
ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি।

মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই,
দুখীর সাথে কাঁদি আমি সুখীর সাথে গাই।
সবার সাথে আছি আমি, আমার সাথে নাই,
জগৎ-স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই।' [ 'স্রোত' ]

কবি-হৃদয় যেমন এই জগৎ-প্রীতির দিকে ঝুঁকিয়াছে, তেমনই আবার ইহারই একটা বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে মানবপ্রীতির গান গাহিয়া উঠিয়াছে। বিশ্ব ব্যাপিয়া যে চিরন্তন মানবধারা—দেশ ও কাল যাহাকে খণ্ডিত করে না—বিভেদ ও বৈষম্য যাহার মধ্যে আবর্ত রচনা করে না, তাহারই সহিত কবি আপনার ক্ষুদ্র মানবসত্তাটি মিলাইয়া মিশাইয়া দিয়া জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়াছেন। নিখিল মানবের সংখ্যাতীত প্রাণ-তরঙ্গের মধ্যে একটি তরঙ্গ হইয়া তিনি বিরাজ করিতে চাহেন, মৃত্যুও তাঁহাকে মানুষের স্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে না—মানুষের স্নেহ-প্রীতির মধ্যেই তিনি চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবেন। তাঁহার এই কামনাই ব্যক্ত হইয়াছে তাঁহার 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের 'প্রাণ' কবিতায়:

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

'মানবের মাঝে' বাঁচিয়া থাকার কামনায় যে মানবপ্রীতি প্রকাশিত, কবির পরবর্তী কবিকর্মে তাহার স্বাক্ষর আরও স্পষ্ট—আরও উজ্জ্বল। স্বদেশ ও স্বজাতির ক্ষুদ্র বিভেদমূলক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া—'জাতিজালপাশ' ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কবি চাহিয়াছেন বিশ্বমানবের সহিত আকুল আগ্রহে মিলিত হইতে। কবি বলিতেছেন:

'হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব-হৃদয়ে মিশিতে—
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস-নিশীথে।
[ 'বিশ্বনৃত্য' : 'সোনার তরী' ]

বিশ্বের বিশাল মানবজাতির মধ্যে যে নানাপ্রকার বিভেদ ও বৈষম্য দেখা যায়, কবির মতে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কবির দৃঢ় প্রত্যয়:

'অন্তরমাঝে সবাই সমান,
বাহিরে প্রভেদ ভবে,'
[ 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' : 'মানসী' ]

স্বার্থমগ্নতাই সংসারে সকল বিভেদ ও বৈষম্যের উৎসভূমি। ইহাকে ত্যাগ করিয়া বাঁচিয়া থাকার যে জীবনদৃষ্টি, তাহা মানুষকে একটি উদার সাম্যবোধের দিকে পরিচালিত করে। মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টির আলোকেই বৃহৎ জগতের প্রতি মুখ ফিরাইয়া দুর্গত মানুষের দিকে তাকাইয়াছেন।

বৃহৎ জগৎকে উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা আত্মমুক্তির জন্য পরমার্থচিন্তায় মগ্ন, তাঁহাদিগকে কবি স্বীকৃতি জানান নাই। তাঁহাদের বিশ্ববিমুখ ধর্মচারণা কবির নিকট অশ্রদ্ধেয়। মানুষের মধ্যেই যে ভগবান রহিয়াছেন—মানুষের সেবাই যে ভগবৎ-সেবা, কবি তাহা দ্বিধাহীন কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন।

'দেবতামন্দির মাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।'

[ 'দেবতার বিদায়' : 'চৈতালি' ]

কিন্তু দেখা গেল, এই ভক্তপ্রবর গৃহহীন, বস্ত্রহীন, দীন ভিখারীকে তাড়াইয়া দিয়া মানব-ধর্মকেই শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করিয়া বসিলেন। কবি তাঁহাকে দেবতার অমোঘ বাণী শুনাইয়া প্রবুদ্ধ করিয়াছেন :

'জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে। [ ঐ ]

স্বার্থপরতা, ভোগেচ্ছা, আত্মাদর মানুষের প্রতি মানুষকে হৃদয়হীন আচরণে প্রবৃত্তি দেয় এবং পরিণামে জাঁকাইয়া তোলে মানুষে মানুষে দুরপনেয় বৈষম্য —যাহার এক কোটিতে প্রবল, অপর কোটিতে দুর্বল ; এক কোটিতে ভোক্তা, অপর কোটিতে ভুক্ত ; এক কোটিতে উৎপীড়ক, অপর কোটিতে উৎপীড়িত। এই সকল ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ তাহার মনুষ্যত্বের মহিমায় বিরাজ করিবে—ইহাই ছিল কবির কাম্য। এইজন্য কবি তাঁহার 'কথা' ও 'কাহিনী' নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থে ত্যাগ, সেবা, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি মহৎ ভাবের কয়েকটি উজ্জ্বল আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন। কবি যেন এই আখ্যানগুলির ভিতর দিয়া আমাদিগকে ভেদবিভেদহীন শান্ত ও সমুন্নত জীবনযাত্রার পথে অঙ্গুলিনির্দেশ করিতেছেন।

মানবসংসারের বিভেদ, বৈষম্য ও ক্ষুদ্রতা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ যে অপরিসীম বেদনা বোধ করিতেন, তাহাই তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছে ভারতীয় ঐতিহ্য হইতে সাম্য ও মানবতার আদর্শ চয়ন করিয়া 'কথা' ও 'কাহিনী'র মালা গাঁথিতে। ভেদ-বিভেদের ঘৃণ্য পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ মানুষের প্রতি

সমবেদনার হস্ত প্রসারিত করুক, সমাজ-আরোপিত হীনতা বা তুচ্ছতার আবরণ ভেদ করিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বটুকু প্রকাশ লাভ করুক, মানুষের মধ্যেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়া 'মানুষের ভগবান'কে মানুষ নমস্কার করিতে শিখুক—ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নসাধ। সাম্যভিত্তিক এক উন্মুক্ত জীবনদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া মানুষকে তিনি কেবল মানুষ বলিয়াই অবলোকন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই রবীন্দ্র-মানসের সাম্যচেতনার সবটুকু পরিচয় নহে। বিশ্ব-আলিঙ্গনকারী এক পরম সাম্যবোধ কবি-মনের গভীরতম প্রদেশ হইতে ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়া কবিকে আনন্দরসধারায় অভিষিক্ত করিয়াছে।

বসুন্ধরার দিগ্বিদিকে আপনাকে বিস্তার করিয়া দিয়া জল-স্থল-আকাশের সবকিছুর সহিত কবি নিজেকে এক ও অভিন্ন মনে করিয়াছেন। এই বিশেষ অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া এমন এক ধরনের সুগভীর সাম্যবোধ জাগ্রত হয়—যাহাতে দেশ-বিদেশের মানুষের মধ্যে কোনো ভেদ বা বৈষম্য থাকে না, সকলকেই একান্ত আপন বলিয়া মনে হয়:

'ইচ্ছা করে মনে মনে,
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে
দেশ দেশান্তরে;'

অথবা,

'সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।'

[ 'বসুন্ধরা' : 'সোনার তরী' ]

শুধু ইহাই নহে, সাম্যবোধের এই বিশেষ স্তর হইতে আবার তৃণ-শৈবালেরও সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইতে বাসনা জাগে:

'শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবনরসে;' [ ঐ ]

বিশ্বের সহিত কবির এই-যে একাত্মতা ও একদেহত্বের অনুভূতি, ইহার ফলে সমস্ত কিছুর মধ্যেই কবি নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পান এবং সমস্তই তাঁহার নিকট সমপ্রিয় হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রচেতনায় বিশ্বব্যাপী প্রেমই বিশ্ব-প্রসারিত সাম্যবোধের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

**অন্য কয়েকজন কবি :**

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালীর জাতীয় জীবনে সাম্যভিত্তিক নানাপ্রকার সংস্কার-আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয়ার্ধে সেই সকল আন্দোলনই প্রবল হইয়া উঠিয়া সারা দেশের আকাশে-বাতাসে একটা তীব্র আবেগ ও উন্মাদনা ছড়াইয়া দিয়াছিল। সুতরাং এই শতাব্দীর আবহাওয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বদাই সাম্য ও মানবতার একটা বায়ুস্রোত বাঙালীর মনের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে—অবশ্য প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে প্রবল গতিতে। উনিশ-শতকীয় বাঙলা কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে একদিকে আখ্যানকাব্যে ও মহাকাব্যে, অপরদিকে গীতিকবিতায় এই প্রাণঝড়ের স্পন্দন ধরা পড়িয়াছে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যে যে সর্ব-বন্ধন-মুক্ত মানবতার বার্তা, রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতাও তাহাই প্রচার করিতেছে। আবার ইঁহারা ছাড়া আরও কয়েকজন বাঙালী কবির কণ্ঠেও এই একই বার্তা—একই সুর—একই সংগীত। কখনও স্বদেশপ্রেমের কবিতা লিখিয়া, কখনও অন্য নানা ভাব ও ভাবনাকে ছন্দে গ্রথিত করিয়া তাঁহারা মূলতঃ সাম্যমূলক মনুষ্যত্ববোধের বাণীই প্রচার করিয়াছেন।

ইংরাজশাসনের প্রথম দিকে ইংরাজের নিকট বাঙালীর অনেক কিছু প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু ইংরাজের উপেক্ষা ও স্বৈরাচারে এই প্রত্যাশায় ক্রমে ক্রমে ব্যর্থতার সুর বাজিয়া উঠিল, এবং ইহার ফলে বাঙালীর মনে একটা তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। শিক্ষিত বাঙালী তখন ইংরাজের বিরোধিতা না করিলেও মানুষ হিসাবে ইংরাজের সহিত একই ভূমিতে দাঁড়াইবার জন্য স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় ঝুঁকিয়া পড়িল। এই অধিকারসাম্য লাভের প্রয়াসেই বাঙালীর মনে সঞ্চারিত হইল দেশ ও জাতির প্রতি মমত্ববোধ। কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় বাঙালীর এই নবজাগ্রত স্বদেশপ্রেমের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

'মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।' [ 'স্বদেশ' ]

কিন্তু ইহাতে কেবল দেশকে নিষ্ক্রিয়ভাবে মনে মনে ভালবাসার কথা। দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া নবগৌরব দান করিবার বাসনা দেখা দিয়াছিল আরও অনেক পরে—উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বাঙালীকে সেই সংগ্রামী দেশপ্রেমে দীক্ষা দান করেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্যের

'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?' স্বাধীনতাকামী বাঙালীর নিকট একদা রণসংগীতের মহিমা লাভ করিয়াছিল।

ইহার পরে দেশপ্রেম লইয়া কতজনে কত কবিতা কত গান রচনা করিলেন ! সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

'মিলে সবে ভারত-সন্তান,
একতান-মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।'

[ 'জাতীয় সঙ্গীত' ]

হিন্দুমেলার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে জাতীয় ঐক্যের বাণী প্রচার করিল।

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় বিলাপ করিলেন :

'কত কাল পরে, বল ভারত রে !
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে। [ 'ভারত বিলাপ' ]

দ্বিজেন্দ্রলালের 'কবিতা ও গানে' ভারতবর্ষের একটি মহিমময় চিত্র ফুটিয়া উঠিল :

'ভারত আমার, ভারত আমার,
যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা,
এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।'

দেশপ্রেমকে আশ্রয় করিয়া উৎসারিত এই সকল কবিতার উৎসমূলে ছিল প্রবল-প্রতাপ শাসকের সহিত দীন-দুর্বল শাসিতের অসাম্যবোধজনিত একটা রুদ্ধ ক্ষোভ।

উনিশ শতকের বাঙালী জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ভেদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। কি রাষ্ট্র, কি ধর্ম, কি সমাজ—সর্বত্রই সে এমন একপ্রকার বিধি-বিধান প্রচলিত করিতে চাহিয়াছিল, যাহাতে সকল মানুষই সমান অধিকার লাভের সুযোগ পায়। বাঙালীর এই সাম্যবাদী মানসিকতার অন্যতম ফলস্বরূপ দেখা দিয়াছিল নারীসমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রচেষ্টা। মানবাধিকারের ক্ষেত্রে নারী যাহাতে পুরুষের স্থায় সমান মর্যাদা লাভ করিতে পারে, সেজন্য শিক্ষিত বাঙালীরা এক প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই নারীমুক্তি-আন্দোলনের সুর উনিশ শতকের বাঙলাসাহিত্যে নানাস্থানে নানাভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। ছোট ছোট গীতিকবিতায় মধ্যেও এই সুরটি

শ্রুত হয়। ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতির জন্য যে ভারতীয় নারীর জাগরণ অত্যাবশ্যক, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি ছোট গীতিকবিতায় তাহা বিশেষভাবে প্রচার করা হইয়াছে। কবিতাটির প্রথমেই আছে : 'না জাগিলে সব ভারত-ললনা, / এ ভারত আর জাগে না জাগে না।'

['সামাজিক সঙ্গীত']

জাতীয় আন্দোলনের যুগে দ্বারকানাথের এই আবেগপূর্ণ ছন্দোময়ী উক্তিটি বহুকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

হিন্দু-সমাজের বালিকা-বিধবাদের দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মনীষীরা যে বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, বাঙলা-সাহিত্যের দরবারে তাহারও অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। সমাজ-নিপীড়িতা এই সকল অল্পবয়সী বিধবা নারীর সর্বসুখবঞ্চিত জীবনের আলেখ্যটি অতি স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে কবি আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'বালবিধবার উক্তি'-নামক ছোট কবিতায় :

'ভারতে শ্মশান-মাঝে, আমি রে বিধবা বালা ;
বিষের মূরতি করি বিধি আমায় পাঠাইলা !
জানিনে কেমন পতি মনে নাই রে সে মূরতি ;
তথাপি যুবতি হয়ে, পেটে অন্ন নাই দুবেলা !
বিবাহ কি তাও জানিনে, কেবল মাত্র পড়ে মনে,
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক দুঃখের খেলা !
পিতামাতা নিদয় হলো, পরের হাতে সঁপে দিল ;
ছিঁড়ে নিয়ে কোমল কলি, কণ্টকে গাঁথিল মালা :
না বুঝিলেম ভালবাসা, নাহি সুখ, নাহি আশা !
কারে কবো এ দুর্দ্দশা, কে বুঝিবে মর্ম্মজ্বালা ?
নিদারুণ দেশাচারে, গেল ভারত ছারে খারে ;
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী,—পাষাণ হয়ে না দেখিলা !'

বালিকা-বিধবার এই করুণ বিলাপ নিঃসন্দেহে বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী গীতিকবিদের অনেকেই পরদুঃখে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছেন। মহিলা-কবি মানকুমারী বসু ও কামিনী রায়ের কবিতায় এই পরদুঃখকাতরতা করুণ লাবণ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

অসহায় একটি 'ভিখারিণী মেয়ে'র দুঃখবেদনার কথা ভাবিয়া কবি মানকুমারীর চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে :

'দিনমান যায় যায় প্রায়,
গেল রোদ গাছের আগায় ;
কে ও গায় পথে বসি' এমন সময় ?—
না না না, আমারি ভুল, গান ও তো নয় ;
পরাণে কত কি ব্যথা পেয়ে,
কাঁদে এক ভিখারিণী মেয়ে !'

এই দুঃখিনী ভিখারিণী মেয়েটির প্রতি কবির সমবেদনা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপন করিয়া লইবার জন্য কবিকণ্ঠে আকুল আহ্বান ধ্বনিত :

'চল ! তোরা ওর হাত ধ'রে,
ডেকে আনি আমাদের ঘরে ;
এ জগতে কেউ ওর আপনার নাই,
কেউ হব বোন মোরা কেউ হব ভাই ;
তা হ'লে ও বেদনা ভুলিবে,
তা হ'লে বা পুলকে হাসিবে !'

অনুরূপ পরদুঃখকাতরতার স্পর্শ লাগিয়াছে কবি কামিনী রায়ের কবিতায়ও। পতিত মানবের অবহেলিত জীবনযন্ত্রণা কবিচিত্তে গভীর সহানুভূতির সঞ্চার করিয়াছে। এই সহানুভূতিই কবির আবেগমিশ্র প্রশ্নে প্রকাশিত :

'পতিত মানব তরে নাহি কিগো এ সংসারে,
একটি ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রুধার ?
পথে পড়ে' অসহায়, পদে তারে দলে যায়,
দু'খানি স্নেহের কর নাহি বাড়া'বার ?' [ 'চাহিবে না ফিরে' ]

ঘৃণাসংকোচহীন উদার প্রেমদৃষ্টি লইয়া এই পতিত মানবের পাশে দাঁড়াইবার জন্য কবি আমাদের ডাক দিয়াছেন :

'তোমাদের বাতি দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া,
তোমাদেরি হাত ধরি' হোক অগ্রসর,
পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি যাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।' [ ঐ ]

জীবনের পথপরিক্রমায় দুর্গতা ভিখারিণীকে ও পতিত মানবকে আপন করিয়া লইয়া অগ্রসর হওয়ার যে নির্দেশ, তাহার প্রেরণা আসিয়াছে মানুষের প্রতি সুগভীর প্রেম ও শ্রদ্ধাবোধ হইতে। মানুষ—সে দরিদ্র হউক বা হীন হউক—মানুষ বলিয়াই প্রেম ও শ্রদ্ধার পাত্র। দুঃখদুর্গতি তাহাকে অবসন্ন করিলেও তাহার মনুষ্যমহিমা অবলুপ্ত হয় না—মানুষ হিসাবে সে ছোট হইয়া যায় না। এই উন্নত মানবিক বোধের উপরই আমাদের পারস্পরিক সহানুভূতির ভিত্তি স্থাপিত করিতে হইবে। বাঙলাসাহিত্যের একটি কবি-বাণী বহুপঠিত হইলেও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

'আপনাকে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী' পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' [ কামিনী রায় : 'সুখ' ]

'সকলের তরে সকলে' আত্মনিয়োগ করিতে পারে তখনই, যখন সকলের সহিত সকলের সমত্ববোধ জাগ্রত হয়। উনবিংশ শতাব্দীব বাঙলা কবিতায় এই সর্বমুখী সাম্যবোধের সুরটি প্রধান্য লাভ করিয়াছে।

## উপন্যাস

### রমেশচন্দ্র দত্ত :

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা উপন্যাস-শিল্পে বঙ্কিমচন্দ্রই শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁহার উপন্যাসে সমকালীন সাম্যবাদী ধ্যানধারণার প্রভাব সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার অনুসরণে যাঁহারা উপন্যাস রচনা করিয়া বাঙলাসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি কবিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রমেশচন্দ্র মোট ছয়খানি উপন্যাস রচনা করেন—'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', 'সংসার' ও 'সমাজ'। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারখানি উপন্যাস অল্পাধিক পরিমাণে ইতিহাসভিত্তিক, শেষ দুইখানি সামাজিক। প্রতিটি উপন্যাসেই উনিশ-শতকীয় নব্য ভাব ও ভাবনার অনুরণন লক্ষণীয়।

রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস—'বঙ্গবিজেতা'। এই উপন্যাসের আখ্যায়িকাটি কল্পিত হইয়াছে বাঙলাদেশের একটি বিদ্রোহের পটভূমিকায়। বিদ্রোহটি ঘটে

মোগলসম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা টোডরমল্লের বাঙলা-শাসনকালে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ইন্দ্রনাথের অপূর্ব সাহস ও বীরত্ব পাঠকের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুঙ্গেরে রাজা টোডরমল্লের জীবনরক্ষার্থ মাত্র 'পঞ্চশত অশ্বারোহী' লইয়া যেভাবে দুই সহস্র শত্রুসেনার সহিত ইন্দ্রনাথ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই বাঙালী বীরের অমিত বিক্রম ও সুনিপুণ রণকৌশলের পরিচয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ভীরুতা ও দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া শক্তি ও সাহসের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অপরাপর বীরজাতির সহিত বাঙালী সমকক্ষতা করিতে শিখুক, ইন্দ্রনাথ-চরিত্রে যেন এই ইঙ্গিতটি স্পষ্টরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষমতাগর্বী ইংরাজ শাসকদের নিকট পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়া বাঙালী বুঝিতে শিখিয়াছিল যে, ইংরাজশাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে দুঃখের রাত্রি আর কোনদিনই প্রভাত হইবে না। ইংরাজ ও বাঙালীর ভিতর নিরন্তর একটা প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক বজায় থাকিয়া যে বৈষম্যের অচলায়তন সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে দলিতপিষ্ট হইয়া বাঙালীর অন্তর 'ত্রাহি ত্রাহি' রব তুলিয়াছিল। কিন্তু ত্রাণ করিবে কে? নিজের ত্রাণ নিজেরই করিতে হইবে। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজনবোধ হইল স্বাধীনতালাভের। বাঙালীর সেই স্বাধীনতাকামনা ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হিন্দুর লুপ্ত গৌরবের সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। ইহারই অন্যতম ফল রমেশচন্দ্রের দুইখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস—'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'। দুইখানি উপন্যাসেই রমেশচন্দ্র নিপুণ হস্তে দুর্দম স্বাধীনতাস্পৃহার উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অবশ্য উভয়ক্ষেত্রেই মুসলমান-কবল হইতে হিন্দুর স্বাধীনতা রক্ষার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমের আনন্দমঠের ন্যায় এখানেও মুসলমান উপলক্ষ্য মাত্র—আসল উদ্দিষ্ট হইল অত্যাচারী ইংরাজশক্তি।

নবযুগের সাম্য ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালী একদিকে যেমন বিদেশীর পীড়ন হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, অপরদিকে তেমনই সামাজিক প্রথাবদ্ধতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মনুষ্যত্বের সুপ্রশস্ত রাজপথের সন্ধানে ফিরিয়াছে। হিন্দুসমাজের কতকগুলি সংকীর্ণ প্রথা দীর্ঘকাল ধরিয়া নারী-পুরুষের গুরুতর বৈষম্যকে বাঁচাইয়া রাখিতেছিল; নবযুগের শিক্ষিত বাঙালীরা এই সকল প্রথার উচ্ছেদ কামনায় প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তুলিলেন। এই যুগের অন্য অনেক সাহিত্যিকের ন্যায় রমেশচন্দ্রেরও রচনায় এই আন্দোলনের তরঙ্গ-স্পন্দন লক্ষ্য করা যায়।

রমেশচন্দ্রের 'মাধবীকঙ্কণ' ইতিহাসের আধারে পরিবেশিত হইলেও মূলতঃ একখানি পারিবারিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে পারিবারিক তথা সামাজিক একটি প্রথার বেদনাদায়ক পরিণতির চিত্র অঙ্কিত করিয়া রমেশচন্দ্র পরোক্ষভাবে ইহার নিরসন কামনা করিয়াছেন। হিন্দুসমাজে বিবাহব্যাপারে পুরুষের যে স্বাধীনতা, নারীর তাহা নাই ; প্রায়ই দেখা যায়, কন্যার মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া পরিবারের কর্তাব্যক্তিদের ইচ্ছাতেই তাহার বিবাহ দেওয়া হয়। অধুনা এই প্রথার কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেলেও পূর্বে ইহা সমাজদেহে দৃঢ়মূল হইয়া ছিল। এই প্রথা কখনও কখনও অবলা নারীর উপর চাপাইয়া দিত জীবনব্যাপী একটা অবরুদ্ধ বেদনার পাষাণভার। বঙ্কিমের শৈবলিনী ইহার একটি বড় উদাহরণ। অপর উদাহরণ রমেশচন্দ্রের 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাসে বর্ণিত হেমলতা চরিত্রটি। হেমলতার জীবনে আসিয়াছিল দুইটি পুরুষ—শ্রীশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথ। বালিকা হেম শান্তধীর শ্রীশচন্দ্রকে শ্রদ্ধাভক্তি জানাইয়াছে, প্রাণচঞ্চল নরেন্দ্রনাথকে ভালবাসিয়াছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হেমের এই গোপন মনোভাবটি তাহার পরিবারের কেহই বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই এবং ইহার ফলেই শেষ পর্যন্ত তাহাকে তাহার 'ভালবাসার ধন' হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছে—নরেন্দ্রনাথকে বিদায় দিয়া শ্রীশচন্দ্রকে জীবনসঙ্গী করিয়া লইতে হইয়াছে। হিন্দুসমাজের প্রথানুযায়ী হেমলতা তাহার স্বাধীন নারীসত্তাকে গুরুজনের অন্ধ অভিলাষ ও রুচির নিকট বলি দিতে বাধ্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রেমকে প্রথার চাপে অত সহজে শুদ্ধ করিয়া দেওয়া যায় না—যায় নাই হেমলতার জীবনেও। এইজন্যই দেখিতে পাই, বিবাহিত জীবনে হেমলতা 'অবিশ্বাসিনী পত্নী' না হইলেও স্বামীর স্নেহযত্ন তাহার 'শুষ্ক মুখখানি'তে প্রসন্নতা ফুটাইতে পারে নাই। নরেন্দ্রের প্রতি যে-প্রেম তাহার গোপন হৃদয়ে সঞ্চিত ছিল, তাহার তুষানল তাহাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়াছে। নারীহৃদয়ের প্রবল প্রেমই ব্যর্থ হইয়া হেমলতার জীবনকে ঊষর মরুতে পরিণত করিয়াছে। ইহার জন্য যদি কাহাকেও বিশেষভাবে দায়ী করিতে হয়, তবে তাহা হইল বিবাহব্যাপারে নারীর স্বেচ্ছা-নির্বাচনের প্রতিবন্ধী একটি বিশেষ সামাজিক কুপ্রথা—যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে নারীপুরুষের দুর্নিবার্য বৈষম্যবোধ হইতে।

নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা সুচিহ্নিত বৈষম্য বজায় থাকিবার ফলে হিন্দুসমাজ নারীকে নানাভাবে নিগৃহীত করিয়াছে—কখনও কৌলীন্যের ধুয়া

তুলিয়া বালিকা-কন্যাকে বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিয়াছে, কখনও কেবল ধনগৌরব দেখিয়া দুশ্চরিত্র ধনীর সহিত দরিদ্রঘরের সরলা বালিকার বিবাহ দিয়াছে, আবার কখনও বা স্বামিহীনা বালিকাকে সুকঠোর বৈধব্যব্রতের পীড়নে পীড়িত করিয়া তথাকথিত ধর্ম ও দেশাচারের ধ্বজা উড়াইয়াছে। নবযুগের নবশিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী চাহিয়াছিল নারীজীবনের এই সকল দুর্গতি দূর করিয়া নারীকে পুরুষের সহিত সমান মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে। রমেশচন্দ্রের 'সংসার' উপন্যাসখানি এই নবযুগচিন্তার সার্থক বাণীরূপ। এই উপন্যাসের আখ্যানভাগে কুলীনপত্নী কালীতারা, ধনিকপত্নী উমাতারা ও বালবিধবা সুধার কাহিনী সন্নিবেশিত করিয়া লেখক হিন্দুনারীর বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছেন। যুগচিন্তার ধারা বাহিয়া তাঁহার পরিশীলিত বুদ্ধিতে ইহাই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে যে, সকলপ্রকার সামাজিক কুপ্রথার অবলুপ্তি ঘটাইয়া নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তাঁহার 'সংসার' উপন্যাসে তাঁহার এই সাম্যবোধেরই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।

রমেশচন্দ্রের 'সমাজ' উপন্যাসে আর এক ধরনের সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। হিন্দুসমাজে জাতিভেদপ্রথার ফলে যে গুরুতর বৈষম্য দেখা যায়, উনিশ-শতকীয় বাঙলার প্রগতিশীল চিন্তাধারা তাহার আমূল উচ্ছেদ সাধনে প্রয়াসী হইয়াছিল। রমেশচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তায় এই যুগচিন্তার অনিবার্য প্রভাব পড়িয়াছে। তাঁহার 'সমাজ' উপন্যাসখানি রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিভেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। অবশ্য উপন্যাসের প্রথম দিকে পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ তারিণীবাবুর সহিত নয় বৎসরের বালিকা গোপবালার বিবাহ ব্যাপারটি বিবৃত করিয়া লেখক হিন্দুসমাজের নারীদলনকারী একটি প্রাচীন কুপ্রথার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন; কিন্তু এই ঘটনাকে ক্ষীণসূত্রে একটি বৃহৎ ঘটনার সহিত যুক্ত করিয়া পরিশেষে অসবর্ণ বিবাহের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন এবং হিন্দুসমাজের জাতিগত বৈষম্য অপনোদনের নির্দেশ দিয়াছেন।

হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতিগত ঐক্য স্থাপনের কামনাই উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর মনে বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছিল। রমেশচন্দ্রের 'সমাজ' উপন্যাসে তাহারই আভাস পরিস্ফুট। গ্রন্থশেষে রমণীকান্তের জবানীতে রমেশচন্দ্রের জাতিভেদবিরোধী মনোভাব স্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে জমিদার রমণীকান্ত তাঁহার দশ সহস্র প্রজাকে খাওয়াইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। সুবিস্তৃত আম্রকাননে ভোজনরত এই বিশাল

জনমণ্ডলীকে দেখাইয়া নূতন কুটুম্ব হেমচন্দ্রকে রমণীবাবু বলিতেছেন: 'ইহারা আমার আত্মীয়-বান্ধব। তুমি আমি যেমন হিন্দু, ইহারাও সেইরূপ হিন্দু, ইহারা আমাদের এক ধর্মাবলম্বী,—এক হিন্দুজাতীয়। পুরাকালে সকল হিন্দুদিগের মধ্যে আহার-ব্যবহার ছিল, কি ছার আধুনিক নিয়মে আমরা বিভিন্ন হইয়া জাতীয় দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের মধ্যে অনৈক্য সাধন করা, দুর্ব্বলতা সঞ্চার করা অনেকের অভিপ্রায়, আমরা নিজের চেষ্টায় যদি ঐক্য সাধন করিতে পারি, তবে হিন্দুজাতির গৌরবের কি আর সীমা থাকিবে?'

উনিশ শতকের হিন্দু-পুনর্জাগরণের (Hindu renaissnce) কথা হইলেও রমণীকান্তের এই উক্তিতে সাম্যবাদের একটি বিশেষ সুর ধ্বনিত হইতেছে। সাম্যবাদ মানুষে মানুষে ভেদ স্বীকার করে না; হিন্দুসমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে ভেদ অস্বীকার করিলে সেই একই সত্যেরই সীমিত স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সাম্যচিন্তার ক্ষেত্রে ইহা একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সন্দেহ নাই।

রমেশচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম এইরূপ কয়েকটি পদক্ষেপে সাম্য ও মানবতার তীর্থে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

## রবীন্দ্রনাথ:

বহুমুখী রবীন্দ্র-প্রতিভা বাঙলা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও অনন্যসাধারণ গৌরবের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত উপন্যাসই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মাত্র দুইখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়—'বউ-ঠাকুরানীর হাট' [১৮৮৩] ও 'রাজর্ষি' [১৮৮৭]। বর্তমান গ্রন্থের উনবিংশ শতাব্দীর কালসীমা অতিক্রম করিবার ছাড়পত্র নাই বলিয়া এই সময়ের মধ্যে রচিত রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত দুইখানি উপন্যাসের উপরই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে দেখা যায়, প্রেম ও প্রতাপের সংঘর্ষে প্রেমই জয়লাভ করিয়াছে। প্রতাপ চাহিয়াছে তাহার চারিদিকে স্বার্থ ও অহংবোধের প্রাচীর খাড়া করিয়া আপনাকে অপর সকল হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে, আর প্রেম তাহার নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছে সকলের মাঝে—সকল হৃদয়ের অনাবৃত উদার ভূমিতে। এইখানেই প্রেম জয়ী হইয়া উঠিয়াছে—এইখানেই তাহার আত্ম-পরভেদহীন দেব-স্বরূপটি চিরকালের নমস্য হইয়া মানবমনে সাম্যচেতনার উদ্বোধন-সংগীত রচনা করিতেছে। মোট কথা, মানুষে মানুষে যে সাম্যবোধ,

তাহার মূলে রহিয়াছে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রসারিত প্রেমের বিরামহীন জয়যাত্রা। রবীন্দ্র-সাহিত্য এই প্রেমের জয়গান করিয়া মূলতঃ সাম্যবাদেরই বন্দনা-গান রচনা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম-রচিত দুইখানি উপন্যাসের মধ্যে 'রাজর্ষি' উপন্যাসটি এই সাম্যাদর্শী প্রেমচেতনার সার্থক বাণীরূপ।

অবশ্য 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসেও প্রতাপ ও প্রেমকে পাশাপাশি রাখিয়া প্রেমের সর্বজয়ী রূপের প্রতি লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহার সর্বনাশা প্রতাপকে স্ফীত করিয়া মানব-ধর্মকে নিষ্পেষিত করিয়াছেন। তাঁহার রাজকীয় দৃপ্ত ক্ষমতার ক্ষুধা মিটাইতে তাঁহার কাকা বসন্তরায় নিহত, পুত্র উদয়াদিত্য দেশত্যাগী, কন্যা বিভা চিরদুঃখিনী, এমন কি রাজমহিষীও সর্বদা শঙ্কিত চিত্তে দিনযাপন করেন। সকলের মধ্যে থাকিয়াও তিনি কাহারও নহেন—আপনার শক্তিমদমত্ততায় স্নেহ-প্রেমের কল্যাণস্পর্শ হইতে আপনাকে বহুদূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন। ইহারই পার্শ্বে লেখক বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের সর্বজনশুভকামী স্নেহকাতর মূর্তিটি অঙ্কিত করিয়াছেন। পরিণত বয়সের ক্ষমাসুন্দর প্রেমদৃষ্টি দিয়া তিনি প্রতাপের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়াছেন—এমন কি, প্রতাপের নির্দেশে তাঁহার হত্যাসাধন হইতেছে জানিয়াও মৃত্যুকালে প্রতাপকে আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছেন, বৃদ্ধবয়সের স্বতোৎসারিত স্নেহধারা ঢালিয়া প্রতাপের পুত্রকন্যাদের অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাঁহার প্রাণনাশে কৃতসংকল্প রুক্ষ পাঠানকেও সুকোমল প্রীতির স্পর্শে বশে আনিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পরোয়ানা লইয়া উপস্থিত সেনাপতি মুক্তিয়ার খাঁকেও পরম সমাদরে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। আপন নাই, পর নাই, শত্রু নাই, মিত্র নাই—সকলকেই তিনি তাঁহার বিশাল হৃদয়ের স্নেহনীড়ে টানিয়া লইয়াছেন। সর্বব্যাপী প্রেমের অঞ্জন মাখিয়া সকলকেই তিনি সমদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। সর্বজনে প্রসারিত তাঁহার এই যে সাম্যবোধ, ইহা তাঁহাকে ক্ষুদ্রদৃষ্টি রাজদম্ভের বহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া পাঠক-হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন দান করিয়াছে।

রবীন্দ্র-কল্পিত এই উদার প্রেম ও সাম্যবোধেরই উচ্ছল প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় 'রাজর্ষি'তে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রভাগে রহিয়াছে সর্বজীবের প্রতি মমতা ও করুণার শুভ্র আলোকদীপ্তি। ভুবনেশ্বরী-মন্দিরের চির-প্রচলিত জীববলি বন্ধ হইয়া গেল ছোট্ট মেয়ে হাসির মমতাভরা হৃদয়ের ছোট্ট একটি করুণাবাণীতে। 'এত রক্ত কেন!'—বালিকা-হৃদয়ের মর্মস্থল মথিত করিয়া উচ্চারিত এই একটি কথা ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্যের সুপ্ত চেতনাকে

জাগাইয়া তুলিয়াছিল—দীর্ঘকালের সংস্কারের মূলে প্রবল আঘাত হানিয়াছিল। এই কথাটিকে কেন্দ্র করিয়াই উপন্যাসের আখ্যানভাগ আবর্তিত।

গোমতা-তীরে মন্দিরের পাষাণঘাটে প্রবাহিত 'রক্তস্রোতের রেখা' দেখিয়া একদিন যে-শিশুটি 'এত রক্ত কেন' বলিয়া করুণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল, সেই শিশুই অলক্ষিতে থাকিয়া রাজর্ষি গোবিন্দমাণিক্যের সমস্ত কর্ম নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে এবং সকলেরই মনের কোণে প্রেম ও করুণার একটি মৃদু চেতনা সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। বিশ্বজননীর নিকট তাঁহার সকল সন্তানই যে সমান স্নেহের —সন্তানের রক্তপাত করিয়া যে মায়ের তৃপ্তি সাধন করা যায় না, এই বোধটি ক্রমে ক্রমে সকলের মনেই জাগ্রত হইয়াছে। ইহার ফলে যে প্রেমদৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে, তাহার আলোকে বড়ছোটোর প্রভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে—একটি মানুষ ও একটি ছাগশিশু উভয়ই যে একই মায়ের সন্তান, এই পরম সত্যটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

শিশুকণ্ঠের উচ্চারিত একটি বাণী এমনই করিয়াই মন্দিরের রক্তস্রোত মুছিয়া ফেলিয়াছিল এবং পরিশেষে সকলের মনে প্রেম ও সাম্যচেতনার উদ্বোধন ঘটাইয়াছিল। কে জানে, কলিঙ্গযুদ্ধের শেষে সম্রাট অশোকও হয়তো এইরূপ একটি শিশুবাণী শুনিয়াছিলেন। বস্তুতঃ আমাদের মনের কোণে যেন একটি দেবশিশু বসিয়া আমাদিগকে নিরন্তর প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছে—এত ঘৃণা কেন? এত হিংসা কেন? কেন এত উৎপীড়ন? আমাদের মধ্যে যাঁহারা সেই প্রশ্ন শুনিতে পান, তাঁহাদের নিকট নিখিল বসুধার সকলেই একান্ত আপনজন হইয়া উঠে। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য অন্তরের সেই বাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া রাজা হইয়াও ঋষি—ঋষির স্নেহপ্রেমের দৃষ্টি লইয়া তিনি মানুষকে দেখিয়াছেন। তাঁহার প্রাণনাশে উৎসাহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের প্রতিও তাঁহার সমান স্নেহদৃষ্টি।

এই উদার প্রেমদৃষ্টিই গোবিন্দমাণিক্যের নিকট রাজার চিরন্তন আদর্শটি উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। রাজ্যলোভী নক্ষত্ররায়ের নিকট তিনি সেই মহান আদর্শটির পরিচয় দিতেছেন: 'রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করো, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো—এ যে করে সে'ই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে,

সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখ-হরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা।'

রাজা ও প্রজায় যে-বৈষম্য প্রবল হইয়া উঠিয়া পৃথিবীতে বহুবার অশ্রুজলের প্লাবন বহাইয়াছে, গোবিন্দমাণিক্যের কথিত রাজাদর্শে সেই বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত। গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমদৃষ্টিতে রাজা যেমন মানুষ, প্রজাও তেমনই মানুষ—রাজা প্রজার রক্ষকমাত্র। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এইরূপ সাম্য স্থাপনের দিকেই উনিশ শতকের বাঙলা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।

বিচারকের নিকট যে সমদৃষ্টি প্রত্যাশিত, 'রাজর্ষি' উপন্যাসে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের বিচারে তাহাও পরিস্ফুট হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যে-ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে জীববলি দিবে বা দিতে উদ্যত হইবে তাহাকে নির্বাসন-দণ্ড দেওয়া হইবে—ইহাই হইল নূতন রাজবিধি। ধ্রুবকে ভুবনেশ্বরীর নিকট বলি দেওয়ার উদ্যোগ করায় রাজপুরোহিত রঘুপতি ও রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায় উভয়ই এই রাজবিধি লঙ্ঘন করিয়া অপরাধী। বিচারাসনে উপবিষ্ট গোবিন্দমাণিক্য উভয়কেই সমান দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন—উভয়কেই নির্বাসন দিলেন, ভাই বলিয়া নক্ষত্ররায়ের প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাত দেখাইলেন না। নক্ষত্ররায় গোবিন্দ-মাণিক্যের পা জড়াইয়া ধরিলেও গোবিন্দমাণিক্য অবিচলিত রহিলেন; সকল কালের সকল বিচারকের যাহা আদর্শ, তাহাই তাঁহার কথায় স্পষ্ট হইয়া উঠিল: 'আমি আপনার শাসনে আপনি রুদ্ধ। বন্দীও যেমন বদ্ধ, বিচারকও তেমনি বদ্ধ।'

বিচারকার্যে এইরূপ সমদর্শিতার দাবিতে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশ মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের রচনায় সেই যুগদাবিরই অপ্রত্যক্ষ স্বীকৃতি।

'রাজর্ষি' উপন্যাসের শেষভাগে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানবসেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও সাম্যবোধের জয়ধ্বনি করিয়াছেন। নিজামতপুরে মড়ক লাগিলে সন্ন্যাসী বিল্বন ঠাকুর পীড়িত পাঠানদিগকে সেবা করিতে লাগিলেন। হিন্দুরা প্রশ্ন তুলিল, হিন্দু-সন্ন্যাসী হইয়া তিনি মুসলমানদের সেবা করিতেছেন কেন। উত্তরে বিল্বন বলিলেন: 'আমি সন্ন্যাসী, আমার কোনো জাত নাই। আমার জাত মানুষ। মানুষ যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত! ভগবানের সৃষ্ট মানুষ যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে তখনই বা কিসের জাত!' জাতের তর্ক না তুলিয়া এই যে অকুণ্ঠ মানবসেবা, ইহা তো উদার সাম্য-বোধেরই পরিচায়ক। ইহাকে উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর জাতিভেদ-

বর্জিত সমাজ-গঠন-প্রচেষ্টার অন্যতম ফল বলিয়া গণ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় যুগানুগত্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু রবীন্দ্রমানস যুগানুসারী হইয়াও যুগোত্তীর্ণ। বিশ্বলীন প্রকৃতির সহিত মানবমনের যে নিগূঢ় সম্পর্ক, তাহা কোনো বিশেষ যুগের অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে এই উদার প্রকৃতি বার বার দেশকালের গণ্ডী ছাড়াইয়া প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির সহিত একাত্ম হইয়া কবি নিখিল মানবকে, তথা নিখিল জীবকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—সমগ্র বিশ্বকে আপন বক্ষে টানিয়া লইতে চাহিয়াছেন। রাজ্যত্যাগী উদাসীন গোবিন্দ-মাণিক্যের মধ্যে যেন কবির এই প্রেমিক সত্তাটি প্রকাশিত। বাসনাক্ষুব্ধ অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করিয়া গোবিন্দমাণিক্য পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। তখন তিনি এক সম্পূর্ণ নূতন মানুষ। 'প্রকৃতিকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখিলেন এবং আপনাকেও তাহার সহিত এক বলিয়া মনে হইল। বৃক্ষলতার সে এক নূতন শ্যামল বর্ণ, সূর্যের সে এক নূতন কনককিরণ, প্রকৃতির সে এক নূতন মুখশ্রী দেখিতে লাগিলেন।······মানবের হাস্যালাপ, ওঠাবসা, চলাফেরার মধ্যে তিনি এক অপূর্ব নৃত্যগীতের মাধুরী দেখিতে পাইলেন। যাহাকে দেখিলেন তাহাকে কাছে ডাকিয়া কথা কহিয়া সুখ পাইলেন—যে তাঁহাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল তাহার নিকট হইতে তাঁহার হৃদয় দূরে গমন করিল না। সর্বত্র দুর্বলকে সাহায্য করিতে এবং দুঃখীকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল আমার নিজের সমস্ত বল এবং সমস্ত সুখ আমি পরের জন্য উৎসর্গ করিলাম, কেননা আমার নিজের কোনো কাজ নাই, কোনো বাসনা নাই।'

পরের জন্য এই যে আত্মবিসর্জী মনোভাব—সকলের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া এই-যে পরম তৃপ্তি, ইহার মূলে রহিয়াছে সকলের সহিত একাত্ম হইয়া সকলের প্রতি সমভাবে প্রসারিত এক প্রেমদৃষ্টি। বিশ্বপ্রসারিত এই প্রেমদৃষ্টির আলোকেই মানবমনে সাম্যবোধের উদ্বোধন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' সেই মহৎ উদ্বোধনের মহাগীত।

## ছোটগল্প

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উপন্যাস রচনার সঙ্গে সঙ্গে গল্প লেখাও চলিতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা

স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ছোট বড় অনেক সাহিত্যিকই অনেক গল্প রচনা করেন। কিন্তু ছোটগল্প বলিতে ঠিক যাহা বুঝায়, বাঙলাসাহিত্যে তাহার সূচনা রবীন্দ্রনাথের হাতে। 'ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা' লইয়া রবীন্দ্রনাথ 'একেকটি করে' গল্প রচনা করিয়াছেন। সমাজ-সমস্যা, পারিবারিক জীবনচর্যা, রাজনীতি, মানবমনের বিচিত্র ভাব ও ভাবনা—এক কথায়, জীবন-নির্ভর বিভিন্ন বিষয় এই গল্পগুলিতে স্থান পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি রচিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে—বিশেষ করিয়া এই শতাব্দীর শেষ দশকে, বাকীগুলি বিংশ শতাব্দীতে। বর্তমান গ্রন্থের লক্ষ্য উনিশ শতকের ছোটগল্পগুলি। এইগুলির মধ্যে আবার যে-সব ছোটগল্পে কোন-না-কোন ভাবে সাম্যভিত্তিক ভাবাদর্শের স্পর্শ লাগিয়াছে, তাহাদের কয়েকটি মাত্র এখানে আলোচিত হইবে। উদ্দেশ্য—রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনার মানসিকতায়ও সাম্যচিন্তার প্রভাব নির্ণয়।

ইংরাজ-পদদলিত বাঙলার দুঃসহ মর্মজ্বালা ফুটিয়া উঠিয়াছে 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটিতে। প্রভুত্বস্পর্ধী ইংরাজ রাজকর্মচারীর উদ্ধত আচরণ ও নিরীহ দেশবাসীর নিরুপায় সহনশীলতার দৃষ্টান্ত দিয়া লেখক সেকালের ইংরাজ ও বাঙালীর দুরতিক্রম্য বৈষম্যের চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে ইংরাজ ও বাঙালীর মধ্যে অধিকারগত সাম্য স্থাপনের যে আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, এই গল্পের শশিভূষণ যেন তাহারই একটি জীবন্ত বিগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ যেমন একদিকে ইংরাজ-বাঙালীর লজ্জাকর বৈষম্যের চিত্র আঁকিয়া দেশবাসীর মনে পরাধীনতার গ্লানিবোধ সঞ্চার করিতে চাহিয়াছেন, অপরদিকে তেমনই সেই বৈষম্যের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত করিবার সংকেতও দিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-ভাবনায় ইহাই শেষকথা নহে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কেবল তাঁহার স্বদেশটির দিকে নিবদ্ধ হইয়া থাকে নাই, সে-দৃষ্টি বিশ্ব-প্রসারিত।[১২] ইংরাজ ও বাঙালীর উনিশ-শতকীয় বৈষম্যের ছবি আঁকিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রবল ও দুর্বলের চিরকালীন সমস্যার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়াছেন, ইংরাজ-প্রপীড়িত অসহায় ভীরু বাঙালীর রূপক-ব্যঞ্জনায় তুলিয়া ধরিয়াছেন জগতের উৎপীড়নক্ষুব্ধ 'মূঢ় ম্লান মূক মুখ'গুলিকে। অন্যায়কারী ইংরাজ রাজকর্মচারীর প্রতি তির্যক্ মন্তব্যে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া এবং ইংরাজ-ভীত বাঙালীর আত্মমর্যাদাবোধহীন আচরণের গ্লানিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া লেখক যেন বিশ্বপিতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন :

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।'[১৩]

'রাজটিকা' গল্পটিতে পরাধীন বাঙালীর ইংরাজমোহের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। নবযুগের বাঙালীদের কেহ কেহ ইংরাজঘেঁষা হইয়া ও ইংরাজের প্রসাদলাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেন এবং সাহেবিয়ানা অভ্যাস করিয়া নিজেদের সাহেব বলিয়া জাহির করিবার উৎকট আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেন। গল্পটিতে লেখক সেই মনোবৃত্তিকেই আক্রমণ করিয়াছেন। ইংরাজপ্রীতি ও দেশপ্রীতির সংঘাত বর্ণনা করিয়া লেখক বলিতে চাহিয়াছেন যে, দেশবাসীর স্নেহপ্রীতির নিকট রাজপ্রসাদ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। রাজা ও প্রজায়, শাসক ও শাসিতে চিরদিনই একটা বৈষম্য বজায় থাকে। রাজানুগ্রহের আকাঙ্ক্ষী হইলে এই বৈষম্যকেই বড় করিয়া তোলা হয়। ইহাকে উপেক্ষা করিয়া দেশবাসীর সহিত সমতল ভূমিতে দাঁড়াইবার যে তৃপ্তি ও গৌরব, মানুষের মনুষ্যত্ব তাহাই দাবি করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের এই চিরকালীন আদর্শটি আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পটিতে নারীকে তাহার স্বকীয় ব্যক্তিমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। গল্পের পরিণতিতে চঞ্চলা গ্রামবধূ চন্দরার অভিমানক্ষুব্ধ স্বাধীন আচরণ আমাদের নিকট নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার একটি অনুপম চিত্র তুলিয়া ধরে। চন্দরাকে বিনাদোষে দোষী সাজানো হইয়াছিল। বড় ভাই দুখিরাম রুই রাগের মাথায় তাহার পত্নীকে খুন করিয়া বসিলে ছোট ভাই ছিদাম তাহার দাদাকে বাঁচাইবার জন্য একটা মিথ্যা ঘটনা সাজাইয়া তুলিল। পত্নী চন্দরাকে সে খুনী বলিয়া প্রচার করিয়া দিল। স্বামীর এই নিষ্ঠুর আচরণে চন্দরার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। ইহার পর হইতেই শুরু হইল চন্দরার অভিমানাহত নারীহৃদয়ের অশ্রুসজল বিদ্রোহ। স্বামী হইয়া যে তাহার স্ত্রীকে বিনাদোষে খুনের দায়ে ধরাইয়া দিল, তাহাকে কোনমতেই সে ক্ষমা করিতে পারিল না। এই রাক্ষস স্বামীর অন্তরলোকে যাহাতে একটা তীব্র অপরাধবোধ জাগ্রত থাকিয়া নিরন্তর তাহাকে শাস্তি দান করিতে থাকে, সেই উদ্দেশ্যে চন্দরা তাহার নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ডের দিকে ঠেলিয়া দিতে লাগিল। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কী বলিলে চন্দরা বাঁচিয়া যাইতে পারে, ছিদাম তাহা বার বার চন্দরাকে শিখাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু চন্দরা তাহার একবর্ণও বলিল না। সময় আসিলে চন্দরা পুলিস হইতে জজসাহেব

পর্যন্ত সকলের নিকটই এমন জবানবন্দী দিল যাহাতে তাহার ফাঁসির হুকুম অনিবার্য হইয়া উঠিল। পুরুষশাসিত নারীজীবনের অপরিসীম বেদনাভার বুকে লইয়া চন্দরা পৃথিবী হইতে বিদায় লইল।

আমাদের সমাজে কত চন্দরা যে এইরূপ পুরুষশাসনের বলি হইয়াছে তাহার সংখ্যা কে নির্ণয় করিবে? স্বমানস-কল্পিত একটা কৃত্রিম অধিকারবোধ লইয়া পুরুষ চিরদিনই নারীর অধিকারকে খর্ব করিয়া আসিয়াছে—এমন কি, নারীর যে মানুষ হিসাবে একটা স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে তাহাও অস্বীকার করিয়াছে। 'শাস্তি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ নারীর এই দুর্বিষহ লাঞ্ছনার প্রতি সমবেদনা জানাইয়া পুরুষের ন্যায় নারীরও স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা বিকাশের মৌন দাবি তুলিয়াছেন।

'মানভঞ্জন' গল্পটি জুড়িয়াও অনুরূপ একটা দাবি আভাসিত। এই গল্পের গিরিবালা স্বামীর নিকট একান্তভাবে অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে, এবং পরিশেষে স্বামীর অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া 'নিজের বিদ্রোহী শক্তিতে' মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নারীর অপর একটি লাঞ্ছিত সত্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় 'দেনাপাওনা' গল্পটিতে। এই গল্পে লেখক হৃদয়হীন বরপণ-প্রথার চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। জীবনের সর্বাপেক্ষা নিকট সম্পর্ক যেখানে লেনদেনের ভিতর দিয়া স্থাপিত হয়, সেখানে আর যাহাই হউক না কেন, মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অবমাননা করা হয়। অথচ হিন্দুসমাজে বহুকাল হইতেই এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। নারীর ব্যক্তিমূল্যকে অস্বীকার করিয়া ইহাতে কেবল আর্থিক লাভের দিকটাই বড় করিয়া দেখা হয়। নারীর নারীত্বের পক্ষে ইহা একটা বড় রকমের অপমান। নবযুগের নারীমুক্তি-আন্দোলনে নারীর এই অসম্মান ঘুচাইবার সংকল্প গ্রহণ করা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' তাহারই অবশ্যকর্তব্যতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

নারী ও পুরুষের মধ্যে যে গুরুতর বৈষম্য উদ্যত থাকিয়া নারীজীবনকে বহুধা লাঞ্ছিত করিয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রবুদ্ধ বাঙলা তাহার নিঃসংকোচ অবলুপ্তি কামনা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে এই যুগকামনারই বিদ্যুৎস্পন্দ অনুভূত। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আমাদের সমাজের ছোটখাট ঘটনার উপর যুগোচিত রঙ লাগাইয়া লেখক সর্বদেশের সর্বকালের একটি বৃহৎ সমস্যার উপর আলোকপাত করিয়াছেন। নারী ও পুরুষের মধ্যে

চিরকালই দেশে দেশে একটা বিরাট বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। মনুষ্যত্বের অবমাননাকারী এই হীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল, রবীন্দ্র-রচনায় সেই প্রতিবাদেরও সুর ধরা পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'ত্যাগ' গল্পটি ইহার একটি সার্থক উদাহরণ। জাতিগত ভেদবুদ্ধি মানুষে মানুষে যে বৈষম্যের সৃষ্টি করে, রবীন্দ্রমানসে তাহা সম্পূর্ণরূপে ধিক্কৃত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জাতি-দেশ-নিরপেক্ষ অখণ্ড মানবতার পূজারী। তাঁহার এই মানবপূজার একটিমাত্র মন্ত্র হইল 'প্রেম'। সেই প্রেমের বলে যে উচ্চনীচ ভুলিয়া মানুষকে কেবল মানুষ বলিয়াই গ্রহণ করা যায়, 'ত্যাগ' গল্পে তাহাই বিশেষভাবে প্রচারিত।

দ্বিধাসংকোচহীন উদার মানব-প্রেমের অপর এক ধরনের অভিব্যক্তি 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটিতে। কাবুলিওয়ালা রহমত সুদূর আফগানিস্তান হইতে মেওয়া বেচিতে কলিকাতায় আসিয়াছে। একটি ছোট হাতের ছাপ-দেওয়া একখণ্ড কাগজ বুকের কাছে রাখিয়া পর্বতগৃহবাসিনী কন্যাটির প্রতি যে ভালবাসা সে প্রতিক্ষণ অনুভব করিতেছে, তাহা ক্রমে বিশেষকে ছাড়াইয়া নির্বিশেষে গিয়া পৌঁছিয়াছে—জাতিধর্মের বাঁধন ভাঙিয়া স্নেহপ্রেমের উদার ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইজন্যই হিন্দু বাঙালী ঘরের ছোট মেয়ে মিনিকে সে নিজ হৃদয়ের সমস্তটুকু পিতৃস্নেহ উজাড় করিয়া দিতে পারিয়াছে। স্নেহপ্রেমের নিরিখে যে সকল মানুষই সমান, কাবুলিওয়ালার আচরণে তাহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জগতের আর সকল পিতার মতো সেও একজন পিতা। স্নেহমমতার ক্ষেত্রে মিনির সম্ভ্রান্তবংশীয় বাঙালী পিতার সহিত এই রুক্ষ আফগান পিতার বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই। '…সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা'—অনুভূতির এক চরম মুহূর্তে মিনির বাবার নিকট এই পরম সত্যটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

সর্বসংস্কার-অতিক্রমী এই বিশ্বজনীন আবেদনই রবীন্দ্রনাথের এক-একটি ছোটগল্পকে চিরকালের সাহিত্যে উন্নীত করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মধ্যযুগীয় অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় নানাদিক দিয়া নানা জিজ্ঞাসা উদ্যত হইয়া উঠিল। পশ্চিমের দমকা হাওয়ায় পুরাতন নোনাধরা দেওয়ালের চুনবালি খসিয়া পড়িতে লাগিল। সমাজে, পরিবারে,

ধর্মে, রাষ্ট্রব্যবস্থায়—জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নূতন ভাবে নূতন ভিত্তি গড়িয়া তোলার একটা তীব্র অস্থিরতা দেখা দিল। এই অস্থিরতাই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলাসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে। নূতন নূতন জীবনাদর্শ প্রচার করিয়া এই সময়কার বাঙলাসাহিত্য জাতির মানসমুক্তি ঘটাইতে প্রয়াসী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি ছোট গল্পে এইজাতীয় মুক্তির সংকেত লক্ষ্য করা যায়। এই সকল ছোটগল্প যুগভাবনাকে সার্থকরূপে প্রকাশ করিয়া জাতির বিভিন্ন সমস্যায় পথনির্দেশ করিতেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আবার ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালকে তুলিয়া ধরিলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি ছোটগল্পে একটা চিরকালীন আবেদন আছে। '...তাঁর ছোটগল্প যুগসম্ভব হয়েও যুগাতিক্রমী, স্থানিক হয়েও সর্বদেশীয়।'[১৮]

## প্রবন্ধ ও রচনা

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মনীষীদের চিন্তাধারা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে প্রধানতঃ প্রবন্ধ ও রচনার বাহনে। রসাবেদনহীন প্রবন্ধই হউক আর রসোত্তীর্ণ রচনাই হউক, উভয়েরই মূল উপজীব্য হইল পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জীবন। এই জগৎ ও জীবনের কথা বলিতে গিয়া লেখককে কখনও কখনও সমাজের বিভিন্ন সমস্যার মুখামুখি হইতে হয়। এই সকল সামাজিক সমস্যার প্রায় প্রত্যেকটিরই মূলে থাকে মানুষে মানুষে বিভেদ ও বৈষম্যবোধ। উনিশ শতকের প্রথম হইতেই এই বিভেদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালী মনীষার অভিযান শুরু হইয়াছে। এইজন্যই রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ পর্যন্ত অনেক লেখকেরই লেখায় সাম্য ও মানবতার ভিত্তিতে সমাজগঠনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই প্রয়াস যে কেবল প্রবন্ধ ও রচনার মাধ্যমেই করা হইয়াছে তাহা নহে। কাব্য, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির ভিতরেও ইহা পরিস্ফুট। কাব্য-কবিতা, উপন্যাস ও ছোটগল্প সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান আলোচনা কেবল প্রবন্ধ ও রচনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত। তাহাতেও একটা কথা আছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ প্রভৃতি বহু চিন্তাশীল মনীষীর সাম্যাদর্শী প্রবন্ধ-নিবন্ধ লইয়া এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনা-পারম্পর্যে যাঁহারা বাদ পড়িয়াছেন, অথচ উনিশ শতকের সাম্যচিন্তার ফসলের

হিসাবে লইতে গেলে যাঁহাদের বাদ দেওয়া সঙ্গত হইবে না, তাঁহাদের কয়েকজনের সম্পর্কে এখানে কিছু কিছু আলোচনা করা গেল। ইহাতে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে সাম্যচিন্তার ব্যাপক বিস্তৃতিটি ধরা পড়িবে আশা করি।

## ভূদেব মুখোপাধ্যায়ঃ

যে-যুগে বাঙলাদেশের আকাশে-বাতাসে একটা ভাঙনের গান ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—সমাজে, ধর্মে, পারিবারিক জীবনচারণায় যাহা কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তাহাতে আঘাত হানিবার প্রচণ্ড উল্লাস দেখা দিয়াছিল, সেই যুগের প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়া মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রাচীনকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহার একপ্রকার অভিনব মূল্য নির্ধারণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু ও সহপাঠী মধু-রাজনারায়ণ ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণরূপে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি প্রবল আনুগত্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বাল্যবিবাহ সমর্থন করিয়াছেন, বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, জাতিভেদের সপক্ষে রায় দিয়াছেন; এক কথায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিবাদী চিন্তাধারার সহিত তাঁহার চিন্তার অনেক ক্ষেত্রেই মিল হয় নাই; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহাকে একেবারে গোঁড়ামি অপরাধে অভিযুক্ত করা চলে না। তাঁহার বহু রচনাতেই তাঁহার চিন্তাশীল মুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষভাব দেখা যায়, তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর সম্প্রীতি স্থাপনের উপর ভূদেব গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতে 'আকার-ইঙ্গিতে', 'আচার-ব্যবহারে' ভারতীয় মুসলমানগণ অনেকটা হিন্দুদের সমপর্যায়ভুক্ত; কাজেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক ঘৃণা থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। হিন্দুদের মুসলমান-বিদ্বেষের অন্যতম কারণরূপে বলা হয়, মুসলমান-রাজত্বে হিন্দুগণ মুসলমানদের দ্বারা নানাভাবে অত্যাচারিত হইত। কিন্তু ভূদেব তাঁহার 'সামাজিক প্রবন্ধ'-নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধ-পুস্তকে সেই মতকে খণ্ডন করিয়া এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ ও বৈষম্যের বোধ সৃষ্টি করিয়াছে ইংরাজগণ। অনেক ইংরাজ গ্রন্থকার মুসলমান-শাসনে হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়া হিন্দু-মনে মুসলমান-বিদ্বেষের বীজ

বপন করিয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া, ইংরাজ শাসকগণ রাজ্যশাসনে ভেদ-নীতির সম্প্রয়োগ করিয়াও হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধাইয়া রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইংরাজের এই দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে 'বিশেষ সতর্ক' হইবার জন্য ভূদেব ভারতীয়দের আহ্বান জানাইয়াছেন। নৈষ্ঠিক হিন্দু হইয়াও তিনি যে এইরূপ মুসলমান-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, ইহা তাঁহার সংস্কারবিহীন উন্নত মনেরই পরিচায়ক।

দেশীয় লোকদের মনে সাম্যভিত্তিক 'জাতীয় ভাব' বা জাতীয়তাবোধ উদ্দীপিত করিবার জন্য ভূদেব দৃঢ়-প্রযত্ন ছিলেন। সমকালীন ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসকগণ যে রাজ্যরক্ষার্থ নানাভাবে ভারতবাসীদের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য বাধাইয়া রাখিবার অপকৌশল আশ্রয় করিয়াছিলেন, ভূদেবের সন্ধানী দৃষ্টিতে তাহা এড়াইয়া যায় নাই। ভূদেব মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন: 'প্রদেশীয় ভাষাগুলির অবান্তর ভেদ রাখিবার জন্য, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ঈর্ষ্যা প্রজ্বলিত করিবার জন্য, হিন্দু সমাজের অন্তরমধ্যে বিদ্বেষ প্রবিষ্ট করিবার জন্য, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরুদ্ধ স্বার্থ জন্মাইবার জন্য, দলাদলির রাজনৈতিক সূত্রে পরিষিক্ত-হৃদয় কোন কোন ইংরাজকে মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ যত্নশীল বলিয়াই বোধ হয়।'[১৫] ভূদেবের আকুল আবেদন— ভারতবাসী এই 'বিচ্ছেদ-প্রবণতা' ত্যাগ করিয়া সর্বক্ষেত্রেই সম্মিলনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উঠুক।

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এদেশে 'পাশ্চাত্য ভাব' অনুকরণের প্রবল স্রোত বহিয়া যাইতে থাকে। ইংরাজমোহ ক্রমে এতই প্রবল হইয়া দাঁড়ায় যে, ইংরাজী-শিক্ষিত দেশবাসীর নিকট ইংরাজই একমাত্র শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ সম্মানিত তাঁহারাও এই সকল 'দিশি সাহেবদের' নিকট একান্ত অবজ্ঞাভাজন হইয়া পড়েন। এবিষয়ে ভূদেবের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করা যাইতে পারে:

"কোন জিলায় একটি 'কৃতবিদ্য' মুনসিফ হইয়া আসিয়া তথাকার জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সাহেব এবং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, সকলেরই বাটী বাটী গিয়া তাঁহাদিগের সম্মানরক্ষা এবং বন্দনা করিয়াছিলেন। কেবল ঐ নগরে যে একটি মহারাজা থাকিতেন, তাঁহার নিকট গমন করেন নাই, প্রত্যুত দেশীয় কোন বড় লোকেরই নিকট গমন করেন নাই। নিজেই অপ্রাসঙ্গিক রূপে ঐ কথার উত্থাপন করিলে, ওরূপ করিলে কেন জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—'রাজা বেটা কি করিতে পারে? আর দেশীয় লোকে কেই বা কি করিতে

পারে ?'—'কৃতবিদ্য'টির সাম্যজ্ঞান এবং সৌজন্যবোধের মূলেই যে কুঠারাঘাত হইয়া গিয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম।"[১৬]

স্বজাতিবৎসল ভূদেব স্বজাতীয়দের মধ্যে সাম্যজ্ঞানের এইরূপ অভাব লক্ষ্য করিয়া অশ্রুমোচন করিয়াছেন।

ভারতবাসীদের মধ্যে নানাভাবে সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছেন ভূদেব। কতকগুলি মৌলিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এদেশের জাতিভেদপ্রথা সমর্থন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু একই বর্ণের মধ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহবিধি অনুমোদন করিয়া বৈষম্যমূলক সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার মূলে আঘাত করিতে চাহিয়াছেন। এ সম্পর্কে তাঁহার একটি উক্তি অনুধাবনযোগ্য : 'একই বর্ণের লোকের মধ্যে যে অবস্থানভেদজনিত বিবাহপ্রতিষেধ এখন দেখা যায় তাহা জাতিভেদ নয়। যাতায়াতের সৌকর্য্যের সহিত সর্ব্বত্রই ঐ আগন্তুক সঙ্কীর্ণতা আপনা হইতেই মিটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক্ প্রভৃতির মধ্যে প্রদেশ-নির্ব্বিশেষে আপনাপন বর্ণমধ্যে বিবাহ চলিলে ভারত-সমাজ দৃঢ়সম্বদ্ধ এবং হিন্দীভাষা অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠে। এরূপ সংস্কার প্রার্থনীয়।'[১৭]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই যে, ভারতবর্ষের ভাষাগত বৈষম্য দূর করিবার উপায়স্বরূপ ভূদেব হিন্দীভাষার সমধিক প্রচলন কামনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিমত : 'ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশব্যাপক। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।'[১৮]

সামাজিক নানাবিষয়ে সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠাকামী হইলেও সাম্য সম্বন্ধে ভূদেবের একটি নিজস্ব প্রতীতি ছিল। তাঁহার মতে, 'জগতে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সাম্য নাই। সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইতে মনুষ্যহৃদয়ে সাম্যজ্ঞানের উদ্বোধ হইয়া যায়। গাছের দুইটি পাতা লইয়া পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিতে গেলেই বুঝিতে পারা যায় যে, একটি যদি অপরটি হইতে কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন না হইত, তাহা হইলেই দুইটিতে ঠিক সমান হইত। সাম্যজ্ঞান এইরূপ প্রত্যক্ষীভূত সাদৃশ্যমূল হইতে জন্মিয়া সাদৃশ্যবোধ হইতে ভিন্ন অপর একটি ভাবরূপে লক্ষিত হয়।'[১৯]

ভূদেব-কথিত সাদৃশ্যবোধ ও সাম্যজ্ঞানের মধ্যে মূলতঃ যে ক্ষীণ পার্থক্য,

তাহাকে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে তেমন স্বীকৃতি দেওয়া হয় না ; কারণ, স্থূলদৃষ্টিতে সাম্য ও সাদৃশ্য অনেকটা সমার্থক। এই দিক দিয়া সাদৃশ্যবাদী ভূদেবকে আমরা সাম্যবাদেরই প্রবক্তা বলিতে পারি।

## সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় :

যে উদার প্রেমদৃষ্টির অধিকারী হইয়া আর্যঋষিগণ পৃথিবীর সমস্ত কিছুই—এমনকি, তুচ্ছ ধূলিকণাও মধুময় বলিয়া মনে করিতেন, বাঙলাসাহিত্যের অঙ্গনে সঞ্জীবচন্দ্র সেই ঋষিসুলভ প্রেমদৃষ্টির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত ভ্রমণকাহিনী[২০] 'পালামৌ' তাঁহার এই সর্বত্রবিসারী প্রেমদৃষ্টির এক অনবদ্য বাণীমূর্তি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "'পালামৌ'তে সঞ্জীবচন্দ্র যে বিশেষ কোনো কৌতূহলজনক নতুন কিছু দেখিয়াছেন অথবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু সর্বত্রই ভালোবাসিবার ও ভালো লাগিবার একটা ক্ষমতা দেখাইয়াছেন।"[২১]

পালামৌ-ভ্রমণকালে সঞ্জীবচন্দ্র যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তাহাই দুইচোখ ভরিয়া দেখিয়াছেন—তাহারই ললাটে সৌন্দর্যের বিজয়তিলক পরাইয়া দিয়াছেন।

পর্বতবিহারী যে কৃষ্ণকায় কোলবালকের দল, তাহারাও তাঁহার দৃষ্টিতে অপরূপ। কোলবালকদের আরণ্য কান্তি তাঁহাকে এরূপ মুগ্ধ করিয়াছে যে, তাহাদের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন : '…সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখনও দেখি নাই ; সকলের গলায় পুঁতির সাতনরী, ধুকধুকীর পরিবর্তে এক একখানি গোল আরসী, পরিধানে ধড়া, কর্ণে বনফুল ; কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে ; কেহ বা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া আছে ; কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। সকলগুলিই যেন কৃষ্ণঠাকুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।'

আবার, একটি লতা বা একটি পক্ষীও তাঁহাকে অনুরূপভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। 'লাতেহার' পাহাড়ে দৃষ্ট একটি লতার বর্ণনায় তাঁহার আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে : '…হঠাৎ একটি লতার প্রতি দৃষ্টি পড়িল ; তাহার একটি ডালে অনেক দিনের পর চারি পাঁচটি ফুল ফুটিয়াছিল। লতা আহ্লাদে তাহা আর গোপন করিতে পারে নাই, যেন কাহারে দেখাইবার জন্য ডালটি বাড়াইয়া দিয়াছিল। একটি কালোকোলো বড় গোচের ভ্রমর তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল ; আর এক একবার সেই লতায় বসিতেছিল। লতা তাহাতে নারাজ, ভ্রমর

বসিলেই অস্থির হইয়া মাথা নাড়িয়া উঠে। লতাকে এইরূপ সচেতনের ন্যায় রঙ্গ করিতে দেখিয়া আমি হাসিতেছিলাম,…'

বনের সামান্য একটি পাখী। বনচারী কত লোকই তো তাহার কূজন শোনে! কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের কর্ণে তাহাই সুললিত ছন্দের সুষমা লাভ করিয়াছে। হরিয়াল ঘুঘুর ন্যায় যে পাখীটি তাহার পক্ষিণী-সহচরীর নিকট কূজন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার সেই কূজনের মধ্যে লেখক শুনিতে পাইলেন মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত একটি শ্লোকাংশঃ—'রাধে মন্যুং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ং'।[২২] পক্ষীটি সঞ্জীবচন্দ্রের মনের উপর যেন কী এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিল। পক্ষিপ্রেমে মুগ্ধ লেখক বলিতেছেনঃ 'পক্ষীটির সঙ্গে কতই বেড়াইলাম, কতবার এই ছন্দ শুনিলাম, শেষ সন্ধ্যা হইলে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম।'

আর একবার সঞ্জীবচন্দ্র তাঁহার তাঁবুতে আগত একটি আদিবাসী সুন্দরী যুবতীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। যুবতীটির রূপ যেন তাঁহার চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময়কার কথা বলিতে গিয়া তিনি নিজেই স্বীকার করিতেছেনঃ 'আমি অনিমেষ লোচনে সুন্দরী দেখিতে লাগিলাম; কেন আসিযাছে, কোথায় বাড়ী, একথা তখন মনে আসিল না। আমি কেবল তাহার রূপ দেখিতে লাগিলাম,……'

সঞ্জীবচন্দ্রের এই রূপদর্শনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা তাঁহার প্রেমিক হৃদয়ের বিশ্বতঃ পরিব্যাপী এক রূপানুভূতি। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেনঃ 'আমি কখন কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের মত রূপ দেখিয়া থাকি, এইজন্য আমি যাহা দেখি, তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। রূপ যে কি জিনিস. রূপের আকার কি, শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে তাহার বাসা, এ সকল বার্তা আমাদের বঙ্গকবিরা বিশেষ জানেন, এইজন্য তাঁহারা অঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া বর্ণনা করিতে পারেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তাহা পারি না। তাহার কারণ, আমি কখন অঙ্গ বাছিয়া রূপ তল্লাস করি নাই। আমি যে প্রকারে রূপ দেখি, নির্লজ্জ হইয়া তাহা বলিতে পারি। একবার আমি দুই বৎসরের একটি শিশু গৃহে রাখিয়া বিদেশে গিয়াছিলাম। শিশুকে সর্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারও দেখিতে পাইতাম না। অনেক দিনের পর একটি ছাগশিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহ্লাদে তাহাকে বুকে করিয়াছিলাম।'

ঈশ্বরসৃষ্ট সকল কিছুর মধ্যেই যেন সঞ্জীবচন্দ্র সৌন্দর্যের লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আমরা যাঁহাকে সত্য শিব বলি, তাঁহাকেই সুন্দর বলিয়া প্রণতি জানাই। সেই চিরসুন্দর তো তাঁহার সৃষ্ট প্রাণী-অপ্রাণী সকলেরই মধ্যে সমভাবে প্রকাশিত থাকিয়া 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'[২৩]—রূপে রূপে নানা রূপ ধারণ করিয়াছেন। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁহার প্রীতি-সমুজ্জ্বল দুইটি চক্ষু মেলিয়া সেই রূপের জাদুকরেরই সর্বতোব্যাপী রূপ দেখিয়াছেন, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তিটি লক্ষণীয় :

'...বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে যে রূপ, লতায় সেই রূপ, নদীতেও সেই রূপ, পক্ষীতেও সেই রূপ, ছাগেও সেই রূপ ; সুতরাং রূপ এক ; তবে পাত্র ভেদ। আমি পাত্র দেখিয়া ভুলি না ; দেহ দেখিয়া ভুলি না ; ভুলি কেবল রূপে। সে রূপ লতায় থাক অথবা যুবতীতে থাক, আমার মনের চক্ষে তাহার কোন প্রভেদ দেখি না।'

সঞ্জীবচন্দ্রের এই নির্বিশেষ রূপোপলব্ধিতে যেন কতকটা pantheism বা সর্বেশ্বরবাদের স্পর্শ লাগিয়াছে। ইংরাজ কবি shelley-র ন্যায় তিনিও যেন বলিতে পারেন : 'And all things seem only one/In the universal Sun' ['To Jane': 'The Invitation']

একই রূপের আলোকে সমস্তই সমান রূপময় হইয়া উঠিয়াছে। রূপদর্শী সঞ্জীবচন্দ্র অনন্ত রূপময়কে রূপে রূপে অভিব্যক্ত দেখিয়া সকলকেই সমভাবে রূপশ্রীমণ্ডিত মনে করিয়াছেন। রূপানুভূতির জগতে ইহা এক অপূর্ব সাম্যবোধ।

## মীর মশার্‌রফ হোসেন :

বাঙলাসাহিত্যে মীর মশার্‌রফ হোসেন মুসলমান লেখকদের অগ্রণী। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক ; অবশ্য 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের রচয়িতারূপেই তাঁহার সৃষ্টি সর্বাপেক্ষা অধিক সার্থকতা লাভ করিয়াছে। রচনার যে প্রসাদগুণ ও উন্নত ভাব-কল্পনার জন্য সাহিত্যের আসরে লেখক স্থায়ী আসন লাভ করেন, মীর সাহেবের রচনায় তাহার অভাব দেখা যায় না। অথচ নানা কারণে বাঙলাসাহিত্যে আজ তিনি বিস্মৃতপ্রায়। কিন্তু মীর মশার্‌রফের সাহিত্য-কৃতির বিচার আমাদের বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য নহে। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে কলুষিত বাঙলাদেশে তিনি যে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মনুষ্যত্বের

মহতী বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্যই তাঁহাকে আমরা এখানে বিশেষভাবে স্মরণ করিব।

মীর সাহেবের রচিত 'গো-জীবন' প্রবন্ধটি তাঁহার উন্নত মানসিকতার সার্থক বাণীবহ। ১২৯৫ সালের চৈত্রসংখ্যা 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' অংশে [ পৃষ্ঠা ৬৯৮ ] এই প্রবন্ধ-গ্রন্থটির সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছেঃ 'কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যাহাতে গোজীবন রক্ষায় সচেষ্ট হন এই অভিপ্রায়ে এই পুস্তকখানি লিখিত। গো বধের বিরুদ্ধে লেখক যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয় লেখকের হৃদয় হইতে সে সকল কথা উত্থিত, তিনি কেবল মুখের কথা মাত্র বলিতেছেন না। পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। লেখক মুসলমান হইয়া এ বিষয়ে যেরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন—যেরূপ অপক্ষপাতী ভাবে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া কেবল আনন্দ নহে আমাদের আশ্চর্য্যও জন্মিল। ভরসা [ ছাপার ভুলে 'ভরষা' ] করি অন্য মুসলমানগণ তাঁহার অনুসরণ করিবেন।'

মুসলমান-সমাজের একটি প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, মুসলমানরূপে পরিচিত হইতে হইলে গোমাংস-ভক্ষণ আবশ্যক। মীর সাহেব তাঁহার 'গো-জীবন' প্রবন্ধে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেনঃ '...শাস্ত্রে এ কথা লিখা নাই যে গোহাড় কামড়াইতেই হইবে, গোমাংস গলাধ [ গলাধঃ ] করিতেই হইবে, না করিলে নরকে পচিতে হইবে।...খাদ্য সম্বন্ধে বিধি আছে যে ( গোমাংস ) খাওয়া যাইতে পারে, খাইতেই হইবে, গোমাংস না খাইলে মোসলমানি থাকিবে না, মহাপাপী হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—এ কথা কোথাও লিখা নাই।'

এই প্রসঙ্গে মীর সাহেবের রসিকতাটুকুও বেশ উপভোগ্য। তিনি লিখিতেছেনঃ 'খাইবার অনেক আছে। ঘোড়া খাইতে পারি—খাই না। ফড়িং ধরিয়া ঘৃতে ভাজিয়া টপাটপ গিলিতে পারি—শাস্ত্রের কথা,—গিলি না। গোসাপ উদরসাৎ করিতে পারি—বিধি আছে, ভয়ে তাহার নিকটও যাই না।...ঘোড়া, মহীষ [মহিষ], বনগরু, মেষ, ছাগল, মৃগ, খরগোস, সকলিত চলিতে পারে?... এত থাকিতে গরুর মাংসে জিহ্বায় জল পড়ে কেন?'

প্রবন্ধটির উপসংহারে এই বিচক্ষণ সাহিত্যিকের সাম্প্রদায়িকতা-বোধহীন মুক্ত মনের সুস্পষ্ট পরিচয় অভিব্যক্ত। গোহিংসা পরিত্যাগ করিবার জন্য তিনি মুসলমান সমাজের নিকট সবিশেষ আবেদন জানাইয়াছেনঃ

'এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মোসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্ম্মে এবং কর্ম্মে এক—সংসারকার্য্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ট [ ঘনিষ্ঠ ] সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি ?

'ধর্ম্মে আঘাত লাগে না, গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্নারও ব্যাঘাত জন্মে না। উন্নতির পথেও কাঁটা পড়ে না। প্রাণের হানিও বোধ হয়—হয় না। এ অবস্থায় গোহিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি ? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চিরসহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, আর যাহা রক্ষা, তাহা বার বার বলিব না। যাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হয় সে ত্যাগে ক্ষতি কি ?'

ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, যে-যুগে অধুনা-প্রচারিত ধর্মনিরপেক্ষতার কথা তেমন দানা বাঁধিয়া উঠে নাই—যে-যুগে বিদেশী সরকার এদেশের শাসনব্যাপারে ভেদনীতির সম্প্রয়োগ করিয়া চলিতেন, উনবিংশ শতাব্দীর সেই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-বিরোধের সম্ভাবনাময় দিনগুলিতে একজন বাঙালী লেখক নিজে মুসলমান হইয়াও হিন্দুদের মুখ চাহিয়া মুসলমান-সম্প্রদায়ে বহুল-প্রচলিত গোহিংসা নিবারণের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। মীর মশাররফের লেখা পড়িলে মনে হয়, তাঁহার মধ্যে এমন এক উদারমনা মানুষ বাস করিত, যাহার নিকট ধর্মের গোঁড়ামি বলিয়া কিছু ছিল না—যাহার দৃষ্টিপথে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর ভাই বলিয়া প্রতীয়মান হইত। ধর্মনিরপেক্ষী হইয়া মানুষকে যিনি ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার চিত্ত সাম্যজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত। মীর মশাররফ হোসেনের রচনায় আমরা তাঁহার এইরূপ জ্ঞানদীপ্ত চিত্তেরই পরিচয় লাভ করি।

## রবীন্দ্রনাথ ঃ

বাঙলাসাহিত্যের অন্যান্য শাখায় যেমন, প্রবন্ধ-নিবন্ধ-রচনায়ও তেমনই রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ শিল্পী। "রবীন্দ্রনাথের গদ্যলেখার ভিতরে নিবন্ধ আছে, প্রবন্ধ আছে, অল্পায়তনের রচনা আছে ;—এই সকলের ভিতরে ধর্ম আছে, ইতিহাস আছে,—সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি সম্বন্ধেও বহু আলোচনা রহিয়াছে—প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য এবং

'অত্যাধুনিক' সাহিত্য সম্বন্ধেও আলোচনা রহিয়াছে,—জীবন-স্মৃতি আছে, ছিন্ন এবং অচ্ছিন্ন পত্র আছে, পঞ্চভূতও রহিয়াছে—আর রহিয়াছে একটি ভাবস্থ বিশেষ মানসিক অবস্থানকে অবলম্বন করিয়া আত্মনিষ্ঠ রচনা।"[২৪] এই বিষয়-বৈচিত্র্যের ভিড় ঠেলিয়া রচনাকার রবীন্দ্রনাথের মানস-পরিচয় লাভ করা দুরূহ ব্যাপার। আর এরূপ বিরাট আয়োজন আমাদের পক্ষে অনাবশ্যকও। আমাদের আলোচনার চারিদিকে উনবিংশ শতাব্দীর গণ্ডীরেখা। এই গণ্ডীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা-সাহিত্যের অতি অল্প অংশেরই স্পর্শ লাভ করি। কিন্তু যেটুকুর স্পর্শ পাই তাহাই বা কম কিসে! রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী'র অবস্থান তো উনবিংশ শতাব্দীর কালসীমার মধ্যেই।[২৫] এই পত্রগুলিকে নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রমানসের রস-নিষ্যন্দী বলা চলে। এইগুলিতে যেমন একদিকে রবীন্দ্র-কবিসত্তার রোমান্টিক ধ্যানধারণার বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, অপরদিকে তেমনই মানবসংসারের প্রতি কবির যে একটা সুগভীর ঔৎসুক্য ছিল তাহাও অপরিস্ফুট থাকে নাই। প্রাত্যহিক জীবনধারণের গ্লানি ও আনন্দবোধ লইয়া যে-মানুষ সংসারের বিচিত্র পথ পরিক্রমণ করিয়া চলিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ উৎসুক নয়নে তাহাকে বার বার চাহিয়া দেখিয়াছেন। মানুষের প্রতি মানুষ-রবীন্দ্রনাথের এই-যে কৌতূহল-দৃষ্টি, ইহাই 'ভারহীন সহজের রস' হইয়া তাঁহার বিভিন্ন পত্রে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। ছিন্নপত্রগুলির এই মানবরস বা human interest লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার মধ্যে স্বতঃই একটা উদার মানবতাবোধ ও সাম্যচেতনার মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিত হইতেছে। বক্ষ্যমান আলোচনায় আমরা প্রধানতঃ সেই গুঞ্জনধ্বনিরই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব।

ছিন্নপত্রের যুগে একদিন দেখি, জমিদার রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দরিদ্র প্রজা ও কর্মচারীদের সহিত মানুষ হিসাবে নিজেকে অভিন্ন মনে করিতেছেন। সাম্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন : 'প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কী মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপর বসে বসে ভান করছি যেন এই-সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তাবিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হতে পারে! অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোটো ছোটো

বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই-সমস্ত ছেলে-পিলে-গোরুলাঙল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরল-হৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না।' [ পত্রসংখ্যা : ১৫ ]।

আবার অপর একখানি পত্রে তাঁহার দরিদ্র চাষী প্রজাদের দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া তিনি সোস্যালিজম্ বা সামাজতন্ত্রকে স্বাগত জানাইতেছেন। তাঁহার অকপট অভিমত : 'সোসিয়ালিস্ট্‌রা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য! কেননা, পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে, কোনো কালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবন-ধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যকীয় জিনিসও বণ্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনা মাত্র, কথনোই সকল মানুষ খেতে পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই—তারা ভারী কঠিন কথা বলে।' [ পত্রসংখ্যা : ১৫ ]। মানবদরদী রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিলোকের যে স্বল্প আভাসটুকু আমরা এখানে লাভ করি, তাহাতেই তাঁহার সাম্যবাদী মননশীলতার পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কেবল মানুষে মানুষে সাম্যবোধ নহে, সামান্য পশুপাখির সহিতও যে মানুষের বিশেষ কোনো প্রভেদ নাই— এই পরম সত্যটিও রবীন্দ্রচিত্তে সাড়া জাগাইয়াছ। রবীন্দ্রনাথের একটি স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ইহার সাক্ষ্য : 'আমি দেখেছি আমি যখন মফস্বলে থাকি তখন পশুপক্ষী জীবজন্তু আমার ভারী নিকটবর্তী হয়ে আসে—আপনাকে তাদের চেয়ে খুব বেশি স্বতন্ত্র কিম্বা উঁচুদরের মনে হয় না। একটি বৃহৎ সর্বগ্রাসী রহস্যময়ী প্রকৃতির কাছে আমার সঙ্গে অন্য জীবের প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর সামান্য বলে উপলব্ধি হয়।' [ পত্রসংখ্যা: ১৪১ ]।

নিখিল জীবের প্রতি এই সমদর্শনই আবার রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন : 'আমার বোধ হয় সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সর্ব জীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি। জগতে আমা হতে যেন দুঃখের সৃজন না হয়ে সুখের বিস্তার হতে থাকে। আমি যেন সকল প্রাণীর সুখ দুঃখ বেদনা বুঝে নিজের স্বার্থের

জন্যে কাউকে আঘাত না করি—এই যথার্থ ধর্ম, এই যথার্থ ঈশ্বরচরিত্রের আদর্শে আপনাকে গঠিত করা।' [ পত্রসংখ্যা : ১১৭ ]।

কিন্তু একটি কথা। সর্বজীবের প্রতি এই-যে প্রেমোপলব্ধি—যাহা 'সর্ব জীবে দয়া' প্রকাশ করিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলে, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রসারী প্রেম ইহাতেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। সে-প্রেম সর্বমানব ছাড়াইয়া সর্বজীবে, সর্ব জীব ছাড়াইয়া পৃথিবীর সার্বিক সত্তায় প্রসারিত। অনুভূতির এক চরম মুহূর্তে জল-স্থল-পর্বত-সমন্বিত বিশাল এই ধরণীর সহিত কবি 'একটা নাড়ীর টান' উপলব্ধি করিয়াছেন। কবির ভাবলোকে তাঁহার ব্যক্তিসত্তা একাত্ম হইয়া গিয়াছে বিশ্বসত্তার সহিত। কবির একখানি পত্রে এই একাত্মতার স্বীকৃতি কাব্যসুষমা লাভ করিয়াছে : '……এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে—আমার এই-যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্ থর্ করে কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার যে-একটি আন্তরিক আত্মীয়-বৎসলতার ভাব আছে ইচ্ছে করে সেটা ভালো করে প্রকাশ করতে, কিন্তু ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না—কী-একটা কিম্ভূত রকমের মনে করবে।' [ পত্রসংখ্যা: ৭০ ]।

রূপ-রস-গন্ধময়ী পৃথিবীর সহিত কবির এই-যে নিবিড় আত্মীয়তা, ইহা তাঁহাকে এমন এক প্রেমদৃষ্টি দান করে—যাহার বলে স্থাবর-জঙ্গম ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত কিছুকেই কবি সমভাবে আপন বুকে টানিয়া লইতে পারেন। পৃথিবীর সহিত কবির এই সুগভীর একাত্মতাবোধ হইতেই জাগ্রত হয় একধরনের অধ্যাত্ম সাম্যবোধ।

কিন্তু ভাবলোকের ঊর্ধ্বভূমিতে বিচরণ করিলেও সমকালীন সমস্যাগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথ উদাসীন হইয়া থাকেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ভারতাগত ইংরাজদের নির্মম আচরণে শিক্ষিত বাঙালীর মনে ইংরাজ-বিদ্বেষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল ; এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাহাই ক্রমে ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করিল। শতাব্দীর সূর্যাস্ত হইবার পূর্বেই ইংরাজের প্রভুত্বগর্বের বিরুদ্ধে বাঙালীর বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িল। রবীন্দ্রচিত্তে সমকালীন এই বিক্ষোভের তরঙ্গ-স্পন্দন লক্ষ্য করা যায়। ছিন্নপত্রাবলীর ৭৭-সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন : 'একে তো ভারতবর্ষীয় ইংরেজগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে। তারা স্বভাবতই আমাদের বড়ো অবজ্ঞার ভাবে দেখে, আমাদের উপর তাদের কানাকড়ির সিম্প্যাথি নেই, তার উপরে আবার তাদের কাছে নিজেকে exhibit করা আমার পক্ষে বড়োই কষ্টকর।'

দেশবাসীকে তিনি ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ করিতে বা ইংরাজের প্রসাদ-গ্রহণে উৎসুক হইতে দেখিলে বিষণ্ণ হইতেন। আবার দেশের লোকদের মধ্যে যাহারা ইংরাজ-ভারতীয়ের বৈষম্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে ব্যর্থ আক্রোশে ইংরাজের বিরুদ্ধে হইচই বাধাইয়া তুলিতে চাহিয়াছে, তাহাদেরও কার্য তিনি সমর্থন করেন নাই ; তাহারা যাহাতে আত্মশক্তির অনুশীলন করিয়া বড় হইতে পারে এবং বড় হইয়া ইংরাজদের সহিত সমমর্যাদায় মেলামেশা করিতে পারে·সেই উদ্দেশ্যে তিনি বহুবার বহুভাবে তাহাদিগকে আহ্বান জানাইয়াছেন। তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত : 'পৃথিবীর মধ্যে যখন আমাদের একটা কোনো প্রতিষ্ঠাভূমি হবে, পৃথিবীর কাজে যখন আমাদের একটা কোনো হাত থাকবে, তখন আমরা ওদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইতে পারব। ততদিন লুকিয়ে থেকে চুপ মেরে আপনার কাজ করে যাওয়াই ভাল।' [ পত্রসংখ্যা : ৭৭ ]। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, স্বদেশীয়দের এই উন্নতিকামনার মূলে রহিয়াছে ইংরাজ ও ভারতীয়ের বৈষম্য হইতে জাত একটা তীব্র বেদনানুভূতি।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে এদেশে সকলপ্রকার ভেদের প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। ধর্মভেদ, জাতিভেদ, নরনারীভেদ—সমস্ত রকম ভেদ অগ্রাহ্য করিয়া বাঙালী-সমাজে একটা মানবমুখী সাম্যব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে সাগ্রহ অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তাঁহার 'স্বদেশ ও সমাজ' গ্রন্থের 'চিঠিপত্র' পর্যায়ে দেখি,

নব্যশিক্ষিত নবীনকিশোর তাহার বৃদ্ধ দাদামহাশয়কে লিখিতেছে: "আমাদের মধ্যে এক বৃহৎ ভাবের বন্যা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমাদিগকে সর্বসাধারণের সহিত একাকার করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকে বিলাপ করিতেছে 'সমস্ত একাক্কার হইয়া গেল', কিন্তু আমার মনে আজ এই বলিয়া আনন্দ হইতেছে যে, আজ সমস্ত 'একাক্কার' হইবারই উপক্রম হইয়াছে বটে। আমরা যখন বাঙালি হইব তখন একবার 'একাক্কার' হইবে, আর বাঙালি যখন মানুষ হইবে তখন আরও 'একাক্কার' হইবে"। এই-যে 'একাক্কার' হওয়া—মনুষ্যত্বের বেদীমূলে সকল মানুষকে সমান আসন দান করা, ইহারই বাণী রবীন্দ্রসাহিত্যে বার বার ধ্বনিত হইয়াছে।

## বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর:

বাঙলাসাহিত্যের আকাশে বলেন্দ্রনাথ একটি অম্লান জ্যোতিষ্ক। বাঙলাসাহিত্যে তিনি প্রধানতঃ প্রাবন্ধিকের ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং মাত্র উনত্রিশ বৎসর জীবিতকালের মধ্যেই [ ১৮৭০-৯৯ ] প্রবন্ধ-রচনায় একটা দুর্লভ বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ঘনিষ্ঠ সহচররূপে বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-প্রতিভার ছত্রচ্ছায়ায় বর্ধিত হইয়া উঠেন। এজন্য তাঁহার রচিত প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্র-চেতনার অনেকখানি অনুরণন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, 'মৌলিক চিন্তা ও ভাবগভীরতার' বিচারে বলেন্দ্রনাথের রচনায় তাঁহার নিজস্বতা অপরিস্ফুট থাকে নাই। তাঁহার বহু রচনায় তাঁহার সৌন্দর্যমুগ্ধ রোমান্টিক কবিমনের পরিচয় পাওয়া গেলেও কোনো কোনো প্রবন্ধে তিনি জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া নিজস্ব ভাব ও ভাবনার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় এবং উড়িষ্যার ভগ্ন দেবমন্দিরের সৌন্দর্য-নিরূপণে তাঁহার যে উন্নত মননশীলতার পরিচয় পাই, তাহারই নিঃসন্দিগ্ধ স্পর্শ লাভ করি তাঁহার জীবনভিত্তিক বিভিন্ন প্রবন্ধেও। এই সকল প্রবন্ধের ভিতর দিয়া আমরা তরুণ বলেন্দ্রনাথের মধ্যে একটি উদারদৃষ্টিসম্পন্ন প্রৌঢ় ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব অনুভব করি।

সমকালীন বাঙলাদেশে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অধিকারসাম্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল, বলেন্দ্রনাথ তাহাকে তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিচার করিয়াছেন। তাঁহার 'স্ত্রী ও পুরুষ' প্রবন্ধটি স্ত্রী-পুরুষের অধিকার

ও ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার মতে, '...স্ত্রী এবং পুরুষের কতকগুলি অধিকার, কতকগুলি ক্ষমতা যেমন সাধারণ, সেইরূপ কতকগুলি আবার স্বতন্ত্র। পুরুষ অথবা স্ত্রী, কেহই একেবারে সকল বিষয়ে বঞ্চিত নহে। পুরুষ জাতির অনেক গুণ আছে, যাহা স্ত্রীজাতির মধ্যে সহজে মিলে না; স্ত্রীজাতিরও এমন গুণ আছে, যাহা পুরুষজাতির মধ্যে দুর্লভ।' হৃদয়বৃত্তিতে তিনি স্ত্রীজাতিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, আর শারীরিক বল ও মানসিক শক্তিতে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতিগত ভেদটি বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছে। এই প্রকৃতিগত ভেদের ফলে স্ত্রী-পুরুষের অধিকারক্ষেত্রেরও একটা মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। '...বাহিরের সহিত সংগ্রাম-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুরুষই পারদর্শী। নারীজাতির কার্য্যক্ষেত্র গৃহ।' অতএব সংসারযাত্রা-নির্বাহের পক্ষে উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে—কেহ কাহারও অপেক্ষা ছোট নহে। বলেন্দ্রনাথের মতে, 'স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পরকে সম্মান করে—একের অভাব অন্যে পূর্ণ করে বলিয়া।' স্ত্রী-পুরুষের ভিতর এইরূপ পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভাব আছে বলিয়াই বলেন্দ্রনাথ বলিতে চাহেন যে, স্ত্রীকে কোনমতেই পুরুষের দাসী বলা সংগত হইবে না—পুরুষের উপর স্ত্রীর যে নির্ভরতা, তাহা কেবল প্রেমের নির্ভরতা মাত্র। উনিশ শতকের বাঙলার অন্যান্য নারী-মুক্তিকামীদের ন্যায় বলেন্দ্রনাথও স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারও অভিমত: 'শিক্ষার সহিত স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দিলে অশুভ ফল দেখা যায় না।' নব্যবঙ্গের অপরাপর শিক্ষিত বাঙালীর মতোই বলেন্দ্রনাথও নারী-পুরুষকে সমান মর্যাদা দিয়াছেন—প্রভেদ এই যে, নারী ও পুরুষকে তিনি আপন আপন স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে স্থাপন করিয়া সমাজে একটা সুষ্ঠু শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার কথা বলিয়াছেন।

কেবল নারী-পুরুষ নয়, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কেও বলেন্দ্রনাথ সমান শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছেন। তাঁহার রচনায় মুসলমান-সম্প্রদায়ের প্রতি যে-সকল সহৃদয়তাপূর্ণ মন্তব্য পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার এইরূপ উদার মনোভাব পরিস্ফুট। ভারতবর্ষীয় হিন্দু মুসলমান অনেকেরই মনে বহুকাল হইতে একটা পারস্পরিক বিদ্বেষভাব বর্তমান। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রধান অভিযোগ—মুসলমানগণ পরধর্মদ্বেষী। কিন্তু বলেন্দ্রনাথ তাঁহার 'মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ'-শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্র কাহারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করে না—যে-সকল মুসলমান তাঁহাদের

আচার-আচরণে অপর ধর্মের লোকদের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখান, তাঁহারা শাস্ত্র-বাণীকে অগ্রাহ্য করিয়াই তাহা করেন। বলেন্দ্রনাথ তাঁহার এই অভিমতের সমর্থনে চিরাঘ আলি নামে হায়দ্রাবাদের এক মৌলবীর শাস্ত্রব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। 'কোরাণ' এবং অন্যান্য নানা গ্রন্থ হইতে বিবিধ বচন উদ্ধৃত করিয়া চিরাব আলি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, '…গোঁড়ামি এবং বিদ্বেষ বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অঙ্গ নহে, নির্ব্বোধ দাম্ভিকদিগের প্রভুত্বে শাস্ত্র লজ্জিত হইয়া এই সকল ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।' মৌলবী সাহেবের উক্তিতে জানা যায়: 'কোরাণে নাকি পরধর্ম্মবিদ্বেষ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ, এবং কাফেররক্তে স্নান কোথাও পুণ্য বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই।' শুধু ইহাই নহে, মহম্মদের নিজের জীবনেই পরধর্মসহিষ্ণুতার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

কোরাণ ও পয়গম্বর প্রত্যেক মুসলমানেরই নিকট পরম শ্রদ্ধাভাজন। বলেন্দ্রনাথ কোরাণের বিধান উল্লেখ করিয়া এবং পয়গম্বরের উপদেশ ও আচরণের কথা বলিয়া একদিকে যেমন হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমানদের ভুল ভাঙিতে চাহিয়াছেন, অপরদিকে তেমনই হিন্দুদের মন হইতে অযথা মুসলমান-বিদ্বেষ দূর করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। পারস্পরিক সহনশীলতার ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হউক—ইহাই বলেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য।

ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠিয়া মানুষের প্রতি প্রেম-প্রীতির বিস্তার একটি বড় আদর্শ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের জীবনাদর্শ ইহা হইতেও মহত্তর। 'পশু-পক্ষী, এমন কি, জড়-প্রকৃতির সহিতও ভারতবর্ষ আপনার হৃদয়ের সংযোগ অনুভব করে এবং তাহাদের প্রতি হৃদয়ের কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে।' 'পশুপ্রীতি' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের এই উক্তিটি কেবল যে ভারতীয় জীবনদর্শনের একটি মর্মসত্য প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে, এই উক্তির আলোকে আমরা বলেন্দ্রনাথের ভারতীয় মনের সর্বব্যাপী গভীর স্নেহ এবং সহানুভূতিরও কতকটা আভাস পাইয়া থাকি। ভারতবর্ষের চিরন্তন প্রেম ও প্রীতির ঐতিহ্যকে আস্বাদন করিবার মতো একটি বিশেষ সংবেদনশীল হৃদয় ছিল বলেন্দ্রনাথের। সেই হৃদয় লইয়াই তিনি প্রাচীন ভারতের কাব্য, কাহিনী ও ধর্মনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। ইহারই ফলে তিনি 'কাদম্বরী'র শিকার-বর্ণনায় শুনিতে পাইয়াছেন '…বাণভট্টের অন্তর হইতে বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায়, পাশবদ্ধ পক্ষিশাবকের ন্যায় একটি করুণ আর্ত্তনাদ…।' ইহারই ফলে আবার 'রঘুবংশ'-এর নবম সর্গে রাজা দশরথের মৃগয়া-সমারোহে লক্ষ্য করিয়াছেন, কেমন

করিয়া '…স্বগয়ামত্ততার মধ্যেও মানবহৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সকরুণ স্নেহ ক্ষরিত হইতে থাকে।' পশুজগতের প্রতি এইরূপ স্নেহশীলতা কালিদাসের রচনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বলেন্দ্রনাথ যেন সমগ্র হৃদয় দিয়া কবিকুলরাজের সেই স্নেহশীলতার স্পর্শ লাভ করিয়াছেন। এইজন্যই দেখিতে পাই, শকুন্তলার বিদায়দৃশ্যে পশুজগতের প্রতি কালিদাস যে সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, বলেন্দ্রনথের চিত্তে তাহা বিশেষভাবে দোলা দিয়াছে। ইহা ছাড়া ভবভূতির 'উত্তরচরিত'-এর তৃতীয় অঙ্কে সীতার পালিত করিশিশু ও ময়ুর-বর্ণনায় পশুদের প্রতি যে অনুরাগ অভিব্যক্ত, তাহাও বলেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। মোট কথা, জীবজগতের প্রতি প্রাচীন ভারতীয় কবিদের 'উদার সহানুভূতি' আবিষ্কার করা বলেন্দ্রনাথের সংস্কৃত কাব্যপাঠের অন্যতম ফল।

ভারতবর্ষের আদিকবির রচিত প্রথম শ্লোকটির প্রেরণামূলে যে বিষাদময় কাহিনীটি আছে, তাহাতেও এদেশের চিরন্তন প্রকৃতিগত জীবপ্রীতি অভিব্যক্ত। নিষ্ঠুর ব্যাধের শরে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটি নিহত হইলে মহর্ষি বাল্মীকি ব্যাধকে অভিশপ্ত করেন।[২৬] বলেন্দ্রনাথ মহর্ষির সেই অভিশাপবাণীর তাৎপর্য-বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে বলিতেছেন: '…ইহার মধ্যে বড় একটি গভীর কথা আছে।—দুর্ব্বলের প্রতি স্নেহ, অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি পৃথিবীতে বড় কম; কিন্তু যেখানে ইহা দেখা যায়, সেখানে মর্ত্ত্য স্বর্গ হইয়া উঠে, সেখান হইতে কুৎসিত অত্যাচার চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত হয় এবং সেখানে বৃহৎ মনুষ্যত্ব সমস্ত বিশ্বকে আপন বক্ষনীড়ে টানিয়া আনিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে।'

বিশ্বালিঙ্গী বৃহৎ মনুষ্যত্বের প্রতি বলেন্দ্রনাথের এই-যে অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ, ইহারই দর্পণে তাঁহার সর্বজীবে প্রসারিত হৃদয়ের একটি ছবি বেশ স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়, এবং ইহাই যে প্রকৃত সাম্যবোধের উৎসভূমি তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

## নাটক

নাটক বাস্তব জীবনের প্রতিরূপ। বাঙলা নাট্যসাহিত্যও ইহার ব্যতিক্রম নহে। বাঙালীর সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি বহন করিয়াই বাঙলা নাটকের অগ্রগতি। বাঙলাসাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় নাটক তেমন উৎকর্ষ লাভ করে নাই সত্য, কিন্তু ইহাতেও যে বাঙালীর জীবনযাত্রা ও মনোধর্মের স্পষ্ট ছাপ লক্ষিত হয় তাহা অস্বীকার করা চলে না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রধানতঃ সংস্কৃত নাটকের এবং কখনও কখনও শেক্‌সপীয়ারের ইংরাজী নাটকের অনুবাদে বাঙলা নাটক রচিত হইলেও ক্রমে ক্রমে ইহা মৌলিক সৃষ্টির পথ ধরিল। আর তখন হইতেই বাঙালী সমাজের সমসাময়িক ভাববিপ্লবের তরঙ্গোচ্ছ্বাস বাঙলা নাটকের প্রাণভূমিকে পরিপ্লাবিত করিতে লাগিল। বাঙালীর এই ভাববিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল মধ্য-যুগের প্রাচীর-বেষ্টিত সংকীর্ণ সমাজগৃহটির সংস্কার সাধন করিয়া উহাকে সাম্য ও মানবতার উদার প্রান্তরে প্রতিষ্ঠিত করা। আবার এই সময়ে ইংরাজ শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে বাঙালীর জাতীয় জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার গ্রন্থিমোচনের জন্যও বাঙালীর হস্ত বিশেষভাবে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙালীর এই মুক্তিকামনাকে যাঁহারা কেবল ইংরাজী শিক্ষার ফল বলিয়া ধরিয়া লন, তাঁহারা বাঙলার জাতীয় জীবনের অন্তর্দেশে যে একটি চিরন্তন বন্ধন-অসহিষ্ণুতার ভাব রহিয়াছে তাহার খোঁজ রাখেন না। বাঙলা নাটকের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার সূচনাপর্বে বাঙালীর এই নিজস্ব মুক্তিস্পৃহাই বাঙলার সমাজজীবনকে বন্ধনমুক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বাঙলীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিপরীতমুখী স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে—যখন চিরলাঞ্ছিতা নারীজাতিকে পুরুষের পাশে সমমর্যাদায় বরণ করিয়া লইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে—সামাজিক সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে আঘাত হানিবার আয়োজন ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে—ইংরাজের স্বার্থপর বণিগ্‌বৃত্তির নাগপাশ ছিন্ন করিবার অভিলাষ যখন এটা ওটা করিয়া অবশেষে নীল-বিদ্রোহের রক্তরাঙা পথ ধরিয়াছে, বাঙালী নাট্যকারগণ তখন প্রথমে ঘরের ফুলে এবং পরে সেই ঘরের ফুলের সহিত বিদেশী ফুল মিশাইয়া বাণী-বন্দনার পশরা সাজাইয়া চলিয়াছেন। ইহার ফলে একদিকে যেমন বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহু-বিবাহ ও সপত্নী-সমস্যা লইয়া বিভিন্ন নাটক আত্মপ্রকাশ করিল, অপরদিকে তেমনই নীলকর সাহেবদের ঘৃণ্য অত্যাচারকাহিনী নাট্যবদ্ধ হইয়া জনচিত্তে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করিল। সর্বত্রই লক্ষ্য হইল নর-নারী, শাসক-শাসিত এবং প্রবল ও দুর্বলের ভেদ ঘুচাইয়া মানুষকে তাহার স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। বাঙলা নাটকের সূচনাপর্ব হইতেই এই সাম্য-স্থাপনের সুর শ্রুত হয়।

বাঙালীর প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবন আশ্রয় করিয়া প্রথম নাটক রচিত হয়

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। রচয়িতা— রামনারায়ণ [ শর্ম্মা ] তর্করত্ন, নাটকখানি— 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'। এই নাটকের 'বিজ্ঞাপন' অংশে আছে: 'ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে, কৃত্রিম কৌলীন্যপ্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে।' বস্তুতঃ বল্লাল সেন-প্রবর্তিত বিভেদমূলক কৌলীন্যপ্রথায় বাঙলার হিন্দুসমাজ একসময় বিশেষভাবেই দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রথায় একই বর্ণের মধ্যেও কৃত্রিম ভেদরেখা টানিয়া দেওয়া হইত এবং তাহার অনিবার্য কুফল ভোগ করিতে হইত নিরপরাধা কুলীন-কন্যাদের। কৌলীন্যাভিমানী পিতা কুলীন বরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া কুলক্রিয়া রক্ষা করার আনন্দে পাত্রাপাত্রও বিচার করিতেন না। পুরুষের ন্যায় নারীরও যে হৃদয় বলিয়া একটি বস্তু আছে, তাহা সম্পূর্ণভাবেই অস্বীকৃত হইত। 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকে নাট্যকার কুলীন-রমণীদের এইরূপ লাঞ্ছিত জীবনের রূপরেখা অঙ্কিত করিয়া কৌলীন্যপ্রথার বিষময় পরিণামের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করিয়াছেন। নাটকটিতে বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর বংশধর কুলীন ব্রাহ্মণ কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারিটি কন্যার বিবাহব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। কুলপালকের কথায় জানিতে পারা যায় তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহ্নবীর '৩২।৩৩ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই', মধ্যমা কন্যা শাম্ভবীর বয়স ২৬ কি ২৭ ; তৃতীয়া কন্যা কামিনী ১৪।১৫ বৎসরের, আর কনিষ্ঠা কন্যা কিশোরী মাত্র ৮ বৎসরের শিশু। ইহাদিগকে কুলীন বরে সম্প্রদান করিবার দুশ্চিন্তা লইয়া কুলপালক দিন কাটাইতেছেন। অবশেষে ঘটকচূড়ামণি অনৃতাচার্যের কৃপায় একটি যথার্থ কুলীন পাত্র পাওয়া গেল—'বিষ্ণুঠাকুরের বংশোৎপন্ন, পরম পবিত্র পাত্র, ফুলের মুখটী।' কিন্তু বয়সের হিসাবে পাত্রের পাত্রত্ব অপেক্ষা পিতৃত্বই মানায় ভালো। ঘটকের নিজের কথায়ই জানা যায়: 'বরের কিঞ্চিৎ বয়োধিক্য, আর এমন অধিক বয়সই বা কি ? সেই ষষ্ঠীর বৎস এই ষষ্ঠীবৎসরে পদার্পণ করিয়াছে।' কৌলীন্য-রক্ষার তাগিদে কুলপালক তাঁহার চারিটি কন্যাকেই এই পিতৃপ্রতিম পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কৌলীন্যের যূপকাষ্ঠে চারিটি নারী-হৃদয়কে বলি দেওয়া হইল।

এই বিবাহ উপলক্ষে রামনারায়ণ কয়েকজন কুলীন-কামিনীকে একত্র সমবেত করাইয়াছেন এবং তাহাদের কথোপকথনের ভিতর দিয়া কৌলীন্য-পীড়িত নারীজীবনের একটি নিখুঁত চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন।

কুলপালকের কন্যাদের বর লক্ষ্য করিয়া চপলা নামে এক রমণী 'সবিষাদে' বলিতেছে :

'আহা মরি আই আই সখি একি শুন্তে পাই,
বর নাকি বায়াত্তুরে বুড়ো।
কপাল নিতান্ত পোড়া, কোথা থেকে এলো মড়া,
ঘটাইল ঘটক আঁটকুড়ো॥'

কিন্তু ইহার বিপরীত চিত্রও সমাজে দুর্লভ ছিল না। কৌলীন্যরক্ষার দায়ে কখনও কখনও নিতান্ত অপগণ্ড শিশু-বরের হস্তেও বর্ষীয়সী কুমারী কন্যাকে সমর্পণ করা হইত। কুলীন-কামিনী সুলোচনার অদৃষ্টে এইরূপ বিড়ম্বনাই ঘটিয়াছিল। চপলার মুখে কুলপালক-কন্যাদের বৃদ্ধ বরের কথা শুনিয়া সুলোচনা নিজ দুঃখের কথা জানাইতেছে :

'কি জানিবি ওলো ধনি ! এ বর মাথার মণি,
মোর পতি দেখে বুক ফাটে।
বয়স খতালে পর, নাতি ভেবে এসে জ্বর,
কোলশোভা হয়ে রাত কাটে॥'

সেযুগে কুলীনবরে কন্যা-সম্প্রদানের এমন একটা অনুপেক্ষণীয় সামাজিক আবশ্যকতা বোধ হইত যে, ঈপ্সিত পাত্রের অভাবে অনেক কুলীন-কন্যার সারাজীবন বিবাহই হইত না। 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের যমুনা এমনই একটি ভাগ্যবিড়ম্বিতা কুলীনকন্যা। তাহার ব্যর্থ জীবনের মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস তাহার উক্তিটিকে বড় করুণ করিয়া তুলিয়াছে :

'আমি কি বলিব বাণী, প্রচীনা সভার মানী,
অভিমানী কথায় কথায়।
বয়স হইল ষাট, বিবাহের নাই পাট,
আছে কাট শেষের উপায়॥'

কৌলীন্যপ্রথার নিষ্ঠুরতম পরিচয় সেইখানেই, যেখানে কেবল অন্ধভাবে কুলমর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত কৌলীন্য-সমৃদ্ধ মুমূর্ষু বৃদ্ধের হস্তেও কন্যা-সম্প্রদানে কোনো সংকোচ দেখা যাইত না। কুলীন-রমণী যশোদা তাহার আত্মদুঃখ বর্ণনার ছলে এই হৃদয়হীন রীতির একটি মর্মবিদারী দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছে :

'ভগিনী আমার ছয়, আমারে নে সাত হয়,
সবার বিবাহ এক দিনে।
কি কব বরের কথা, মনে হলে মর্ম্ম-ব্যথা,
এই হেতু কহিতে পারিনে॥
তার বয়সের সম পাহাড় পর্ব্বত কম,
আছে কি না ভুবন ভিতরে।
উহার চরম-কালে, বন্ধুরা না ফেলে খালে,
গঙ্গাতীরে আনিল সত্বরে॥
পাইয়া সুযোগ্য ঘর, বরি মোরা সেই বর,
অতঃপর সে পায় পঞ্চত্ব।
তখনি বৈধব্য-দশা, প্রাপ্ত হই সপ্তস্বসা,
কিবা কব কুলের মহত্ত্ব॥'

কৌলীন্যপ্রথার কুফল দেখাইবার জন্যই রামনারায়ণের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটক রচিত হইয়াছিল। এই নাটকটি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, নারীজাতির প্রতি রামনারায়ণের হৃদয়ে একটা বিশেষ সহানুভূতি ছিল। এই সহানুভূতিই তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তৎকাল-প্রচলিত বহুবিবাহপ্রথা উৎসাদনের উদ্দেশ্যে 'নব-নাটক' নামে অপর একখানি নাটক রচনা করিতে। এই নাটকখানির পুরা নাম—'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক' ( ১৮৬৬ খ্রীঃ )। এই নাটকে গ্রাম্য জমিদার গবেশ বাবুর কাহিনী উপলক্ষ্য করিয়া বহুবিবাহের করুণ পরিণতি চিত্রিত হইয়াছে। গবেশবাবুর প্রথমা স্ত্রী সাবিত্রী; তাঁহার দুই পুত্র—সুবোধ ও সুশীল। পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াও গবেশবাবু তাঁহার প্রথমা স্ত্রী বর্তমানেই চন্দ্রলেখা নামে এক বালিকাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেন। তারপর আরম্ভ হইল সতীন-নির্যাতনের পালা। চন্দ্রলেখার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া সাবিত্রী শেষ পর্যন্ত উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিল। গবেশবাবুও দুশ্চিন্তা ও অশান্তিতে স্বাস্থ্য হারাইয়া অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন। সুবোধ বিদেশে ছিল; বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাতা-পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অতিশয় কাতর হইয়া পড়িল এবং সেই শোকেই তাহার মৃত্যু হইল। এইভাবে মৃত্যুর পর মৃত্যু ঘটিয়া একটি সংসারকে একেবারে তছনছ করিয়া ফেলিল। বহুবিবাহের পরিণতি যে কতদূর ভয়াবহ হইতে পারে, তাহার একটি সাক্ষ্য হইয়া রহিল এই সর্বনাশা কাহিনীটি।

এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া নাটকের উপসংহারে নাট্যকার স্থত্রধারের জবানীতে বহুবিবাহপ্রথা রহিত করিবার আবেদন জানাইয়াছেন : '...সভ্য মহোদয়বর্গ ! আপনারা গুণগ্রাহী, এই নাটকখানি দেখ্‌লেন, অভিনয়ে গবেশবাবুর তুরবস্থা সকলেই স্বচক্ষে নিরীক্ষণ কর্‌লেন, আর কি আপনারা বহুবিবাহ প্রথায় অনুমোদন কর্‌বেন ? ও তুষ্প্রথা আর রাখ্‌তে চাবেন ? যাতে ঐ নানা দোষাকর ঘৃণিত তুষ্প্রথা দেশ হতে দূরীভূত হয় তদ্বিষয়ে আপনারা কি কিছু যত্ন কর্‌বেন না ? যদি করেন্‌, আমরা কৃতার্থ হই, গ্রন্থকর্ত্তা কৃতার্থ হন, এবং যে সকল মহোদয়ের উদ্যোগে এই নাটক প্রস্তুত হয়ে অভিনীত হলো তারাও কৃতার্থ হন।'

রামনারায়ণের সমকালে ১৮৫৮ সালে কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ লইয়া অপর একখানি নাটক প্রকাশিত হয়। নাটকখানির নাম—'সপত্নী-নাটক'। নাট্যকার—তারকচন্দ্র চূড়ামণি। নাটকের প্রথম অঙ্কেই তিন ভগিনীর কথোপকথনের ভিতর দিয়া কৌলীন্যপ্রথা ও তাহার প্রবর্তক রাজা বল্লাল সেনের প্রতি সেকালের ভাগ্যবিড়ম্বিতা কুলীন-কন্যাদের তীব্র বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। এই কথোপকথনের অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

'নিতম্বিনী। আজ সকালটা কেবল বাপের বাড়ী দাসীপানা কত্তে কত্তেই মারা গেলাম !...

দিদি ( কাদম্বিনী )। ...জানিস্‌ তো ভাই ! সবাইকেরি তো এই এক দশা। পোড়া বল্লম্‌, মর্‌, কি বলে গা, বল্লেন, না, দূর হোক্‌, ( ক্ষণেক চিন্তা করিয়া ) না ভাই ! নামটা ভাল মনে হচ্ছে না, ঐ যে পুরুষগুলো কি বলে, কি একটা সেন পুব্যে বাঙাল থলীধরা মর্‌ ! সে আবার রাজা হয়েছিল। ঐ বোম্বীটা না মর্‌বে, আমাদের না এ যন্ত্রণা হবে, বল্‌বো কি বোন ! যেন টাঁড় বকনের মতন ঘুর্যে ঘুর্যে মরে গেলাম ! মেয়্যে মানুষের প্রাণে কি এত সয় গা।

...পোড়া রাজারও কি কখন এমন হুকুম বের্‌ হয় গা ! যে একটা পুরুষের পঞ্চাশটা, ষাটটা, একশটা মাগ, আর কেউ কোপ্নী আর আপ্‌নি, লোটা আর সোটা নিয়্যে ঘুর্যে ঘুর্যে মরুক ! এমন পোড়া রাজার মাথায় বজ্রাঘাত পড়ুক, মর্‌, হাসিও পায় দুঃখও ধরে।'

কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ-রীতির নিষ্ঠুর পীড়নে বাঙলার কুলকামিনীগণের মর্মজ্বালা এখানে স্পষ্ট আভাসিত।

বহুবিবাহ-রীতির অবশ্যম্ভাবী ফল সপত্নী-সমস্যা। 'সপত্নী-নাটক'-এ এই

সমস্যার করুণতম পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে। নাটকের নায়ক-নায়িকা ভূধর ও সৌদামিনী। প্রথম অঙ্কে উভয়ের কথোপকথনে দাম্পত্য-প্রেমের অনবদ্য চিত্র পরিস্ফুট। কিন্তু তৃতীয় অঙ্কে বা শেষ অঙ্কে দেখিতে পাই, ভূধর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করায় সৌদামিনীর সপত্নী-বিধ্বস্ত জীবনে নামিয়া আসিয়াছে নিদারুণ হাহাকার। সৌদামিনী বিলাপ করিতেছে: 'হা! আমার মত হতভাগ্য রমণী ত্রিজগতে নাই! স্বামী দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। সপত্নী-যন্ত্রণাই আমার জীবনের প্রধান উপভোগ হইল।'

বাঙলার ঘরে ঘরে কত সৌদামিনী যে এইরূপ সপত্নী-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া জীবন দুর্বিষহ মনে করিয়াছে, তাহার হিসাব কে রাখে!

মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) নাটকে সপত্নী-ঈর্ষাতুরা দেবযানীর উক্তিতেও যেন বাঙলার কুলনারীর সপত্নী-যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। রাজা যযাতি প্রথমা মহিষী দেবযানী বর্তমানেই শর্মিষ্ঠার রূপলাবণ্যে ভুলিয়া তাহাকে বিবাহ করেন। অভিমানিনী দেবযানী রোষে ক্ষোভে যযাতির রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আসেন। পথিমধ্যে সখী পূর্ণিকার সহিত কথোপকথনে তাঁহার নিদারুণ মর্মবেদনা প্রকাশিত। পূর্ণিকাকে দেবযানী বলিতেছেন: 'সখি, তুমি কি আমাকে ঐ পাপ নগরীতে ফিরে যেতে এখনও পরামর্শ দাও? এমন নরাধম, পাষণ্ড, পাপী, কৃতঘ্ন পুরুষের মুখ কি আমার আর দেখা উচিত? সে দুরাচার তার প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠাকে লয়ে সুখে রাজ্যভোগ করুক, সে শর্ম্মিষ্ঠাকে রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা করে তাকে লয়ে পরমসুখে কালযাপন করুক! তার সঙ্গে আমার আর কি সম্পর্ক?...আহা! আমার কি কুলগ্নেই সেই দুরাচার, দুঃশীল, দুষ্ট পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল!...হায় রে বিধি! তোর কি এই উচিত? আমি এ দুরাচারের প্রতি অনুরক্ত হয়ে কি দুষ্কর্ম্মই করেছি। এমন পতি থাকা না থাকা দুই তুল্য; তা যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল পেলেম।'

সপত্নীতে অনুরক্ত পতির প্রতি দেবযানীর এই রূঢ় মনোভাব সপত্নী-পীড়িত বহু নারীরই হৃদয়সত্য। এইজন্যই বাঙালী নারীরা স্বামীকে সতীনের হাতে না দিয়া যমকে দেওয়াও অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছে।

সপত্নী-সমস্যার সরসতম বর্ণনা লক্ষ্য করি দীনবন্ধু-রচিত 'জামাই বারিক' (১৮৭২) নাটকে। নাটকটির দ্বিতীয় অঙ্কে পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী বগলা ও বিন্দুবাসিনীর কলহ প্রচুর হাস্যরস উদ্রেক করিলেও সেকালের সপত্নী-সমস্যার একটি বাস্তব চিত্র তুলিয়া ধরে। বেচারা পদ্মলোচন এই সমস্যার প্রধান বলি।

উভয় স্ত্রীর ঈর্ষা ও কলহের মধ্যে পড়িয়া তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত। নিরন্তর স্ত্রীহস্তে নির্যাতিত হইয়া দাম্পত্য-মিলনের এক বেদনাবিদ্ধ জীবন তাহার সম্বল হইয়া উঠিয়াছে। প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়েও তাহাকে দুই স্ত্রীর সমানভাবে মন যোগাইয়া চলিতে হয়। তাহার এই অসহায় অবস্থার আভাস পাওয়া যায় বন্ধু অভয়কুমারের সহিত তাহার কথোপকথনের একটি অংশে :

'অভ। কি দাদা হরগৌরী হয়ে বসে রয়েছ যে—অর্দ্ধেক অঙ্গে তেল দিয়েছ, অর্দ্ধেক অঙ্গ রুক্ষ রেখেছ।

পদ্ম। আমার পক্ষাঘাত হয়েছে—দুই সতীনে শরীরটে ভাগ করে নিয়েছে ; ডান দিক্‌টে বড় আবাগীর, বাঁ দিক্‌টে ছোট আবাগীর। ছোট আবাগী এতক্ষণ তেল মাকাচ্চিল ; চুলচেরা ভাগ, বাঁ অঙ্গে মাখ্‌য়েছে ডান অঙ্গ পড়ে রয়েছে—দেখ না ডান দিকে তেলের দাগটি লাগে নি; বড় আবাগী আসে, ডান দিকে তেল পড়বে, নইলে এইরূপেই বসে থাক্‌তে হবে।

অভ। আপনি কেন ডান দিকে তেল দিয়ে নেয়ে ফেলুন না, বেলা তো অনেক হয়েছে।

পদ্ম। তা হলে কি আর আস্ত থাক্‌বো! বড় আবাগী দুদ্দাড় করে কিল মার্‌বে, কেঁদে বাড়ী মাথায় করবে, ঝাঁটা ফির্‌য়ে ঘাড় ভাঙ্গবে—বলবে আমাকে একটু ভালবাস না, আমার অঙ্গটা আমার জন্যে রাখলে না, আপনি তেল দিলে।'

এমনই করিয়া দুই স্ত্রীর ভাগ-বাঁটার টানাটানিতে পদ্মলোচনকে নাস্তানাবুদ হইতে হয়। ইহার উপর আবার দুই সতীনের প্রাণান্তকর কলহ তো আছেই। সপত্নী-সমস্যা যে জীবনকে কিরূপ অসহ করিয়া তোলে, কয়েকটি হাস্যোজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া দীনবন্ধু তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন।

সপত্নী-সমস্যার ন্যায় বাল্যবিবাহও একসময় এদেশের নারীসমাজে একটি বড় সমস্যা হইয়া উঠিয়াছিল। আট বছরে গৌরীদান করিয়া পুণ্যার্জনের লোভে পিতামাতা তাহাদের বালিকা-কন্যাকে বৃদ্ধ বরের হাতে তুলিয়া দিতেও সংকুচিত হইতেন না। ইহাতে বিবাহের যে মূল লক্ষ্য দাম্পত্য-প্রণয়, তাহাই উপেক্ষিত হইত। 'সপত্নী-নাটক'-এ এই নিষ্ঠুর দেশাচারকে লক্ষ্য করিয়া ভুবনেশ্বর নামে এক ব্যক্তি আক্ষেপ করিতেছেন :

'বাল্যকালে দিস্‌ বিয়া পরস্পর ভিন্ন হিয়া,
বর কন্যা মিলন না হয়।

তাহাতেই বংশ নাশ, ধন নাশ ধর্ম্মনাশ,
সর্ব্বনাশ শোকের উদয় ॥'

বস্তুতঃ বাল্যবিবাহের ফলে সামাজিক নানাপ্রকার দুঃখকষ্টের সূত্রপাত হইত। বৈধব্য তো ছিল বাল্যবিবাহের একান্ত সহচর। তাহা ছাড়া ইহা আবার স্ত্রীশিক্ষারও বিশেষ অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল কারণে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙলাদেশের শিক্ষিত সমাজে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন গড়িয়া উঠে। এই আন্দোলনের সমর্থনে কয়েকখানি নাটক রচিত হয়। এই সকল নাটকে বাল্যবিবাহের নানাপ্রকার দোষ দেখাইয়া উহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানানো হয়। নাটকগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল 'সম্বন্ধ-সমাধি নাটক'[২৭] (১৮৬৭)। ইহা ছাড়া আরও দুইখানি নাটকের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে—একখানি, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের 'বাল্যবিবাহ নাটক'[২৮]; অপরখানি, শ্যামাচরণ শ্রীমানীর 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' [ ১৮৬০ ]।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে যে-সকল সামাজিক আন্দোলন দেখা দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যকর আন্দোলন—বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন। এই শতাব্দীর পূর্বেও বাঙলাদেশে কাহারও কাহারও মনে বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল এবং সেই অনুসারে এই বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টাও চলিয়াছিল। কিন্তু প্রতিকূল সমাজের বিরোধিতায় সে-চেষ্টা স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তোলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সেই আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়। এই সময় হইতেই বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বিভিন্ন নাটক রচিত হইতে থাকে। যিনি এই বিষয়ে সর্বপ্রথম নাটক রচনা করেন, তাঁহার নাম উমেশচন্দ্র মিত্র। তাঁহার নাটকখানি 'বিধবাবিবাহ নাটক' ( ১৮৫৬ ) নামে পরিচিত। নানা কারণে ইহা বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এই নাটকে সুলোচনা নামে এক বালিকা-বিধবার করুণ পরিণতির চিত্র অঙ্কিত করিয়া নাট্যকার বিধবা-বিবাহের সপক্ষে জনমত জাগ্রত করিতে চাহিয়াছেন। কীর্তিরাম ঘোষের বিধবা কন্যার নাম সুলোচনা। নাপতিনী রসবতীর মধ্যস্থতায় প্রতিবেশী রামকান্ত বসুর পুত্র মন্মথর প্রতি সে আসক্ত হয়, এবং উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয়। ফলে সুলোচনা গর্ভবতী হয়। শেষে

সুলোচনা লোকলজ্জার ভয়ে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করে। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পীড়নে বাল্যবয়সে বিধবা হইলেও যে নারীর সমস্ত কামনা-বাসনার অবলুপ্তি ঘটে না, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য নাট্যকার সুলোচনা চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়াছেন। সুলোচনা যুবতী, যৌবনোচিত রঙ্গপ্রিয়তা ও চপলতা তাহার সমস্ত সত্তাকে কানায় কানায় ভরিয়া রাখিয়াছে—বৈধব্যের বজ্রহস্তও তাহা অবদমিত করিতে পারে নাই। দেশে তখন বিধবা-বিবাহের আন্দোলন চলিয়াছে, সুলোচনা তাহার খবর রাখে, এবং সেই খবর রাখে বলিয়াই তাহার গোপন অন্তরে নিজের বৈধব্যদশার বিরুদ্ধে একটা চাপা বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। গ্রামের অদ্বৈত দত্তের বিধবা কন্যা প্রসন্নের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইলে বর দেখিয়া সুলোচনা মনে মনে যে উক্তি করিয়াছে, তাহাতে তাহার এই বিদ্রোহী ভাবটির আভাস পরিস্ফুট। সেকালের নাটকে ব্যবহৃত স্বগত ভাষণে সুলোচনা বলিতেছে : 'আহা দিব্বি বরটী যে গা.…বরের অদৃষ্টটা ভাল, একেবারে রাঁধা ভাত পেলে। প্রসন্নের অদৃষ্টটাও ভাল বল্‌তে হবে, আমাদের মত চিরকালটা জ্বলে পুড়ে মর্‌তো —সর্ব্বনাশী একাদশীর ভার বইতো, সে সব দায় এড়ালো। আমাদের মত আলো চাল্ খেতে হবে না—চড়ুকির হাসির মত কেবল মুখে ধম্ম ধম্ম করে মর্‌তে হবে না।' [ ৩য় অঙ্ক ]। ইহার পর রসবতী নাপিতানীর সঙ্গে কথোপ-কথন প্রসঙ্গে সুলোচনা বিধবা-বিবাহের প্রতিকূল সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতেছে : '…পোড়া দেশে কতকগুলিন লোক না মলে আর কতকগুলিন না হলে, রাঁড়ের বিয়ে কি সর্ব্বত্রে চল্‌বে? এই একটা বিয়ে হচ্চে, দেখিস্ দেখি এর কত গোল হবে। এক কর্ত্তা বল্‌বেন, ওর বাড়ীতে ভাত খাওয়া হবে না, আর এক কর্ত্তা বল্‌বেন, এ বিয়ের পুরুত, বরযাত্রদের একঘরে করা উচিত। ভাই, এই সব বুড়ো বুড়ো কর্ত্তারা এক বার ভুলেও ভাবেন না, যে বিধবা হয়ে কত লোক কত কি কচ্চে। যারা কিছু না করে ধর্ম্ম পথে আছে, তাদের ক্লেশটাও তো ভাবতে হয়, তাদের বাঁচ্‌বার সাধ কি থাকে বল্ দেখি?' [ ৩য় অঙ্ক ]।

বস্তুতঃ নাট্যকার তাঁহার নাটকে সমাজের 'বুড়ো বুড়ো কর্ত্তা'দের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে সুলোচনার এই উক্তিরই সত্যতা প্রমাণিত হয়। তৃতীয় অঙ্কে 'অদ্বৈত দত্তের বাটী'তে রামদেব তর্কালংকার ও হরিহর-প্রমুখ ভট্টাচার্যদের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে বিধবা-বিবাহের বিরোধী মনোভাব স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত। বিবাহবিষয়ে স্ত্রীপুরুষের অধিকারভেদ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া যুক্তি দেখানো হইতেছে : 'যেমন এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা

যায়, সেই রূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করতে পারে, যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না, সেই রূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করতে পারে না।' [ ৩য় অঙ্ক ]।

গ্রাম্য সমাজপতিদের এইসকল উক্তিতে যে হৃদয়হীন রক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, সুলোচনার পিতা কীর্ত্তিরাম ঘোষও ছিলেন তাহার একজন বড় সমর্থক। আত্মঘাতিনী অনুতপ্তা কন্যার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়াইয়াও তিনি কন্যাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন : 'পাপীয়সী ! এদেশে কি আর বিধবা নাই, তুমিই যাবজ্জীবন ক্লেশ পেয়েছ, আর কেহ কি ক্লেশ পায় নাই ? সকলেই কি তোমার মত পাপ পঙ্কে নিমগ্না হয়েছে ?' [ ৪র্থ অঙ্ক ]।

সুলোচনা ইহার উত্তর দিয়াছে। বলিয়াছে : 'পিতা ! সকলের কি সমান প্রবৃত্তি ? সকলের কি সমান সহ্য গুণ ? যাদের স্বাভাবিক সুপ্রকৃতি তারা ধর্ম্ম পথে আছে, যাদের মন আমার মত চঞ্চল তাদের এই রূপে দুর্ঘটনা ঘটেছে। হায় ! আমার যদি পতি আশ্রয় থাকতো, তা হলে কি আমি এরূপ কুকর্ম্মে রত হতেম ! তা হলে কি আমাকে আত্মঘাতিনী হতে হতো ! তা হলে তোমাকে কি কলঙ্ক—লোকলজ্জা ভোগ করতে হতো !' [ ঐ ]

সুলোচনার এই উক্তি একদিকে যেমন রক্তমাংসে গড়া বিধবা যুবতীর অপ্রতিরোধনীয় দেহবাসনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, অপরদিকে তেমনই বিধবাবিবাহের কর্তব্যতা সম্বন্ধেও ভাবাইয়া তোলে। ইহার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন সত্যটি রহিয়াছে, তাহার স্পর্শে শেষ পর্যন্ত কীর্ত্তিরামের পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া গিয়াছে।

সুলোচনাকে নাট্যকার সর্বকালের দেহবাসনাপীড়িত বিধবা যুবতীদের প্রতীকরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুলোচনার বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া প্রবীণ সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন : 'তাহার বৈধব্যজীবনের করুণ ছায়াতল দিয়া তাহার প্রাণপূর্ণ উল্লসিত জীবনের যৌবনরথ সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উদ্দাম বেগে ছুটিয়া গিয়াছে। তারপর গতির বেগে পিচ্ছল কর্দমাক্ত পথ হইতে সজোরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পথিপার্শ্বের কণ্টকশয্যা আশ্রয় করিয়াছে।'[২৯] হিন্দুসমাজের একান্ত রক্ষণশীল মনোভাবের ফলে এইভাবে কত বিধবার 'প্রাণপূর্ণ উল্লসিত জীবন' যে নিরুপায় হইয়া 'পিচ্ছল কর্দমাক্ত পথ' ধরিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত 'পথিপার্শ্বের কণ্টকশয্যা আশ্রয় করিয়াছে', তাহার ইয়ত্তা নাই। উমেশচন্দ্র যেন সেই সকল হতভাগিনীদের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ

করিয়া তৎকালীন বাঙলায় জনচিত্তের নিকট বিধবা-বিবাহের আবেদন লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

উমেশচন্দ্রের পরে বিধবাবিবাহ লইয়া অনেকেই অনেক নাটক রচনা করেন। এই সকল নাটকের মধ্যে সবগুলিই যে বিধবাবিবাহের সমর্থনে রচিত তাহা নহে, কিছু কিছু ইহার বিরুদ্ধেও রচিত হইয়াছিল। সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে এই নাটকগুলির মূল্য নগণ্য। কিন্তু এই একটি বিষয় লইয়া সেকালে যে নাট্য-রচনার ঝড বহিয়াছিল, তাহাতেই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে বিধবাবিবাহ হিন্দুসমাজের একটি বড় সমস্যা। ইহা লইয়া চিরদিনই মতভেদ রহিয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর ও তাঁহার অনুবর্তিগণ যেমন বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে আগ্রহী ছিলেন, রাধাকান্ত দেব-প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তেমনই ইহার প্রবল বিরোধিতা করিয়াছেন। বাল্যবিবাহ ও বহু-বিবাহের প্রতিরোধে জনচিত্তের যেমন সায় পাওয়া গিয়াছিল, বিধবাবিবাহে তেমন পাওয়া যায় নাই। এই জন্যই শতাধিক বৎসর পূর্বে বিধিবদ্ধ হইলেও বিধবাবিবাহ আজও পর্যন্ত বাঙালীর সমাজে বিশেষ প্রচলিত হয় নাই। না হউক, তথাপি বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের পশ্চাতে যে একটা উদার মানবিক অনুভূতি রহিয়াছে তাহাই বড় কথা।

কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বৈধব্য-পালনের সুকঠোর অনুশাসন—এসকলের ভিতর দিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া এদেশে নারীনিগ্রহ চলিয়া আসিতেছিল। পুরুষ-শাসিত সমাজে সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য অতি প্রবল-ভাবে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল। পুরুষ যথেচ্ছাচার করিত, কিন্তু নারীকে মানুষের স্বাভাবিক দাবি ও প্রবৃত্তিকে নিরন্তর অবদমিত করিয়া রাখিতে হইত। দীর্ঘকাল ধরিয়া নারী ও পুরুষে এইরূপ বৈষম্য চলিতে থাকায় সমাজের সুস্থ ও বিবেক-সম্পন্ন লোকের মনে আপনা হইতেই ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রতিবাদ জাগিয়া উঠে। ইংরাজী শিক্ষার ফলে তাহাই আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল মাত্র। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উনিশ শতকের নবযুগচেতনায় ইংরাজী-জানা ও ইংরাজী-না-জানা উভয় শ্রেণীর নাট্যকারই নারীপীড়ক প্রথাসমূহের উচ্ছেদ সাধনে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নবেলা হইতেই বাঙালী নাট্যকারদের লক্ষ্য ছিল সর্বপ্রকার বৈষম্যের উন্মূলন ঘটাইয়া সাম্য ও মানবতার ভিত্তিতে জাতীয় জীবন গড়িয়া তোলা। এইজন্য কেবল যে নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূর করিবার

ব্রতপালনেই তাঁহাদের লেখনী উদ্যত হইয়াছিল তাহা নহে, প্রবল ও দুর্বলের মধ্যে যে চিরন্তন বিরোধ ও অসাম্য, তাহার বিরুদ্ধেও তাহা বজ্রগম্ভীর প্রতিবাদ তুলিয়াছিল। এই প্রতিবাদের সার্থকতম প্রকাশ দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' [ ১৮৬০ ] নাটকে। এই নাটকের প্রথম সংস্করণে নাট্যকারের নামোল্লেখ না করিয়া তাহার পরিবর্তে লেখা ছিল: 'নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্।' ইহাতেই আভাসিত হইতেছে যে, প্রবল-প্রতাপ নীলকর সাহেবদের হস্তে নিপীড়িত দুর্বল দেশীয় প্রজাদের কথা লইয়াই নাটকখানি রচিত। দুইটি পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া এই নিপীড়নের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। একটি, সম্পন্ন গৃহস্থ গোলোকচন্দ্র বসুর পরিবার; অপরটি, ছাপোষা দরিদ্র রাইয়ত সাধুচরণের পরিবার।

নীলকর সাহেবের নীলের দাদন লইয়া গোলোক বসুর পরিবার সর্বস্বান্ত হইতে চলিয়াছে। গোলোক বসুর বড় ছেলে নবীনমাধব গিয়া সাহেবকে জানান: 'সাহেব, আমারদিগের লোকজন লাঙ্গল গোরু সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত রাখুন, কেবল আমারদিগের সম্বৎসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করি না।' [ ১।১ ]। কিন্তু সাহেবের কণ্ঠে উপহাসের সুর: 'তোমরা তো যবনের ভাত খাও না।' [ ঐ ]। অগত্যা অনশন সম্বল জানিয়াও সাহেবের ভয়ে ধানের জমিতে নীলের চাষ করার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। গোলোকচন্দ্রের ভাষায়: 'সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাযে কাযেই গত্তে হবে।' [ ঐ ]। কিন্তু নবীনমাধব ঠিক এতটা নতি স্বীকার করিতে রাজী হন না। তাঁহার 'ভ্যালা সাহস'। সাহেবের অন্যায় জুলুমের তিনি প্রতিবাদ করেন, কখনও বা সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতেও চান, আবার নীলকরদের অত্যাচার হইতে নিরীহ প্রজাদের রক্ষা করার জন্যও তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। ক্ষমতাগর্বী নীলকরগণ ইহা সহ্য করিবে কেন? তাহারা নবীনমাধবকে শায়েস্তা করিবার জন্য একটি মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া গোলোকচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করে। অপমানিত গোলোকচন্দ্র কারাগারেই উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। ইহার পর নীলকরদের নিকট সামান্য সৌজন্য ভিক্ষা করিতে গিয়া পিতৃশ্রাদ্ধের পূর্বেই নবীনমাধব গুরুতরভাবে আহত হন; সেই আঘাতেই পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। নবীনমাধবের মাতা সাবিত্রী পুত্রশোকে উন্মাদিনী হন। উন্মাদ-অবস্থায় তিনি কনিষ্ঠা পুত্রবধূ সরলতার গলায় পা দিয়া তাহাকে হত্যা করেন। পরে হঠাৎ তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে অনুশোচনার

গভীর আঘাতে তিনি নিজেও প্রাণত্যাগ করেন। এই ভাবে একটি সুখী ও সচ্ছল পরিবার নীলকরের অত্যাচারের ফলে একেবারে তছনছ হইয়া যায়।

সাধুচরণের পরিবারও নীলকরের নির্মম অত্যাচারে বিপর্যস্ত। নীলকরের আমিন আসিয়া এই পরিবারের প্রধান সম্বল একখানি ধানজমিকে নীলচাষের জন্য চিহ্নিত করিয়া যায়। সমগ্র পরিবারটির উপর ভাবী অনশনের ছায়া নামিয়া আসে। সাধুচরণের অশিক্ষিত ভ্রাতা রাইচরণের করুণ উক্তিতে এই বিপজ্জনক অবস্থাটি স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে: '···আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে। আহা জমি তো না, য্যান সোণার চাঁপা। এক কোন্ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম। খাব কি, ছ্যালেপিলে খাবে কি, এতডা পরিবার না খাতি পেয়ে মারা যাবে, ও মা! রাত পোয়ালি যে দু কাটা চালের খরচ, না খাতি পেয়ে মর্‌বো আরে পোড়া কপাল, আরে পোড়া কপাল, গোড়ার নীলি কল্লে কি?' [ ১।২ ]। কিন্তু ইহার জন্য প্রতিবাদ করা নিষ্ফল। নীলকরের লোকেরা সাধুচরণ ও রাইচরণকে জোর করিয়া কুঠিতে ধরিয়া লইয়া যায়। সেখানে চলে প্রচলিত প্রথায় উভয় ভ্রাতার উপর নীলকর উড সাহেবের অত্যাচারের রুদ্র লীলা। প্রচলিত প্রথায়ই চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে দুই ভাই সাহেবের নিকট 'দস্তুর মোতাবেক দাদন' দিয়া ছাড়া পায়। কিন্তু এইখানেই দুর্বৃত্ত নীলকরের অত্যাচারের পরিসমাপ্তি ঘটে না। কাঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গে কামিনীর উপরও তাহাদের নজর। ইহার ফলে সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণিকে সহ্য করিতে হয় ছোটসাহেব রোগের হস্তে নারীত্বের নির্মম লাঞ্ছনা। লাঞ্ছিতা ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকি হইয়া মৃত্যু ঘটে। প্রবলের সীমাহীন অত্যাচারের ফলে বাঙলার একটি নিরীহ চাষী পরিবারের বুকে হাহাকার জাগিয়া উঠে।

দুর্বলের উপর সবলের এই-যে অত্যাচার, ইহা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে না। 'সমাজের মধ্যে চিরদিনই সবল দুর্বলের উপর যে অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, তাহার ধারা যুগে যুগে নূতন নূতন রূপ নেয়।···বাংলার সমাজ-জীবনের সম্মুখে এই অত্যাচারী মধ্যযুগে মুসলমান রাষ্ট্র-শক্তির প্রতিনিধি কাজির রূপ ধারণ করিয়ায়াছে, উনবিংশ শতাব্দীতে তাহাই নীলকরের রূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে,···।[৩০] যুগ-নিরপেক্ষ এই অত্যাচারিগোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'নীলদর্পণ' নাটকে নিত্যকালের প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে। সবল ও দুর্বলের মধ্যে যে চিরন্তন বিরোধ ও বৈষম্য, তাহার

একটি কালোচিত রূপ চিত্রিত করিয়া নাট্যকার যেন মানুষের শুভবুদ্ধির নিকট সাম্য ও মানবতার আবেদন জানাইতেছেন।

অত্যাচারীর অত্যাচারের প্রতিবাদকল্পে 'নীলদর্পণ'-এর পরে আরও কয়েকখানি বাঙলা নাটক রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন-প্রণীত 'জমীদার দর্পণ' [ ১৮৭৩ ] নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে জমিদার-কর্তৃক প্রজাপীড়নের যে-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাৎকালিক জমিদারী শাসন ও শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা একান্ত বাস্তবানুগ। নাটকের 'প্রস্তাবনা' অংশে নটের প্রতি সূত্রধারের উক্তিতে সেকালের আয়াসপ্রিয় হীনস্বভাব জমিদারদের পরিচয় কতকটা উদ্‌ঘাটিত: 'আচ্ছা মফস্বলে এক রকম জানওয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ সহরেও বাস করে, সহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর! সহরে তাদের কেউ জানে যে এ জানওয়ার বড় শান্ত—বড় ধীর, বড় নম্র; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শ্যাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না! বলব কি, জানওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।...এ জানওয়ারদের চারখানা পাও নাই—লেজও নাই। এরা খাসা পোষাক পরে, দিব্যি সরু চেলের ভাত খায়। সাড়ে তিন হাত পুরু গদীতে বসে, খোসামোদে কুকুরেরাও গদীর আশে পাশে ল্যাজ গুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে। কিছুরই অভাব নাই, যা মনে হচ্ছে তাই কর্চ্ছে। বিনা পরিশ্রমে সচ্ছন্দে মনের সুখে কাল কাটাচ্ছে। জানওয়ারেরা অপমানভয়ে নিজে কোন কার্যই করে না। ভগবান তাদের হাত পা দিয়েছেন বটে. কিন্তু সে সকলি অকেজো। দিব্বি পা আছে অথচ হাঁটবার শক্তি নাই। দেখতে খাসা হাত, কিন্তু খাদ্য সামগ্রী হাতে করে মুখে তুলতেও কষ্ট হয়। কি করে? আহারের সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিয়ে দেয়।'

নাটকে উল্লিখিত হায়ওয়ান আলী এইরূপ একজন 'জানওয়ার'-সদৃশ জমিদার। তাঁহার চারিদিকে মোসাহেবের দল তাঁহাকে সর্ববিধ পাপকর্মে উৎসাহ দেয়। তাঁহার বেতনভোগী সর্দারগণ তাঁহার প্রজাপীড়নের প্রধান সহায়। প্রজার উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন তাঁহার বংশের চিরন্তন রীতি। তাঁহার গর্ব: 'এই হাতে কত কাণ্ড করেছি, কতজনের ও কর্ম্ম করেছি,... আমার বাপজী কুকুর দিয়ে মানুষ খাইয়েছেন। আর আমরাও কত কি করেছি,...'[২/৩]। এই গর্ব লইয়াই তিনি আপন খেয়ালখুশি অনুসারে প্রজাপীড়ন করিতে থাকেন। নিজের ঘৃণ্য কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য কুলবধূর সর্বনাশ

করিতেও তাঁহার কুণ্ঠা নাই। দরিদ্র প্রজা আবুমোল্লার স্ত্রী নুরুন্নেহারের উপর তাঁহার লালসাদৃষ্টি পতিত হয়। অসহায় নুরুন্নেহার জমিদারের পাশব লালসার শিকার হইয়া অসহ্য নির্যাতন ভোগ করে, এবং সেই নির্যাতনের ফলেই সে প্রাণ হারায়।

জমিদার-কবলিতা নুরুন্নেহারের ভীরু হৃদয়ে ব্যাকুল প্রশ্ন জাগিয়াছিল: 'জমিদার হয়ে এমন কাজ ক'ল্লে? ধর্ম্মের দিকে চাইলে না। এত কষ্ট কি আর এক প্রাণে সয়? হায় হায় এদের দমন-কর্ত্তা কি আর কেউ নেই? এদের উপরে কি আর হাকিম নেই?' [২।৩]। হাকিম যে না ছিল তাহা নহে, কিন্তু সেই হাকিমের বিচারও জমিদারগণ অর্থবলে ক্রয় করিয়া লইতেন। জমিদার হায়ওয়ান আলীও তাহাই করিলেন। অর্থবলে জুরির বিচারে 'Not guilty' হইয়া তিনি বেকসুর খালাস পাইলেন। পরদারলোভী যে নরপিশাচ নারীমর্যাদা পদদলিত করিয়া ও নারীহত্যা করিয়া উল্লাস করিয়াছে, বিচারকের পবিত্র আসন হইতে তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র অভিশাপ বর্ষিত হইল না, এবং তাহা হইল না কেবল সে জমিদার বলিয়া—বিত্তবলে বলীয়ান বলিয়া।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এইরূপ হৃদয়হীন প্রজাপীড়নই ছিল বাঙলার জমিদারসমাজের প্রকৃত স্বরূপ। 'জমীদার দর্পণ' নাটকে তাহাই নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে মানুষে মানুষে যে বৈষম্য ও বিরোধ সমুদ্যত থাকিয়া অত্যাচারের উৎস খুলিয়া দেয়, গ্রামবাঙলার ছোট একটি কাহিনীর ভিতর দিয়া নাট্যকার তাহারই রূপরেখা তুলিয়া ধরিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার নাটকে বিশেষ কালের প্রতিচ্ছবি থাকিলেও ইহার একটি সর্বকালিক আবেদন আছে। নাট্যকার যেন মনুষ্যত্বের উদার প্রান্তরে দাঁড়াইয়া মানুষের উপর মানুষের যুগবিসর্পী পীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে সবাপেক্ষা জনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁহার রচনার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকারদের রচনা অপেক্ষা অনেক গুণে বেশী। কিন্তু কেবল ইহাতেই যে তিনি সমধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার রচনার পশ্চাতে ছিল তাঁহার একটি সমাজ-সচেতন স্বচ্ছ দৃষ্টি। এই দৃষ্টি লইয়াই তিনি তাঁহার সমকালীন সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও রুচিবোধের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জনপ্রিয়তার সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ ইহাই।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজের মতো বাঙলাদেশের হিন্দুসমাজেও দীর্ঘকাল ধরিয়া কতকগুলি কুপ্রথা বদ্ধমূল হইয়া ছিল। এই সকল কুপ্রথা যুগের পর যুগ মানুষের মনুষ্যত্বকে অবদমিত করিয়া রাখিয়া পরিশেষে অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ আত্মসমাধি রচনা করিতেছিল। আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালীর অন্তর্জগতে প্রথার দাসত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইতেছিল এবং তাহাই নবযুগের ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল। সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি প্রথার নিবারণে ও বিধবাবিবাহের বৈধতা প্রতিপাদনে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় যে আন্দোলন দেখা দিয়াছিল, তাহাকে বাঙালী মনের দীর্ঘসঞ্চিত বিক্ষোভেরই প্রকাশ বলা চলে। আবার এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, নারী-প্রগতি বিষয়ে নবযুগের বাঙলায় যত রকমের আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে নর-নারীর সুচিরবর্ধিত বৈষম্য ঘুচাইবার একটা সযত্ন প্রয়াস। উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে—বিশেষ করিয়া এই শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালীর এই সংস্কার-প্রয়াস বিশেষভাবে জোরালো হইয়া উঠিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের নাটকে ইহার সার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

গিরিশচন্দ্রের একখানি সামাজিক নাটক—'বলিদান'। বাঙলার হিন্দুসমাজে একসময়ে পণপ্রথার কৃপায় বিবাহের নামে কিরূপে কন্যাকে বলি দেওয়া হইত, তাহার একটি অনবদ্য চিত্র এই নাটকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুগের সংস্কারচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই নাট্যকার তাঁহার নাটকে এই সংস্কারযোগ্য বিষয়টির উপস্থাপনা করিয়াছেন। এইজন্য নাটকখানি একান্তভাবে যুগোপযোগী হইয়া উঠিয়াছে।

নাটকটিতে করুণাময় বসু নামে এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের তিন কন্যার বিবাহ-ব্যাপার বর্ণিত। সে-যুগে প্রচলিত উৎকট পণপ্রথার চাপে পড়িয়া করুণাময় বিপদ গণিতেছেন। প্রথমা কন্যা কিরণময়ীর বিবাহ দিতে গিয়া যে-কয়টি পাত্রের তিনি সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটিরই—কেবল ছেলে বলিয়া—যোগ্যতা অপেক্ষা পণ্যমূল্য অনেক বেশী। তাঁহার নিজের কথায়ই জানা যায়: 'প্রথমটির বাপের আড়াই কাঠা জমীর উপর একখানি বাড়ী। শুনতে পাই, সেই বাড়ী বাঁধা দিয়ে দু'খানি ঘর তুলেছে! আঠার বছরের ছেলে, স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, বাপের অন্ন ধ্বংসান আর শখের থিয়েটার করেন। তাঁর দর

হাজার টাকা নগদ, হাজার টাকার গহনা, খাট-বিছানা, ঘড়ীর চেন—তিন হাজার টাকার ধাক্কা। আর একটী ছেলের বাড়ী-ঘর-দোর নেই, কল্‌কাতায় বোনের বাড়ী এসে পড়া-শুনা ক'রছে, এখনও একটা পাশ করে নাই, তাঁরও খাঁই দু'হাজার টাকার কম নয়। আর একজনের বাপ চীনেবাজারের মুহুরী, শুন্‌তে পাই, দেশে বাড়ী-ঘর-দোর আছে, কল্‌কাতায় দু'খানি ঘর ভাড়া ক'রে বাপ-বেটায় থাকেন। ছেলেও নাকি দিনকতক বাদে বাপের সঙ্গে চীনেবাজারে বেরোবেন। ছেলেবেলায় ব্যামো হ'য়ে স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন, ইংরিজি পড়া-শুনো হয় নাই। এরও ওজন-দরে সোণা চাই, ঘড়ি-ঘড়ীর চেন চাই। আর এক-জনের বাপ কোন্ হৌসে চাক্‌রি ক'ত্তেন, চোর বদ্‌নাম নিয়ে বাড়ীতে ব'সে আছেন। ছেলে দু'বার পুলিসে জরিমানা দিয়েছেন, হ্যাণ্ডনোটের দালালি করেন, মাসের মধ্যে পনের দিন বাড়ী থাকেন না। তাঁর বে ক'রতে বড় ইচ্ছা নাই, তবে এক রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব হ'লে, ঘটক ঠাকুরের প্রতি কৃপা ক'রে আর কনের বাপের মাথা কিনে বে ক'রতে রাজী হ'তে পারেন।' [১/১]

অবশেষে কালীঘটকের ঘটকালিতে করুণাময় কিছু কম পণেই কিরণ্ময়ীর বিবাহ দিলেন। কিন্তু শীঘ্রই জানা গেল যে, জামাতা মোহিতমোহন লম্পট ও মাতাল এবং তাহার মাতা 'বউকাঁটকী'। স্বামী ও শাশুড়ীর নির্যাতনে অতিষ্ঠ হইয়া কিরণ্ময়ী কিছুদিনের মধ্যেই পিত্রালয়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহার পর দ্বিতীয়া কন্যা হিরণ্ময়ীর পালা। কন্যাভারগ্রস্ত করুণাময় তাহাকে মুকুন্দলাল নামে এক বিপত্নীক রুগ্‌ণ পাত্রের হাতে তুলিয়া দিলেন। বিবাহের অল্পদিন পরেই সে বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। বাকী রহিল কনিষ্ঠা কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী। কিন্তু দুই কন্যার বিবাহ দিয়া করুণাময় এরূপ ভাবে ঋণে জড়াইয়া পড়িলেন যে, এই কন্যার বিবাহ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। অর্থাভাবে তাঁহার একমাত্র পুত্র নলিনের পড়া বন্ধ হইয়া গেল। বিধবা কন্যা হিরণ্ময়ী নিজেকে পিতামাতার ভারস্বরূপ মনে করিয়া জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল।

এদিকে দেখিতে দেখিতে জ্যোতির্ম্ময়ীরও বিবাহের বয়স হইল। প্রতিবেশী এক ধনী ব্যক্তি তাঁহার দুশ্চরিত্র পুত্র দুলালচাঁদের সহিত জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহ ঘটাইবার জন্য করুণাময়কে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। দুঃখকষ্ট ও দুশ্চিন্তায় করুণাময় অনেকটা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি এই বিবাহে স্বীকৃতি দান করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইলেন। এই সময় কিশোর নামে

এক শিক্ষিত ও ধনবান যুবক করুণাবশতঃ জ্যোতির্ময়ীকে বিবাহ করিতে অগ্রসর হইলেন। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। কিন্তু বিবাহসভায় হঠাৎ দুলাল-চাঁদের পিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং করুণাময়কে তাঁহার চুক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। করুণাময় চিরদিনই সত্যনিষ্ঠ। শেষ বয়সে সত্যভ্রষ্ট হইতে হইল ভাবিয়া তিনি নিরতিশয় আত্মগ্লানি বোধ কবিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন আর তাঁহার করিবার কিছুই ছিল না। কিশোরের সঙ্গেই জ্যোতির্ময়ীর বিবাহ হইয়া গেল। অনুতপ্ত করুণাময় বিবাহের রাত্রেই উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিলেন। করুণাময়ের পত্নী সরস্বতীও গভীর শোকে প্রাণ হারাইলেন। হিন্দুসমাজের কন্যাবিবাহ-সমস্যা এইভাবে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে দুঃখ ও বিপর্যয়ের প্লাবন বহাইয়া দিল।

আলোচ্য নাট্যকাহিনীটি লক্ষ্য করিলে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, বিবাহ বিষয়ে সমাজে পুত্র ও কন্যার মধ্যে একটা বিপুল তারতম্য বর্তমান। পণপ্রথার অভিশাপ কেবল কন্যাকর্তাকেই বহন করিতে হয়। [ অবশ্য হিন্দুসমাজের তথা-কথিত নিম্নবর্ণের কোনো কোনো সম্প্রদায়ে বরপণের পরিবর্তে কন্যাপণেরও চলন আছে ]। বিবাহ ব্যাপারে 'ছেলের বাপ' ও 'মেয়ের বাপ'-এর মধ্যে যে গুরুতর ব্যবধান, ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে চিরন্তন বৈষম্যবোধেরই সাক্ষাৎ মিলিবে। গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক কালে এই সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকে সেই প্রতিবাদেরই প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যুগের বাস্তব রূপটি চিত্রিত করিয়াই গিরিশচন্দ্র তাঁহার কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন—যুগোচিত সংস্কারচিন্তার সহিত তাঁহার হৃদয়ের কোনো যোগ ছিল না। "কোন সামাজিক সমস্যাই তাঁহার চিত্ত কোনদিন অধিকার করে নাই; কারণ, তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, সামাজিক সমস্যামূলক বিষয় সম্পর্কে সমসাময়িক নেতৃবৃন্দ যাহা ভাবিতেন, তাঁহার নাটকের মধ্যে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র।··· তবে তিনি যে গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিতেন না, তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করেন নাই, তাঁহার 'শাস্তি কি শাস্তি' তাহার প্রমাণ। আত্মবোধ বিসর্জন দিয়া তিনি কোন সামাজিক আন্দোলনকে সমর্থন করেন নাই।"[১১] তাঁহার এই আত্মবোধ গড়িয়া উঠিয়াছিল ভারতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির একান্ত অনুগত হইয়া, এবং ইহার

ফলে তিনি কয়েকখানি পৌরাণিক ও ভক্তিরসাশ্রিত নাটক লিখিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই এরূপ উন্নত আদর্শ ও নীতিশিক্ষার মধ্যে তিনি মানুষ হইয়া উঠেন যে, নটজীবনের বিপরীতমুখী কর্মধারার মধ্যেও তাহার প্রভাব একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। এই প্রভাবেরই একটি উল্লেখযোগ্য ফল—'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'। এই নাটকে বেশ্যাসক্ত লম্পট বিল্বমঙ্গল হইতে সন্ন্যাসী সোমগিরি পর্যন্ত সকলেই কৃষ্ণভক্তির অমৃতধারায় সিক্ত হইয়া এক মহাজীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কৃষ্ণভক্তি লাভ করিলে উচ্চ-নীচ, পাপী-অপাপী সকলেই তুল্যরূপ সাধু ও পবিত্র হইয়া উঠে—ইহাই নাটকখানির প্রতিপাদ্য। ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা অনুসরণ করিয়া নাট্যকার ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ভগবানের নিকট সকলেই সমান—মহাপাপীও ভক্তিপথে থাকিলে ভগবানের করুণা হইতে বঞ্চিত হয় না। সমবর্ষী ভাগবতী করুণায় এই বিশ্বাসই গিরিশচন্দ্রকে অভিনয়-জগতের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা হইতে দক্ষিণেশ্বরের শান্ত পরিবেশের দিকে পথ দেখাইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তবৃন্দের মধ্যে বসিয়া তিনি সকলের সহিত সমভাবেই ঠাকুরের করুণা লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই সময়ে ঠাকুরের শিক্ষায় অদ্বৈতবাদ-প্রসূত এক মহান সাম্যবোধে তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার রচিত 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকে তাঁহার এই নবলব্ধ অনুভূতির উচ্ছল প্রকাশ। সামান্য ছাগশিশু হইতে ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ পর্যন্ত সকলেই যে জগন্মাতার সন্তান এবং সকলেরই প্রতি যে তাঁহার সমান স্নেহদৃষ্টি, এই বোধে উত্তীর্ণ হইয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকে বুদ্ধদেবের সাম্যমূলক দীর্ঘ উপদেশবাণী সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পুত্রকামনায় লক্ষবলি দিতে উদ্যত মহারাজ বিম্বাসারকে অসহায় 'ছাগপাল'-এর প্রতি নিষ্ঠুরতা বর্জনের উপদেশ দিয়া বুদ্ধদেব [ সিদ্ধার্থ ] বলিতেছেন :

'মহারাজ !
জীবগণ হিংসি' পরস্পরে,
ভাসে মহাদুঃখের সাগরে।
হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম্ম-উপার্জ্জন ?
দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয় ?…'[৪।২]

হিংসা ত্যাগ করিয়া বৃহৎ-ক্ষুদ্র-নির্বিশেষে সকলের প্রতি প্রেমবিস্তারই অদ্বৈতবাদের মূল শিক্ষা। গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনের রচনায় এই সাম্যাদর্শী শিক্ষাই বিশেষভাবে প্রচার করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাণ্ডার হইতে সমাহৃত এই যে মহান সাম্যবোধ, ইহা আবার উনিশ শতকের রবীন্দ্র-সাহিত্যেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' [১৮৮৪] নাটকে অসীমের সন্ধানী ব্যর্থ-সাধন সন্ন্যাসীর কণ্ঠে ইহার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি :

'অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।
যাহা-কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অনন্ত সকলি !
বালুকার কণা সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে ?
বড়ো ছোটো কিছু নাই, সকলি মহৎ।' [ ১০ম দৃশ্য ]

সন্ন্যাসী প্রকৃতির মায়াজাল ছিন্ন করিয়া অসীমের পরিচয় লাভের জন্য দীর্ঘকাল গুহার মধ্যে তপস্যামগ্ন থাকিয়া অবশেষে একদিন সিদ্ধিলাভ হইল ভাবিয়া জাগিয়া উঠিলন। তাঁহার মনে হইল—'বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞান-চিতানলে'। কিন্তু বিশ্বকে ভস্ম করিয়া তো বিশ্বেশ্বরকে পাওয়া যায় না, সীমাকে বাদ দিলে অসীমের স্থান কোথায় ? সীমার মধ্যেই যে অসীমের অবস্থান—সীমার রূপ ধরিয়াই যে অসীম ব্যক্ত হইতেছে, এই পরম সত্যটি উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সন্ন্যাসী আত্মকেন্দ্রিক সাধনাকেই বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বজীবনের স্পর্শে তাঁহার এই ভুল ভাঙিয়া গেল। সংসারের বিচিত্র মানবমণ্ডলী ও তাহাদের বিচিত্র কর্মকোলাহল সন্ন্যাসীকে ক্রমে ইহাই বুঝাইয়া দিল যে, সমস্তই সেই অসীমের প্রকাশ মাত্র। বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে এই যে অসীমের উপলব্ধি, ইহার নিকট বড়-ছোট বলিয়া কিছু নাই—আত্মপরভেদও মুছিয়া যায়। 'বিশ্বের সীমানা' ভাঙিয়া ফেলিতে চাহিয়া সন্ন্যাসী এই মহতী উপলব্ধি হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে বিশ্বসীমার নিকট নিজেকে ধরা দিয়া ইহাকেই একান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সীমার মধ্যে অসীমের সুর বাজিয়া উঠিয়া সীমায় সীমায় এবং সীমা ও অসীমে একাকার করিয়া দিল।

'সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা'কে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য-রচনার একটিমাত্র পালা বলিয়াছেন। সীমা ও অসীমের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান—সীমার মধ্যেই যে অসীমের প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ ভাবদৃষ্টিতে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই দেহসীমায় আবদ্ধ প্রতিটি মানুষকে

অসীমের প্রতিরূপ মনে করিয়া বিশ্বের সকলকেই সমান প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন। তাঁহার মানবপ্রেম কোনো বিশেষ ব্যক্তি, দেশ বা জাতিতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়া বিশ্বপ্রেমে পরিণতি লাভ করিয়াছে। বিশ্ব-প্রসারিত এই প্রেমই রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার কাব্যরচনার স্বপ্নলোক হইতে ক্ষণে ক্ষণে 'সংসারের তীরে' ফিরিয়া যাইতে প্রেরণা যোগাইয়াছে। সংসার-প্রত্যাবৃত্ত কবি বাস্তব জীবনের দুঃখ ও সংঘাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দরিদ্র ও সাধারণ মানুষকে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। কবির হৃদয়ের এই প্রেম ও করুণার ভাবটি তাঁহার রচিত 'মালিনী' [ ১৮৯৬ ] নাটকে সুপরিস্ফুট। এই ভাবটি 'মালিনী' নাটকের অব্যবহিত পূর্বে রচিত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তীব্র ভাবাবেগের সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। 'মালিনী' বস্তুতঃ 'এবার ফিরাও মোরে'র জীবন্ত ও বিস্তৃত সংস্করণ। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় 'বলো মিথ্যা আপনার সুখ, মিথ্যা আপনার দুঃখ', 'বাহিরিনু ধূসর প্রসর রাজপথে জনতার মাঝখানে' প্রভৃতি পঙক্তির প্রতিধ্বনি মালিনী ও সুপ্রিয়ের উক্তিতে স্পষ্টই শোনা যায়।

'মালিনী'-উপাখ্যানটি মূলতঃ বৌদ্ধকাহিনী হইলেও রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন-কল্পনার সৃষ্টি। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সংস্কারমুক্তি এবং মৈত্রী-করুণা-প্রণোদিত যে সত্য-ধর্মের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাই তাঁহাকে স্বপ্ন-কল্পনায় উদ্‌বোধিত করে। ইহাকে তিনি 'মনের একটা গভীর আত্মপ্রকাশ' বলিয়াছেন। এই কল্পনা তিনি চেষ্টা করিয়া করেন নাই, ইহা আসিয়াছে 'ঘুমন্ত বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে।' অর্থাৎ সীমা-অসীমের তত্ত্বদর্শী রবীন্দ্রমানসে বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীকরুণার আদর্শ অন্তর্লীন হইয়া ছিল, একটি কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া তাহাই উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে।

রাজকন্যা মালিনী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছে স্বাভাবিক হৃদয়াবেগের আবেশে। রাজ্যের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরা ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়াছে—তাহারা চাহিয়াছে মালিনীর নির্বাসন। মালিনীও রাজগৃহের সংকীর্ণ সীমায় নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে চাহে নাই, বিশ্বপ্রেমের মহতী বাণীতে ঘর-ছাড়ার ডাক সে শুনিতে পাইয়াছে। তাই মাতার নিকট তাহার আকুল প্রার্থনা :

'ওগো মা, শোন্ মা কথা—
বোঝাতে পারি নে মোর চিত্তব্যাকুলতা।
আমারে ছাড়িয়া দে মা, বিনা দুঃখশোকে,

শাখা হতে চ্যুতপত্রসম। সর্বলোকে
যাব আমি—রাজদ্বারে মোরে যাচিয়াছে
বাহির-সংসার।' [ ১ম দৃশ্য ]

জনজীবনের স্পর্শে আসিয়া মালিনীর হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে সর্বজনের প্রতি অফুরন্ত প্রেম ও করুণায়। এমন কি, 'বাহির-সংসার' হইতে যখন মালিনীকে ঘরে ফিরাইয়া আনা হইল, তখনও সে আত্মকেন্দ্রিক হইয়া থাকিতে চাহে নাই। রাজ্যের প্রজাদের প্রতি তাহার নির্দেশ :

'তোমরা যেয়ো না দূরে
এসেছ যাহারা। প্রতিদিন রাজপুরে
দেখা দিয়ে যেয়ো। সকলেরে এনো ডাকি,
সবারে দেখিতে চাহি আমি। হেথা থাকি
রব আমি তোমাদেরি ঘরে পুরবাসী।' [ ৩য় দৃশ্য ]

আত্মবিলোপী এই যে প্রেম—যাহা সকলেরই প্রতি সমভাবে প্রসারিত থাকিয়া সার্থক হইয়া উঠে, ইহাই আবার মালিনীর চিত্তকে ক্ষমাসুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ফলে সে তাহার নির্বাসনকামী প্রজাগণকে ক্ষমা করিতে পারিয়াছে—ক্ষমা করিয়াছে বিদ্রোহী ক্ষেমংকরকেও। এমন কি, মালিনীর একান্ত অনুগত সুপ্রিয়কে হত্যা করিয়াও ক্ষেমংকর মালিনীর এই মহতী ক্ষমা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। সুপ্রিয়ের আকস্মিক মৃত্যুর গভীর আঘাতে মূর্ছিত হইয়া পড়িবার মুহূর্তেও মলিনী পিতার নিকট আকুল আবেদন জানাইয়াছে :

'মহারাজ, ক্ষম ক্ষেমংকরে'। [ ৪র্থ দৃশ্য ]

মালিনীর প্রজ্ঞাদীপ্ত অন্তরে যে-প্রেম উদ্ভাসিত হইয়া একদিকে বিদ্রোহী প্রজাদের স্ববশে আনিয়াছে এবং অপরদিকে নবধর্মদ্বেষী ক্ষেমংকরকেও ক্ষমাগুণে জয় করিয়া লইয়াছে, তাহাই আবার সুপ্রিয়কে নবভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাকে দিয়া বিশ্বপ্রেমের মহাবাণী উচ্চারণ করাইয়াছে :

'স্বর্গ আছে কোন্ দূরে,
কোথায় দেবতা—কে বা সে সংবাদ জানে।
শুধু জানি বলি দিয়া আত্ম-অভিমানে
বাসিতে হইবে ভালো, বিশ্বের বেদনা
আপন করিতে হবে—যে কিছু বাসনা
শুধু আপনার তরে, তাই দুঃখময়।' [ ঐ ]

শত্রু-মিত্র-ভেদরহিত এই মহান প্রেমকে অন্যতম উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রসাহিত্য চিরন্তন সাম্যাদর্শী মানবধর্মের জয় ঘোষণা করিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাসাহিত্যে সাম্যবাদী চিন্তাধারার ইহাই পরম পরিণতি।

---

১। 'বহির্মুখী প্রভাব, বিশেষতঃ যে প্রভাব বহুকাল ধরিয়াও বিস্তার লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই—মাত্র কয়েক বৎসর ধরিয়া নাগরিক জীবনের একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট অংশের উপর নিজের অধিকার স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, জাতির সংস্কারের মধ্যে যদি তাহার প্রেরণা না থাকিত, তবে ইহা তাহার অন্তর্মুখী জীবনে এমন বিপুল সাড়া জাগাইতে পারিত না।' আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'মহাকবি শ্রীমধুসূদন'

২। তদেব : পৃ. ১৯১।

৩। তদেব : পৃ. ১৯১।

৪। শশিভূষণ দাশগুপ্ত : 'বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ'

৫। '১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমপাদে লর্ড রিপণের মন্ত্রণা-পরিষদের আইন-সদস্য স্যার সি. পি. ইলবার্ট যে বিল উপস্থাপিত করেন, তাকে অবলম্বন করে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে। দেশী বিচারকেরা যাতে ইউরোপীয়দের বিচার করতে পারেন, এ বিলের মধ্যে তারই সুপারিশ ছিল। বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ এই বিল ও লর্ড রিপনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু করে। ইউরোপীয়েরা আত্মরক্ষার জন্য একটি সমিতিও গঠন করেন। এই বিলের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সমাজের প্রতিক্রিয়া ভারতীয়দের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে তীব্রতর করে তুলেছিল।' রথীন্দ্রনাথ রায় : 'সাহিত্য-বিচিত্রা'

৬। 'ভারত-সঙ্গীত' কবিতার শিরোটীকায় আছে : 'ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদসাহদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব এবং মোগল সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে ভারত-ভূমি আচ্ছন্ন করিয়া মহারাষ্ট্র অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন মাধবাচার্য্য নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের হীনতায় একান্ত দুঃখিত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎসাহ-প্রবর্দ্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। শিবাজীর সময় হইতে তাঁহার প্রণীত সঙ্গীত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং অত্যন্ত আদরণীয় হয়। মাধবাচার্য্যের মৃত্যুর পর অন্যান্য গায়কেরা দেশে দেশে সেই গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারত-সঙ্গীত লিখিত হইয়াছে।'

৭। 'অমিতাভ' কাব্যের ভূমিকায় কবি [ নবীনচন্দ্র ] বলিতেছেন : 'অবতারদিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতি লাভ করে, তাঁহাদিগকে অধিক আমাদের আপনার বলিয়া বোধ হয়।'

৮। এইজন্য নবীনচন্দ্রের ত্রয়ীকাব্যকে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গচ্ছলে 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' [Mahabharat of the nineteenth century] আখ্যা দিয়াছিলেন।

৯। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় [ -সম্পাদিত ]: 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' [১৩৬০], পৃ. বিরানব্বই-তিরানব্বই।

১০। শশিভূষণ দাশগুপ্ত : 'বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ'

১১। 'খৃষ্ট' : সূচনা।

১২। 'দেশকে একান্ত করে দেখা কখনোই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম নয়—বরং স্বদেশীয়ানার বিরুদ্ধে সর্বদাই তাঁর সোচ্চার প্রতিবাদ। দেশের উপরে আছে পৃথিবী, জাতির উর্ধ্বে অবস্থিত সর্বমানবিকতা। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে সমকালীন রাজনীতির চাইতেও বড় স্থান দিলেন মানুষের চিরকালের সত্যকে, চিরদিনের সমস্যাকে, সুখ-দুঃখ-আশা আনন্দকে।' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'সাহিত্যে ছোটগল্প'

১৩। 'নৈবেদ্য' [ ৭০-সংখ্যক কবিতা ]।

১৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'সাহিত্যে ছোটগল্প'

১৫। 'সামাজিক প্রবন্ধ' : 'ভূদেব-রচনাসম্ভার'—প্রমথনাথ বিশী-সম্পাদিত

১৬। তদেব : পৃ. ৬৫।

১৭। তদেব : পৃ. ২০২।

১৮। তদেব : পৃ. ১৯৩।

১৯। তদেব : পৃ. ৮৬।

২০। 'পালামৌ' রচনাটির জীবননির্ভর সাহিত্যিক আবেদন লক্ষ্য করিয়া প্রবীণ সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য ইহাকে 'ভ্রমণোপন্যাস' বলিয়াছেন [ অধীর দে-প্রণীত 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা' গ্রন্থের 'পরিচায়িকা' দ্রষ্টব্য ]। বস্তুতঃ 'পালামৌ' তথ্যভারমুক্ত একটি রসসমৃদ্ধ রচনা।

২১। 'সঞ্জীবচন্দ্র ( পালামৌ )' : 'আধুনিক সাহিত্য'।

২২। সঞ্জীবচন্দ্রকৃত বঙ্গানুবাদ : 'রাধে, আর রাগ করিও না। চেয়ে দেখ, স্বয়ং হরি তোমার পদতলে।'

২৩। 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ', দ্বিতীয়াধ্যায়—পঞ্চম [ মধু ] ব্রাহ্মণ।

২৪। শশিভূষণ দাশগুপ্ত : 'বাঙলা-সাহিত্যের একদিক' পৃ. ১৪১।

২৫। 'ছিন্নপত্রাবলীর পত্রগুলি লেখা হয় ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। অধিকাংশ পত্রই কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা। পত্রগুলির সঙ্গে কবির ঘর-সংসারের এবং লৌকিক প্রয়োজনের কিছু কিছু কথা যে না ছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহা বর্জন করিয়া লৌকিক জীবনের পত্রচরিত্রকে আংশিক ছিন্ন করিয়া অভিনব সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

২৬। মহর্ষি বাল্মীকির অভিশাপবাণীটি এইরূপ :

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥'

২৭। নাটকখানির পুরা নাম—'কুলীন বৈদিককুল-কৌলীন করবাল ভূতং সম্বন্ধ সমাধি নাটকম্'। নাটকটিতে রচয়িতার নামের উল্লেখ নাই। ডঃ সুকুমার সেন আভ্যন্তর প্রমাণ হইতে ইহা অনুমান করিয়াছেন যে, নাটকটি রামনারায়ণের অথবা তাঁহার অগ্রজ প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের রচনা। 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড [ তৃতীয় সংস্করণ ], পৃ. ৪০।

২৮। নাটকটির রচনাকাল জানা যায় না। ডঃ সুকুমার সেন জানাইতেছেন, ১৭৮১ শকাব্দের কার্তিক সংখ্যা 'বিবিধার্থসংগ্রহ'-এ এই নাটকের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।—দ্রষ্টব্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪২।

২৯। 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ পৃ ২০৫।

৩০। তদেব : পৃ. ৩৩৬।

৩১। আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ ( ৩য় সং ), পৃ. ২১৯-২২০।

*

# শব্দসূচী

[ প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠাঙ্ক-সূচক ]


অক্ষয়কুমার দত্ত ৭, ১০, ৪৬, ৫৩, ২৩৭-৪১, ২৭৬, ২৯৬
অগাস্ট কোঁত ১৪৫ ['কোঁত' দ্রঃ]
অনুলোম ৩৬
অবলাবান্ধব ২৫৯, ২৮৩
অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ৯৭
অমিতাভ ২১
অমৃতাভ ২১
আত্মচরিত ২৮৩
আত্মজীবনী ২৭৫
আদি অস্ট্রেলীয় ১০৭
আদি নর্ডিক ১০৭
আদি ব্রাহ্মসমাজ ২৪৬
আনন্দচন্দ্র মিত্র ২১, ২২৭
আনন্দমঠ ৪৭, ১৫৪, ৩০১, ৩০৬, ৩১০-১
আনন্দমোহন বসু ২৫৭
আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব ১৯৩
আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ ১৫২, ১৫৫
আরপুলি পাঠশালা ১৫৯
আলালের ঘরের দুলাল ৮৯
অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ১৬০
অ্যাল্‌পাইন ১০৭
অ্যাল্‌পোদীনারীয় ১০৭
ইউনিয়ন চ্যাপেল ২৭৯
ইণ্ডিয়া গেজেট ৯৫
ইয়ং বেঙ্গল ৪৬, ১৬২-৩
ইলিয়াড ১৬৩
ঈশোপনিষৎ ৭১, ১৮৮, ২৩২
ঈশ্বর গুপ্ত ৫৮, ৬৬ ['গুপ্তকবি' দ্রঃ]
উইলিয়ম কেরী ৬৪ ['কেরী' দ্রঃ]
উইলিয়ম পিট ১৫২
উদ্ভট কবিতা ৮৭
উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম ১০১
উপনিষদ ১৮০, ১৮৪, ২৩১
উপযোগবাদ ১৪৫, ১৬৯
উমেশচন্দ্র মিত্র ২৫
এঙ্গেল্‌স ১৫১, ৩০৫
এডমণ্ড বার্ক ১৫৪
ওয়েন ৩২৯
কপালকুণ্ডলা ৩১৯
কবিকঙ্কণ ২৯, ১২৬, ১২৭
কবিকঙ্কণ চণ্ডী ১১৮, ১৩৭
কবীর ৭৫-৭, ৮২
কমলাকান্তের দপ্তর ১৭১
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ১৪২
কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ১৪২
কব্লিন ১৫৯
কাবে ৩২৯
কামিনী রায় ২২, ৩৯৫
কার্ল মার্কস ১৪৯, ৩৩৬ ['মার্কস' দ্রঃ]
কালা আইন ১৭৭
কিশোরীচাঁদ মিত্র ২৯৬
কুন্তী ৫৬
কুমারসম্ভব ১১৬
কুলীন-কাহিনী ৪১
কুলীনকুল-সর্বস্ব ২৫, ৮৮, ২২২, ৪২৮
কৃত্তিবাস ১২২-৩, ১৩৬
কৃষ্ণকান্তের উইল ৩১৬, ৩২৩
কৃষ্ণচরিত্র ৩১২, ৩৩৭
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮২, ১৬২
কেরী ১৫৯
কেশবচন্দ্র সেন ৮-১০, ৫৩, ৬৬, ৮২, ৯৬, ২৪১-২, ২৪৪, ২৪৭, ২৫০-১, ২৫৩-৪, ২৫৬, ২৬৭, ২৭৩, ২৮০-১

কোঁত ৩, ১৪৬-৭, ১৬৯, ৩০০, ৩৪০
কোরান ১৮০
ক্যাথলিক সোস্যালিজম ১৬৪
ক্রুজেড ৮১
ক্ষিতিমোহন সেন ৭৭, ৮৫-৮, ৯৮, ১০২-৩
খনা ৫৬
খ্‌ৱাজা মুইন অলদীন চিশ্‌তী ৭৮
খ্রীষ্ট ৩২৮
গান্ধারী ৫৬
গার্গী ৫৬
গিনি উপকূল ৩২
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৬-৭, ৪৪১
গুপ্তকবি ৪৭
গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ২৫৪
গৌরগোবিন্দ রায় ২৮১
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ৫৭
ঘনরাম ১২৮-৯, ১৩৭
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৫-৮
চণ্ডীচরণ সেন ৮৪
চণ্ডীমঙ্গল ১১৭, ১২৫-৬, ১২৮, ১৩৭
চন্দ্রশেখর ৩১৯-২০
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১০১
চর্যাপদ ১২০, ১৬৫
চার্লস [ প্রথম ] ৪৪
চার্লস টাউনশেণ্ড ১৫২
চিকাগো ৩৫২
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৪৯, ৫১, ৫৩, ১৩৯, ১৪৬
চৈতন্য ২৫২, ২৫৬
চৈতন্য ভাগবত ৬৩, ১৩৮
জন টমাস ৬৪
জন স্টুয়ার্ট মিল ১৪৮, ১৬৯, ৩২৯ ৩৩১, ৩৪০ ['মিল' দ্রঃ]
জনা ৫৯
জবালা ৩৭
জরৎকারু কাহিনী ১১৯
জরথুস্ট্রপন্থী ৬১
জর্জ ওয়াশিংটন ১৭৩
জর্জ গ্রেনভিল ১৫২
জর্জ টম্‌সন ২৮৯
জাঙ্গুলী ১১৮, ১১৯
জাতিভেদ ৮৫, ৮৮, ৯৮, ২৬২, ২৭৮, ২৮৫
জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা ২৩৬
জামাই বারিক ২৫, ২২২
জালিয়ানওয়ালাবাগ ৪৫
জিজ্ঞাসা ১০১
জীবনস্মৃতি ২৯৪
জে. ওয়ার্ড ৬৫
জে মার্শম্যান ৬৫
জেম্‌স মিল ১৬৯
জেম্‌স সিল্ক বাকিংহাম ১৯৭
জেরেমি বেন্থাম ১৬৯ ['বেন্থাম' দ্রঃ]
জ্ঞানান্বেষণ ৯৫
ঝালী ৭৬
টড ৩০৯
টমাস পেইন ১৫৭, ১৬৮
টিপু পাগল ১৫০, ১৭২
টুইলারিস ১৫৫
টেকচাঁদ ঠাকুর ৮৯ ['প্যারীচাঁদ মিত্র' দ্রঃ]
ডবলিউ গ্র্যান্ট্‌ ৬৫
ডি. বার্নসডন ৬৫
ডিরোজিও ৩, ৫৩, ১৬০-৩, ১৭৬
ডেভিড হিউম ১৬৮ ['হিউম' দ্রঃ]
ডেভিড হেয়ার ১৪২, ১৫৯
ড্রিংক ওয়াটার বীটন ১৫৯, ২০১ ['বেথুন' দ্রঃ]
ঢেকুর পালা ১৩০
তত্ত্বকৌমুদী ২৬৩, ২৮৩, ২৮৫
তত্ত্ববোধিনী ৫৩, ১৫০, ১৭২, ২৩৯, ২৯৬
তারাচাঁদ চক্রবর্তী ১৬১

দয়ানন্দ ৩৯
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৪৬, ১৬১, ১৬২
দাদূ ৭৫, ৭৭, ৮২
দাশরথি রায় ২১৬
দিদেরো ১৫৫
দীনবন্ধু মিত্র ২৫-৬, ৪৭, ১৬৩, ২২২, ৪৩২, ৪৩৮
দীনেশচন্দ্র সরকার ৮৭
দুর্গেশনন্দিনী ৩০০, ৩০৮
দেবী চৌধুরানী ১২, ৫৯, ৩০২, ৩১৮
দেবীবর ঘটক ৪০
দেবী ভাগবত ১১৯
দেবী সিংহ ৪৫
দেবেন্দ্রনাথ ৬৯, ৯৬, ২৩০-৪, ২৩৭-৯, ২৪১-২, ২৪৪, ২৪৬, ২৬৩, ২৬৫, ২৭১-৩, ২৭৫
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২১
দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৪২, ১৬২
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ৪৬
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ২১
ধর্মমঙ্গল ১২৮-৩০
ধ্রুবানন্দ মিশ্র ৮৭
নগেন্দ্রনাথ বসু ৬২, ৮৬, ১০৪
নন্দকুমার ৪৫ ১৪০
নবনাটক ২৫, ২২২, ৪৩০
নববিধান ২৫৩
নবীনচন্দ্র সেন ২০-১, ৩৮১
নিকোলাস [ দ্বিতীয় ] ৪৪
নিজাম অলদীন ঔলিয়া ৭৮
নীলদর্পণ ২৬, ৪৭, ১৪৪, ১৫৪, ১৬৩ ২৯১-২
নেগ্রিটো ১০৬
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৫৫
পদ্মাপুরাণ ৬৩, ১১৯, ১২৫
পদ্মাবতী ১১৯
পদ্মিনী উপাখ্যান ৪৭, ২৯৮
পরাশর সংহিতা ২০৯-১০
পরিচারিকা ২৪৭
পলাশীর যুদ্ধ ২১, ১৫৪
পামর ১৫৯
পালামৌ ২৩
পোপ ৮০
পোবিডোনোস্টেভ ৪৪
প্যারীচাঁদ মিত্র ১৬১, ২৯৬ ['টেকচাঁদ ঠাকুর' দ্রঃ]
প্রতাপাদিত্য ১৮
প্রতিনিধি সভা ২৫১
প্রতিলোম ৩৬
প্রত্যক্ষবাদ ১৪৫-৬, ১৬৯
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ২৮৪
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৪১, ১৬২
প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ১১৩
প্রার্থনা পত্র ১৯৪, ১৯৬
প্রেরিত মহাপুরুষবাদ ২৫১-২
প্রোটেস্টাণ্ট্ ৬১, ৮১
প্লেটো ১৪৮
প্লেহ্‌বি ৪৪
ফণা ৭৭
ফরাসী বিপ্লব ১৫৫-৬, ৩২৮, ৩৪০
ফুরিয়ে ১৪৯
ফ্রান্সিস বেকন ১৬৮ ['বেকন' দ্রঃ]
বঙ্কিমচন্দ্র ১১-৪, ২৩, ৪৭, ৫২, ৫৯, ৬৬, ৮২, ৮৮, ৯৩, ৯৪, ৯৮, ১০১, ১০৪, ১৫১, ১৬৩, ১৭০-১ ২৯৬
বঙ্গবিজেতা ২২, ৩৯৭
বলিদান ২৬
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩-৪, ৪২৩
বল্লাল সেন ৪০, ২১৯
বাংলার নারী জাগরণ ২৮৪
বামাবোধিনী পত্রিকা ২৪৭
বাল্যবিবাহ নাটক ২৫
বাল্যোদ্বাহ নাটক ২৫

বিজয়কুমার গোস্বামী ২৫৭, ২৮৫
বিজয় গুপ্ত ৬৩, ১১৯, ১২৫
বিদ্যাসাগর ৫-৬, ৫৭, ৯৭, ১৬২, ২০০-১, ২২৫-৮
বিধবা-বিবাহ নাটক ২৫
বিপিনচন্দ্র পাল ১৬৬, ১৬৮-৯, ১৭৬, ১৭৮, ২৪৬, ২৫০, ২৭২, ২৭৭, ২৭৮, ২৮৩
বিপ্রচরণ চক্রবর্তী ৮৪
বিবেকানন্দ ১৪, ২৩, ৫২, ৬৭, ৬৯, ৮২, ১২৩, ১৫১, ১৬৩, ৩৪০, ৩৪৩-৮, ৩৫২-৩, ৩৬৬
বিশপ্‌স্ কলেজ ১৪২
বিষ্ণুপুরাণ ১৩৪
বুদ্ধদেব-চরিত ২৭
বৃদ্ধ হিন্দুর আশা ২৩৬
বৃন্দাবন দাস ১৩৮
বেকন ১৪৫
বেথুন ১৭৬
বেদ ১৮০, ১৮৪, ২৩১
বেন্থাম ৩, ১৪৫, ৩৪০
ব্যাস্তিল ১৫৫
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০, ২২৫
ব্রহ্মপুরাণ ১৩৫
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ১১৯
ব্রাহ্মণসেবধি ৬৫-৬, ১৮৫, ১৯৫
ব্রাহ্মিকা সমাজ ২৪৭
ব্ল্যাকিড্‌ ১০৭
ব্ল্যাক অ্যাক্‌ট ২৯১, ৩৩৫
ভট্ট-ভবদেব ৬১
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬, ১০০
ভরার মেয়ে ৪২
ভল্‌টেয়ার ১৫৫
ভাগোয়া ঝাণ্ডা ৪৬
ভারতচন্দ্র ১৬৫
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ২৩, ২১৫, ৪১১
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ৯৭
মখদুম সৈয়দ আলি অল্‌-হুজরীরী ৭৮
মদনমোহন তর্কালংকার ৫৭
মধুসূদন দত্ত ২০, ২৫, ৫৯, ৮২, ২৯৭, ৩৭০
মনোমোহন বসু ২১, ৯০
মহম্মদ ৭৭, ২৫২, ২৫৬
মহাযান ৬১ ১০১
মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ২২, ৩৯৮
মহেশচন্দ্র ঘোষ ৮২
মাধবচন্দ্র মল্লিক ১৬২
মাধবীকঙ্কণ ২৩, ৩৯৯
মানকুমারী বসু ২২, ৩৯৫
মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১১৭
মার্কস ১৫১, ৩০৫
মার্শম্যান ১৫৯
মিল ১৪৫, ১৫১, ১৬৯
মীয়াঁ। মীর ৭৮
মীর মশাররফ হোসেন ২৩, ৪১৬, ৪৪০
মীরাবাঈ ৭৬
মুকুন্দরাম ১১৭, ১১৯, ১২৬-৮, ১৩৭
মেকলে ১৪৩, ১৬৭
যোগেশচন্দ্র বাগল ১৭৬-৭
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২১, ৪৭, ২৯৮
রবিদাস ৭৫-৭
রবীন্দ্রনাথ ১৭-৯, ৭১, ৮০, ৯০, ৯৭, ১০১, ১৬৪, ২৭০, ২৭৫, ২৯৪, ৩৮৮, ৪০১, ৪১৮, ৪৪৬
রমেশচন্দ্র দত্ত ২২, ৮৫, ২৯৬, ৩৯৭
রসিককৃষ্ণ মল্লিক ৪৬, ৫৩, ৯৫, ১৬১, ১৭৬
রাজনারায়ণ বসু ৭, ১০, ৮৯, ৯০, ২১৬, ২৩৩, ২৩৬-৭, ২৭৪
রাজপুত জীবনসন্ধ্যা ২২, ৩৯৮
রাধাকান্ত দেব ৬৬, ১৪২, ১৬২
রাধানাথ শিকদার ৯০-১, ১৬১, ১৭৬-৭
রামগোপাল ঘোষ ১৬১-২, ২১৬, ২৮৯
রামতনু লাহিড়ী ১৬১, ১৭৬

রামনারায়ণ তর্করত্ন ২৫, ৪২৮
রামমোহন ৪-৬, ২৩, ৪৬, ৫৩, ৫৭, ৬৫-৭, ৬৯, ৭১, ৮২, ১০০, ১০১, ১৪১-২, ১৬২, ১৬৬, ১৮১, ১৮৩-৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯৪, ২০০, ২৩০, ২৫৮, ২৯১
রামাই পণ্ডিত ৬১
রামানন্দ ৭৫-৬
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২৬৭
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১০১
রুশো ৪৬, ৭১, ১৪৭-৮, ১৫৫, ১৫৭, ১৭০, ২৯৯, ৩০৫, ৩২৮, ৩২৯, ৩৪০
লক ১৪৫, ১৬৮-৯
লর্ড আমহার্স্ট ১৬৬
লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক ১৪২
লর্ড কর্ণওয়ালিশ ৪৯, ৫১, ২৮৯
লর্ড নর্থ ১৫৩
লালমোহন বিদ্যানিধি ৮৭
লুই ( পঞ্চদশ ) ৪৪
লুই ব্লাংক ( ব্লাং ) ১৪৯, ১৫০, ৩২৯
শঙ্করাচার্য ৭১-৩
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ২২৫
শাক্যসিংহ ৭১, ৭৩
শাস্তি কি শান্তি ২৭
শাহ ইনায়ত ৭৮
শাহ লতীফ ৭৮
শিবচন্দ্র দেব ১৬২, ১৭৬
শিবনাথ শাস্ত্রী ১৬৬, ১৭৫, ১৭৭-৮, ২৫৪-৫, ২৫৭, ২৬২, ২৬৬, ২৬৭, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৭-৮, ২৮৩-৫
শিশিরকুমার ঘোষ ৪৬
শূন্যপুরাণ ৬২
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৭২
শ্যামাচরণ শ্রীমানী ২৫
শ্রীঅরবিন্দ ২৮
শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা ৬২
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ২৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩১৮
শ্রীরাম পাঁচালী ১৩৬
শ্রীরামপুর মিশন ৬৪-৬, ৮১, ১০০
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ৩৩২
শ্লোক সংগ্রহ ২৪৬
সংবাদ প্রভাকর ৫৮
সংবাদ সাধুরঞ্জন ৫৮
সংসার ২২, ৪০০
সঙ্গত সভা ২৪২
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৩, ৪১৪
সতীদাহ ১৭৯
সত্যকাম ৩৭
সত্যবতী ৫৬
সত্যভামা ৫৬
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১
সপত্নী নাটক ২৫, ৪৩১
সমদর্শী ২৫৫-৬
সমাচার চন্দ্রিকা ৬৬
সমাচারদর্পণ ৬৪, ৬৬
সমাজ ২২, ৪০০
সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ-সমিতি ২৪১
সম্বন্ধ নির্ণয় ৮৭
সম্বন্ধ কৌমুদী ৬৬
সর্বশুভঙ্করী পত্রিকা ৫৭
সাধনা ১৬৪
সাধনাশ্রম ২৬৭
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২৫৩-৪, ২৫৭, ২৭৩, ২৮৩
সিপাহী বিদ্রোহ ২৯৭
সিয়া ৬১
সুনীতি দেবী ২৫২
সুন্নী ৬১
সুলভ সমাচার ৯৬
সূফী ৬১, ৭৭-৯
সে কাল আর একাল ৮৯

সেণ্ট সাইমন ১৪৯
সেরপুর বিবরণ ১৭২
স্টো ১৫৭
স্ট্যাম্প আইন ১৫২, ১৭৩
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক ৫৭
হরচন্দ্র চৌধুরী ১৭২
হরচন্দ্র ঘোষ ১৬২, ১৭৬
হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৭
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৯৬, ২৯৮
হিউম ১৪৫, ১৬৯
হিন্দু কলেজ ১৪২, ১৬০, ১৬২
হিন্দু পেট্রিয়ট ২৯৬
হিন্দু মেলা ৪৬, ৯০, ২৩৭, ২৯৮
হীনযান ৬১
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২০, ৩৭৫
হোমার ১৫৩
হ্যালিডে সাহেব ২০৩

Abraham Lincoln ৩৪, ৮৪
Age of Reason ১৫৭, ১৭৫
Andrew Johnson ৩৪
Athenium ১৬২
Bengal Spectator ৯১
Black Acts ১৬২
British Indian Association ৪৬
Byron ১৫৬
Calcutta University Calendar ১৭২
Campbell ১৫৬
Communism ১৪৮
Comte ১৫৬
Daniel Defoe ১৫৬
Das Kapital ১৪৯
David Hare ১৭৫
Du Contract Social ৪৬
Edward Aveling ৩৩৬
Europe and Asia ২৪৮, ২৮০
Faraday ১৫৭
First Continental Congress ১৫৩
Fourier ১৫০
French Revolution ১৭৫
George Eliot ১৫৬
Gibbon ১৫৬
Goldsmith ১৫৬
Gospel according to St. Mathew ১০
Grandfather of Nationalism ২৩৭
Hume ১৫৬
Imitation of Christ ৩৫০
India Gazette ১৪১
Indian League ৪৬
Ivanhoe ১৫৬
Jesus Christ ২৪৮, ২৮০
J. J. Rousseau ১৭৫
John Fitzgerald Kennedy ৩৪, ৮৪
John Stuart Mill ৯৬, ১৫৬, ১৭২, ১৭৫
Kant ১৫৬
Lecky ১৫৬
Le Contract Social ১৭০
Locke ১৫৬
Martin Luther King ৮৪
Milton ১৫৬
Minutes on Education in India ১৬৮
M. K. Gandhi ৮৬
National Association ৪৬
Newton ১৫৬
O. A. Sherrard ৮৪

Pantheism ৭৭
Paul and Virginia ১৫৬
Rajasthan ১৫৬
Rational Religion ২৬৫
Reynolds ১৫৬
Robinson Crusoe ১৫৬
Satyarth Prakash ৮৬
Scott ১৫৬
September Massacre ১৫৫
Shakespeare ১৫৬
Social Contract ১৪৭, ১৫৭, ১৭০, ১৭১, ১৭৪, ১৭৫
St. Simon ১৫৩
Swami Dayananda ৮৬
Thomas Paine ১৬৯, ১৭৫
Townshend Acts ১৫৩
Unitarian Christianity ১৯০
Unitarian Committee ১৮৭, ১৯০, ১৯৫
Universal Man ১৯৪
Universal Religion ১৮১
Vicar of Wakefield ১৫৬
Watt ১৫৭
Wilberforce ৮৪
William Wordsworth ১৭৫
Young Bengal ১৬১
Young India ৮৬
Young Man In The White House ৮৪